LIBRARY
2/123

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 2/123

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

2/89

Library

Sri Sri Mā Anandamoyee
Ashram
Varanasi (U.P.)

Presented by
Sri Shashadhar Bhattacharya
Jodhpur Park.
Calcutta - 31
9.2.75-

PRESENTED

LIBRARY
No....2/123
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

উপনিষদ্‌রহস্য

বা

গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা প্রণীত

LIBRARY
No....2/1.23
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

দ্বিতীয় খণ্ড

PRESENTED

অষ্টম খণ্ড

মহেশ লাইব্রেরী
পুস্তক-বিক্রেতা
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-৭৩

—ঃ ~~সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স~~ ঃ—
~~ওরিয়েণ্টাল পাবলিসিং কোং~~
~~১১ডি, আরপুলি লেন, কলিকাতা-১২~~

১৫৲

—: প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, উপনিষদ্‌রহস্য কার্য্যালয়,
শ্রীগুরুমন্দির, ৬৪ কালী ব্যানার্জ্জী লেন, হাওড়া

★

তৃতীয় সংস্করণ

★

জয়নারায়ণ প্রেস
১১ডি, আরপুলি লেন, কলিকাতা-১২ হইতে
শ্রীদেবীপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত

★

LIBRARY
No..........
mayee Ashram
BANARAS

উপনিষদ্ রহস্য

বা

গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মখণ্ড

[কর্ম্মযোগ]

PRESENTED
by
Shashadhar Bhattacharya
Calcutta

সাংখ্যযোগের ব্রহ্মখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, জীব নিজে সনাতন অব্যয়, তাহার উপর দিয়া সংস্কারের বা শক্তির বা বিরাটের বিবিধ চিত্রমালা প্রবাহিত হইয়া অহর্নিশ চলিয়া যাইলেও তাহার নিজ অস্তিত্বের তাহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। নিস্পৃহভাবে আপনার এই অচল সনাতন অবস্থায় যুক্ত হইয়া থাকিলেই ব্রহ্মশক্তি লাভ করা যাইতে পারে। তবে আর কর্ম্মের আবশ্যকতা কি? তবে কর্ম্মের হুড়াহুড়িতে আপনাকে বিনষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? আমি যদি বুদ্ধির দ্বারা আত্মসত্তায় যুক্ত হইয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমার কর্ম্মরূপ সংগ্রামে জর্জ্জরিত হইবার অন্য সার্থকতা কি?

তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন। প্রাণ যখন উক্তরূপ প্রশ্নে আপনাকে সংশয়াচ্ছন্ন বলিয়া বিবেচনা করে, প্রাণশক্তির সম্যক্ স্ফুরণ সাধনার দ্বারা সংঘটিত হইবার পূর্ব্বেই উক্তরূপ সন্দেহে জীবের পুরুষকার যখন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সে অবস্থাটা অতীব সঙ্কটাপন্ন। তাঁহাকে লাভ করিলাম না, জ্ঞানে তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিফলিত করিয়া, তাঁহাতে যুক্ত থাকিবার সংকল্প করিয়াই, কর্ম্ম বা সাধনাকে নিরর্থক বলিয়া বিবেচনা করিলাম। এ অবস্থাটি মোহাচ্ছন্ন অবস্থা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মহীন জ্ঞানমাত্র অবলম্বন করিয়া এই সঙ্কটস্থলে অনেক সাধক গতিহীন হইয়া পড়ে—অনেক সাধক এইরূপে পুরুষকারে জলাঞ্জলি দিয়া, তাহাদিগের ইহ জীবনের ধর্ম্মমুখী গতি হারাইয়া শান্তি-ভোগে বঞ্চিত হয়। অনেক বীর এই সঙ্কটে আলস্যপরায়ণ হইয়া নীরস অন্ধকারময় ত্যাগের পথে জীবন অতিবাহিত করে। অনেক জীবের যোগ-জীবন মায়ের ক্রোড়ে এইখানেই ঘুমাইয়া পড়ে, সুতরাং এটি একটি মহাপ্রশ্ন, এবং সর্ব্বাগ্রে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইয়া তবে কর্ম্মে অগ্রসর হইতে হয়। সেই জন্য ভগবান্ সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মযোগের অবতারণা করিলেন।

সাংখ্যযোগাধ্যায়ে যে অপূর্ব্ব বুদ্ধিযোগের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে

বুদ্ধিযোগের স্থূল অবয়বটুকু অঙ্কিত হইয়াছে মাত্র। সেই বুদ্ধিযোগে অনুরক্ত হইয়া, প্রগাঢ়ভাবে উহা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা সহজসাধ্য নহে। আমরা ক্ষুদ্র জীব, মহাশক্তির কণামাত্র লইয়াই আমাদের জীবত্ব। সেই কণামাত্র জীবত্ব আবার অহং-সংস্কারে সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ। মহাশক্তির প্রতি কণাই অনন্ত সত্য, কিন্তু জীবত্বের আবরণের ভিতর বদ্ধ থাকিয়া উহার সে মহিমা যেন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। অনন্ত জীবসংঘ-মণ্ডিত এ ব্রহ্মাণ্ডে আমরা মহাশক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাই সত্য, কিন্তু সকলগুলি যেন সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকণামাত্র। ঊষার শিশিরসম্পাতসদৃশ সে শক্তিকে আমরা জীবে জীবে দেখিতে পাই। বহু বহু বিন্দু, কিন্তু সবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র—ছেদযুক্ত, পরস্পর যেন বিচ্ছিন্ন। আমরা শক্তির সমুদ্র দেখিতে পাই না। আমরা এ জীবসংঘের সাধারণ গতি—সর্ব্বসাধারণ উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি না। জীবের কর্ম্মগুলিকে যেন স্ব স্ব স্বতন্ত্র কর্ম্মবিশেষ বলিয়াই আমরা বুঝিয়া থাকি। ব্যষ্টি জীবের কর্ম্ম, সমষ্টি জীবসংঘের কর্ম্মপ্রবাহের সহিত যেন সম্বন্ধশূন্য, এই ভাবে আমরা জৈবিক কর্ম্মকে পরিদর্শন করি। এইরূপ জ্ঞান থাকিতে বুদ্ধিযোগ সম্যক্ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তি যোগভ্রষ্ট হইয়া, জগৎময় বৈষম্য পরিদর্শন করিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়ে—আলস্যের মোহে পতিত হইবার উপক্রম হয়। সেই জন্য ভগবান্ অপূর্ব্ব কর্ম্ম-জীবনের একখানি বিশাল ছবি সাধকের সম্মুখে এই অবস্থায় ধারণ করেন। তখন সহসা কর্ম্মরূপে বিকশিতা জননীর কর্ম্মময়ী মূর্ত্তির দিকে সে সাধকের লক্ষ্য পড়িয়া যায়। সাধক দেখে, কর্ম্মহীনতা কোথাও নাই। জড় হইতে সূচনা করিয়া জীবচৈতন্য অবধি সমস্তই চিন্ময়ী মহাশক্তির তাড়নে অহর্নিশ কর্ম্মানুরত, আর সে সমস্ত কর্ম্মই সাধনামাত্র। জলে স্থলে, আকাশে ব্যোমে, যেখানে যত কিছু পরিবর্ত্তন, পরিণাম মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংঘটিত হইতেছে, সাধক দেখে, সে সমস্ত ব্রহ্মযজ্ঞ। তাহার নিজের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে, তাহার পঞ্চকোষাত্মক দেহে যাহা কিছু উদ্বুদ্ধ ও লীন হইতেছে, সে সমস্ত ব্রহ্মযজ্ঞ। ক্ষিতি বিরাটের উদ্দেশ্যে আপনার গন্ধতন্মাত্রা বিকীর্ণ করিতেছে, যেখানে যে প্রকারে সম্ভব, সেই প্রকারে আপনার গুণ বিকশিত করিতে ক্ষিতি কুণ্ঠিত নহে। পৃথিবীবক্ষে বিচিত্র গন্ধ যাহা কিছু অনুভব করি, সে সমস্তই ক্ষিতিতত্ত্বের তন্মাত্রা; ক্ষিতি নির্ব্বিচারে ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে তাহা বিকীর্ণ করিতেছে। সমুদ্রের জলরাশি বাষ্পাকারে অহর্নিশ সূর্য্যরূপ ব্রহ্মাগ্নিকুণ্ডমুখে ছুটিয়াছে অথবা যেখানে উত্তাপ, সেইখানেই মেঘাকারে নির্ব্বিরোধে ছুটিয়া চলিয়াছে। তেজ রূপের ডালি ধরিয়া, মরুৎ স্পর্শের কমনীয় অনুভূতি লইয়া, ব্যোম প্রণব-সঙ্গীতের মনোহর তরঙ্গ-হিল্লোল বুকে লইয়া বিরাটের পূজায় অবিরাম নিযুক্ত। তান্মাত্রিক দেবতাবর্গ এইরূপ তন্মাত্রার পুষ্পাঞ্জলি লইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিরাট্ পূজায় ব্যাপৃত। জীব-জগৎও

দেবতা-কল্পিত মাতৃপূজার দ্রব্যসম্ভার মাত্র; কিন্তু যজ্ঞীয় পশু যেমন বলি প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বক্ষণ অবধি আপনার যজ্ঞ-পূর্ণকরণরূপ মহাকার্য্য না বুঝিয়া, নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করে, তদ্রূপ সাধারণ জীবমণ্ডলী যজ্ঞার্থে সৃজিত হইয়াও আপনারা ভোগ করিতে করিতে অজ্ঞানভাবে সে মহাযজ্ঞে সহায়তা করে। জীবের লক্ষ্য যত দিন না এ বিরাট্ পূজার দিকে পড়ে, তত দিন জীব অহংজ্ঞানের পরিপোষণ করিতে করিতে এইরূপে দৈবী শক্তির দ্বারা যজ্ঞমুখে চালিত হইতে থাকে। যত যজ্ঞক্ষেত্রের নিকটস্থ হইতে থাকে, তত জীবের লক্ষ্য দেবশক্তির দিকে নিবদ্ধ হয়। তত সে দেখিতে পায়, এ জগৎ তাহার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অহং সেবার জন্য রচিত নয়; এক বিরাট্ অহং উদ্দীপিত হইয়া, তবে তাহার মত ক্ষুদ্র পরমাণুতেও সে অহংজ্ঞান ও ভোগ প্রকটিত করিয়া দিয়াছে। তাহার অহং এক বিরাট্ অহংএর অস্তিত্বে অবস্থিত ও নেতৃত্বে পরিচালিত। তখন সে জীব সাধকপদবাচ্য হয়, সে তাহার অহংটুকুকে বিরাট্ অহংএর উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি-স্বরূপ অর্পণ করিতে থাকে। সে বিরাটে—স্থূলে পরা প্রকৃতির পূজা দেখিয়া, আপনি তাহা হইতে উৎসাহ, আনন্দ, প্রেম লাভ করে ও সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া—সেই আনন্দে আনন্দিত হইয়া—সেই প্রেমে প্রেমিক হইয়া মহাযজ্ঞে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। সে বিরাট্ পূজার মন্দিরে আপনার সংস্কাররূপ পুষ্পপাত্রে যাহা কিছু পায়, তাহাই অঞ্জলি ভরিয়া বিরাট ব্রহ্মাণ্ডসংঘের সহিত সমস্বরে "মা মা" বলিতে বলিতে ঢালিতে থাকে।

এত দিন দেবশক্তির দ্বারা তাহার যে পুরুষকার সঞ্চিত ও পুষ্ট হইতেছিল বা যে শক্তি পুরুষকাররূপে প্রতিফলিত হইতেছিল, এইবার হইতে তাহার সেই পুরুষকার বা দেবশক্তি দেবতাদিগেরই ব্রহ্মযজ্ঞরূপ মহাকার্য্য পোষণে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। তাহার পূজা, দেবতাবৃন্দের পূজার সহিত মিলিত হইয়া সে মহাপূজাকে ঘনীভূত করিতে থাকে। অর্থাৎ এত দিন দেবতাদিগের দ্বারা সে পরিপুষ্ট হইতেছিল, এইবার সে দেবতাদিগের পরিপোষণ করিতে থাকে। এইরূপে দেব-সংঘের সহিত তাহার সম্বন্ধ গাঢ়তর হইয়া আসে, এবং তাহার সঞ্চিত পুরুষকারের সার্থকতা সংঘটিত হয়। সে দেবতাদিগকে আত্মশক্তি নিবেদন করে, এবং প্রতিদানে পুনরায় মঙ্গল-ধীশক্তি লাভ করিতে থাকে। তার পর সে দেবতা, সে জীব, সে বিরাট্ এক হইয়া যায়। যজ্ঞ, যজ্ঞকারী, দেবতা ও যজ্ঞাধিপতি এক হয়। আর সে আপনিই পুরুষকারের কেন্দ্র হয়। দেবতাদিগের নিকট আমরা যে শক্তি লাভ করি, তাহা প্রথমতঃ কর্ম্মরূপে ফুটিয়া সংস্কাররূপে আমারই ভবিষ্যৎ পুরুষকারের সঞ্চয় করে। ইহাকেই আমরা সাধারণতঃ দৈব বলিয়া উল্লেখ করি। বস্তুতঃ দৈব ও পুরুষকার দুইটি বিভিন্ন শক্তি নহে। দৈবরূপে যাহা লুকাইয়া থাকে, চেতনজ্যোতিতে পুরুষকাররূপে তাহাই ফুটিয়া উঠে, অন্য নূতন কোন শক্তি নহে। আজ যাহা পুরুষকার, কাল তাহাই দৈব; আজ যাহা দৈব, কাল তাহাই পুরুষকার।

স্থূলতঃ দৈবশক্তির সহিত আমাদিগের সম্বন্ধের মধ্যে দুইটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তর—যত দিন সে দেবশক্তি আসে ও পুরুষকাররূপে পুষ্ট হয়, কিন্তু দেবতাকে প্রতিদান করা হয় না বা দেবতাভিমুখে ধাবিত হয় না। এবং দ্বিতীয় স্তর, যখন সেই শক্তি প্রতিদানস্বরূপ পুরুষকাররূপে দেবতামুখে ধাবিত হয়। প্রথম অবস্থার লক্ষ্য ক্ষুদ্র অহংভোগ দুঃখ-জড়িত সুখ এবং বিরাম আলস্যে, মৃত্যুতে, জড়তায়। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ যখন ওই দৈবশক্তি বা পুরুষকার দেবতাভিমুখে প্রধাবিত, তখনকার লক্ষ্য বিরাট্ অহং, ভোগ দুঃখহীন সুখ, এবং বিরাম শান্তিতে, অমরত্বে, চৈতন্যসত্তায়। যত দিন আমরা কর্ম্মও করিব, অথচ কর্ম্মের কঠোরতা উপলব্ধি করিয়া আলস্য ও জড়তায় বিজড়িত হইয়া অবসাদ অনুভব করিব ও তিনিই সব করাইতেছেন বলিয়াও তাঁর ভাবে আচ্ছন্ন না হইয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিব, তত দিন আমরা প্রথম শ্রেণীর জীব। যখন আমরা আমাদিগের ক্ষেত্রোপজাত কর্ম্মের কঠোরতা কল্পনায় মগ্ন হইব না, এবং বিরাট্ শক্তি করাইতেছেন, আমি কর্ত্তা নহি ভাবিয়া আরও আনন্দস্ফুরিত হইয়া উঠিব, এবং বিফলতা আসিলে অবসাদ না পাইয়া শান্তিমাত্র লাভ করিব, তখন আমরা পরবর্ত্তী দ্বিতীয় অবস্থার জীব। "ভগবান্ করাইতেছেন, আমি নহি"—এই জ্ঞানটুকু প্রথম অবস্থায় জীবের আলস্য পরিবর্দ্ধন করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় জীবের উৎসাহ সম্বর্দ্ধিত করে। বস্তুতঃ ভগবান্ করাইতেছেন, এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইলে প্রাণ কি নব বলে বলীয়ান্ হয় না? সে মঙ্গলময়ী চিন্ময়ী শক্তি যখন এ কার্য্য করাইতেছেন, তখন আবার অমঙ্গল, নিরাশা, অকৃতকার্য্যতার আশঙ্কা কেমন করিয়া বুকের ভিতর আসিতে পারে? বিশ্বজননী মা আমার সহায়, এ কথা কি মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার করে, না—আলস্য পরিবর্দ্ধন করে? যাহারা এ কথায় নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্রয় দেয়, তাহারা প্রথম শ্রেণীর জীব, এখনও সাধক হইবার যোগ্য হয় নাই।

যাঁহারা এই দ্বিতীয় অবস্থার শেষ সীমায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্থূল ক্রিয়া হ্রাস হইয়া যায়, কিন্তু নিষ্ক্রিয়তা তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে, তাঁহারা অহর্নিশ অন্তঃস্ফুরণে স্ফুরিত ফুটন্ত কুসুমের মত বা দীপ্ত সূর্য্যের মত অন্তরে তেজঃসত্তা-সমন্বিত। স্থূল জগৎ ও স্থূল কর্ম্ম তাঁহাদিগের চক্ষে প্রতিফলিত হয় না। তাঁহারা অন্তর্জগতে অহর্নিশ জাগ্রত চৈতন্যে যুক্ত থাকেন এবং চৈতন্যেই বিরাম লাভ করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহাদিগের বিরাম স্ফুরণে। চিন্ময়তা তাঁহাদিগের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম হইয়া যায়। অন্তর্বাহ্য সমস্ত এক অন্তর্য্যামীর চিদ্‌বিলাসরূপে সে দেখে আপনার অন্তরে এবং অন্তরেই সে চেতন-সত্তায় রমমাণ থাকে। অন্তরে সে সমস্ত লাভ করিয়া আত্মাকেই ব্রহ্মরূপে পরিদর্শন করে। যতক্ষণ তুমি দেখিবে, অপরে তোমার কার্য্য করিয়া দিলে তুমি সুখী হও, কিন্তু আপনি করিতে হইলেই ভগবানের কর্ত্তৃত্ব দেখ ও নিষ্ক্রিয়তার ভাণ কর,

ততক্ষণ বুঝিও, তুমি পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছ, তোমার নিজ ধর্ম্ম নহে। এই পরধর্ম্ম গ্রহণ করারূপ একটি অবস্থা, পূর্ব্ব দুইটি অবস্থার সঙ্গমস্থলে আসিয়া সকল জীবেই দেখা দেয়। এ অবস্থায় বিশেষভাবে কর্ম্ম ও বিরাট্ কর্ম্মযোগ হৃদয়ে প্রতিফলিত করিতে হয়। অর্জ্জুনের এই অবস্থাকেই ভগবান্ এই তৃতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য করিয়াছেন।

এস, প্রথম শ্রেণীস্থ জীব বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিও না। তোমার প্রকৃতিগত ভাব ক্ষুদ্র অহং। তোমার সেই ভাবকে বিরাট্ অহংভাবে পরিণত করিয়া লও। "তিনি করাইতেছেন" বলিয়া আরও উৎসাহ, আনন্দ ও সফলতা লাভ করিবে। তিনি করাইলে কার্য্যে বিফলতা আসিতে পারে না। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অনিবার্য্য, ওই জ্ঞানেরও আনন্দ ও উৎসাহ তদ্রূপ অনিবার্য্য। তোমার অভ্যন্তর দিয়া বিরাট্ মাতৃশক্তি প্রবাহিত, এ কথা মনে পড়িলে আর মুহূর্ত্তের জন্য তুমি অলস মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবার অবসর পাইতে পার না। তুমি চারি ধারে বিরাট্ ব্রহ্মময়ী-পরিচালিত দেবতাবৃন্দ ও দেবতা-পরিচালিত জীবসংঘ পরিদর্শন কর। জগৎকে বিরাট্ যজ্ঞক্ষেত্র বলিয়া কল্পনা কর এবং আপনিও একজন সেই যজ্ঞের হোতা হইয়া দেব-কৃপার প্রতিদানকল্পে দেবতাভিমুখে কর্ম্মহবিঃ অর্পণ কর। তুমি দেখ, মহা দেবশক্তির দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে, দেখিয়া নিজ অহংজ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব বিরাট্ কর্ত্তৃত্বে ঢালিয়া দিয়া আনন্দে নির্ভয়ে উৎসাহে কর্ম্মে ব্রতী হও। তোমার ক্ষেত্রোচিত কর্ম্মে কর্ম্মে উৎফুল্লচিত্তে নদীপ্রবাহে তরঙ্গের মত নাচিয়া বেড়াও। রণস্থলে রণোল্লাসের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া যেমন কেহ থাকিতে পারে না, এ ব্রহ্মাণ্ডকে কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ দেখিলে তুমিও তদ্রূপ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে না।

যাঁহার আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্ম করিলেও দোষ নাই, না করিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু সাধারণ জীব তুমি, সে ধর্ম্ম পরিগ্রহণ করিও না। কেন না, তোমার কর্ম্ম না করিয়া অবস্থান করিবার সাধ্য নাই। এবং সে ক্ষমতা আসিলেও তুমি কর্ম্ম করিও। এ বিরাট্ কর্ম্মময় যজ্ঞাগারে তুমি কর্ম্মানুরত না থাকিলে তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাধারণ জীব কর্ম্মে নিরুৎসাহ হইবে। কার্য্যের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা বা স্বীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা এ পুণ্য কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মাসক্ত সাধারণ জীবের কর্ম্মবুদ্ধি ভেদ করিও না।

তোমার প্রকৃতি তোমার ক্ষেত্রানুযায়ী কর্ম্মে তোমায় প্রবর্ত্তিত করিবে। তুমি ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া কি করিবে? তুমি শুধু ইন্দ্রিয়-সকলের বা তোমার প্রকৃতির সে ক্রিয়ায় নিরপেক্ষভাবে অবস্থান কর, তাহার বশীভূত হইও না, তোমার এ প্রকৃতির বা ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন বাহির হইতে হইবে না, ইহার প্রকৃত কৌশল অভ্যন্তরে। তোমারই প্রকৃতি বুদ্ধি হইতে কর্ম্ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বুদ্ধি উহার নিশ্চয়াত্মিকা সূক্ষ্মা গতি, কর্ম্ম উহার স্থূল

বিকাশ মাত্র ; সুতরাং ইন্দ্রিয়কর্ম্মরূপ সে স্থূল গতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে সূক্ষ্মতম বুদ্ধি অংশের পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। তুমি সেই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বুদ্ধি আমাতে সংযুক্ত রাখিতে প্রয়াস পাও। বাহিরে কর্ম্ম এখন যাহাই হউক, তোমার ক্ষেত্র এখন যাহাই হউক, সে দিকে চাহিও না। এইরূপে সূক্ষ্ম দিক্ হইতে কার্য্য আরম্ভ করিলেই তবে রজোগুণ-সমুদ্ভব কাম তুমি জয় করিতে সমর্থ হইবে। এবং ব্রহ্মোদ্দেশে কর্ম্ম করিতে করিতে আপনার অন্তরেই বিশ্ব অনুভব করিয়া, আপনার আত্মায় বিশ্বরূপ দেখিয়া, আত্মাকে চিনিয়া তাঁহাতে যুক্ত হইবে। কর্ম্মবিহীন হইয়া আত্মান্বেষণে অগ্রসর হইলে কষ্টসাধ্য পথে বিচরণ করা হইবে মাত্র।

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ওঁ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

PRESENTED

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

হে জনার্দ্দন! চেৎ যদি কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী (ইতি) তে তব মতা অভিপ্রেতা, হে কেশব! তৎ কিং ঘোরে কর্ম্মণি যুদ্ধে মাং নিয়োজয়সি।

ব্যবহারিক অর্থ।—জনার্দ্দন! যদি পূর্ব্বোক্তরূপ বুদ্ধিযোগ বা জ্ঞানই কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার অভিমত হয়, তবে যুদ্ধরূপ ঘোর কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ কেন?

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ পূর্ব্ব অধ্যায়ে সাংখ্য ও বুদ্ধিযোগ, এই দুই প্রকারে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। তীক্ষ্ণ দর্শনের সহিত দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি উভয় প্রকার যোগের দ্বারাই সাধককে কর্ম্মী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু স্থূলভাবে দেখিতে গেলে তাঁহার উপদেশদ্বয় বিরোধ-বিমিশ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাংখ্যযোগ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বলিবার ছলে তিনি প্রকৃতি-পুরুষ বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সাংখ্যমার্গী বা সন্ন্যাসীদিগের মত তিনি প্রকৃতি অংশকে “নেতি নেতি” করিয়া ধারণা করিতে উপদেশ দেন নাই; তিনি অবিচলিত ভাবে তাহার মধ্যে কেবল আত্মসত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন এবং সেই আত্মাকে ব্রহ্মরূপে দেখিবার জন্য বা আত্মাই ঈশ্বর, এই জ্ঞানে আরোহণ করাইবার জন্য কর্ম্মময় সাধনা অবলম্বনের উপদেশ দিতে প্রকৃতিবিপর্য্যয় যত প্রকারেই আসুক না কেন, তাহাতে নিজ অব্যয়, অচ্যুত, অবিনাশী, অচল, সনাতন অবস্থার প্রগাঢ় ধারণা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যদি “নেতি নেতি” করিয়া প্রকৃতি অংশকে বা পরিণাম-সকলকে উড়াইতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে কার্য্যতঃ পরিণামদর্শনমাত্রই ঘটিবে। “নেতি নেতি” করিলে প্রকৃতিরই ধ্যান করা হয়, প্রকৃতিকে আত্মমহিমরূপে দেখা হয় না। দুঃখ চাহি না—দুঃখ চাহি না বলিলে দুঃখেরই ধ্যান করা হয়। ইহা প্রকৃতি—ইহা প্রকৃতি, এরূপ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলে ভূত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে থাকে, প্রকৃতি আর ব্রহ্মপ্রকৃতি হয় না।

তাহা না করিয়া, অবিচলিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে ভূতের মোহ ছুটিয়া যায়। এই আভাসটুকু দিবার জন্য সাংখ্যমার্গ বলিতে গিয়া তিনি কর্ম্মেই বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ বলিবার কালে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্ম্মে সাধককে উত্তেজিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মাত্র সাংখ্যজ্ঞান ধারণা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি সাংখ্যযোগ বর্ণনাকালে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিবার জন্য উপদেশ দিতে পারিতেন না। ইহাই ভগবানের সাংখ্যযোগ বর্ণনার বিশেষত্ব। যে সাংখ্যযোগ অবলম্বন করিয়া জীব কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হয়, সেই সাংখ্যজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই ভগবান্ সাধককে কর্ম্মময় হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

আবার বুদ্ধিযোগ নামে তিনি কর্ম্মযোগের অবতারণা করিয়া ভগবানে প্রবল ভাবে বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত থাকিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কর্ম্মযোগের ভিতর কি প্রকার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে, তাহাই তিনি বুদ্ধিযোগ নামে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি আত্মার ব্রহ্মসত্তায় সাধককে অবিরাম যুক্ত থাকিয়া স্থিতধী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বুদ্ধিযোগ নামে কর্ম্মযোগ বলিতে গিয়া জ্ঞানের কথাই বলিয়াছেন। আত্মার নিত্যত্ব সাংখ্যজ্ঞানে জানিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মকর্ম্মময় হইতে জীবকে উপদেশ দিয়াছেন।

এইরূপে জ্ঞানের ভিতর কর্ম্ম প্রবিষ্ট করাইয়া এবং কর্ম্মের ভিতর জ্ঞানকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া তিনি কৌশলে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ কার্য্যতঃ উভয়ই যে এক, সেই শিক্ষার পূর্ব্বসূচনা করিয়াছেন। কর্ম্মযোগকে বুদ্ধিযোগ নামে অভিহিত করিয়া, আত্মার বিরাট্ ব্রহ্মসত্তার ধারণা করিতে উপদেশ দিয়া, ভগবান্ বস্তুতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ যে একই, যোগ অর্থে—কি জ্ঞানে, কি কর্ম্মে আত্মস্বরূপ ভগবানে যুক্তভাবে অবস্থান করা মাত্র এবং এই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় যে যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই মহাবাক্যটি বুঝাইয়াছেন।

কিন্তু ভেদবুদ্ধিযুক্ত ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাঁহার উপদেশের অন্তর্নিহিত এ মহাসত্যটুকু সহসা প্রতিভাসিত হয় না। তাঁহার বুদ্ধিযোগের কথা শুনিয়া সাধারণ সাধকের মনে হয়, যেন তিনি জ্ঞানেরই প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত উপদেশরাশি যেন জটিল বলিয়া বিবেচিত হয়। আর মনে হয়, যেন তিনি জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিতে বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। সেই জন্য অর্জ্জুন বা সাধকের প্রাণ এই সময়ে সমধিক কাতর হইয়া পড়ে এবং বলিতে থাকে—হে ভগবন্! তুমি আমাকে ঘোর কর্ম্মক্ষেত্ররূপ সংসার-রণাঙ্গনে প্রেরিত করিয়া কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ, আবার প্রাণের ভিতর জ্ঞান ফুটাইয়া কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছ, যেন কর্ম্ম হইতে অবসর লওয়াইবার জন্য প্রাণকে কর্ম্ম-বিরক্তি-যুক্ত করিয়া তুলিতেছ। যদি এই জ্ঞান অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে শরীরী করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ কেন? আমাকে

রণাঙ্গনে প্রেরণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেছ কেন প্রভু! আমায় ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদিগের নিগ্রহের জন্য কর্ম্ম-যুদ্ধ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিতেছ কেন? সংস্কার-স্তূপের মাঝে আমায় নিক্ষিপ্ত করিয়া, আমায় অহর্নিশ বহির্ম্মুখে ছুটাইতেছ কেন? তোমাতে যুক্ত হইয়া থাকারূপ জ্ঞান অবলম্বন করিলেই যদি আমার মঙ্গল হয়, তবে আর প্রাণে কর্ম্মের কশাঘাত করিতেছ কেন? তবে আমায় যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছ কেন?

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধকের প্রাণে যখন ভগবদ্‌জ্ঞান প্রকটিত হইতে থাকে, তখন হইতে প্রথম তাহার কর্ম্মে যেন অনাস্থা আসে; কি সামান্য জাগতিক কার্য্য, কি উপাসনা প্রভৃতি, সকল প্রকার কর্ম্মে ঔদাস্য প্রকাশ পায়। জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকি, তাঁহার সত্তায় নিমগ্ন হই, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রাণে প্রবল থাকে, নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মসত্তার ধারণার দিকে প্রাণের বেগ থাকে, নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত স্থৈর্য্য কল্পনায় প্রাণ ডুবিয়া থাকিতে চাহে, অথচ কার্য্যতঃ তাহা পারে না। এইরূপ উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া সে এক দিকে কর্ম্মহীনতা, আলস্য ও বিমর্ষতার দ্বারা আক্রান্ত হয়; অন্য দিকে ভগবৎলাভে আপনাকে বঞ্চিত দেখিয়া, আত্মিক উন্নতির কোন লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া, কিছু হইল না, জীবন বৃথা গেল, ইত্যাদিরূপে খেদ করিতে থাকে। তাহার প্রাণ যেন ভগবানের সাংখ্যযোগ শুনিয়া, সে স্থির চিদ্‌ঘন সনাতন অবস্থার লোভে যুক্ত হইয়াছে, অথচ বুদ্ধিযোগ বুঝিতে না পারিয়া, বুদ্ধিযোগকে যেন কর্ম্মবিরোধী অনুভব করিয়া তাহার প্রাণ কার্য্য করিতে থাকে। কিরূপ করিলে স্থৈর্য্য লাভ করিবে, তাহা ঠিক করিতে পারে না। ভগবদাভাস যত দিন না পাওয়া যায়, তত দিন জ্ঞান এইরূপ বিষাদবিমিশ্র জ্ঞান, ইহা কর্ম্ম-পূর্ব্বজ্ঞান। ভগবদাভাস পাইবার পরও শুধু জাগতিক কর্ম্মে নিস্পৃহতা আসে, কিন্তু উহা সাধনার মাত্রা পরিবর্দ্ধন করে। সাধারণ কর্ম্মও সাধনার অন্তর্গত হইয়া পড়ে। অর্জ্জুনের এ জ্ঞানস্পৃহাও কর্ম্মবিরক্তিযুক্ত, কর্ম্ম-পূর্ব্বজ্ঞান।

এই শ্লোকটি যে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার প্রশ্ন, তাহার বাহ্য লক্ষণ শ্লোকে সম্যক্ প্রকাশিত। মূল শ্লোকে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে দুইটি নামে সম্বোধন করিয়াছেন,—একটি নাম জনার্দ্দন, অন্য নাম কেশব। জনার্দ্দন শব্দের অর্থ এইরূপ,—"জনয়তি উৎপাদয়তি ব্রহ্মরূপেণ ইতি জনঃ,—অর্দ্দতি পালয়তি, অর্দ্দতি হন্তি চ ইতি অর্দ্দনঃ।" যিনি ব্রহ্মরূপে উৎপাদন, বিষ্ণুরূপে পালন, মহেশ্বররূপে সংহার করেন, তিনিই জনার্দ্দন। আর কেশব শব্দের অর্থ,—ক—ব্রহ্মা,—অ—বিষ্ণু, ঈশ—শিব, ব—গমনার্থক। প্রলয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র যাঁহাতে লীন হইয়া থাকেন, তিনিই কেশব। অথবা "কে জলে শববদ্‌ভাতি," কারণ-সলিলে যিনি শববৎ একমাত্র ভাসমান থাকেন। একটি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়রূপ বিরাট্ কর্ম্মব্যাপ্তিবোধক, অন্যটি কর্ম্মান্তের মহানিদ্রারূপ অপূর্ব্ব বিরাম, স্থির অবস্থাজ্ঞাপক। এইবার সমগ্র শ্লোকটির অর্থ দেখিলে বুঝা যায়, সাধক বলিতেছেন,

হে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ মহাকর্ম্মময়ী মহাশক্তি! যদি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি বা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর কেন আমায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ—কারণ-সলিলশায়িনী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরগ্রাসিনী, বিরামময়ী মহাশক্তি! ভগবান্ কর্ম্ম করিতে উত্তেজিত করিতেছেন, অহর্নিশ কর্ম্মের উদ্দীপনা প্রাণে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন, যেন তিনি কর্ম্মময় মূর্ত্তিতে আমাতে আবির্ভূত, এইরূপ বুঝিয়া—সাধক তাঁহার সেই মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া আপনার প্রাণের বেদন বুঝাইতে চাহে; সেই জন্য পূর্ব্বে জনার্দ্দন নামে অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছেন। তার পর তাঁর প্রাণের যথার্থ তৎকালীয় যে বিরামমুখী গতি, সেই বিরাম, সেই মহাস্থির অবস্থা তাঁর প্রিয় বলিয়া—সেই অবস্থা তাঁহার আকাঙ্ক্ষ্য বলিয়া—তিনি সেই বাঞ্ছনীয় অবস্থায় ভগবানের যে মূর্ত্তিতে অবস্থান করিবেন, সেই মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া কেশব নামে সম্ভাষণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণের তখনকার অবস্থা কর্ম্মক্লান্তিযুক্ত বলিয়া, জাগতিক কর্ম্মসকল বিষবৎ প্রতীয়মান হয় বলিয়া, তিনি অবসাদের মোহে আচ্ছন্ন বলিয়া, মহাশক্তির শান্তিময় কর্ম্মশূন্য ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিতে চাহিতেছেন। বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইয়া থাকিলেই স্থৈর্য্য লাভ হইবে, তবে যেন আর কোন কর্ম্ম করিতে হইবে না। কিন্তু কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্মের ভিতর সেই বুদ্ধিযোগ অবলম্বন না করিলে সে স্থিতধী অবস্থা যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এ কথা সাধক ত তখন জানে না; তাই কর্ম্ম হইতে কর্ম্ম না করিয়াই ছুটিয়া পলাইবার মোহে মুগ্ধ হইয়া, কেশবরূপে সে মহাশক্তিকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া, লোভযুক্ত চিত্তে বলিতে থাকে,—মা গো! আর কেন তবে আমায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ? দে মা মহার্ণব-শায়িনি! সর্ব্ববিধ্বংসিনি, স্থিরা জননি! ক্রোড় দে মা! কর্ম্মময়ী জনার্দ্দনরূপিণি, তোর কর্ম্ম-তরঙ্গে আর যে উঠিতে নামিতে পারি না; বিরাম না পাইলে আর যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না—দে—ক্রোড় দে মা! একবার তোর সেই নিষ্ক্রিয় নির্গুণ শুদ্ধ চিন্মাত্র অবস্থায় আমায় লইয়া চল মা! একবার স্থির হইয়া আমায় স্তন্যপান করিতে দে মা! একবার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত তরঙ্গ, সমস্ত সংস্কার সমভাবাপন্ন করিয়া, প্রসুপ্ত করিয়া, বিরল, জনহীন মহানীরব, নিস্তব্ধ, রুদ্ধ-কাল-স্রোত ক্ষেত্র রচনা করিয়া, আমায় বুকে ধরিয়া, আমার অভিনব অস্তিত্ব দেখিতে দে মা! আয়—নিশ্চিন্তরূপিণি কেশবমূর্ত্তিময়ি মা, আর ভাবিতে পারি না—ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল, প্রাণ মরু হইয়া গেল, আয়—নিশ্চিন্তে প্রলয়ে যেমন করিয়া থাকিস, তেমনি নিশ্চিন্তে আমায় অবস্থান করিতে দে! যে অবস্থায় আমার এ দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে, নব নব সঙ্কল্পরূপে অহরহ ব্রহ্মশক্তি উজ্জীবিত হইবে না, সেই সমস্ত সংকল্পের পালন হেতু মহাবিষ্ণুমায়া আমায় সে সকলে সম্বদ্ধ করিবে না ও তাহাদের ধ্বংস করিতে রুদ্রশক্তি প্রকট হইয়া ঘন ঘন বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভোগ করাইবে না, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্র-প্রসবিনি! আমায় সেই অবস্থায় লইয়া চল!

সাধক তখন জানে না, সেই অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্যই কর্ম্মবৃক্ষ রোপিত,

তাহারই ভিতর দিয়া বুদ্ধি-রস উৎসৃষ্ট এবং সেই বুদ্ধিরস ঘনীভূত হইয়া, মাতৃভাবযুক্ত হইয়া, তবে তার এই বাঞ্ছনীয় ফল প্রসব করিবে। মা আমার কর্ম্মানন্দ, ভোগানন্দ ও বিরামানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ অবস্থা, এবং সেই তিন আনন্দের অভ্যন্তর দিয়া যে কর্ম্মাকর্ম্মহীন পূর্ণানন্দ, যে আনন্দের অপব্যয় কোথাও নাই—কি কর্ম্মে, কি বিরামে, কি ভোগে, কোথাও ছেদ নাই—যে আনন্দ অবস্থায় কর্ম্মে আছি, কি বিরামে আছি, কি ভোগে আছি, এবম্বিধ অনুভূতি আসে না, সেই মহানিত্যানন্দ, এই চতুর্ব্বিধ আনন্দে আমাদের আনন্দময় না করিয়া ছাড়িবেন না, এ কথা সাধক আনন্দানুভূতির পূর্ব্বে বুঝিতে পারে না। এই কর্ম্মই আনন্দময় হইবে এবং ইহা ব্যতীত আর এক সর্ব্বানন্দের সমাবেশ লাভ হইবে। সাধক! আজ যাহা ভাল মন্দ বলিয়া বিচার করিতেছ, কাল সে সমস্তই ভাল হইবে; আজ যাহা হিতাহিত বলিয়া দর্শন করিতেছ, কাল সমস্তই হিতযুক্ত হইবে, আজ যাহা নিরানন্দযুক্ত উপলব্ধি করিতেছ, কাল তাহাই মহানন্দময় দেখিবে। তুমি ভাবিও না।

তবে সাধকের এ প্রশ্ন ঠিক সময়োচিত হইয়াছে। যতক্ষণ আমরা এ কর্ম্মক্ষেত্রকে আমার নিজের সংস্কারাত্মক দেহ, অথবা বিরাট্ ব্রহ্মসংস্কারাত্মক এ সংসার বা ব্রহ্মাণ্ড—এই উভয় সঙ্কল্পজাত পরিবর্ত্তনকে আনন্দময়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম না হই—তত দিন এই নরলোক সুখ-দুঃখবিজড়িত, হর্ষ-বিষাদমিশ্রিত, জন্মমৃত্যু-কণ্টকিত বলিয়া অনুভব করি। কখনও এ বিশ্বসাম্রাজ্যকে আনন্দ-নিকেতন বলিয়া আত্মহারা হই, কখনও বিষাদের আগার ভাবিয়া মর্ম্মাহত হই। এবং এই উভয় বিপরীত ভাবে পীড়িত হইয়া ক্লান্ত অবসন্ন হই ও শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ি—বিরামের কথা শুনিলে প্রাণ প্রলুব্ধ হয়। সেই জন্য অর্জ্জুন, কর্ম্ম না করিয়াই শান্তি পাইবার লোভে মুগ্ধ হইয়া এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। ইহা সে অবস্থায় স্বধর্ম্ম।

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ২

ব্যামিশ্রেণ এব বাক্যেন—ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা, ক্বচিৎ জ্ঞানপ্রশংসা ইত্যেবং বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সীব; তদেকং নিশ্চিত্য বদ, যেন জ্ঞানেন কর্ম্মণা বা অন্যতরেণ শ্রেয়োঽহম্ আপ্নুয়াম্।

ব্যবহারিক অর্থ।—তোমার জ্ঞান ও কর্ম্মোদ্দীপক বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধি বিমোহিত হইতেছে, অতএব একটি আমায় নিশ্চয় করিয়া বল, যাহাতে আমার শ্রেয় লাভ হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ জ্ঞানযোগের কথা বলিবার সময় কর্ম্মের প্রশংসা এবং কর্ম্মের কথা বলিবার সময় জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সাধকের প্রাণ শ্লোকানুরূপ অবস্থায় জ্ঞানের উপরই সম্যক্ আগ্রহবান্ থাকে সত্য,

কিন্তু সে জ্ঞানকে ঘনীভূত করিয়া হৃদয়ে ফুটাইয়া তুলিতে বা তদনুযায়ী ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে সক্ষম হয় না। হৃদয়ে জ্ঞান আছে সত্য, কিন্তু সে জ্ঞানের সহিত তাহার হৃদয়ের ঐক্য নাই; সুতরাং সে আপনার কাছে আপনি পদে পদে অপদস্থ হইতে থাকে। এবং সেই জন্য কর্ম্মমার্গ প্রয়োজনীয় বলিয়া সময়ে সময়ে প্রতিভাসিত হয়। এইরূপে কখনও জ্ঞানে, কখনও কর্ম্মে তাহার প্রাণ ধাবিত হইতে থাকে। যেন ভগবান্ কখনও তাহাকে জ্ঞানে, কখন তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন। কখনও ধর্ম্মময় কর্ম্মে—কখনও ধর্ম্মময় চিন্তনে, কখনও গৃহধর্ম্মে, কখনও সন্ন্যাসে তাহার প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইটা বিভিন্ন শক্তি নহে। একই শক্তি যখন মাত্র অন্তঃকরণকে পরিচালিত করে এবং বাহ্য কর্ম্মের সহায়তা না লইয়াও অনুভূতির বিকাশ করিয়া লয়, তখন উহা জ্ঞানপদবাচ্য; আবার সেই শক্তি যখন বাহ্য করণে উদ্রিক্তা হইয়া বাহ্য কর্ম্মসাহায্য অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুভূতি ফুটাইয়া তোলে তখন উহা কর্ম্ম। সাধনা উদ্দেশ্যে এই প্রকারে যখন কেহ বাহ্য কর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া, হৃদয়ে ভগবদনুভূতি ভোগ করে বা করিতে প্রয়াস পায়, আশ্রমোচিত কর্ম্মে বীতরাগ হইয়া, অথবা পূজা-যজ্ঞাদি ভগবন্মুখী কর্ম্মে অনাস্থাযুক্ত হইয়া শুধু ভাবের দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভে সচেষ্ট থাকে, তখন তাহাকে সন্ন্যাসী বলা যায়। আবার যখন কেহ আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া অথবা পূজাযজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া ভগবৎ-লাভে যত্নশীল থাকে, তখন তাহাকে কর্ম্মী বলা হয়। ক্ষেত্রের তারতম্যে এইরূপে সাধনা দুই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্য্যতঃ সাধনারূপ মহাকার্য্যটুকু উভয় ক্ষেত্রেই এক—ভগবদনুভূতি। ইহাই গীতার অভিপ্রায়। কর্ম্মের সাহায্যেই হউক অথবা জ্ঞানের সাহায্যেই হউক, আশ্রমধর্ম্ম ছাড়িয়াই হউক অথবা আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই হউক, ধ্যানাদির দ্বারাতেই হউক অথবা পূজাদির দ্বারাতেই হউক, মায়ে সংযুক্ত হইয়া থাকাই সাধনা। আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনও কর্ম্ম, পূজাদিও কর্ম্ম, ধ্যানাদিও কর্ম্ম, নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করাও কর্ম্মবিশেষ; সমস্ত কেবল কর্ম্মের আকারের বিভিন্নতা মাত্র। এ সৃষ্টিচক্র কর্ম্মময়; কর্ম্মশূন্য অবস্থা বা কর্ম্মশূন্য সাধনা হইতে পারে না। কেন না, সাধনা নিজেই কর্ম্মবিশেষ। যতক্ষণ না আত্ম-অস্তিত্বে জীব-অস্তিত্ব মিলাইয়া চিরস্থিতি লাভ করে, ততক্ষণ এইরূপে কর্ম্ম-সাহায্যেই সেই অস্তিত্বে মিশাইবার প্রয়াস জীবহৃদয়ে উদ্দীপ্ত থাকে, এবং অবস্থানুসারে বিভিন্ন কর্ম্মাসক্তি ফুটিয়া ফুটিয়া তাহাকে বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত করে।

কিন্তু সাধারণতঃ জগতে এ মূল কর্ম্মসাধনার কথা বিস্মৃত হইয়া, জীবের জীবনগতির বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া কাহাকেও সন্ন্যাসী, কাহাকেও কর্ম্মযোগী বলিয়া অভিহিত করে। আশ্রমধর্ম্ম-পরিত্যাগীদিগকেই সন্ন্যাসী এবং আশ্রমোচিত কর্ম্মনিরতদিগকে কর্ম্মী আখ্যা

দিয়া থাকে। আশ্রমেই জীবের জন্ম হয়; জীব আশ্রমধর্ম্মের অন্তঃস্থিত সাধনার কথা ভুলিয়া, আশ্রমের মোহে বা বিষয়ভোগাদি কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া পড়ে; এবং ভগবানের কথা স্মরণে আসিলে সেই সকল আশ্রম-ধর্ম্মকে মহাশত্রু ভাবিয়া মনে করে, এ সমস্ত হইতে অবসর না লইলে সাধনা হইবে না। সাধনা হউক বা না হউক, গৃহত্যাগী হইয়া পড়িবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। কাণে হাত দিয়া না দেখিয়া কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে। সমুদ্রে ডুবিয়া রত্ন উদ্ধার করিবার কথা না ভাবিয়া, সমুদ্র শুষ্ক করিয়া রত্নলাভে যত্নশীল হয় এবং তদ্রূপ যত্নশীল জীবই শ্রেষ্ঠ, এই প্রকার ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া পড়ে।

ভাগ্যবান্ সাধক, যিনি ভগবান্‌কে গুরুরূপে পরিদর্শন করেন, যিনি প্রাণের সমস্ত উদ্দীপনাকে ভগবৎপ্রেরিত বলিয়া ধারণা করেন, যিনি শিষ্যরূপে ভগবানের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে যখন দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত বুদ্ধিযোগের কথা উদ্ভাসিত হয়, সৌভাগ্যবশতঃ যখন তাঁহার ধীশক্তি মুখ্য সাধনার কথা প্রাণে প্রকটিত করে, অর্থাৎ যখন অনুভূত হয় যে, বাহ্য জীবনগতির পরিবর্ত্তনমাত্র সাধনা নহে, বুদ্ধির দ্বারা মায়ে যুক্ত থাকাই যথার্থ সাধনা, তখন তাঁহার প্রাণ নূতন আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সত্য, কিন্তু তত্রাচ মোহ দূরীভূত হয় না। তখনও তিনি নিজ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারেন, তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যের সহিত তাঁহার কর্ম্মের ঐক্য নাই। তাহার প্রাণ মায়ে যুক্ত হইতে চাহিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার স্বভাব তাহাকে জগৎসম্ভোগে রত করিয়া রাখিতেছে। বিষয়ের মায়া হনন করিতে তাহার প্রাণ সক্ষম হইতেছে না। বিষয়-সকল শত্রুভাবে তখনও তাহার চক্ষে প্রতিভাত; মন, ইন্দ্রিয়, সকলকেই অরিভাবে তাহার স্বভাব তখনও বুঝিতেছে এবং পূর্ব্ববৎ শত্রু বুঝিয়াও তবু তাহাদের মায়াতে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার প্রাণ সেই বুঝিয়া সর্ব্বত্যাগী হইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত; অথচ ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মে স্বভাব অনুযায়ী বিচরণশীল; ইন্দ্রিয়-সকল বাহ্য বিষয়-সকলকে মাতৃরূপে বহন না করিয়া বিষয়মাত্ররূপেই বহন করিয়া আনিতেছে। অর্থাৎ সে বিষয়-সকলকে তখনও বিষয়ই দর্শন করিতেছে, মাতৃরূপে দর্শন করিতে ইচ্ছা সত্ত্বেও পারিতেছে না; অথচ এই অক্ষমতার জন্য একবার ভাবিতেছে—ইন্দ্রিয়াদি হনন করি, এবং তাহার সূচনাস্বরূপ সন্ন্যাস অবলম্বন করি, আবার বুদ্ধিযোগের কথা জ্ঞানাকারে থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কার করিতেছে,—"কেন ছাড়িব? এই বিষয়ই যখন মা হইবে, তখন বস্তুতঃ ছাড়িবার আবশ্যকতা কি? কিন্তু তবু কেন ভগবান্ আমায় যুদ্ধে উত্ত্যক্ত করিতেছেন? কেন স্বাধীন পশুজীবনের মত ইন্দ্রিয়চালিত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে না দিয়া, হিতাহিত জ্ঞানাকারে অহর্নিশ আমায় চারি ধার হইতে সংযত করিয়াই রাখিতেছেন এবং ইন্দ্রিয়-জয়ের দিকেই জীবন-গতিকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন। যদি বিষয়-সকলই মাতৃরূপে প্রকটিত হইবে, তবে মনুষ্য-হৃদয়ে মনের

বিপক্ষে সমরায়োজনের আবশ্যকতা কোথায় ? মনকে হনন করিবার দিকে মনুষ্যবুদ্ধি কেন চালিত ?" পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়-সকলের মায়ামাত্র বা বিষয়-সকলের মায়ামাত্র আমাদের সমরের লক্ষ্য—ইন্দ্রিয় বা বিষয়-সকল নহে ; কিন্তু এ কথা তখনও সাধক ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই এইরূপ বিবিধ বিমিশ্র বুদ্ধি তাহার প্রাণকে আলোড়িত করে ; এবং মহামায়া যে ভাবে আমাদিগকে চালিত করিতেছেন, তাহা বিরোধপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইতে থাকে। বুদ্ধিযোগের কথায় তাহার বিষয়-মায়া যেন অলক্ষ্যভাবে আরও একটু প্রশ্রয় পায়, এবং ত্যাগের পথ হইতে বিষয়-ভোগযুক্ত, ইন্দ্রিয়-মায়া-কালিমা-লিপ্ত সাধারণ গৃহী অবস্থায় কখনও অনুরাগ বাড়ে, আবার সাধারণ জীবের ভাগ্যহীনতা পরিদর্শন করিয়া, সাধারণ সন্ন্যাস বা ত্যাগ অবলম্বন করিতে প্রাণ কখন চাহে। যথার্থ সন্ন্যাসী, গৃহাশ্রম ছাড়িয়া সন্ন্যাসাশ্রমমাত্র অবলম্বনেই যে হয় না, যথার্থ সন্ন্যাস পাইবার জন্যই যে গৃহধর্ম্ম, যথার্থ সন্ন্যাস পাইবার উপায়স্বরূপই যে মন ও ইন্দ্রিয়াদি মিত্র হইলেও শত্রুভাবে প্রাণকে বেষ্টন করিয়া মা সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, এ মহাজ্ঞান তখনও সাধক পায় না।

শুধু ইহাই কি ? সে অবস্থায় প্রাণের বিমিশ্র ভাবের সংখ্যা নাই। প্রাণ চাহে শান্তি এবং শান্তির উপায়স্বরূপ মায়া হননে সে অশক্ত ;—বাহ্যবিষয় মাত্র বিষবোধে বর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প ! বিষয়ে বিষবৎ অনুভূত মায়াংশটুকু পরিত্যাগ করিতে বিষয় পর্য্যন্ত ত্যাগেই অগ্রসর। আবার অগ্রসর হইয়াই দেখে, শব্দ স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ, কিছুই ভুলে নাই—কেহ যাইতে চাহে না—একান্ত রক্ত-সম্বন্ধে মর্ম্মে মর্ম্মে যুক্ত ! কোথায় ত্যাগ !—হইতে পারে না। সাপ মারিতে শিব মরে, অথচ সর্প সর্পবৎই প্রতীয়মান, শিবাঙ্গের আনন্দপ্রদ অলঙ্কার কুণ্ডলিনীর মত প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করিতেছে না। তার পর আবার স্বভাবের গতি এক প্রকার, প্রাণের গতি অন্য প্রকার ! সে কাতর হয় ; তাহার প্রাণ ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকে,—"মা গো, আমার প্রাণের বিরোধযুক্ত এই সমস্ত ভাবরাশিই তোমার আদেশ। প্রাণের আবেগও তোমার আদেশ মাত্র, আমার ভ্রান্তিসঙ্কুল কর্ম্মও তোমার আদেশ মাত্র। আমার স্বভাবের গতি, আমার মোহ, ভ্রান্তি, দুর্ব্বলতা, ইহাও তোমারই আদেশ মাত্র। আমার আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা, তোমাকে পাইবার আশা, ইহাও তোমার আদেশ মাত্র। আমার প্রাণের কামনা, আমার জ্ঞানের কলহ, আমার বুদ্ধির অস্থিরতা, আমার সংসার-মোহ, আমার সন্ন্যাসের স্পৃহা, আমার যত কিছু উদ্দীপনা, তোমার বাক্য ছাড়া ত কিছু নহে ; তবে এ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বাক্য আর না বলিয়া আমায় একমুখী, একগতি, এক তুমিময় করিয়া দাও। এক ধ্রুবের সন্ধান করিয়া দাও ; আমি আরও মোহান্ধ হইতেছি ; তোমার জ্ঞানের দীপ্তি যত ধীরে ধীরে লাভ করিতেছি, অন্ধকার যেন তত ঘনীভূত হইতেছে। হে এক, হে একেশ্বর, আমায় এক কর, এক আদেশ দাও—

আমার কোটি লক্ষ্যশূন্য বাসনা, কামনা, জ্ঞান, একমুখে ধাবিত কর, এক নিশ্চয়-প্রবাহে আমায় পূর্ণ কর। তুমি বিবিধ বিমিশ্র বিষয়রূপে আর আমার হৃদয়ে না নাচিয়া, একরূপে অন্তর্বাহ্য জুড়িয়া আমার চারি ধারে বেষ্টন কর মা! আমার প্রাণের যে কোন উৎস যে ভাবে যেমন করিয়াই উঠুক, যেন তোমাতে গিয়া মিলাইতেছে দেখিতে পাই মা। তুমি শত্রু মিত্র এক কর, হর্ষ বিষাদ এক কর, আলোক আঁধার ভাঙ্গিয়া এক কর, তুমি আমি ভাঙ্গিয়া এক কর। তোমার একত্বে আমার সহস্র জ্ঞান-চূর্ণিত, সহস্রভাব-খণ্ডিত হৃদয়কে আশ্রয় দাও! "একং মে বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।" শ্রেয় ও প্রেয় লইয়া মরিতেছি, প্রিয় ও শ্রেয়ের ধাক্কায় প্রাণ যাইতেছে মা; যাহা শ্রেয়, তাহা আমার প্রিয় হইতেছে না; যাহা প্রিয়, তাহা আমার শ্রেয় নহে বলিয়া বুঝিয়া ভয়ে মরিতেছি। প্রেয়-শ্রেয়দ্বন্দ্বে হৃদয় জর্জ্জরিত মা; শ্রেয় লাভও হইতেছে না, প্রিয় ভোগও নিশ্চন্তে হইতেছে না; যাহাকে বিষ বলিয়া জ্ঞান দিয়াছ, তাহাই প্রাণে প্রিয় করিয়া রাখিয়াছ; বিষ খাওয়াইতেছ, হে নিষ্ঠুর। আবার তার উপর বলিতেছ—ইহা বিষ! অমৃত খাইতে দিতেছ না, অথচ মাথার কাছে ধরিয়া লুব্ধ করিতেছ—ইহা অমৃত! লুব্ধ করিতেছ, শক্তি দিতেছ না; এ কি—এ কি ব্যবহার মা—এমন দগ্ধ আর করিও না। যাহা শ্রেয়, তাহাই কর মা—শ্রেয় আদেশেই আমার প্রাণ পূর্ণ কর মা! আর আমার প্রিয়ের অভাব হইবে না! আমার সমস্ত প্রিয়ত্ব গুটাইয়া লইয়া একমাত্র তুমি প্রিয়রূপে আমার প্রাণে দাঁড়াও। দাঁড়াইয়া শুধু শ্রেয়ের দিকে আমায় পরিচালনা কর। সমস্ত শ্রেয়-প্রেয় জঞ্জাল দূর হউক! যে দিকে চাই, সেইখানেই এ শ্রেয়-প্রেয় পরস্পর অসিহস্তে উপস্থিত। প্রাণ যেখানে যায়, অশোক-বনে সীতার অনুধাবনে চেড়ীর মত এ শ্রেয়-প্রেয় আমায় ব্যতিব্যস্ত করে; আর পারি না মা, তার পারি না! আমার প্রাণভরা শ্রেয়ও হয় না, প্রাণভরা প্রেয় লাভও হয় না। হে পূর্ণে! বুঝিয়াছি, এক না হইলে এ ছিন্নদেহ রাহুর প্রাণ পূর্ণ হইবে না। তুমি এক হও।

আরে সাধক! এখনও "শ্রেয়ঃ অহং আপ্নুয়াম্" রহিয়াছে যে! এখনও দূরে—এখনও দূরে!

কিন্তু ঠিক উপযুক্ত প্রার্থনা! আর কে আছে! আর কাহার কাছে চাহিবে? চাহ! কাতর হইয়া, পায়ে লুটাইয়া সেই প্রিয়ের কাছে শ্রেয় সন্ধান কর। প্রিয়—শ্রেয় হইবে। যাহাকে প্রিয় করিয়াছ, সেই তোমার শ্রেয় হইবে।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩

হে অনঘ, ময়া পুরা প্রোক্তা দ্বিবিধা নিষ্ঠা অস্মিন্ লোকে বর্ত্ততে। সাংখ্যানাং

জ্ঞানযোগেন (নিষ্ঠা), যোগিনাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠা। (দ্বিবিধা নিষ্ঠা একস্থা এব তু অধিকারিভেদেন প্রকারভেদমাত্রমুক্তং লক্ষিতম্ বা, পঞ্চমাধ্যায়ে দ্রষ্টব্যম্)।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে অনঘ অর্জ্জুন! আমি পুরাকালে বলিয়াছি, ইহলোকে দুই প্রকারের নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকশালীদিগের জ্ঞানে নিষ্ঠা এবং যোগীদিগের কর্ম্মে নিষ্ঠা।

যৌগিক অর্থ।—নিঃশেষরূপে চিত্ত যাহাতে অবস্থান করে, তাহাকে নিষ্ঠা বলে। এ নিষ্ঠা সম্বন্ধে পূর্ব্বে তিনি সূর্য্যদেবকে বলিয়াছিলেন, চতুর্থ অধ্যায়ে সে কথা বলা আছে, এবং সূর্য্যকে কখন কখন বলেন, সে কথা পরে আলোচিত হইবে। তবে সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই নিষ্ঠাকে দুই প্রকারে উপলব্ধ হইবার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চিরদিনই নিষ্ঠা দুই প্রকারে লক্ষিত হয়। এ উভয় প্রকারের নিষ্ঠা বস্তুতঃ দুই নহে, একই; তবে অধিকারিভেদে উহা ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। এক প্রকার নিষ্ঠা সাংখ্যমার্গীদিগের লক্ষণ, অন্য প্রকার যোগীদের।

ভগবান্ সাংখ্যমার্গীদিগকে যোগী বলিয়া সম্বোধন করিলেন না। সাংখ্যাবলম্বী পুরুষ জ্ঞানের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে নিত্যানিত্য-মিশ্রিত দেখিয়া, নিত্যের জন্য অনিত্যের দিক্ হইতে আপনার গতি ফিরাইতে থাকেন। এইরূপে তিনি কেবল ত্যাগের পন্থা অনুসরণ করেন; এবং কার্য্যতঃ এই জন্য বাহ্য লক্ষণ হিসাবে তিনি যোগী নামে অভিহিত না হইয়া বিয়োগী নামে অভিহিত হইতে পারেন। অনন্ত পরিণামশীলরূপে সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট এ ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে অবস্থান করিয়া, অনন্ত প্রকার তরঙ্গভঙ্গে পরিণামময় মনকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, পরিণামপূর্ণা প্রকৃতি দর্শন না করিয়া, জীব কয় মুহূর্ত্ত অবস্থান করিতে সমর্থ হয়? তিনি স্থূল প্রকৃতি দর্শন করিতে না চাহিলেও তাঁহার চিত্তে উহার প্রতিবিম্বপাত না ঘটিয়া থাকে না। এবং কার্য্যতঃ তাঁহাকে "ত্যাগ ত্যাগ" করিয়াই সমধিক ব্যস্ত হইতে হয়। তাঁহারা সাধারণতঃ সন্ন্যাসিপদবাচ্য। তাঁহাদিগের বাহ্য লক্ষণ ত্যাগরূপে প্রকাশ পায়। আশ্রমধর্ম্ম তাঁহাদিগের বিষবৎ প্রতীয়মান হয় এবং উহা তাঁহাদিগের চক্ষে উপেক্ষিত হইয়া পড়ে। ইহাঁদিগের ব্রহ্মনিষ্ঠা ত্যাগনিষ্ঠাতেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

অন্য প্রকারের সাধক এই প্রকৃতিকেও ভগবৎস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিয়া, সাধারণ দ্বিত্বজ্ঞান ভাঙ্গিয়া এক করিতে চাহে, দুই একে যুক্ত করিতে চাহে, এই জন্য ভগবান্ বাহ্যলক্ষণানুযায়ী ইহাদিগকে যোগী নামে অভিহিত করিলেন, ইহাঁরা সম্মুখে যাহাই পান, তাহাই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া ধারণা করেন; প্রাণের শক্তি, চিত্তের সমস্ত বৃত্তি, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অনুভূতিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাঁহারা মায়েরই অঙ্গে প্রক্ষেপ করেন। নির্গুণ সগুণ, সাকার নিরাকার সমস্ত ধারণা মাতৃঅঙ্গেই পর্য্যবসিত হয়; যত রকমের যাহা কিছু পায়, তাহাই মায়ে যোগ করিয়া দেয়। এই হিসাবে ইহাদিগকে

যোগী বলা এ স্থলে ভগবানের অভিপ্রেত। ইহাদিগের সাধারণ লক্ষণ ত্যাগ নহে—যোগ—পরিগ্রহণ ; বৃক্ষে পুষ্পে ফলে, জলে স্থলে আকাশে, সূর্য্যে চন্দ্রে, জীবে জড়ে, আলোকে আঁধারে, হর্ষে বিষাদে, গৃহধর্ম্মে সংসারত্যাগে, সর্ব্বত্র তাঁহাকে দর্শন করিতে ইহারা সচেষ্ট।

ইঁহারা সংসার-ধর্ম্মে অনাস্থাযুক্ত নহেন। ইঁহারা জাগতিক কোন অবস্থাতেই বিরক্তি প্রকাশ করেন না। সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত সংকল্প, সমস্ত আদানপ্রদান ব্রহ্মময় করিতে ইঁহারা প্রয়াস পান। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥" ইহাই তাঁহাদিগের লক্ষ্য। "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" এই ভাব ইঁহাদিগের বিশেষ লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্তপ্রকার জ্ঞাননিষ্ঠাযুক্ত পুরুষের যেমন মূল লক্ষ্যে সর্ব্বদা অবস্থিতি না হইয়া "ত্যাগ ত্যাগেই" অবস্থিতি হয়, অপর যোগনিষ্ঠা-যুক্ত পুরুষদিগের তদ্রূপ, মূল লক্ষ্যে অবস্থিতি না হইয়া সংসারে মোহযুক্ত কর্ত্তৃত্বাভিমানে অবস্থান সংঘটিত হয়। ভোগবিলাস আসিয়া বিরাট্কর্ত্তৃত্ব ভুলাইয়া দেয় এবং যোগ লক্ষ্য হইলেও ভগবদ্-বিয়োগেই উহা পর্য্যবসিত হয়। দুই প্রকার নিষ্ঠায় এই দুই প্রকার অন্তরায়। একের লক্ষ্য প্রত্যগাত্মায়, অন্যের পরমাত্মায় বা পরমেশ্বরে ; এবং আত্মা ও পরমাত্মা এক বলিয়া প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য হিসাবে উভয়ই এক। কার্য্যতঃ উভয়েই যোগী। কার্য্যের পন্থা হিসাবে বা প্রকৃতির সহিত ব্যবহারে একজন বিয়োগী, অন্য জন যোগী ; কার্য্যের দোষ হিসাবে উভয়েই মোহযুক্ত—উভয়েই উদ্দেশ্যভ্রষ্ট। সুতরাং উভয়েই স্থূলতঃ অঘযুক্ত। সেই জন্য সেই কলুষ লক্ষ্য করিয়া, উভয় মুখের সেই পতনে তীব্র দৃষ্টি করিয়া, ভগবান্ অর্জ্জুনকে এ স্থলে অনঘ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তিনি উভয় পন্থার সাধারণ উদ্দেশ্য যে আত্মযুক্ত অবস্থালাভ ও সেই যুক্ত অবস্থা লাভ করিতে সন্ন্যাস ও সংসারাশ্রমের বিরোধহীন একটি সাধারণ পন্থা আছে এবং উহাই যে অনঘ পন্থা ও অনঘ হইবার প্রকৃষ্ট উপায়, ইহাই অর্জ্জুনকে বুঝাইতে হইবে বলিয়া 'অনঘ' বলিয়া অর্জ্জুনকে সম্ভাষণ করিলেন। এমন একটি পন্থা আছে, যাহা অবলম্বন করিলে সংসারীও সন্ন্যাসের সুবিধাটুকু গ্রহণ করিতে পারে, এবং সন্ন্যাসীও সংসারাশ্রমীর সুযোগটুকু লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই পন্থা বর্ণনাই গীতার অন্যতম উদ্দেশ্য। অর্জ্জুনকে অনঘ বলিয়া, যেন তাঁহাকে সেই পন্থায় অভিষিক্ত করিয়া, বিরোধের মধ্যস্থলে যে ক্ষেত্রে সম্মিলন সম্ভব, সেই স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, উভয় পার্শ্বস্থ বিরোধযুক্ত অবস্থার বর্ণনায় অগ্রসর হইতেছেন।

এই স্থলে নিষ্ঠা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলি। সাধারণতঃ আমাদিগের তিনটি অবস্থা পরিলক্ষিত হয়—তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগের জীবনগতি প্রবাহিত হইতে থাকে,—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। তিনটি অবস্থা সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা

একটি মাত্র অবস্থারই অহর্নিশ ভোগ পাই। স্বাপ্নিক অবস্থাটুকু মাত্র আমাদিগের ভোগ্য। জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থার আস্বাদ আমরা হারাইয়া বসিয়া আছি। আমরা যাহাকে জাগ্রত অবস্থা বলি, উহা পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা নহে; আমরা যাহাকে সুষুপ্তি বলি, উহা পূর্ণ সুষুপ্তি নহে। আমাদিগের জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—সমস্তই স্বপ্নময় অবস্থা মাত্র। মায়ের আমার বিরাট্ শক্তিতে এই জাগরণ ও সুষুপ্তি অবস্থাদ্বয় পূর্ণরূপে প্রকটিত। মায়ের জাগরণে সৃষ্টি, স্বপ্নে স্থিতি ও সুষুপ্তিতে সৃষ্টির লয় সংঘটিত হয়। জাগরণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর জাগেন, মায়ের সুষুপ্তিতে তাঁহারা আপনাদিগের অস্তিত্ব হারান। এই পূর্ণ জাগ্রত ও পূর্ণ সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদিগের অধিকার নাই বলিয়া আমরা ইচ্ছাময় নহি। আমাদিগের ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সংঘটিত হয় না। যে দিন আমরা এই অবস্থাদ্বয় নিজ অধিকারে আনিতে সমর্থ হইবে, সেই দিন আমাদিগের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তৃত্ব আমাদিগের করে ন্যস্ত হইবে। আমরা মায়ের জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সঙ্গে আপনাদিগের জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি মিলাইয়া সমস্ত সৃষ্টিচক্র পরিদর্শন করিতে সমর্থ হইব।

যাহা হউক, জাগ্রত ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাদ্বয় আমাদিগের সাধনা দ্বারা লাভ করিতে হইবে বলিয়া আমাদিগের নিষ্ঠা এই দুই প্রকারের। এই শ্লোকে যে দুই প্রকারের নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই জাগরণ ও সুষুপ্তি অবস্থাদ্বয় লক্ষ্য করিয়া। জীবের নিষ্ঠা স্ব স্ব অবস্থা হিসাবে, কাহারও জাগরণের দিকে, কাহারও সুষুপ্তির দিকে। যাহাদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের দিকে, তাহারা সুষুপ্তিমুখী এবং সাংখ্যমার্গিরূপে জগতে তাহারাই পরিদৃষ্ট। যাহারা জাগরণমুখা, তাহাদিগের নিষ্ঠা—প্রকৃতিকে মাতৃ-অঙ্গে যুক্ত করিবার দিকে, এবং কর্ম্মযোগী নামে তাহারাই অভিহিত। জীব জন্মে জন্মে এইরূপে কখনও জাগরণ মুখে, কখনও সুষুপ্তির মুখে ধাবিত হয়। এই দুই মুখে সাধনার গতি জীব-জগতে পরিদৃষ্ট হয়। কয়েক জন্ম ধরিয়া এইরূপ কখনও জাগরণমুখে, কখনও বা সুষুপ্তিমুখে সাধনা করিবার পর, তবে জীব গীতারূপে প্রকটিত মহাপন্থার সন্ধান পায়। তখন সাধক এমন একটি সাধনার সন্ধান পায়, যাহা তাহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের সামঞ্জস্য সংঘটিত করিয়া দিয়া একটি অবস্থায় আনিয়া ফেলে। বিপরীতরূপে পরিদৃষ্ট এই জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থাদ্বয় এক হইয়া দাঁড়ায়, গতি উভয়মুখী আর না থাকিয়া, এক স্খলনহীন ধ্রুব অবস্থা তাহাকে আনিয়া দেয় এবং তাহার যাতায়াতস্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়।

যাহা হউক, এই উভয় প্রকার নিষ্ঠা বর্ত্তমান বলিয়া সাধনারূপ যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠানও প্রথমতঃ উভয়মুখী। জীবনকে ভগবন্মুখী করিতে হইলে, আমাদিগের জীবন-যাত্রার সমস্ত সাধারণ কার্য্যকে ভগবন্মুখী করাই প্রকৃষ্ট সাধনা হইলেও সর্ব্বদা জীব তাহা করিয়া উঠিতে পারে না; কর্ত্তৃত্বাভিমান আসিয়া কর্ম্মকে বন্ধনমাত্রে পরিণত করিয়া

দেয়; এবং সেই জন্য অন্য কতকগুলি বিশেষ আনুষঙ্গিক ক্রিয়ার সাহায্য জীবকে গ্রহণ করিতে হয়। সেই ক্রিয়াগুলিকে সাধারণতঃ যোগক্রিয়া বলিয়া শাস্ত্র অভিহিত করে। সেই যোগক্রিয়া বা সাধনাও উক্ত নিষ্ঠাদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য প্রথমতঃ উভয়-মুখী হওয়া উচিত। মূলাধার চক্রের দিকে যখন গতি থাকে, তখন জীব জাগরণমুখী এবং যখন আজ্ঞাচক্রমুখী থাকে, তখন সুষুপ্তিমুখী। এই জাগরণ ও সুষুপ্তি বা মূলাধার ও আজ্ঞাচক্রে গুরুপ্রদর্শিত উপায়ে পরিভ্রমণ করিতে সচেষ্ট হইলে তবে সাধক তাহার জীবনগতির সমস্ত কার্য্যকে ভগবন্মুখী করিয়া লইতে পারে। সাধককে মা মা করিতে করিতে এই উভয় মুখে ছুটাছুটি করিতে হয়। একবার অন্তর হইতেও অন্তরে, একবার বাহ্য হইতেও বাহ্যে জীবকে কিছুদিন গতিবিধি নিয়মিত করিয়া লইতে হয়। এইরূপে গুরু-প্রদর্শিত পন্থার সাহায্যে জীবনগতি ফিরাইয়া লইতে পারিলে, তখন এই উভয় নিষ্ঠার উপর আমাদিগের অধিকার আসে। এবং তার পর নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা পুরুষ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ যোগক্রিয়ার কথা পরে বলিব।

যাহা হউক, প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠাকে ও জ্ঞাননিষ্ঠা কর্ম্মনিষ্ঠাকে সাহায্য করে ও পরস্পর পরস্পরের পোষণের কারণ হইয়া উঠে। ইহাদিগের পরস্পরের এই প্রকার সাহায্য আদানপ্রদানের দ্বারা ভগবদাসক্তি বা ভক্তিরূপ সাধনার প্রাণটুকু পুষ্ট হয়। যেমন শ্বাস ও প্রশ্বাসের দ্বারা আমাদিগের প্রাণ রক্ষা হয়, তদ্রূপ এই উভয় নিষ্ঠার দ্বারা আমাদিগের মাতৃমুখী আসক্তি সংরক্ষিত হয়। সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে কোনটিকে অবহেলা করিতে পারা যায় না। জাগরণ ও সুষুপ্তি বা কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, এই উভয় দিক্ই সমান ভাবে জীবমাত্রের লক্ষ্য। কোন বিষয়ে চিত্ত তন্ময় হইয়া গেলে যেমন শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ই স্তব্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ উক্ত উভয় প্রকার গতির সাহায্যে ভগবন্মুখী হইতে হইতে এমন এক ক্ষেত্র সম্মুখে পাইব, যেখানে সমস্ত রুদ্ধ হইয়া গিয়া কেবল আসক্তি বা ভক্তির এক অনাবিল নিস্তরঙ্গ উজ্জ্বল ব্যাপ্তি জগন্মণ্ডল ডুবাইয়া বিস্তৃত থাকিবে। এবং তখন, শুধু তখনই আমরা যথার্থ নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিব। নতুবা কোন নূতন কর্ম্মের আরম্ভ রোধ করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করা যায় না, অথবা আরব্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই সে অপূর্ব্ব কর্ম্মহীন বিরামরূপ মহাসিদ্ধি আমাদিগের আয়ত্তে আসিতে পারে না। কিন্তু সাধারণতঃ এ দুই নিষ্ঠা যেন বিরোধী বলিয়া মনে হয়।

সাধারণের ধারণা যে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন; এই দুই ধর্ম্ম একত্রে এক সময়ে এক ক্ষেত্রে প্রতিপালিত হইতে পারে না। সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এক স্থলে সম্যক্ ভাবে প্রতিপালিত হওয়া অসম্ভব। ভগবান্ গীতায় বলেন, এই দুয়ে বস্তুতঃ বাহ্যিক লক্ষণ ব্যতীত অন্তরঙ্গে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং উক্ত আশ্রম-দ্বয়ের মূল প্রতিপাল্য অংশটুকু সম্যক্ ভাবে সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত; এবং সেই জন্য ভগবান্ এ স্থলে এই দুই নিষ্ঠার কথা উত্থাপন করিয়া, প্রথমে

এই তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে বলিতেছেন ও সাধককে প্রথমেই কর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সাধকের বিষাদ অবস্থার পর যখন বিচার ধীরে ধীরে প্রাণে সঞ্জাত হইতে থাকে, এবং যখন বিশ্বাসের দ্বারা ভগবান্ ও আত্মা সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত ধারণা প্রাণে অবধারিত হয়, তখনও তাহার কর্ম্মে স্পৃহা আসে না। বরং জ্ঞানের প্রাধান্য প্রাণকে অধিক আকর্ষণ করে, এবং সাধক, নিষ্কর্ম্ম অবস্থার জন্য লালায়িত হয়; অর্থাৎ তখন সাধক বস্তুতঃ ভগবান্‌কে পাইতে তত চাহে না, যত আপনার শান্তির জন্য ব্যস্ত থাকে। যদি মাতৃ-প্রাপ্তি ছাড়া শান্তির অন্য কোন উপায় থাকিত, তবে সে সাধক সেই অবস্থায় স্বচ্ছন্দে তাহা অবলম্বন করিত। আত্মমোহে ও ক্লান্তিতে তখন প্রাণ পূর্ণ, তখনও সাধক মায়ের প্রেমে আকুল হয় নাই, তখনও অবসাদ-জনিত আলস্যে তার হৃদয় অবসন্ন; সে কোন গতিকে নিষ্কৃতিমাত্রের জন্য তখন উন্মুখী। অথচ অরি মিত্র, উভয় জ্ঞানের মোহ একই বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সে ধারণা তখনও বিদূরিত করিতে পারে না।

এই কারণে এই সময়ে ভগবান্ সাধকের প্রাণে অগ্রে কর্ম্মস্পৃহা জাগাইয়া দেন। এবং কর্ম্ম যে একান্ত করণীয়, ইহা ধীরে ধীরে প্রাণের ভিতর ফুটাইয়া দিতে থাকেন। এই নিষ্ঠাদ্বয় বিচার সেই কর্ম্মে উদ্দীপনা আনিয়া দিবার সূচনা মাত্র। স্বাভাবিক এই দুই প্রকার জীব-নিষ্ঠার তারতম্যেই কেহ ত্যাগী ও কেহ কর্ম্মী হইয়া থাকে। ত্যাগনিষ্ঠ পুরুষের আত্মচিন্তন অর্থাৎ প্রত্যগাত্মোপলব্ধি-চেষ্টা প্রবল থাকে এবং কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষের ঈশ্বর উপাসনাদি ব্রহ্মবাদের অন্তর্গত কর্ম্মময় অনুষ্ঠান প্রিয়তর বোধ হয়। ব্রহ্মবাদ বলিতে কর্ম্মবাদই প্রধানতঃ বুঝিতে হয়। আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ময় ব্রহ্মবাদকে সন্ন্যাসানুকূল ভাবে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মবাদের ভিতর ত্যাগবাদ প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা প্রকৃত ব্রহ্মবাদের অনুশীলন—ত্যাগসংযুক্ত ভোগাত্মক আশ্রমোচিত কর্ম্মানুশীলন। এবং সন্ন্যাস ইহার চতুর্থ অবস্থায় স্বেচ্ছামূলক বিধান। আশ্রমোচিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রথম হইতে সন্ন্যাস অবলম্বন গীতার মোটেই শিক্ষা নহে, বরং গীতা উহারই প্রতিকূলে প্রকৃত কর্ম্মী ও প্রকৃত সন্ন্যাস কাহাকে বলে, তাহাই বিশদ্ ভাবে বুঝাইয়াছেন। কর্ম্ম যে জীবের অবশ্য করণীয় এবং কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে, এরূপ ধারণা যে ভ্রান্তিপূর্ণ, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইতেছে।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪

ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ অপ্রারম্ভাৎ ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনাম্ আশ্রম-ধর্ম্মাণাং, নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মশূন্যতাং নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থানম্ বা পুরুষঃ অশ্নুতে ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। পরন্তু কর্ম্মণামারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং গম্যতে ইতি ভাবঃ। ন চ সন্ন্যসনাদেব কর্ম্মপরিত্যাগরূপাৎ

সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি। ন চ কর্ম্মণামনারম্ভাৎ জন্মজন্মান্তর-কৃতারব্ধকর্ম্মণাং সন্ন্যাসাৎ বাপি সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি, বিফলা ভবতি তেষাং ত্যাগ-চেষ্টা ইতি।

"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিবদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥" ইতি শাস্ত্রানুশাসনং যতিনাং পক্ষে, ন তু সাধারণ-মনুষ্যাণাম্। যতয়ঃ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি ইত্যাদিবাক্যস্যায়মেবার্থঃ যৎ কর্ম্মণি আত্মকর্ত্তৃত্বং ন পরিপশ্যন্তি ইতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—কর্ম্মানুষ্ঠানের আরম্ভ রোধ করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইতে পারে না বা নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থিতি ঘটিতে পারে না। এবং মাত্র কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই সে সিদ্ধি লাভে অধিকারী হওয়া যায় না।

যৌগিক অর্থ।—শাস্ত্রবিহিত আশ্রমোচিত কর্ম্মসকল না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইতে পারে না। অথবা আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। নূতন কর্ম্ম আরম্ভ করিলাম না, এবং পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারজাত আমার ক্ষেত্রের স্বতঃ উদ্ভূত কর্ম্মসকল বা চেষ্টাসকল যত্নের দ্বারা পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম; এইরূপ করিলেই কর্ম্মস্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিব, এইরূপ অনেকে মনে করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। কোন নূতন সংকল্প যদি মনে না করি, এবং আমার আশ্রমবিহিত কর্ম্মসকল, এবং মন ও বুদ্ধিআদি-প্রণোদিত অন্য আমার সংস্কারজাত কর্ম্মসকল যাহারা স্বতঃই ইচ্ছাকারে বা কর্ম্মাকারে হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেগুলিকে যদি কার্য্যে পরিণত হইতে না দিই, তাহা হইলেই উভয় দিক্ হইতে কর্ম্মস্রোত পরিত্যাগ করিতে পারি, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা অনেকে আপনাকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় লইয়া যাইতে প্রয়াস পান। শাস্ত্রে যে সকল স্থলে কর্ম্মই বন্ধনের হেতু এবং কর্ম্মত্যাগই মোক্ষের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল স্থলকে ভিত্তি করিয়া অনেকে নিষ্ক্রিয়তা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়, এবং তাহার উপায়স্বরূপ উক্ত প্রণালীতে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে সচেষ্ট হয়। সাধকও পাছে এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মের অনাবশ্যকতায় বিশ্বাস স্থাপন করে, অথবা অর্জ্জুন পাছে তাঁহার মোহাক্রান্ত অবস্থায় সেই সকল শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যে কর্ম্ম করিতে বৃথা কুণ্ঠিত হন, সেই জন্য ভগবান্ এই স্থলে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, কর্ম্মারম্ভ ও কর্ম্ম সম্পাদন ব্যতীত ব্রাহ্মী স্থিতি কখনও লাভ হইতে পারে না। শাস্ত্র কোথাও জীবকে কর্ম্মত্যাগী হইতে উপদেশ দেন নাই। "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিবদ্যয়া পরিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥" ইত্যাদি শ্লোকে যতিদিগের কর্ম্মসম্বন্ধীয় লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে মাত্র। সাধারণ জীব, যাহারা এখন যতি হইতে সক্ষম হয় নাই, তাহাদিগের কর্ম্মত্যাগ বিধেয় নহে। কর্ম্মের অনারম্ভ ও জন্ম-জন্মান্তর-সূচিত কর্ম্মের ত্যাগ, ইহার দ্বারা জীবের জীবনযাত্রা মহাস্থিতিতে আসিয়া পৌঁছাইতে পারে না।

"নৈষ্কর্ম্ম্য" শব্দ প্রয়োগের অন্য একটি উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থে

নিষ্ক্রিয়তা। নিষ্ক্রিয়তা বা কর্ম্মশূন্যতা এই শব্দটি, ইহার মুখ্য মর্ম্ম ছাড়া, সে কর্ম্মেরই অস্তিত্ব-জ্ঞাপক আর একটি ভাব প্রকাশ করে। নঙ্‌তৎপুরুষ সমাস দ্বারা যে সমস্ত শব্দ নিষ্পন্ন হয়, সেই সমস্ত শব্দেরই অনেক স্থলে ইহা একটি ধর্ম্ম। অসুখ বলিলে সুখের বিপরীত অবস্থা বুঝাইয়া থাকে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা সুখের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। সুখ বলিয়া একটি জিনিষ ছিল, যাহার অভাবে অসুখরূপ ভাব উদ্দীপিত হইয়াছে, ইহাই অসুখ শব্দ হইতে বুঝিতে পারা যায়। স্মৃতিতে সুখের সংস্কার থাকে বলিয়া, তবে অসুখ বলিয়া একটি ভাব সুখের বিপর্য্যয়ে অনুভব করি। তদ্রূপ কর্ম্ম-সংস্কার হৃদয়ে না থাকিলে নিষ্ক্রিয়তা বা নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থার অনুভূতি হইতে পারে না। মাতৃ-ভাবাপন্ন কর্ম্মপ্রবাহে পরিচালিত না হইয়া, কেমন করিয়া নৈষ্কর্ম্মের অনুভূতি লাভ হইবে ? আমরা বহু জন্ম ধরিয়া কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি ও করিতেছি ; জীব মুহূর্ত্তমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, সেই জন্য যথেষ্ট কর্ম্ম-সংস্কার আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চিত হইতেছে ও সেই জন্যই নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থার অনুভূতির অভাব আমাদিগের হইবে না। আমরা কর্ম্মমগ্ন জীব বলিয়াই উক্ত অবস্থা আমাদিগের লভ্য। শুধু তাহা নহে ; নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দ প্রয়োগের আর একটি উদ্দেশ্য আছে। আমরা সাধারণতঃ যে ভাবে কর্ম্ম করি, সে ভাবের কর্ম্ম মাতৃমুখী কর্ম্ম নহে, বহির্মুখী কর্ম্ম ; সুতরাং উহা কর্ম্মপদবাচ্য নহে, অকর্ম্ম। বহির্মুখী কর্ম্ম রুদ্ধ করিতে পারিলে বহির্মুখী নৈষ্কর্ম্ম্যমাত্র লাভ হইতে পারিত ; তাহাতে শান্তির আভাস মাত্র হইতে পারিত। কিন্তু বহির্মুখী কর্ম্ম বা অকর্ম্ম রোধ করিতে হইলে, অগ্রে সে কর্ম্মকে অন্তর্মুখী কর্ম্মে বা যথার্থ কর্ম্মে পরিণত করিতে হয় ; বিচিত্র ভাবোল্লাসযুক্ত বহির্জগতের দিক্ হইতে এক মহাভাবের দিকে সকল শক্তিকে বা শক্তির বিকাশরূপ কর্ম্মকে ফিরাইতে হয় ; সেইরূপে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী কর্ম্ম-সংস্কার সংগ্রহ করিতে হয়, এবং তবে তখন অনন্ত শক্তি-সাগরে আমাদিগের শক্তিপ্রবাহ লীন হইয়া যায় ও সেই সময়ে নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ একটি শান্তিপূর্ণ ভাব ফুটাইয়া তুলিতে থাকে। অন্তর্মুখে কর্ম্মপ্রবাহ ফিরিল না, অন্তর্মুখে কর্ম্ম-সংস্কার জন্মিল না, অথচ নৈষ্কর্ম্ম্য ভাব অনুভূতিতে আসিল, বহির্মুখী কর্ম্ম বন্ধ করিলাম, আর অমনি নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ হইল, ইহা অসম্ভব। "নৈষ্কর্ম্ম্য" শব্দটি ব্যবহার করিবার ইহাও অন্য উদ্দেশ্য। আমাদিগের অকর্ম্ম-সকলকে কর্ম্মে পরিণত করিয়া, অকর্ম্ম-সংস্কারকে কর্ম্ম-সংস্কারে পরিণত করিয়া তবে নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইব। সাধারণ কর্ম্মের আরম্ভ হইল না, সে সাধারণ কর্ম্মসকল যথার্থ কর্ম্মে পরিণত হইতেও আরম্ভ হইল না, অথচ নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইল, ইহা অসম্ভব। এই সকল কারণে সে স্থিতিরূপ অবস্থাটিকে "নৈষ্কর্ম্ম্য" শব্দে ভগবান্ অভিহিত করিলেন। "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে" শ্লোকাংশে কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দ প্রয়োগের ইহা মর্ম্ম।

কোন দেশে একজন তস্কর ছিল। প্রতি রজনীতে তস্করতা না করিলে তাহার

নিদ্রা আসিত না। অভাব না থাকিলেও সে স্বীয় প্রকৃতির তাড়নে প্রত্যহ গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিত। এইরূপ কিছু দিন যাইবার পর সেই গ্রামে একজন সন্ন্যাসী আসিলেন। সন্ন্যাসীর নিকট গ্রামস্থ সকলে গিয়া আপন আপন জ্বালা-যন্ত্রণার কথা জ্ঞাপন করিয়া, তাহার প্রতিকারের উপায় জানিতে লাগিল; কেহ ধর্ম্মের জন্য, কেহ অন্য কারণে—সন্ন্যাসীর নিকট যাইতে গ্রামের কেহ বাকী রহিল না। একদিন সেই তস্কর গিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম জানাইয়া কহিল,—"প্রভো! আমি বদ্ধ শঙ্কটাপন্ন নারকী জীব, আমার গতি করুন। আমি একজন তস্কর; প্রতি নিশিতে তস্করতা না করিলে আমার নিদ্রা হয় না। আমি কত চেষ্টা করিতেছি; প্রাণপণে এ কুকার্য্য পরিত্যাগের জন্য যত্ন করিতেছি, ভগবান্‌কে কত জানাইতেছি; কিন্তু এ অভ্যাস কিছুতেই যাইতেছে না। এক দিকে অনুতাপ, অন্য দিকে কুপ্রবৃত্তি আমায় অহর্নিশ দগ্ধ করিতেছে। আপনি ইহার উপায় বিধান করুন। আমায় এ কুপ্রবৃত্তির কবল হইতে পরিত্রাণ করুন।"

মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী তস্করের কাতরতা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রাণে সাধু-তস্কর ভেদ ছিল না। যে তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহারই মঙ্গলের জন্য ভগবান্‌কে জানান ও মঙ্গলের উপায় বিধান করেন। সুতরাং তস্করও তাঁর কৃপালাভে বঞ্চিত হইল না। সন্ন্যাসী তস্করকে উপদেশ দিয়া কহিলেন,—"বৎস! আমি তোমার শান্তির উপায় বিধান করিতেছি, আমার উপদেশ মত নিঃশঙ্কচিত্তে প্রত্যহ কার্য্য করিও। তোমার মঙ্গল হইবে। আমি তোমার জন্য তস্করতাই ব্যবস্থা করিলাম! তোমায় প্রতি নিশায় ভগবানের প্রাসাদে তস্করতা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তোমার অন্তরের মধ্যেই তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় প্রাসাদ বিরাজিত। সে বিরাট্ প্রাসাদ অহর্নিশ প্রহরিবেষ্টিত; অতি সাবধানে, সতর্কতার সহিত প্রাসাদে প্রবেশ করিও এবং অতি সাবধানে সতর্কতার সহিত আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইও; কেন না, সে পুরুষের সহস্র চক্ষুকে বঞ্চিত করিতে বিলক্ষণ সতর্কতার প্রয়োজন।"

তস্কর সন্ন্যাসীর উপদেশ মত প্রত্যহ নিশাকালে আপনার গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, যেন সম্মুখে একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ; তাহার চারি ধারে প্রহরী পরিভ্রমণ করিতেছে; আর সে নিজে যেন অতি সাবধানে এক ধারে সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চুরির সুযোগের অপেক্ষায় গৃহস্থের গৃহপার্শ্বে অপেক্ষা করা তাহার নিত্য অভ্যাস, সুতরাং সে স্বচ্ছন্দে কল্পনায় সে ভাব ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইতে লাগিল। এক দিন দুই দিন এইরূপ চিন্তা করিবার পর, এক দিন ওইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিল, যেন জনৈক প্রহরী একটু অসতর্ক হইয়াছে। চুরি বিদ্যায় অদ্ভুত অধিকার তাহার ছিল; সে সেই সুযোগে নিমেষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িল, কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। তার পর সে কল্পনায় ধীরে ধীরে যেন সম্মুখস্থ একখানি

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। অতি সাবধানে, অতি নিঃশব্দভাবে পদক্ষেপ করিতেছে; তাহাতে তার উত্তম দখল ছিল; পিপীলিকার মত সে সেই গৃহমধ্যে যেন প্রবেশ লাভ করিল; এবং সন্ন্যাসীর বাক্য মত সে দেখিল, যেন সেই গৃহে রত্নপালঙ্কে একজন অপূর্ব্ব রূপবান্ পুরুষ শায়িত রহিয়াছে; সে গৃহের চারি ধার মণিমাণিক্যে খচিত। আনন্দে আত্মহারা হইয়া সে সেই সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে উদ্যোগ করিল; সভয়ে সেই শায়িত পুরুষের দিকে চক্ষু রাখিয়া ধীরে কর প্রসারণ করিতেছে; স্থিরচক্ষে সেই পুরুষকে দেখিতেছে; স্থির লক্ষ্যে হস্ত প্রসারিত হইতেছে! ধীরে ধীরে একখানি উজ্জ্বল প্রস্তর যেমনি উত্তোলন করিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সে দেখিল, সেই শায়িত পুরুষ সহস্রচক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া। মুহূর্ত্তের জন্য ভয়ে তাহার আত্মা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু একি! সে সহস্রচক্ষের দৃষ্টি যে স্নেহময়! অধরে পবিত্র হাস্যরেখা। সে পুরুষ ধীর স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতেছেন,—"ভয় নাই, লইয়া যাও, যত পার লও। এ গৃহে প্রবেশ করিতে তোমার বহু কষ্ট হইয়াছে; আর কষ্ট হইবে না। এবার নিত্য আসিও, নিত্য যত ইচ্ছা রত্নাদি লইয়া যাইও।"

তস্কর লুটাইয়া পড়িল।—"ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, আর চুরি করব না, আপনাকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি, আর গৃহে যাইব না, আপনার দাসানুদাস হইয়া এইখানে থাকিব, আমায় আশ্রয় দিন।"

"যাও বৎস! তাহাই হইবে; প্রত্যহ তুমি আমার নিকট এমনি করিয়া আসিও, আমি তোমায় ভালবাসি! আর তোমার আসিতে ক্লেশ হইবে না।"

তস্কর তস্করতা দ্বারা জীবনের সার্থকতা লাভ করিল। তস্করতায় তার পারদর্শিতা ছিল বলিয়াই সে এ পন্থায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল; সে চিন্তাস্রোত ফিরাইতে বেগ পায় নাই। আমরা আমাদিগের সাধারণ ভাবাদি পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎমুখে যাইতে চাই; সুতরাং ধ্যানাদি কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারি না।

তস্কর একান্ত শ্রদ্ধার সহিত সন্ন্যাসীর উপদেশ মত প্রত্যহ নিশাকালে মায়ের ঘরে চুরির চেষ্টায় ফিরিয়াছিল; এবং দৃঢ় অধ্যবসায় ও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চিন্তাস্রোতকে এইরূপে অন্তর্মুখে প্রবাহিত করিতে করিতে ভগবন্মুখী হইয়া জীবনের কৃতার্থতা লাভ করিল। এ উপাখ্যানের আর অন্য ঘটনাবলীতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু এইমাত্র বুঝিলাম যে, কর্ম্ম রোধ কর বলিলেই কর্ম্ম রোধ করা যায় না; কিন্তু সেই কর্ম্মকে অন্তর্মুখে চালিত করিয়া দিলে, তার পর তাহা রোধ করিবার উপায় হয়। তস্করের চুরি করা প্রথম দিন হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

এত কথায় কাজ কি? অথবা এত কথার প্রয়োজন হইয়া পড়ে শুধু আমরা মাকে দেখি না বলিয়া; মা অহর্নিশ কি ভাবে আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন,

তাহা বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করি না বলিয়া; যদি কর্ম্ম না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইতে পারিত, অথবা যদি সাধারণ কর্ম্মসকল মাতৃমুখী কর্ম্মে পরিণত না হইয়া লয়প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে আমাদিগের কর্ম্মময়ী প্রকৃতি না হইয়া, অন্য প্রকৃতি লইয়া আমরা এ মরলোকে প্রেরিত হইতাম। যে মা আমার চক্ষুর চক্ষু, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার মনের মন, আমার আত্মার আত্মা, যে মা আমায় ক্রোড়ে ধরিয়া ম্লানময়ী ক্ষুদ্রারূপে আজ প্রতিফলিত হইতেছে, যে মা আমায় বুকে লইয়া যেন দরিদ্রের মলিন কুটীরে চির-প্রপীড়িতার মত অবস্থান করিতেছে, যে কর্ম্মময়ী মা আমার আজ শতগ্রন্থি মলিনবসনা-রূপে আমার চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া তুমি অহর্নিশ তাহার ক্রোড় হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছ, যাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তুমি "ত্যাগ ত্যাগ" করিয়া আকুল হইয়াছ; ওগো, তোমরা এমন করিয়া তার হতাদর করিও না। তোমরা দেখিতেছ না, সে তোমার সহস্র হতাদর ও ঘৃণা উপেক্ষা করিয়াও তোমায় বুকে লইয়া তোমার মঙ্গল চাহিয়া চলিয়াছে, তোমার পরুষ ব্যবহারে অভিমানে তার নাসা বিস্ফারিত হইতেছে, তার চূর্ণ কুন্তলদাম ললাটে কাঁপিয়া উঠিতেছে, তার হৃদয় আবেগে স্পন্দিত হইতেছে, তার স্নেহপীড়িত চক্ষে অভিমানের বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিতেছে! তোমার প্রত্যেক ধিক্কারে তার ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে, তোমার প্রত্যেক হুতাশে তার অঙ্গের লাবণ্যসুষমা শুকাইয়া যাইতেছে; তোমার প্রত্যেক বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে তার বক্ষের স্তনধারা বিশুষ্ক হইতেছে।

ওগো, তোমরা এমন করিয়া মায়ের দিকে চাহিও না। "যার জন্য চুরি করে, সেই বলে চোর"—এ ভাব তোমরা বুক হইতে মুছিয়া ফেল। আমিও একদিন চাহিয়াছিলাম; আমিও একদিন আমার প্রকৃতিকে দীনা দেখিয়া বিদ্বেষের তীব্র কটাক্ষে তাহাকে পীড়ন করিয়াছিলাম! তার কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিদর্শন করিয়া তাহার আলিঙ্গনকে বিষবৎ অনুভব করিয়াছিলাম। তার পর একদিন দেখিলাম, শুভ মাহেন্দ্র ক্ষণে মঙ্গলপ্রভাতে একদিন দেখিলাম—এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি স্ত্রী, কি পুরুষ বুঝা যায় না, সৌন্দর্য্যের তার বর্ণনা হয় না, স্থৈর্য্যের তার কল্পনা করা যায় না। জ্যোতির তার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। এমন ম্লান মর্ম্ম নাই, যাহা তার নির্ম্মলতার পরিমাণ করে। কালস্রোত সেথা স্তব্ধ; কোটি সূর্য্য সে জ্যোতিঃসাগরের—সে নিস্তরঙ্গ ক্ষেত্রের বহু দূরে বিম্ব-মেখলার মত প্রতিভাত; কোটি দেবঋষি-সংঘ পশ্চাতে লইয়া কত ব্রহ্মা সুবর্ণ-থালে কুসুমরাশির মত আপন আপন ব্রহ্মাণ্ডরাশি চরণ উদ্দেশে উপহার দিবার জন্য নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া সৃজন করিতেছে, কত বিষ্ণু সে ব্রহ্মাণ্ডকুসুমের প্রতি অণু মায়া-সূত্র দিয়া গ্রথিত করিয়া, তদ্রূপ নীরবে বিস্ফারিত-নয়নে মেখলা নির্ম্মাণ করিতেছে; কত মহেশ্বর সে সকল মেখলা লইয়া সেই কমনীয়মূর্ত্তির চরণ উদ্দেশে প্রক্ষেপ করিতেছে! সমস্ত আকাশ তাল পাকাইয়া ফেলিলেও সে স্থৈর্য্যের উপমা

হয় না ; জগতের সমস্ত চক্ষুর জ্যোতি ঘনীভূত করিলেও সে বিকাশ বুঝি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; কোটি পর্ব্বতের অচল ভাব হৃদয়ে ধারণ করিলেও, সে মহিমময়ীর অচলতার কণামাত্র বুঝা যায় না ; স্ফুটিত কুসুমস্তূপের কল্পনা করিলেও, সে কোমলতার, সে নির্ম্মলতার উচ্ছ্বাস বুকে ধরিতে পারা যায় না। সে মূর্ত্তি দেখিয়া নহে, সহসা আমার চক্ষে সে চক্ষু পতিত হইবামাত্র সে মূর্ত্তির ভঙ্গিমা দেখিয়া চিনিলাম, এ যে সেই মা ; এই মূর্ত্তি অন্য কেহ নহে, আমার সেই অনাদৃতা উপেক্ষিতা মা ! আমি যে দিন উপক্ষো করি, সে দিন এমনি করিয়া অভিমানে স্নেহার্দ্র চক্ষু আবৃত করিয়াছিল, এমনিই ওষ্ঠাধর স্পন্দিত হইয়াছিল, এমনই অলকারাশি দুলিয়া উঠিয়াছিল, এমনই নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়াছিল, এমনই ভ্রূভঙ্গিমায় ভ্রূকুটীবিলাস খেলিয়াছিল ; অথচ স্নেহের পীড়নে সে অভিমান এমনিই প্রভাতের জ্যোৎস্নার মত অস্ফুট ছিল। সে দিন যাহাকে আমার ছিন্নবসনা, মলিনা, উন্মাদিনী মা বলিয়া বুঝিয়া বিরক্ত হইয়াছিলাম, আজ তাহাকেই ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর-সেবিতা, ভুবনমোহিনী অন্নপূর্ণেশ্বরী, কর্ম্মময়ী জ্ঞানময়ী স্নেহময়ী, জগতের মা বলিয়া বুঝিলাম। অন্য কেহ নহে—অন্য কেহ নহে, এ আমার সেই মা !

দীনা বলিয়া স্বীয় প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করিও না ; দীন বলিয়া অথবা বন্ধন আদি ভাবিয়া স্বীয় কর্ম্মপ্রবাহকে বিষবৎ বোধ করিও না ; উহারই পায়ে ধরিয়া বল,— 'অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় !" মা, তুমি আমায় অসৎ হইতে সতে লইয়া চল, তুমি আমায় অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া চল, তুমি আমায় মৃত্যু হইতে অমরত্বে লইয়া চল। আমি অনিত্য, অসৎ বিভ্রমে বিভ্রান্ত ; আমায় সৎ মূর্ত্তি দেখাও ; আমি অজ্ঞান অন্ধকার ভাবিয়া অন্ধ, আমার চক্ষে জ্যোতি দাও ; আমি অস্তিত্ব হারাইবার ভয়ে মুহুর্মুহু চমকিত, আমায় নিত্য সনাতনরূপে প্রতিভাত কর। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় তোমার সিদ্ধি লাভ হইবে।

সমগ্র জীবনগতি সম্বন্ধেও যেমন, নিত্য ব্যষ্টি সাধনা সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিবে। প্রথমতঃ মায়ের চির অভ্রান্ত নিয়মানুসারে সাধনারূপ কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। সাধনা আমরা অহর্নিশ করিয়া থাকি ; তবে আমরা বুঝি না যে, আমরা সাধনা করিতেছি। আমরা অহর্নিশ মায়ের দ্বারে ভিক্ষা লাভ করিতেছি, কিন্তু সে ভিক্ষায় কখনও বিমুখ হইতে হয় নাই বলিয়া উহা আমাদিগের গ্রাহ্যের ভিতর আসে না। "যতো যতো নিবর্ত্ততে ততস্ততো বিমুচ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বাবস্থা লক্ষ্য করিয়া উক্ত হয় নাই, কর্ম্মের পরবর্ত্তী অবস্থার লক্ষণ ; যদি কর্ম্ম না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইবার হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ড কর্ম্মময় হইত না। সে কথা পরে বলিব। যাহা হউক, সে সমস্ত সাধারণ কর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা ভগবদুদ্দেশে কৃত বিশিষ্ট নিত্যক্রিয়াগুলি লইয়াও বড় গোল বাধাই। যখনই

ভগবানের কথা মনে পড়ে, অমনি মনে হয়, যদি সদ্‌গুরু পাইতাম, তাহা হইলে সাধনা হইত, নতুবা সাধনায় আমাদিগের মত জীবের কোন আশাই নাই। এইরূপ হতাশ বিভ্রমে পড়িয়া আমরা আমাদিগের স্ব স্ব জাতীয় নিত্যক্রিয়াগুলি ছাড়িয়া দিয়া বাক্যমাত্র সার করিয়া বসিয়াছি ও জীবনটিকে এক উচ্ছ্বাসহীন, ভীতি-জড়িত, আবিল সময়স্রোতে পরিণত করিয়াছি। শাস্ত্রানুশাসনে আর জীবন থাকিতে পারিতেছে না; ইহার আর স্থিতিস্থাপকতা শক্তি নাই। আমাদিগের আশ্রমধর্ম্ম আশ্রমকর্ম্ম যদি আমরা যথাসাধ্য সম্পন্ন করি, তাহা হইলে এ দুর্দ্দশার অবসান নিশ্চয় হয়। তোমার নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কর, গুরু আপনি আসিবেন; নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইবে। কিন্তু না করিয়া হইবে না।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫

জাতু কস্যাঞ্চিদপি অবস্থায়াং ক্ষণমাত্রসপি কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকর্ম্মকৃৎ তিষ্ঠতি, সর্ব্বাবস্থায়াং প্রতিক্ষণম্ কর্ম্মকৃৎ ভবতি ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ সন্ সর্ব্বঃ জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—কোন অবস্থাতেই ক্ষণমাত্র কালও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্ম না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য বা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করা যায় না। ভগবান্ উপস্থিত শ্লোকে বলিতেছেন, উক্ত অবস্থা কর্ম্ম না করিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই, প্রকৃতি জীবে জীবে বিরাজ করিয়া, স্বীয় মহিমায় বিমুগ্ধ করিয়া অহর্নিশ তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। প্রকৃতি কে? আমি। আমি প্রকৃতিরূপে জীবকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছি। আমি আমার প্রিয় জীবমণ্ডলীকে প্রকৃতিরূপে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। আমার এ স্নেহময়, এ প্রেমময়, এ জ্ঞানময়, এ মায়াময় আলিঙ্গন দিয়া জীবের জীবত্ব দিয়াছি, তাহার আমিত্ব নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি। আমার নিজের আমিত্ব দিয়া তার “আমিত্ব” রচনা করিয়াছি। জীব যে নিজ অস্তিত্ব অনুভব করে, সে আমার দেওয়া অস্মিজ্ঞানময় স্নেহালিঙ্গনের গুণে। আমার বিরাট্ আমিত্বের মাঝে নিমজ্জিত করিয়া, আমার বিরাট্ কর্ম্মময় দেহের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া, আমি জীবকে মজাইয়া রাখিয়াছি। কর্ম্ম না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। আমার আমিত্বের স্ফুরণের মাঝে স্ফুরিত না হইয়া আমি কাহাকেও থাকিতে দিই না। আমার প্রত্যেক পরমাণুকে আমি বিরাট্ দেখিতে চাই। এই জন্যই আমার এ আলিঙ্গন—এ দেহ—সোহাগের দান।

তাই জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, কাহারও কর্ম্ম না করিয়া থাকিবার উপায় নাই।

প্রতিক্ষণে প্রত্যেক অবস্থায় এ কর্ম্মস্রোত উচ্ছ্বসিত। মহাত্মা শঙ্কর বলেন,—"সর্ব্ব" শব্দের অর্থ সমস্ত অজ্ঞ জীব; কেন না, অজ্ঞ জীবমাত্রই কর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত। জ্ঞান—আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আর প্রকৃতির দ্বারা জীব বিচলিত হয় না। কিন্তু হায়, সে জ্ঞানময় অবস্থাটিও কি একটি জ্ঞানময়ী প্রকৃতি নহে? প্রকৃতি ছাড়া কিছু নহে—হইতে পারে না। মুক্ত অবস্থাও প্রকৃতির ঐ অবস্থান্তর মাত্র। মা আমার যখন চঞ্চলারূপে প্রতিভাত, তখন বলি—আমরা বদ্ধ; যখন অবিচঞ্চলা স্থিররূপিণী, তখন বলি—আমরা মুক্ত, ব্রহ্মযুক্ত। বিচিত্ররূপময়ী মাকে আমার জীব যত দেখে, তত—তত মজিতে শিক্ষা করে, তত মজে, তত ধারণা করে,—"তুমি আমার দেহ, তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার মন, তুমি আমার বুদ্ধি, তুমি আমার আত্মা।" তত জীব বলে, তুমি আমার দেহের দেহ, তুমি আমার চক্ষুর চক্ষু, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি আমার আত্মার আত্মা। তত জীব অন্তর হইতে অন্তরে প্রবেশ করে। তত দেহের অভ্যন্তরে দেহের সন্ধান পায়, তত আলিঙ্গনে শিহরিয়া উঠে, তত জীব নৈষ্কর্ম্ম্যের দিকে অগ্রসর হয়; তত কর্ম্মময় দেহযন্ত্র-সকল সুখাবেশে বিগলিত হইতে থাকে, তত শিবত্ব লাভ করিতে থাকে; তার পর—তার পর সুখের ঘোরে পূর্ণ বিগলিত হইয়া মাতৃঅঙ্গে মিলাইয়া মা হইয়া যায়। মায়ে মজা—ইহাতে জ্ঞানী অজ্ঞানী বাদ নাই, বাদ যাইবার উপায় নাই। তাই বলি, সর্ব্ব শব্দের অর্থ অজ্ঞানী জীব নহে—সর্ব্ব অর্থে জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই—কর্ম্মী ও সন্ন্যাসী সকলেই। সন্ন্যাসও কর্ম্মবিশেষ; প্রকৃতিবিশেষ—মাতৃরূপবিশেষ। স্বয়ম্প্রকাশ আত্মা প্রকাশ-মহিমাশূন্য কখনই নহেন। আত্মাই আত্মার মহিমা, আত্মানাত্ম প্রকাশদ্বয় আত্মারই অভিব্যক্তি। মহিমা ও প্রকৃতি একই কথা।

আবার বলি, দেহ কি জান? মাতৃ-আলিঙ্গন! প্রাণ মন কি জান? মাতৃ-আলিঙ্গন! জ্ঞান বুদ্ধি বিজ্ঞান কি জান? মাতৃ-আলিঙ্গন! পঞ্চ কোষাত্মক দেহ অর্থে মায়ের পাঁচ প্রকারের আলিঙ্গন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জড় অর্থে মাতৃ-স্নেহের ঘনীভূত বিকাশ। এখানেও সেই কথাই বলিতেছি, দেহ অর্থে মাতৃ-স্নেহালিঙ্গনের ঘনীভূত বিকাশ। এ ধারণা উপলব্ধি করিতে অভ্যাস কর। সর্ব্বদা সর্ব্ব সময়ে একজনের মর্ম্মস্পর্শী সুখময় আলিঙ্গনে তুমি আবদ্ধ বলিয়া ধারণা কর; অহর্নিশ স্নেহের চুম্বনে অভিস্নাত; অহর্নিশ অগাধ ভালবাসার পেষণে সংস্পৃষ্ট বলিয়া আপনাকে ভাবিতে থাক। ইহা কল্পনা নহে—যথাযথ সত্য। সত্যের আবিষ্কার করিয়া কৃতার্থ হও, সমস্ত সাধনা সমাপ্ত হইবে। বিপথে বিভ্রমে, বিপদে সঙ্কটে, শোকে রোগে, মৃত্যুশয্যায় অথবা স্বপদে সম্পদে, সুখে গৌরবে সর্ব্বদা—সর্ব্বদা দেখ, মা আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া বিস্তার অপেক্ষা বিস্তারে, আলোক অপেক্ষা আলোকে, আনন্দ অপেক্ষা আনন্দে তোমায় চুম্বন করিতে করিতে লইয়া চলিয়াছেন। তুমি দেখ; তুমি আলিঙ্গনের

প্রতিদান দাও, তুমি মাতৃচরণ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শত সহস্র চুম্বনে অভিষিক্ত কর। তোমার গতি খরতর হইবে।

আরও এক কথা; এ মায়ের ক্রোড়ে থাকিয়া কেহ কখনও কর্ম্ম না করিয়া ত থাকিতে পারে না, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; আবার কেহ অকর্ম্মকৃৎ হইয়া থাকিতে পারে না। জীব যতই অকর্ম্মরূপে সাধারণচক্ষে প্রতিভাত কর্ম্ম করুক, উহা কর্ম্ম বা মাতৃমুখী কর্ম্মে পরিণত হইবার জন্য ছুটিবেই। আমাদিগের কর্ম্মপ্রবাহ উপস্থিত অকর্ম্ম-রূপে পরিদৃষ্ট হইলেও উহা আমাদিগকে কর্ম্মমুখে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে বুঝিতে হইবে। অকর্ম্মকারী হইয়া অবস্থান করিবার উপায় নাই। তিষ্ঠতি অর্থে স্থিতি লাভ করা। যতক্ষণ আমরা অকর্ম্মকারী থাকিব, যতক্ষণ আমাদিগের কর্ম্ম মাতৃমুখী কর্ম্মে পরিণত না হইবে, ততক্ষণ স্থিতিলাভ করিবার উপায় নাই। "অকর্ম্মকৃৎ সন্ ন তিষ্ঠতি"—অকর্ম্মকৃৎ থাকিতে তিষ্ঠাইবার উপায় নাই। ইহাই এখানে বিশেষ মর্ম্ম বুঝিতে হইবে; এই সকল মর্ম্মই মায়ের গীতার বিশেষত্ব। ইহা না বুঝিলে গীতা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না।

তিষ্ঠানরূপ অবস্থা বা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে হইলে কর্ম্মকৃৎ হইতে হইবে। এবং কর্ম্মকৃৎ হইতে হইলে কর্ম্ম করিতে হইবেই। এই জন্য মা আমার কর্ম্মময়ী।

কর্ম্মের দ্বারা হৃদয়-সমুদ্র মথিত না হইলে অমৃতের কলস উঠিবে না; জীব নিজ নিত্য অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া অমর হইতে পারিবে না। জীব যত দিন না এ অমৃতের সন্ধান পায়, তত দিন কর্ম্মমন্থনে হৃদয়রূপ ক্ষীরোদ সমুদ্র মথিত করিতে হয় ও করে। আমরা অহর্নিশ এ মন্থনকার্য্যে ব্যাপৃত; আমাদিগের আমিত্বরূপ মৈনাক পর্ব্বত হৃদয়রূপ ক্ষীরোদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাতে কর্ম্মবাসুকী বিজড়িত করিয়া মন্থন করিতেছি। এক দিকে অন্তর্মুখী শক্তি বা নিবৃত্তি বা দেবশক্তি ও অন্য দিকে বহির্মুখী শক্তি বা প্রবৃত্তি বা অসুরশক্তি সে কর্ম্ম-বাসুকীকে আকর্ষণ করিতেছে; তাহাতে আমিত্বের মৈনাক একবার অন্তর্মুখে, একবার বহির্মুখে বিঘূর্ণিত। বহির্মুখী শক্তি সর্ব্বাগ্রে আকর্ষণ করে, তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে অন্তর্মুখী আকর্ষণ উপলব্ধি হয়। কর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম গতিই বহির্মুখী। প্রথম সৃষ্টির বিকাশই বহির্মুখী কর্ম্মে অনুষ্ঠিত, সেই জন্য কর্ম্মবাসুকীর ফনার দিক্ ধরিয়া অসুর বা বহির্মুখী শক্তি আকর্ষণ করে; এবং লাঙ্গুলের দিকে—মূলের দিকে অন্তর্মুখী শক্তি বা দেবশক্তি প্রত্যাকর্ষণ করিতেছে। আমিত্ব অতীব গুরু। ইহা বিরাট্ রাজরাজেশ্বরীর সম্ভোগের সমগ্রী। এ আমিত্বরূপ মৈনাক-মন্থন-দণ্ডের বিরাট্ আন্দোলন সাধ্য কি, জীবের হৃদয় সহ্য করিতে পারে। মা আপনার এ অনির্ব্বচনীয় গুরুতম সম্ভোগের সামগ্রী প্রত্যেক পরমাণুকে সম্ভোগ করাইতে চাহেন। স্নেহাভিমানিনী মা আমার সেই জন্য প্রত্যেক জীব-হৃদয়ের তলদেশে কূর্ম্মরূপে থাকিয়া ইহা বহন করিতেছেন। মা আমাদিগের আমিত্বের ভার বহন ও সহ্য

করিতেছেন, সেই জন্য এত ঘর্ষণে আমাদিগের হৃদয় মথিত হইলেও ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় না। যেমন মাতৃবক্ষে শিশু দাঁড়াইয়া ক্রীড়াকূর্দ্দন করে, তদ্রূপ আমাদিগের এ মন্থন মাতৃ-পৃষ্ঠে অনুষ্ঠিত। অহর্নিশ এইরূপে মাতার উপর ভর রাখিয়া, আমাদিগের কর্ম্মবাসুকীবিজড়িত আমিত্ব-দণ্ড দেবতা ও অসুরের দ্বারা আকৃষ্ট ও বিঘূর্ণিত হইতেছে।

কিন্তু ইহার সর্ব্বপ্রথম ফল হলাহল—ত্রিতাপ ; মন্থনের পেষণে কর্ম্ম-সর্পের মুখ দিয়া হলাহল উদ্গীর্ণ হইতেছে। ত্রিতাপ-হলাহলের দহনে হৃদয়-সমুদ্রের কত কুসুম-কমনীয় ভাব বিনষ্ট হইতেছে। গরলের তাপে হৃদয় বিদগ্ধ হইতেছে, আকাশ মেঘে ভরিয়া দিগন্ত অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিতেছে। বাসুকীর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে প্রবৃত্তিরূপ ঝঞ্ঝাবাত উঠিয়া সমুদ্রবক্ষকে উদ্বেলিত ক্ষুব্ধ ছিন্নভিন্ন করিতেছে। অসুরবৃন্দ তাপের জ্বালায় ছুটিয়া পলাইতেছে। মন্থন বুঝি আর হয় না। অমৃত বুঝি আর উঠে না।

আমরা কর্ম্মবন্ধনের জ্বালায় যত জর্জ্জরিত হই, ততই আমাদিগের বহির্মুখী গতি শ্লথ হইয়া পড়ে, প্রবৃত্তি-সকল দমিত হইতে থাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মে ঔদাসীন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, কু অন্তর্হিত হইতে থাকে, কিন্তু সেই মাত্রায় উদ্যম উৎসাহ হারাইয়া যায়, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জগতে যেন না থাকিলে নয়, তাই থাকি ; না করিলে নয়, তাই করি ; না হাসিলে নয়, তাই হাসি ! এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা মরলোকের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট।

দুই দিকের টান না থাকিলে ত মন্থন হইতে পারে না ; মন্থনের জন্য দেখ দেব ও অসুর দুই প্রয়োজন, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই আবশ্যক। কিন্তু ত্রিতাপ-দহনে বহির্মুখী শক্তি বা প্রবৃত্তি জর্জ্জরিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে ; সুতরাং মন্থন-কাণ্ড বন্ধ হইতে বসিয়াছে। আমাদিগের অন্তর্মুখী শক্তি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঘনান্ধকারে আকাশ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া। কে এ সময়ে রক্ষা করিবে ? কিসে আবার মন্থন-কার্য্যের সুযোগ ঘটিবে ? কেমন করিয়া অমৃতের সন্ধান পাইব ? কেমন করিয়া নিজ অব্যয় অচ্যুত সনাতন অবস্থা দেখিয়া কৃতার্থ হইব ? মৃত্যু-ভয়ের কবল হইতে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইব ? কি হবে, আমাদের কি হবে !

সন্তানের এ সঙ্কটে মা কি আর স্থির থাকিতে পারে ! প্রিয়ের ব্যথায় প্রিয়তম কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ! তার আসন টলিল ! মা আমার মহেশ্বর বা জগদ্‌গুরুরূপে আসিয়া উপস্থিত ! ভয় নাই—এস ! ব্যথিত, জর্জ্জরিত, চিন্তাগ্রস্ত, অবসাদাচ্ছন্ন, ক্ষুন্ন, পীড়িত সন্তানবৃন্দ ! আমি তোমাদিগের গুরু আসিয়াছি ! আমি সমস্ত হলাহল পান করিতেছি, আমি তোমাদিগের কর্ম্মোদ্ভূত কালকূট কণ্ঠে গ্রহণ করিতেছি, তোমাদিগের সমস্ত তাপের ভার আমি লইলাম ; ত্রিতাপের ভাবনা আর

তোমাদিগের ভাবিতে হইবে না, সে ভার আমার ; তোমরা মন্থন পুনরারম্ভ কর। অমৃত-কলস প্রাপ্ত হইবে।

মহেশ্বর বিষপান করিলেন ; আনন্দে মন্থন চলিল। সে মন্থনে চন্দ্র উঠিল, কমলা উঠিলেন, কত কি মঙ্গল-পুঞ্জ ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। মঙ্গলে দিক্‌সকল ভরিয়া গেল।

সদ্‌গুরুরূপে আমরাও জগদ্‌গুরুকে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পাই। গুরু বলেন,—"বৎস, কর্ম্ম কর ; আমি তোমাদিগের কর্ম্ম-উদ্ভূত ত্রিতাপরূপ হলাহল পান করিব। তোমাদিগের ফলের ভার আমার। আমার উপর সমস্ত অর্পণ করিয়া তোমরা পূর্ব্ববৎ মন্থন করিতে থাক।" জীব গুরু পাইয়া, সমস্ত ভাবনার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমুখে কর্ম্ম করে। তখন জীবের প্রবৃত্তি মাতৃমুখী কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

যিনি এইরূপে শিষ্যের পাপপুণ্যের ভার গ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। যিনি থাকিয়া থাকিয়া প্রেমে আকুল হইয়া মাতৃ-উদ্দেশে বলেন,—"মা! তোমার এ জীবসন্ততির সমস্ত ভার আমার উপর দিয়া, উহাদিগকে শান্তিময় ক্রোড় দাও, উহাদিগের ভার আমার শিরে দিয়া, তুমি উহাদিগের শিরে চরণ দাও, উহাদিগের ভ্রান্তি আমি লইলাম, ভ্রান্তিরূপিণি! তুমি উহাদিগের তৃতীয় চক্ষু উন্মেষিত করিয়া অমৃতের, সনাতনত্বের সন্ধান দাও'—তিনিই গুরু। তিনি মনুষ্য হইলেও দেবতা, তিনি জীব হইলেও শিব ; তিনিই মৃত্যুর অধীন হইলেও মৃত্যুঞ্জয় ; তাঁর চরণে কোটি কোটি নমস্কার!

মা আমাদিগকে এইরূপে কর্ম্ম না করাইয়া ও সদ্‌গুরু না মিলাইয়া এবং পরে অমরত্বের সন্ধান না দিয়া ছাড়িবেন না।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণ্যাদীনি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষায়ান্ স্মরন্ আস্তে, বিমূঢ়াত্মা বিমুগ্ধান্তঃকরণো মিথ্যাচারঃ কপটাচারঃ স উচ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—বাক্ পাণি আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে মাত্র নিগ্রহ করিয়া, মনের দ্বারা বিষয়-সকল যে স্মরণ করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া অভিহিত হয়।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্ম না করিয়া থকিবার উপায় নাই ; এবং অকর্ম্ম-সকল কর্ম্মে পরিণত না হইলেও মা ছাড়িবেন না। কিন্তু এই কর্ম্ম-পরিণতির ভিতর দিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যে উপস্থিত হইতে হইলে তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান স্তর বা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থাটিতে আমরা কপটাচারী হইয়া পড়ি। আমরা

কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট হই। সচেষ্ট হই সত্য, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে সংযত করিয়া লইলেও মন সেই কর্ম্মক্ষেত্রেই বিচরণ করিতে থাকে। বাহিরে আমি ত্যাগী হইলেও অন্তরে আমি প্রায় পূর্ব্ববৎ। এই অবস্থা অতিরিক্ত প্রবলভাবে ক্রিয়া করিয়া সময়ে সময়ে অনেককে গৃহাশ্রমত্যাগী করিয়া কপট সন্ন্যাস পরিগ্রহণে নিযুক্ত করিয়া ফেলে। আবার যে সকল জীবে উহা তত প্রবলভাবে ক্রিয়া না করে, তাহারা আশ্রমে থাকে সত্য, কিন্তু ওইরূপ কপটাচারী হইয়া; এ কপটাচারের ভিতর দিয়া সকলকে যাইতে হয়। ইহা স্বাভাবিক। বিষয়ে বিমুগ্ধান্তঃকরণ জীবের ইহা সাধারণ গতির অবস্থা-বিশেষ। এবং এই কপটাচারের দ্বারাই পরে আমরা সত্যাচারী হইয়া পড়ি। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধও সেই জন্য অবশ্য প্রতিপাল্য। যথার্থ পক্ষে দেখিতে গেলে বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিতে হইলেই প্রায় সাধারণ জীবকে কপটাচারী হইতে হয়। শাস্ত্র যে বিষয়ের বিধান দিয়াছেন, তাহা করিতে মন না চাহিলেও আমাদিগের উহা প্রতিপাল্য। তবেই মনের ও কার্য্যের গতি বিভিন্ন হইল, আমরা মিথ্যাচারী হইলাম। শাস্ত্রের নিষেধ-সকল মানিতে হইলেও মনের তদ্‌বিরুদ্ধ আবেগ চাপা দিয়া সময়ে সময়ে আমাদিগকে কার্য্য করিয়া যাইতে হয়। তবেই আমরা কার্য্যতঃ মিথ্যাচারী হইলাম। যত দিন না শ্রেয়ই আমাদিগের প্রিয় হইয়া উঠে, যত দিন না প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়-সকল এক সুরে বাজে, এক আনন্দে বিভোর হয়, এক ধ্রুব-লক্ষ্যে গতিযুক্ত হয়, তত দিন এইরূপে কপটাচারী হইতেই হইবে। কপটাচার হইতেই সত্যাচার লাভ হইবে। মিথ্যাই সত্যে পরিণত হইবে।

যখন মহালক্ষ্যে আমি মুগ্ধ হই, তখন আর চেষ্টা করিয়া শাস্ত্রবিধি-সকল অনুধাবন করিতে হয় না; তখন প্রাণ আপনা হইতেই বিধিবৎ কার্য্যেই রত হইয়া পড়ে। কেন না, স্থিরলক্ষ্য পুরুষের কার্য্য-সকলই বিধি বা বিধির মূল ভিত্তি। এবং তাঁহার বিধি-নিষেধ মানিয়া চলা না চলা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অনুরোধসাপেক্ষ নহে। হয় ত না মানিলেও চলে; এবং কর্ম্মত্যাগী হইতেও জীব অধিকার লাভ করে ও পরে হইয়া পড়ে; কিন্তু তত্রাচ কপটাচার-যুক্ত সমাজের মধ্যে যতক্ষণ থাকিতে হইবে, ততক্ষণ নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও সে সকল বিধি-নিষেধ জগতের মুখ চাহিয়া মানিয়া চলা অবশ্য কর্ত্তব্য। সে কথা ভগবান্ পরে বলিয়াছেন।

যাহা হউক, কপটাচার অনুধাবন করিতে করিতে ক্রমশঃ জীব সত্যাচারে আসিয়া উপস্থিত হয়; শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের সেই জন্য আবশ্যকতা। এই জন্যই নিত্যক্রিয়া-সকলের ব্যবস্থা। তাই প্রাণ ভগবান্‌কে ডাকিতে না চাহিলেও কপটাচারের বশবর্ত্তী হইয়া নকল করিয়াও ডাক অভ্যাস করিতে হয়। প্রাণ যদি নাও চাহে, প্রাণ যদি মায়ের দিকে ফিরিতে মুহূর্ত্তের জন্য তৃষ্ণা অনুভব না

করে, তবু শাস্ত্রবিধান অনুসারে ডাকিও ; নকল করিয়াও মাকে ডাক ; নকল করিয়াও মায়ের জন্য প্রতি সন্ধ্যায় কাঁদ ! পূর্ব্ব হইতেই কপটাচার বলিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইও না ; কেন না, এ কপটাচার সত্যাচারের উপায়স্বরূপ জানিবে। সত্যাচার এক দিনে কেহ পায় নাই, কেহ পাইতে পারে না। বহু জন্ম মিথ্যাচার করিতে করিতে তবে উহা সত্যাচারে পরিণত হয়। জগতে যে সমস্ত পুরুষকে যথার্থই সত্যাচারী দেখিতে পাই, অর্থাৎ প্রাণ মন ও কার্য্যে ঐক্য যাহাদিগের থাকে বা প্রাণের আকুলতায় মাকে ডাকিতে যাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, জানিও—বহু জন্ম মিথ্যাচার বা নকল ডাকের পর তবে এ অবস্থায় তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মিথ্যাচার জিনিষটা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, প্রাণ বা মনের গতি এক প্রকার ও কার্য্যের গতি অন্য প্রকার দেখিয়া মানুষ মিথ্যা বলিয়া একটা নাম দিয়াছে মাত্র। মিথ্যাটা সত্যেরই অবস্থাবিশেষের আংশিক রঞ্জনা অথবা বিপর্য্যয় মাত্র ; সুধু আচার সম্বন্ধে নহে ; সকল বিষয়েই বুঝিও। মিথ্যা ও সত্যের ধান্ধা যেখানে উদয় হইবে, সেইখানেই এইরূপে সত্য ও মিথ্যাকে দর্শন করিবে।

আজ যাহা করিতে গেলে তুমি মিথ্যাচারী হইয়া পড় অর্থাৎ কার্য্যে ও মনে ঐক্য থাকে না, দুই দিন অভ্যাসের পর তাহাই আবার না করিলে মিথ্যাচারী হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ তখন প্রাণ আর উহা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। করুণাময়ী মায়ের আমার করুণার ইহা একটি অপূর্ব্ব লক্ষণ। আজ হয় ত একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর কার্য্য করিয়া তুমি উহা তুচ্ছ বলিয়া ভাবিতে পার ; আজ হয় ত একবার উপেক্ষায় ঔদাস্যে অবহেলায় মা বলিয়া ডাকিয়া তুমি ভাবিতে পার, উহা কিছুই নহে ; কিন্তু জানিও, ভাবের অমর বীজ তোমার ওই অবহেলা ও উপেক্ষা-জড়িত ডাকটির ভিতর লুক্কায়িত আছে ; সর্ব্ববীজস্বরূপ মা আমার উহারই ভিতর দিয়া তোমার অন্তরে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন ; উহা কখনও ব্যর্থ হইবার নহে ; ব্যর্থ বলিয়া জগতে কিছু নাই। আজিকার ওই উপেক্ষার আহ্বান ধীরে ধীরে তোমার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকিবে ; আজিকার একটি ডাক, কাল দুইটি ডাকে, পর দিন চারি ডাকে, পর দিন শতে, পর দিন লক্ষে, কোটি আহ্বানে পরিণত হইবে। একটি উপেক্ষার আহ্বান উপেক্ষায় হতাদরে তোমার প্রাণে প্রবেশ করিয়া, কালে তোমার চির আদরের তুমিত্বটুকুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে ; তুমি মাতৃনামময় হইয়া পড়িবে। মিথ্যাচারে যাহা একবার হইয়াছিল, সত্যাচারে তাহাই সহস্রবার হইবে। মায়ের আমার এই মহিমা কার্য্যে কার্য্যে সংরক্ষিত।

মিথ্যাচার ঘৃণা করিও না। মনে করিও না, মিথ্যাচারের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া ভগবান্ এই শ্লোকটি বলিয়াছেন বা বলেন। তাহা নহে ; তিনি কার্য্যের অবস্থাবিশেষের কথা বলিয়াছেন। কর্ম্মের ভিতর দিয়া যাইতে হইলে, কর্ম্ম আগে

এক দিক্ হইতে সূচনা করিয়া জীবকে কি প্রকারে তৎকর্ম্মময় করিয়া ফেলে এবং প্রথম সূচনায় জীব যে প্রকারে মিথ্যাচারিরূপে আপনাকে অনুভব করে, সেই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

আবার বলি, মিথ্যাচার না করিয়া আমাদিগের গত্যন্তর নাই। তাই শাস্ত্রে যাহা বলে, আমরা প্রাণের সমস্ত আবেগ চাপিয়া তাহাই করিতে সচেষ্ট হই। মনের উপর তীব্র আকর্ষণ অনুভূত হইলেও আমরা কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া রাখি। মনের একান্ত আবেগ চাপিতে না পারিলে, মহাশক্তিরূপিণী মায়ের শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া কাঁদি, শক্তি ভিক্ষা করি। সমাজ-বন্ধনও জীবকে এই প্রকারে চারি ধার হইতে মিথ্যাচারের ভিতর দিয়া সত্যাচারের দিকে লইয়া যায়। নতুবা পশুত্বে পুনরায় মনুষ্যত্ব নিমগ্ন হইয়া পড়িত। আশ্রমধর্ম্ম জীবকে মিথ্যাচারী হইতে বাধ্য করিয়া রাখে, এবং কালে সত্যাচারী করিয়া তুলিয়া, তার পর তাহাকে নৈষ্কর্ম্ম্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

কিন্তু তাই বলিয়া এই মিথ্যাচারই তোমার লক্ষ্য নহে; তোমার গতি তোমায় এইরূপ কর্ম্মী মাত্র করিয়া পর্য্যবসিত হয় না, সুতরাং যাহাতে উহা না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহা তোমার লক্ষ্য, যে সত্যাচারী অবস্থা তোমার লভ্য, ভগবান্ সে অবস্থার কথা পরে বলিবেন। তুমি মিথ্যাচারে ডুবিয়া আছ বলিয়া মিথ্যাচার পরিবর্দ্ধিত করা তোমার অভিপ্রেত হওয়া উচিত নহে, বরং যাহাতে সে মিথ্যাচার দ্রুত সত্যাচারে তোমায় লইয়া যায়, তাহাই তোমার কর্ত্তব্য। সেই জন্য ভগবান্ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের বিচার প্রাণে ফুটাইবার সময়, কপট-সন্ন্যাস পরিগ্রহণ যে কর্ত্তব্য নহে, সেই অভাস দিবার জন্য এই মিথ্যাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

যদি বল, শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মানিবার সময়েও যখন আমরা প্রায় মিথ্যাচারিরূপেই প্রতিপন্ন হই, এবং যখন সেই সকল মিথ্যাচারই সত্যে লইয়া গিয়া উপস্থিত করে, তবে কপট সন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগী হওয়াই ত যুক্তিযুক্ত। মন যাহাই বলুক না কেন, কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিতে রাখিতে বা কপট কর্ম্মত্যাগী হইতে হইতে কালে যথার্থ নৈষ্কর্ম্ম্য ত আসিতে পারে! যেমন কপট ভাবে শাস্ত্রীয় বিধি প্রতিপালন করিতে করিতে সত্যভাবে বা কর্ম্ম ও মনকে এক করিয়া সে বিধি-সকল প্রতিপালন করিবার শক্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে, তদ্রূপ কপট ভাবে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে কালে উহাই আমায় সত্য সন্ন্যাসে বা নৈষ্কর্ম্ম্যে পৌঁছাইয়া কেন না দিবে? অথবা শাস্ত্রীয় নিষেধ-সকল মানিবার সময় যখন কপট ভাবেই আমাদিগকে প্রায় ত্যাগী হইতে হয়, মন ছাড়িতে না চাহিলেও শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে যখন আমরা অনেক কার্য্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য হই, তখন কপট সন্ন্যাসের অবলম্বন বরং প্রশস্ত। তবে আমি সংসারাশ্রমের কর্ম্মজালে কেন জড়াইয়া থাকিব? কেন কপট সন্ন্যাস অবলম্বন করিব না?

তাহা নহে। শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ-সকলের লক্ষ্যই ত্যাগের দিকে, যথার্থ সন্ন্যাসের দিকে বা সূক্ষ্ম কথায় মাতৃ-পরিগ্রহণের দিকে। কার্য্য-সকলকে যে ভাবে সম্পাদন করিলে, যে সকল নিয়ম ও নিষেধের গণ্ডীর ভিতর দিয়া পরিচালিত করিলে যথার্থ নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইতে পারে, শাস্ত্র সেই সকলই বিধি ও নিষেধ বলিয়া আদেশ করিয়াছেন; যথার্থ নৈষ্কর্ম্ম্য ও সন্ন্যাস লাভের বা মাতৃ-লাভের জন্যই কর্ম্ম। এবং সেই সকল কর্ম্মকে সেই সত্য সন্ন্যাসমুখে অগ্রসর করিবার জন্য শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ-সকলের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে ত্যাগ ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইয়া আসিতে থাকে ও সময়ে যথার্থ সন্ন্যাসে আনিয়া জীবকে উপস্থিত করে। হঠকারিতার দ্বারা ত্যাগ লভ্য নহে বলিয়াই এ শাস্ত্র সকলের আবশ্যক। হঠাৎ মনের ক্ষণস্থায়ী আবেগের বশে কপট সন্ন্যাস পরিগ্রহণ করিলে উহা নৈষ্কর্ম্ম্যে না পৌঁছাইয়া বিপরীত দিকে, কর্ম্মহীনতার দিকে বা জড়তার দিকে জীবকে লইয়া যায়; সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ত্যাগের অভ্যাস ধীরে ধীরে করাইবার জন্য, ধীরে ধীরে জীবকে মাতৃমুখী করিবার জন্য, তাই ভগবদিচ্ছায় গৃহস্থাশ্রমরূপ একটি অপূর্ব্ব আশ্রম মনুষ্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। নতুবা পশুত্বের পরই সন্ন্যাস লাভ হইতে পারিত। মায়া চর্চ্চার আবশ্যকতা থাকিত না। ব্রহ্মশক্তির পরই শিবশক্তির স্ফুরণ হইত; বিষ্ণুশক্তির বিকাশের প্রয়োজন ঘটিত না। বিষ্ণুমায়া লাভ ও সেই মায়া দ্বারা যাহার মায়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরা যত দিন না হইবে, তত দিন যথার্থ ত্যাগী হইবার উপায় নাই। সেই জন্য শাস্ত্র একবারে ত্যাগী হইবার ব্যবস্থা না করিয়া বিধি-নিষেধযুক্ত আশ্রমধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। নতুবা ত্যাগই যখন শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য, তখন শাস্ত্র একবারে ত্যাগী হইবারই সর্ব্বত্র আদেশ করিতেন। শাস্ত্রে যে সকল স্থলে ত্যাগের ব্যবস্থা ও প্রশংসা আছে, সে সকল স্থল কেবল উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া যাহারা আশ্রমে মৃত্যুময় জীবন অতিবাহিত করে ও যাহার মায়া, তাহাকে না দিয়া, আপনার গলায় সর্প রাখিয়া, আপনি ফণিভূষণ হইয়া গরলে জর্জ্জরিত হয়, তাহাদিগকে ত্যাগমুখে বা শাস্ত্রের ও আশ্রমের মূল লক্ষ্যের দিকে উদ্বোধিত করিবার জন্য।

তাহা হইলে প্রধানতঃ আমরা এই বুঝিলাম, আমরা আশ্রমে কপটাচারী সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কপট সন্ন্যাস প্রশস্ত নহে বা কপট ভাব থাকিতে আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সন্ন্যাস বস্তুতঃ নৈষ্কর্ম্ম্যের উপায় নহে, নৈষ্কর্ম্ম্য নিজেই সন্ন্যাস।

আবার এই সন্ন্যাসই যথার্থ সত্য পরিগ্রহণ। সত্যাচার পরিগ্রহণের নামই সন্ন্যাস। মাকে সম্পূর্ণভাবে জড়াইয়া ধরার নামই সন্ন্যাস। আমরা তত দিন আশ্রমে থাকিতে বাধ্য, যত দিন না আমরা মাকে এইরূপে সম্পূর্ণভাবে জড়াইয়া ধরিতে সক্ষম হই। সাধারণ অবস্থায় আমরা যে সময়ে সময়ে মা মা করিয়া আকুল হই,

উহাও মিথ্যাচার, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখনও সম্পূর্ণ মাতৃ অস্তিত্বে আমরা নির্ভর করিতে, বিশ্বাস করিতে সক্ষম হই নাই। বহু জন্ম ধরিয়া কল্পনায় আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিতেছি; বহু জন্ম ধরিয়া আমরা মায়ের দিকে চক্ষু ফিরাইতে অভ্যস্ত হইতেছি। এই মনুষ্যক্ষেত্রে সে চক্ষু সম্পূর্ণভাবে জীব ফিরাইতে সমর্থ হয়! এই ক্ষেত্র হইতে জীব যথার্থ সত্য লাভ করিয়া সত্যাচারী হয়। এই মনুষ্যজন্মে জীবের সকল ক্রন্দনের অবসান হইবে। কত বার মনুষ্যরূপে সঞ্জাত হইয়া, একটু একটু করিয়া তবে মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসযুক্ত হয়। বহু বিচার বিভ্রান্তি, বহু আয়াস, বহু বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া বহু জন্ম যাতায়াত করিয়া, শেষে কাঁদিয়া বলিয়া থাকে,—"মা গো! কল্পনায় কল্পনায় তোমায় গড়িয়া আসিতেছি; কল্পনায় কল্পনায় তোমায় পূজা করিয়া আসিতেছি। আমার সুখ-দুঃখ মন্থনের মাঝে তোমার কল্পনাময়ী মূর্ত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছি। তুমি আমার আঁধার হৃদয়ের লুকাইয়া পূজা করিবার দেবতা। আমার নিভৃতে নীরবে আদর করিবার প্রতিমা। আমার সকল কাহিনী যতন করিয়া শুনিবার লোক। আমার সকল দীর্ঘশ্বাস বুক পাতিয়া লইবার স্নেহমূর্ত্তি। বহির্জগতের প্রত্যেক কষাঘাতে কাঁদিয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইবার আশ্রয়স্থল। তুমি কি শুধুই কল্পনাময়ী—না সত্য? সত্য আছ কি? যদি না থাক, তবে ক্ষুধাতুরের মত বার বার তোমার দ্বারে করাঘাত করিতে প্রাণ ছোটে কেন? যদি থাক, তবে সহস্র কাতর ক্রন্দনে উত্তর দাও না কেন? এস মা! আর যে তুলিতে পারি না। সন্দেহ-দোলার আন্দোলন আর যে সহ্য হয় না মা! একবার মাত্র এস! একবার মাত্র আসিয়া বল, "এই যে আমি রহিয়াছি। তোর কল্পনা সত্য, মিথ্যা নহে। আমি তোর অভয়া জননী—আয়! আর কাঁদিতে হইবে না—বুকে আয়!"

প্রাণের এইরূপ তীব্র লালসা যখন আসিয়া পড়ে, তখন সেই জীব সত্যের আভাস পাইতে থাকে। তখন হইতে জীব সত্যাচারী হইতে থাকে। অর্থাৎ তাহার কর্ম্মসকল মিথ্যাচার মাত্র না থাকিয়া সত্যাচারে পরিণত হইতে থাকে। তাহার মাতৃ-আহ্বান, শুষ্ক শাস্ত্রাদেশ পরিপালন মাত্র আর থাকে না। ভাবময়—সত্যময় হইয়া পড়ে।

মা ছলনাময়ি! এ মিথ্যাচার তুমিই ত শিক্ষা দিয়াছ! তুমি নিজে অহর্নিশ মিথ্যাচারিণীরূপে জীবচক্ষে প্রতিফলিতা হইয়া কেন রহিয়াছ? তুমি যখন বুকের ভিতর স্নেহ ও বজ্র ধরিয়া সুনীল অম্বর জুড়িয়া মেঘরূপে আসিয়া দাঁড়াও, শ্যামাঙ্গিনি! তোমায় মা বলিয়া জ্ঞান আমায় শিখাইয়া দিলেও প্রাণ তোমার সে বজ্র-ক্রীড়ায় শিহরিয়া সঙ্কুচিত হয় কেন? মা বলিয়া তোমায় দেখিতে পাই না কেন? মায়ের অট্ট হাসি ভাবিয়া জীব, নির্ভয়ে আনন্দে বজ্রপাত বক্ষে ধারণ করিতে পারে না কেন? তুমি দীপ্তিময়ী অনলশিখারূপে জীবের সম্মুখে যখন উপস্থিত হও, জীব তোমার সে

জ্যোতিঃসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেও তোমার দাহিকা শক্তির ভয়ে তোমায় বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে পারে না কেন? মা বলিয়া তোমায় ধরিতে পারে না কেন? তুমি যখন কালসর্পরূপে আসিয়া সম্মুখে ফণা বিস্তার করিয়া আপন গৌরবে দুলিতে থাক, তোমার সে অভিনব বিভীষণ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইলেও তোমার মুখে মুখ দিয়া চুম্বন করিতে জীব সাহসী হয় না কেন? তুমি মৃত্যুরূপে যখন আসিয়া জীবকে অচেতন করিতে থাক, জীব কেন সাগ্রহে তোমার সে ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহে না? জীব জানে—তুমি মঙ্গলময়ী, তোমার সর্ব্বত্র নিত্য মঙ্গলমূর্ত্তি মাত্র বিরাজিত, কিন্তু তবু জীব সর্ব্বত্র তোমায় সোহাগ করিতে সক্ষম হয় না কেন? তুমি যখন কাম, ক্রোধ, লোভ, রোগ, শোক, দারিদ্র্য-আদিরূপে মনুষ্য-হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাক, তখন জীব তোমায় অমৃতরূপিণী জানিয়াও পরিণাম ভাবিয়া ভীত হয় কেন? তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে একমাত্র স্নেহ ও মঙ্গল লইয়া রহিয়াছ, জলে স্থলে, অনিলে অনলে, বৃক্ষে জীবে, সর্ব্বত্র তুমি নিত্যমঙ্গলা হইয়াও, অনিত্য অসৎ অমঙ্গলময়ীরূপে প্রতিফলিতা হও কেন? তুমি স্নেহের সুরে প্রণব-পূরিত সামগান গাহিলে, আমি বুঝিলাম—পক্ষীর কূজন মাত্র! কেন তোমার ছদ্মবেশ? তুমি স্নেহের চক্ষু বিস্তারিত করিয়া আমার দিকে চাহিলে, আমি ভাবিলাম—সূর্য্যোদয় হইল মাত্র অথবা জ্ঞান বিকাশ হইল মাত্র! কেন তোমার এ ছলনা? তুমি স্নেহের আলিঙ্গনে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিলে—আমায় দেহ দিলে, আমি সে আলিঙ্গনকে ভাবিলাম নশ্বর দেহ মাত্র। কেন—কেন মায়াবিনি! জানি, ইন্দ্রিয়পথে যাহা আমি অনুভব করিতেছি সে সমস্তই তুমি—তবু অনুভবে তুমি না আসিয়া বিষয়রূপে অনুভূত হও কেন? তুমি সত্য যাহা, তাহা আমায় সর্ব্বদা দেখিতে দাও না! জানি, মিথ্যা বলিয়া কিছু নাই, হইতে পারে না। সুতরাং এ মিথ্যা শব্দ বা ভাবটিও মিথ্যা নহে—সত্য। কিন্তু এমন "মিথ্যারূপ" সত্য হইয়া আমাদিগকে মিথ্যা দেখিতে শিখাইলে কেন? শুনিয়াছি, জগতে সবই সত্য, "নাম" ও "রূপ" ছাড়া। আমি জানি, নামও সত্য, রূপও সত্য। সত্যও যেমন একটি ভাববিশেষ, মিথ্যাও তদ্রূপ একটি ভাববিশেষ এবং সত্য। তবে সর্ব্বতোভাবে সত্য হইয়া এ মিথ্যারূপ সত্য তুমি কোথায় পাইলে—কেমন করিয়া হৃদয়ে স্থান দিলে, কেন সুবর্ণ অঙ্গে কালিমা লিপ্ত করিয়া তোমার ও আমার মাঝে ব্যবধান নির্ম্মাণ করিলে? কেন এমন করিয়া মজাইলে—মিথ্যারূপিণী সত্য! কেন এমন করিয়া পীড়ন করিলে সত্যরূপিণী মিথ্যা! কেন এমন করিয়া কাঁদাইলে—স্নেহময়ি পাষাণি! ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, উভয়ের আমিত্ব এক আমিত্বে পরিণত হওয়া—তোমার আমিত্ব আমার করিয়া লওয়া। তোমাকে যখন "আমি" বলিয়া বুঝিব, তখন আমার সাধ পূর্ণ হইবে। তুমি আপনি সে সুখ ভোগ করিতেছ, আমায় কেন দিতেছ না? আমি বিষয়বিমূঢ়াত্মা সত্য; কিন্তু সেই

বিষয়কে যখন তুমি বলিয়া দেখি, তখন তোমার নীরব স্নেহ আমায় যে আরও বিমূঢ় করিয়া ফেলে! তুমি হয় ত বলিবে—"কালে পাইবে," "এইবার পাইবে"। আমি বলি—কেন এই মুহূর্ত্তে পাইব না! কেন এত দিন এত জন্ম পাই নাই! তার উত্তর কি তুমি দিবে! কি বলিয়া তুমি আমায় বুঝাইবে! তোমার বুঝাইবার গোটা-কয়েক বাঁধা কথা আছে জানি—যেমন "কর্ম্মফল," "ক্রমশঃ," "দুঃখ বলিয়া কিছু নাই," "দুঃখ না হইলে সুখ উপলব্ধি হয় না"—"আঁধার না হইলে আলোক উদ্ভাসিত হয় না"—ইত্যাদি। ও সব বাঁধি কথায় ভুলিয়া বুকে অনেক দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া চাপিয়া আসিয়াছি, অনেক চক্ষের জলে চক্ষে মিলাইয়া লইয়াছি, অনেক বিষাদের আবেগ নকল আনন্দের হিল্লোলে মিলাইয়া দিয়াছি! অনেক দুঃখের অন্ন সুখ করিয়া খাইয়াছি! কিন্তু আজ তুমি মিথ্যাচারের কথা তুলিয়াছ—আজ সরল গম্ভীর ভাবে "মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে" বলিয়া মিথ্যার কথা উত্থাপন করিয়াছ—আপনি মিথ্যাচারী হইয়া, আমাকে মিথ্যাচারী করিয়া, আবার আপনিই "মিথ্যাচার" বলিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিয়াছ, আজ আর অভিমান চাপিয়া রাখিবার স্থান আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে খুঁজিয়া পাইতেছি না। এস—সুবিশাল হৃদয় পাতিয়া, তাহাতে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি একবার চাপিয়া ধরিয়া, তুমি আমার এ প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি! ভালবাসা কি যুক্তির বাঁধ মানিয়া চলে! "কর্ম্মফল"—সে আবার কি? তোমার কি কর্ম্মফল আছে নাকি? তোমাকে চাহিলে কর্ম্মফল থাকে? রাজা ভৃত্যের দ্বারা চালিত! "ক্রমশঃ!"—কেন ক্রমস্ফুরণ? দুঃখ-শূন্য সুখ কেন হইবে না? আঁধার না হইয়া আলোকানুভূতি কেন হইবে না? তুমি কি অক্ষম? তোমার সে শক্তি কি নাই? তোমার শক্তিতে কি কোথাও কিছু অসঙ্কুলান হয় নাকি! তবে—তবে কপটী—আমার "কেন"র উত্তর দিতে কি তোমার শক্তি নাই? আমার অসংখ্য অভিমান-ভরা "কেন" তুমি বুঝাইয়া দাও।

কি বলিলে! "তুমি যেমন চাহিয়াছ—তেমনই আমি দিয়াছি! তুমি যেমন ক্রীড়া আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে,—তাহাই আমি সাদরে তোমায় দিয়াছি! আমি কল্পলতা, তোমার সমস্ত কল্পনা পুরাইতে আমার প্রাণ চহে। তোমার সাধনা পূরণ করিয়াছি!" কি বলিলে? কি বলিলে যাহা চাহিয়াছি, তাহাই দিয়াছ! তাহা অবাধে দেওয়াই তোমার মহিমা! আমি বিষ চাহিলে তুমি বিষই দিবে! তুমি আমায় ভালবাস?

বল,—তাই বল—আবার বল মা—"আমি তোমায় ভালবাসি! আমি মিথ্যাচার করি, আমি তোমায় ভালবাসিয়া মোহান্ধ হইয়া পড়ি। আমার বিশাল প্রাণ সঙ্কুচিত করিয়া, তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তুমি যাহা চাহ, তাহাই দিয়া ফেলি। অবাধে দিই—নির্ব্বিচারে দিই—নিজত্ব অবধি দিয়া ফেলি! আমি

তোমার ভালবাসিয়া মায়াময়। তবে আমি অমৃতময় বলিয়া, আমি যাহা যে আকারেই দিই, তাহাই অমৃত! মিথ্যা কিছু হইবার উপায় রাখি নাই। বৃথা হইবার কিছু আশঙ্কা নাই; তুমি যে খেলনা চাও, আমি অমৃত দিয়া সেই খেলা প্রস্তুত করিয়া তোমায় দিই। অমৃতই আমার ভাণ্ডার, আমার অন্য ভাণ্ডার নাই! থাকিলে বোধ হয় দিয়া ফেলিতাম—ভুলে! তোমাকে লইয়া আমি ভালবাসার খেলা খেলিতেছি। তুমি বুক হইতে লাফাইয়া পড়িতে চাহিয়াছ—আমি বুকে রাখিয়াই তোমার সে স্বপ্ন দেখাইয়াছি! দেখাইয়াছি, যেন তোমার ও আমার মাঝে ব্যবধান রহিয়াছে। তুমি খেলার স্বপ্নে মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছ—আমার খেলার চমক ভাঙ্গিয়াছে! কি করিলাম বলিয়া জিহ্বা দন্ত দ্বারা নিপীড়িত করিয়া, নিজ মোহ দূর করিয়া, তোমায় ক্রোড়ে লইতে এই আমি আসিয়াছি! বৎস—শিষ্য—পুত্র—প্রিয়! সখা! আমি তোমায় ভালবাসিয়া মোহান্ধ! আমি মিথ্যাচারপরায়ণা!”

ইহাই মায়ের উত্তর। মা ভালবাসিয়া আত্মহারা! সে ভালবাসার আলিঙ্গন-সুখে মত্ত হইয়া, সে সুখ-স্ফুরণে কণ্টকিত হইয়া আমরা দিগ্‌বিদিকে ছুটিয়া পড়িয়াছি। দিক্‌সকল তাই রচিত হইয়াছে; ঈশ্বরাদি—দেবতাবর্গরূপে, গ্রহাদি—শক্তিধররূপে, আমাদিগের সে আনন্দক্রীড়ার মত্ত অবস্থা হইতে পুনরায় মাতৃমুখী করিবার নিয়ামক-স্বরূপ হইয়া মাতৃশক্তিই আমাদিগকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া চলিয়াছে। নিশ্চিন্তে মুগ্ধ জননী ইহা দর্শন করিতেছেন। ছেলেরা যেমন চিনির পুতুল তৈয়ারি করিয়া, তাহাকে বস্ত্রখণ্ডাদিতে সাজাইয়া ক্ষণকাল ক্রীড়া করে এবং চিনিতেই তাহাদিগের পুতলীর সাধ মিটিয়া যায়, তদ্রূপ অবহনীয় সুখাবেশে আমরা নিত্য অপরিণামী হইয়াও বহু মূর্ত্তিতে উন্মত্ত হইয়া তোমা হইতে দূরে চলিয়া আসিবার কল্পনা করিয়া ফেলিয়াছি এবং নিত্য অমৃতেই সে অবস্থা-সকল রচিত হইয়াছে। ক্ষণকাল পরে বালকের সেই চিনির পুত্তলি ভক্ষণের মত আমরা ক্রীড়ার পর ক্রীড়া ভঙ্গ করিতেছি. উহা অমৃত জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া আমাদিগকে অমৃতত্বে লইয়া যাইতেছে। এইরূপ নিত্য নির্ম্মিত বহু লইয়া ধরিতে ছাড়িতে ধরিতে ছাড়িতে আমরা নিত্য একত্বের দিকে ফিরিয়া চাহি না। গড়া ভাঙ্গার ভিতরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখকে মাত্র জড়াইয়া ধরি। মিথ্যাচারের সুখের মুখ চাহিয়া মিথ্যাচারী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করি। মঙ্গলময়ীর সমস্তই মঙ্গলময় বলিয়াই রক্ষা, নতুবা আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইত। গহ্বরপ্রবিষ্ট স্রোতোবারির মত বদ্ধ হইয়া আমরা কতকগুলা বহু লইয়াই নিত্য মত্ত থাকিতাম। বহু হওয়া অর্থে বহু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহু পদার্থে মত্ত থাকা। আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন যাহা কিছু উপলব্ধি করি, তখন আমরা নিজেরাই তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হই। মনোবিজ্ঞানের কথা, পরে বলিব। যাহা হউক, এই বহুত্ব লাভ করিতে যাইলেই ইহার মধ্যে মধ্যে ব্যবধান পড়িয়া যায়; নতুবা বহুত্বের উপলব্ধি আসিতে পারে না। মায়ের

মঙ্গলধর্ম্ম-রচিত এই ব্যবধানসকলই দুঃখরূপে প্রতিভাত হয়—আমাদিগকে নিত্যত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা চারি ধারেই ব্যবধান দেখিয়া আবার পূর্ণত্বের দিকে—একত্বের দিকে যাইতে ইচ্ছা করিতে আরম্ভ করি। ইচ্ছা যত অধিক পারিমাণে অন্য ইচ্ছা-সকলকে পরাভূত করিয়া প্রবল হইতে থাকে, তত আমরা বুঝিতে পারি, আমার বহুত্ব বস্তুতঃ নাই। একই অমৃত চারি ধারে বিস্তৃত ; কার্য্যতঃ আমরা নিত্যই আছি। বহু বলিয়া যাহা দেখিতেছি, তাহা বহু নহে, একেরই সত্যাচারকৃত বহুমূর্ত্তিকে আমাদের মিথ্যাচারকৃত বহু বলিয়া দর্শন। মিথ্যাচার করিয়া আমরা আপনাদিগকে অনিত্য ভাবি, ব্রহ্মাণ্ড অনিত্য ভাবি। এ সকল আমার ইচ্ছাকৃত একদেশদর্শন মাত্র, মিথ্যাচার মাত্র। যেমন চক্ষু সঙ্কুচিত করিলে সূর্য্যের রশ্মিরেখা-সকল পরিদৃষ্ট হয়, সম্পূর্ণ উন্মেষিত চক্ষে আলোকবিস্তার ছাড়া রশ্মিরেখা যেমন পরিদৃষ্ট হয় না, অথবা গবাক্ষ দিয়া প্রবিষ্ট হইলে যেমন তাহাতে রেণুসকল পরিদৃষ্ট হয়, বিস্তৃত আকাশতলে উহা যেমন হয় না, তদ্রূপ আমাদিগের ইচ্ছাকৃত সংকীর্ণ চক্ষে বা ইন্দ্রিয়পথে বিষয়-সকল উপলব্ধ হইতেছে ; আবার ইন্দ্রিয়সকল বিস্তৃত হইলে আর উহা বিষয় বলিয়া উপলব্ধ না হইয়া, একমাত্র নিত্য অমৃত সমুদ্র বলিয়া বুঝিব। মিথ্যাচার তখন দূর হইবে। তখন প্রত্যেক পদার্থমধ্যে মাতৃ-স্নেহ প্রবাহিত দেখিয়া—চারি ধারে মাকে দেখিয়া, মায়ের বহুমূর্ত্তি বলিয়া জানিয়া, অনন্ত বিস্তারে হৃদয় বিস্তৃত হইতে থাকিবে, একমাত্র মস্তক লইয়া মাকে প্রণাম করিয়া সাধ মিটিবে না। দুইখানি মাত্র বাহু লইয়া চারি ধারে অবস্থিতা মাকে স্পর্শ করিয়া আশা পূরিবে না ; তখন প্রাণ বলিবে,—"দাও মা—সহস্র শির দাও—সহস্র দিকে সহস্র শির পাতিয়া তোমায় প্রণাম করি ; সহস্র বাহুতে সহস্র দিকে তোমার সহস্র চরণ স্পর্শ করি ! প্রতি বিন্দুতে তুমি নিত্য পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ; আমি দেখিলাম—দুই চক্ষু দিয়া দেখিয়া উঠিতে পারিতেছি না—সহস্র দিকে সহস্র চক্ষে দেখিব—সহস্র দিকে সহস্র হৃদয়ে তোমার পূজার সম্ভার সাজাইব—সহস্র কণ্ঠে সহস্র দিকে তোমায় মা বলিয়া ডাকিব।" তখন তোমার সহস্রদল পদ্ম শিরে ফুটিবে, তখন অমৃত ঝরিবে, তখন তুমি সহস্র-শীর্ষ-পুরুষ নারায়ণ হইবে। মিথ্যাচার হইতে সত্যাচারে তখন মাতা পুত্র উভয়েই দাঁড়াইবে।

সত্যাচারের দ্বারা যেমন মা অনন্তা হইয়াও অণুস্বরূপা, মিথ্যাচারের দ্বারা যেমন আমরা নিত্য হইয়াও অনিত্যকল্প, তদ্রূপ আবার এই মিথ্যাচার অবলম্বন করিয়াই সত্যাচারে যাইতে হইবে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাই বলি সাধক তুমি মিথ্যা কল্পনার সাহায্যে প্রতিক্ষণে সর্ব্বতোব্যাপিনী মাকে আমার পূর্ব্বোক্তরূপে সহস্র শিরে প্রণাম কর ; মনে কর, যেন তোমার আকাঙ্ক্ষ্য দেবতা উর্দ্ধে অধেঃ, চারি ধারে তোমায় বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান ; আর তুমি সহস্রশীর্ষ হইয়া তাঁহার চরণে চরণে লুটাইতেছ, সহস্রচক্ষু হইয়া সহস্র ধারে তাঁহাকে দেখিতেছ, সহস্র করে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া,

করিয়া, সহস্র চক্ষে তাঁহার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতেছে। তোমার আপাদমস্তক সর্ব্বত্র সহস্র কণ্ঠে ভালবাসার, কৃতজ্ঞতার, সুখের নিদর্শনস্বরূপ মহা আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে। কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে কর্ম্মরূপিণী মায়ের অঙ্গে চারি ধারে সংযুক্ত করিয়া— মনের দ্বারা এই ভাবে মাকে গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রিয়-বিমূঢ়াত্মা তুমি একবার মায়ে বিমূঢ় হও, তোমার এই মিথ্যাচার তোমায় সত্যাচারে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবে। সেই কথা ভগবান্ পরশ্লোকে বলিতেছেন।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭

হে অর্জ্জুন, যস্তু ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য মাতৃযুক্তেন্দ্রিয়ো ভূত্বা ইত্যর্থঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগং কর্ম্মরূপং যোগং আরভতে অনুতিষ্ঠতি, অসক্তঃ ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ সন্ স বিশিষ্যতে মিথ্যাচারাৎ বিশিষ্টো ভবতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন! আবার যে মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়-সকলকে নিয়মিত বা মাতৃযুক্ত করিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, ফলাভিলাষ-শূন্য সেই পুরুষ বিশিষ্টতা লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, কর্ম্ম-পরিণতির ভিতর দুইটি স্তর আছে। প্রথম স্তরটি মিথ্যাচারপূর্ণ বলিয়া ভগবান্ তদ্রূপ কর্ম্মকারীদিগকে মিথ্যাচার বলিয়া উল্লেখ করিলেন। সাধারণ জীবমাত্রেই এইরূপ মিথ্যাচারী। দ্বিতীয় স্তরটি উক্ত মিথ্যাচারোদ্ভূত সত্যাচরণ, এবং সেই জন্য জীব মিথ্যাচার হইতে ক্রমে সত্যাচরণে আসিয়া সত্যাচারী হইয়া বিশিষ্টতা লাভ করে। প্রথম স্তরের কথায় বলিয়াছি, মনে যাহাই থাক, কার্য্যসকলকে শাস্ত্রানুশাসন ও সমাজানুশাসনের বশবর্ত্তী রাখিয়া লোকে সংসারে বিচরণ করে। ওইরূপ করিতে করিতে সে আপনার মিথ্যাচার উপলব্ধি করে; দেখে, বস্তুতঃ তাহার কার্য্যসকল তাহার মনোময় কোষের পরিপোষণ করিতে অসমর্থ; বৃথা তাহার কর্ম্ম-সংযম। তখন মনের উপর লক্ষ্য পড়িতে থাকে এবং ক্রমশঃ মনের উপর সমধিক লক্ষ্য পড়ায় মনকে নিয়মিত করিতে প্রয়াসী হয়। মাতৃ-উদ্দেশে কৃত পূজা, স্মরণ আদি বিশিষ্ট কার্য্য ছাড়া অন্যান্য সাধারণ কার্য্যসকল করিবার সময়েও মাতৃচরণে মনকে নিযুক্ত রাখিবার জন্য অহর্নিশ যত্ন করিতে থাকে; এবং তখন ক্রমশঃ কর্ম্মের বাহ্য ফলের দিকে আর লক্ষ্য না থাকিয়া, ওই যুক্ত অবস্থার উপর সমধিক লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আহারাদি সামান্য কার্য্যসকলও তাহাদিগের সাধারণ শরীর সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিতেছে কি না, তাহা তত না ভাবিয়া, সেই সকল কার্য্য করিবার সময়েও মাতৃযুক্ত হইয়া করিতে পারিল কি না, ইহাই তাহার চিন্তার বিষয় হইয়া পড়ে। এইরূপ চিত্তবৃত্তি লাভ করিতে করিতে সে পুরুষ ক্রমশঃ কর্ম্মের বাহ্য বা সাধারণ ফলে লক্ষ্য হারাইয়া বসে বা উহাতে অনাসক্ত হইয়া পড়ে। সমস্ত আসক্তি গুটাইয়া মাতৃ-

মুখে ছুটিতে থাকে। এবং তখন সত্যাচারী পুরুষ হইয়া, সত্যরূপে বিশিষ্টতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

জীব এই অবস্থায় সত্যাচার লাভ করিবে বলিয়াই ভগবান্ 'অর্জ্জুন' বলিয়া সাধককে সম্ভাষণ করিলেন। তখন সত্যের বিমল শুভ্র জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—চিরদিনের জন্য মিথ্যা শব্দ তিরোহিত হইয়া যায়; মনে হয়, যেন এক-খানি শুভ্র চৈতন্যময় আকাশ ব্যতীত আর কোথাও কিছু নাই—কোথাও কিছু ছিল না। যেন সে আকাশের প্রতি অংশ চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ময়, স্নেহময়, উদার, আকর্ষণময়। সে আকর্ষণ কল্পনীয় নহে, যথার্থ অনুভূত হয়। চুম্বক সংস্পর্শে লৌহ-খণ্ড যেমন আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সে লৌহখণ্ডকে চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে যেমন সে চুম্বকের চুম্বকশক্তির আকর্ষণ অনুভব করা যায়, তদ্রূপ উক্ত সত্য অবস্থা হইতে প্রাণকে ঘুরাইয়া বহির্জ্জগতের দিকে আনিতে হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যেন কি একটা আকর্ষণ দ্বারা প্রাণ সত্যে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। শুধু আকর্ষণ মাত্র নহে, তাহা চৈতন্যময় চুম্বক। জীব সর্ব্বাঙ্গব্যাপী উদার বিমল স্নেহকম্পনসংযুক্ত চুম্বনের সুখানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া থাকে, কে যেন তাহাকে অন্তর্বাহ্য ব্যাপিয়া সহস্রধারে সহস্র চক্ষু বিস্তারের মাঝে সহস্র মুখে চুম্বন করিতেছে! সে আকুল চুম্বনে জীব আপনাকে হারাইয়া ফেলে, জীব চুম্বনময় হয়, জীব চুম্বকত্ব লাভ করে। এইরূপে মাতৃচুম্বন উক্ত অবস্থায় জীব অর্জ্জন করে বলিয়া, চুম্বন অর্জ্জন করিয়া চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ভগবান্ 'অর্জ্জুন' নামে এ স্থলে সাধককে অভিহিত করিলেন। অর্জ্জুন অর্থে এ স্থলে শুভ্র। অর্জ্জনের দ্বারা শুভ্রত্ব লাভ হয়, শুভ্রত্ব অর্জ্জন করিতে হয়; অর্জ্জুন শব্দের একটা প্রধান অর্থ—শুভ্র।

কি করিয়া শুভ্র হইব? কি করিয়া এই চুম্বন অনুভব করিব? কেমন করিয়া এই স্নেহময় চুম্বন অনুভব করিয়া চুম্বকত্ব লাভ করিব? ইন্দ্রিয়সকলকে মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, করিয়া কর্ম্মযোগ করিতে হইবে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মরূপ মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সাধারণতঃ আমাদিগের প্রাণ ভগবান্‌কে চাহিলেও মন জাগতিক বিষয়-সকলে মত্ত থাকে। জীব যখন সাধক হয় অর্থাৎ যখন সাধনার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন তাহার মনও প্রাণের সহিত ভগবান্‌কে চাহিতে থাকে। কিন্তু মনের সে আকাঙ্ক্ষা ভগবদাকাঙ্ক্ষা নহে—ভগবৎশক্তির আকাঙ্ক্ষা। প্রাণ মজে ভগবানে—মন মজে ভগবানের মহিমায়। প্রাণ শুধু তাঁহাতে স্বতঃ মগ্ন হইয়া থাকে, মন তাঁহার রূপে গুণে মগ্ন হয়। প্রাণ তাঁহার চরণ দুখানি মাত্র চাহে, মন তাঁহার শিরোদেশ—যে স্থান হইতে বুদ্ধি, মহিমা আদি গুণসকল স্ফুরিত হয়, সেই শোভায় আকৃষ্ট হয়। তখন সাধনারূপ কর্ম্মসংগ্রাম চলিতে থাকে। ভারত-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে কুরু ও পাণ্ডব, উভয় পক্ষই চাহিয়াছিল। ভগবান্ বলিলেন—"কল্য

নিদ্রাভঙ্গে যাহার মুখ অগ্রে দর্শন করিব, আমি তাহার পক্ষে থাকিব।” পরদিন দুর্য্যোধন গিয়া কপট নিদ্রাভিভূত কপটীর মস্তকশিহরে উপবেশন করিল, অর্জ্জুন পদতলে। কপটীর নিদ্রা ছুটিল, পদতলে দৃষ্টি পড়িল, অগ্রে অর্জ্জুনকে সম্ভাষণ করিলেন; তার পর দুর্য্যোধনকে। যাহা হউক, তবু কপটী দুর্য্যোধনকে বলিলেন, “এক পক্ষে আমি স্বয়ং থাকিব, অন্য পক্ষে আমার নারায়ণী সেনা; সে বিপুল বাহিনীর প্রত্যেক সেনা যুদ্ধে মৎসদৃশ; তুমি কি চাহ বল।” দুর্য্যোধন চাহিল নারায়ণী সেনা; অর্জ্জুন নারায়ণকে স্বদলে পাইয়া কৃতার্থ হইল।

এইরূপে সাধকের মন প্রাণ উভয়েই ভাগবান্‌কে চাহে, কিন্তু প্রাণ চরণতলে গিয়া উপবিষ্ট হয়, মন মহিমার উৎস মস্তকশিহরে গিয়া অপেক্ষা করে। প্রাণ চরণ পায়—তাঁহাকে পায়; মন সিদ্ধি শক্তি লাভ করে—নারায়ণী সেনা পায়। এস মা—তুমি আমার প্রাণকে মজাও, তোমার মহিমায় আমার মন মজুক; তোমাতে আমি মজি, তোমার রূপে গুণে, সোহাগে আমার মন নিমজ্জিত হউক। আমি তোমাকে পাইতে থাকি; মন তোমায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে পাইতে থাকুক, মহিমাগাথার দ্বারা আমায় আকর্ষণ করুক, আমি তাহাতে আকৃষ্টমাত্র না হইয়া আরও তলাইয়া যাইতে থাকি; আমি মহিমায় যেন আবদ্ধ হইয়া না যাই—তুমি এই করিও. তোমার সিদ্ধি শক্তিতে যেন গতি রুদ্ধ না হয়; জানি, তুমি মনের অধীনে মহাশক্তি দিবে—জানি, তুমি মনকে আমার মহিমময় করিয়া, সিদ্ধিযুক্ত করিয়া আমার বিপক্ষে সজ্জিত করিবে; কিন্তু সে সুধু আমার গতি খরতর, আমার শক্তি প্রবলতর করিবার জন্য, তোমাকে প্রবল ভাবে জড়াইয়া ধরাইবে বলিয়া—আমাকে তোমার হৃদয়ের অন্তস্তলে লইয়া যাইবে বলিয়া। তাই বলি—আমার মন তোমার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া, তোমার মহিমা লাভ করুক, নতুবা কর্ম্ম-সমর সুসম্পন্ন হইবে না, ভূভার হরণ হইবে না। এ কর্ম্ম-সংগ্রামের উদ্দেশ্য কাহারও জয় পরাজয় মাত্র নহে—ইহার উদ্দেশ্য ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা—ভূভার হরণ।

মন এইরূপে মাতৃমহিমায় মজার নামই মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সকল নিয়মিত করা, ইহাই পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিযোগের অবতারণা। মনের দ্বারা সাধক অহর্নিশ তোমায় দেখিতে —তোমার স্নেহাস্বাদন করিতে থাকুক, মন তাহা হইতে মহিমযুক্ত, সিদ্ধিযুক্ত হইতে থাকিবে। আর প্রাণ সুধু ডুবিয়া থাকুক; আবেগ আশঙ্কাশূন্য অগাধ নিশ্চিন্তে তোমায় মগ্ন হউক; দেখা দাও না দাও—কথা কও না কও—স্নেহাদর আসুক না আসুক, প্রাণ তোমার কোন মহিমার অপেক্ষা না রাখিয়া সুধু পর্ব্বতের মত, স্তম্ভের মত অচল থাকুক; যথার্থ কর্ম্মযোগ সম্পন্ন হইবে। মিথ্যাচারকৃত কর্ম্মসকলই অমৃতময় সত্যময় হইবে।

এই স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। সাধারণতঃ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী

“কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য” আদি শ্লোকটি এবং এই “যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি” আদি শ্লোকটি—এই দুইটির অনেকে এইরূপ অর্থ মাত্র গ্রহণ করেন যে, ভগবান্ যেন কপট কর্ম্মত্যাগীদিগকে নিন্দা করিতেছেন, এবং বুদ্ধিযোগের প্রশংসা করিতেছেন। কার্য্যতঃ বিষয় ভোগ করিলাম না, অথচ মনে মনে তাহার চিন্তা রহিল, ইহা যে কদর্য্য, সে কথা না বলিলেও অর্জ্জুনের মত লোকের বুঝিবার বাকি থাকে না; সুতরাং নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ভগবদুদ্দেশ্য—কর্ম্মস্তর মাত্র বর্ণনা করা; সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮

ত্বং নিয়তং নিত্যম্ অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম কুরু, হি অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠং, অকর্ম্মণশ্চ তে শরীরযাত্রাপি ন প্রসিদ্ধ্যেৎ॥ ৮

ব্যবহারিক অর্থ।—তুমি নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। কেন না, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মহীন হইলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ৮

যৌগিক অর্থ। কর্ম্ম না করিয়া যে থাকিবার উপায় নাই, ইহা পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন। এবং সেই কর্ম্মসকল কিরূপে তোমায় অমৃতে লইয়া গিয়া পৌঁছিয়া দিবে, তাহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্ম পরিত্যাগের চেষ্টা অপেক্ষা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার প্রয়াস পাওয়াই শ্রেয়ঃ। এই মর জগৎ এই জন্যই অহর্নিশ কর্ম্মময়; এমন কি, কর্ম্ম না করিলে জীবের শরীর রক্ষা অবধি অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমাদিগের স্থূলাদি শরীর-সকল পর্য্যবেক্ষণ করিলে সর্ব্বত্র বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র পরিদর্শন করিতে সমর্থ হই। আমাদিগের দেহে এমন একটা পরমাণু নাই, যাহা এক মুহূর্ত্ত কর্ম্ম না করিয়া অবস্থিত। যেখানে যে পরমাণুতে কর্ম্মহীনতা আসিতেছে, তাহা আর এ কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিবার স্থান পাইতেছে না, মৃত অণুর মত দেহ হইতে নির্গত হইয়া যাইতেছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে বিচিত্র কর্ম্মাবলী অহর্নিশ অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা দেখিতে পাইলে জীব বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কে একজন আমার এ দেহক্ষেত্র ব্যাপিয়া আমার জন্য অহর্নিশ পরিশ্রম করিতেছে, আমার গৃহ সুসজ্জিত করিয়া দিতেছে—সুশৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। কে একজন আমার মুখ চাহিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়ে আমার আমিত্বের পরিপোষণের জন্য সহস্র ব্রহ্মাণ্ড হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া, বাছিয়া বাছিয়া উপকরণরাশি সংগ্রহ করিয়া স্তরে স্তরে আমার দেহ-ভাণ্ডার সাজাইতেছে। কে একজন বিনা প্রতিদানে স্নেহের পসরা বুকে লইয়া, আমার অজ্ঞাতসারে অবিরাম পরিশ্রম করিয়া, আমার সংরক্ষণ ও পোষণ করিয়া মঙ্গলের দিকে আমায় ধাবিত করিতেছে—কে একজন আপন ভোগের আশা না করিয়া, আমার জন্য ভোগ্যসম্ভার বহন করিতেছে,—আমায় ভোগ করিতে দিয়া আপনি সন্তুষ্ট হইতেছে।

কে একজন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, শান্তি প্রভৃতি নানা বৃত্তি আকারে সাজিয়া সাজিয়া আসিয়া আমায় মোহন বেশে সাজাইতেছে—আমার দেহকে কর্ম্মময় করিয়া রাখিতেছে। একটা কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস প্রতিদান-স্বরূপ পায় না—একটা স্তুতি বা মিষ্ট কথার প্রত্যাশা রাখে না—একটা বিনীত চাহনির পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে না—সে আমার কে রে? উদ্দেশে কিছু দিতে গেলে সহস্র গুণে গুণিত করিয়া তাহাই আমায় ফিরাইয়া দেয়, সে আমার কে রে? শত হতাদর, শত উপেক্ষায় সর্ব্বদা আমার জন্য আদরের উৎস খুলিয়া রাখিয়াছে—সে আমার কে রে? স্নেহের জননী, উপদেশের গুরু, অবসাদভার বহনের ভর্ত্তা, বিপদে বন্ধু, কর্ম্মে সারথী, প্রণয়ে সখা, সেবায় পুত্র, মিলনে স্বামী, আদরে কন্যা, রসোল্লাসে পত্নী, আমার সর্ব্বস্ব, আমার সর্ব্ব, সে আমার কে রে? কু বলিয়া আমাতে কিছু খুঁজিয়া পায় না—কু বলিয়া আমার কিছু উপেক্ষা করে না—কু বুঝিয়া মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু ফিরায় না—কু দেখিয়া আমার পরিচর্য্যার ত্রুটি করে না—আমাতে কু দেখিবার চক্ষু তাহার নাই, সে কে রে? নীরবে খাটে—নীরবে চাহিয়া থাকে—নীরবে সোহাগ করে—নীরবে উপদেশ দেয়—নীরবে সদাহাস্যানন্দে আমার ক্ষেত্রকে কর্ম্মময় করিয়া রাখে, এবং একা সহস্র হইয়া সহস্রধারে স্নেহ বরিষণ করে, সে আমার কে রে?

সে যাহাই হউক, দেখিতে তাহাকে পাই বা না পাই, কিন্তু আমার জন্য যে, অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, ইহা আমি বুঝিতে পারি। আমি দেখিতে পাই বহির্জগতে সূর্য্যস্বরূপ কেন্দ্র হইয়া অবস্থান করিয়া সে ব্রহ্মাণ্ডকে যেমন কর্ম্মময় করিয়া রাখিয়াছে, আমার নাভিকেন্দ্ররূপ দেহকেন্দ্রে তদ্রূপ সূর্য্যরূপে অবস্থান করিয়া এ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকেও কর্ম্মময় করিতেছে; সেই জন্যই এ কেন্দ্রের নাম সূর্য্য। ব্রহ্মাণ্ডে কর্ম্মসকলের নিয়ন্তা বলিয়াই মা আমার সূর্য্য নামে অভিহিতা। আমাদিগেক নাভিকেন্দ্রে তদ্রূপ সূর্য্যগ্রন্থি বিদ্যমান। বহির্জগতের বিরাট্ সূর্য্যের রশ্মিপ্রবাহ দিয়া যেমন প্রাণপ্রবাহ, তেজঃপ্রবাহ দিঙ্মণ্ডল ছাইয়া বর্ষিত হয়, আমাদিগের নাভিকেন্দ্রস্থ সূর্য্যগ্রন্থি তদ্রূপ তাহা আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমার সমগ্র দেহমণ্ডলে বিকীর্ণ করে। সেই তেজ অবলম্বন করিয়া চেতনা দেহের অন্যান্য কেন্দ্রে উদ্বোধিতা হয়; দেহস্থ পরমাণুরূপী জীবসমষ্টি কর্ম্মনিরত হইতে থাকে। বাহ্য জগতে সূর্য্য যেমন ভূক্ষেত্রে কিরণ বর্ষণ করিয়া বারি বর্ষণ করেন, তদ্রূপ আমাদিগের নাভিস্থ এই সূর্য্যও স্বীয় কিরণে দেহকে কর্ম্মতাপদীপ্ত করিয়া রসপ্রবাহ স্বাভিমুখে আকর্ষণ করেন, আবার তাহা পরিশুদ্ধ করিয়া বৃষ্টি আকারে দেহে বর্ষণ করেন। দেহ এইরূপে আলোকময়, তেজোময়, রসময় হইয়া ব্রহ্মযজ্ঞ নিষ্পাদন করিতেছে। ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্ম-যজ্ঞাগার নামে সেই জন্য দেহ অভিহিত। এ যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা পরে করিতেছি। শুধু মা আমার যে এই দেহক্ষেত্রে যজ্ঞপতিরূপে থাকিয়া ব্রহ্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতেছেন এবং এইরূপে যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা না থাকিলে, দেহ

যে কর্ম্মময় থাকিত না ও শরীরযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত না, সেইটুকু মাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত আহার নিদ্রা আদি কর্ম্মসকল না করিলেও শরীরযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। সকল কর্ম্ম ছাড়িলেও শারীর ধর্ম্মসকল ছাড়িবার উপায় নাই; সুতরাং এ ভাবে অকর্ম্ম্য হইবার উপায় নাই; কর্ম্ম করিতেই হইবে, ইহা বলাই ভগবদভিপ্রায়। তবে এই কর্ম্মসকল দুই স্তরের, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সেই জন্য দুই প্রকারে ইহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সেই কথা পরশ্লোকে বলিতেছেন।—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯

যজ্ঞার্থাৎ (দেবপূজার্থাৎ) কর্ম্মণঃ অন্যত্র তদেকং বিনা অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ। হে কৌন্তেয়, তদর্থং যজ্ঞার্থং কর্ম্ম সমাচর, চ মুক্তসঙ্গঃ ভব। বা মুক্তসঙ্গঃ (সন্) মুক্তপুরুষসঙ্গঃ সন্ কর্ম্ম সমাচর। ৯

ব্যবহারিক অর্থ। কর্ম্মসকল দেবতা পূজার জন্য ; অন্য উদ্দেশে কৃত হইলেই এই লোক কর্ম্মবন্ধনমাত্ররূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি দেবতা-প্রীতির জন্য মুক্তসঙ্গ হইয়া কর্ম্ম কর।

যৌগিক অর্থ। দেবতা-প্রীতি যাহাতে হয়, তাহার নাম যজ্ঞ। কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান একমাত্র যজ্ঞের জন্য, এবং যজ্ঞ উদ্দেশে কৃত না হইলেই এই কর্ম্মময় লোক বন্ধনমাত্র-রূপে ভোগে আসে। যে এই জগৎ মাতৃপূজার মন্দির বলিয়া চিনিতে না পারে, যে ইহার প্রতি কর্ম্মকে মাতৃপাদপদ্মে নিবেদিত আহুতি বলিয়া ধারণা করিতে না পারে, তাহার পক্ষেই এই লোক কারাগার। মায়ের দিকে চাহিলেই এ ব্রহ্মাণ্ডকে মাতৃপূজার মন্দির বলিয়া চিনিতে পারা যায়। মায়ের দিকে চাহিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই উহা মাতৃ-প্রীতিতে পরিণত হইয়া যায়। মায়ের জাজ্বল্যমান অস্তিত্বের দিকে চক্ষু নিপতিত হইলেই সকল কর্ম্ম সাধনা হইয়া দাঁড়ায়। মুক্তকেশীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেই জীব মুক্ত-সঙ্গ হয়, এবং তখন তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকল শিশুর আনন্দক্রীড়ায় পরিণত হইয়া যায়—মাতৃ-প্রীতির কারণ মাত্র বা যজ্ঞরূপে উদ্ভাসিত হয়।

কর্ম্মের আবার শক্তি কি? শক্তি—কর্ম্ম যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেই ভাবের। বাহিরে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। আকাশে শক্তিলহরী ছুটিতেছে, আনন্দে নির্ভয়ে, মাতৃ-অস্তিত্বের উপলব্ধি হৃদয়ে পাইয়া সেই আনন্দের বেগে ; বায়ু বহিতেছে—সেই আনন্দের বেগে ; জ্যোতিঃ উচ্ছ্বসিত হইতেছে—সেই আনন্দের বেগে ; রস জীবন-স্বরূপ অণুতে অণুতে বিকশিত হিল্লোলিত হইতেছে—আনন্দের বেগে ; গন্ধ বায়ুর অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া ছুটিতেছে—আনন্দের বেগে। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে,

মাতৃঅস্তিত্বের আনন্দবেগে হৃদয়-কুসুম সর্ব্বত্র প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে, সর্ব্বত্র দেবতা-বৃন্দ, ঋষিবৃন্দ, সিদ্ধ মহাপুরুষসঙ্ঘ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছেন, সেইগুলিই জড় প্রকৃতি বলিয়া তোমরা ধারণা করিয়া জড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ। তোমরা কি এ আনন্দ-খেলায় যোগ দিবে না? তোমাদিগের হৃদয়াকাশে মাতৃঅস্তিত্বের বিশাল জ্যোতিঃ কি প্রস্ফুরিত হইবে না? তোমরা কি সপ্তলোকমণিমেখলা কণ্ঠে ধারণ করিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া একবার মা মা বলিয়া ডাকিবে না? তোমার কর্ম্মসকল কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে পদক্ষেপ মাত্র না হইয়া সুখ-সৌগন্ধময় কুসুমাস্তরণে বিলাসক্রীড়ায় পর্য্যবসিত হইবে না? যজ্ঞাগারের চারি ধারে যজ্ঞাগ্নি উদ্গীরিত হইতেছে, শুধু তুমি কি তোমার অন্ধকার হৃদয়টুকু লইয়া ছায়ার মত এ আলোকময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিবে? তুমি মা না বলিলে, তুমি মায়ের দিকে না চাহিলে, তোমাকে আশ্রয় করিয়া যে অনন্ত কোটি জীব অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগের গতি কি হইবে? হে মনুষ্য—হে ব্রহ্ম! তুমি তোমার দেহস্থ প্রজাদিগের মুখ চাহিয়াও মায়ের দিকে—অন্তরের দিকে মুখ ফিরাও। তোমার প্রাণ-যজ্ঞের শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছে, আহুতি দাও, কর্ম্মসকল অমৃতময় হউক—মিথ্যা হইতে সত্যে উপনীত হও—মৃত্যু হইতে অমৃতে গিয়া উপস্থিত হও। জানিও, মাতৃ-অঞ্চল ধরিয়া যে কার্য্যে পদক্ষেপ করিবে, তাহাই সত্য, মাতৃ-অঞ্চল ছাড়িয়া যে কর্ম্মে পদক্ষেপ করিবে, তাহাই মিথ্যা।

যতক্ষণ না মুক্তকেশীর সঙ্গ করা হয়, ততক্ষণ এই লোক কর্ম্মবন্ধন মাত্র—তোমার এই দেহ কারাবন্ধন মাত্র। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিলে এই লোকই মুক্তিক্ষেত্র। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম অর্থ —ভগবদুদ্দেশে কর্ম্ম। ভগবদুদ্দেশে কর্ম্ম কেমন করিয়া করিবে? বলা সহজ, করা কিন্তু তত সহজ নহে। যতক্ষণ না মাতৃবিশ্বাসে প্রাণ পরিপূরিত হয়, ততক্ষণ এ যজ্ঞ সহজ-সাধ্য নহে। বিশ্বাস সংস্থাপিত না হইলে, যাহার উদ্দেশে কর্ম্ম করিবে, তাহার অস্তিত্বে সংশয় থাকিলে কর্ম্মসকল যজ্ঞ হইতে পারে না। তোমার কি সে বিশ্বাস আছে? —নাই। যতক্ষণ এ ভৌতিক জগৎকে চৈতন্যময় যজ্ঞাগার বলিয়া ধারণা করিতে না পারিবে, ততক্ষণ কোন ক্রমে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে না। আবার স্বীয় অন্তরে অন্তর্যামিনী চিন্ময়ীকে দেখিয়া, তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে যতক্ষণ না চিন্ময়ী শক্তির লীলানিকেতন বলিয়া জানিবে, ততক্ষণ বাহ্য শক্তিকেও চিন্ময়ী বলিয়া জানিতে পারিবে না। সেই জন্যই এ যজ্ঞের ধারণা করিতে হইবে, যজ্ঞকারীদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইবে। তুমি মাতৃঅস্তিত্বের দলিল-পত্র খুঁজিতে খুঁজিতে এ জীবন অতিবাহিত করিলে, মাকে ত কই খুঁজিলে না! তুমি ভাব, বুঝি তাঁহাকে দেখিতে পাইলে তবে বিশ্বাস স্থাপিত হয়; কিন্তু জানিও, যাহার বিশ্বাস সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার আর দেখিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সে কিছু চাহে না, চাহিবে আবার কি? তাঁহাতে অহর্নিশ ডুবিয়া রহিয়াছে, আবার চাহিবে কি? অচল, ঘন, দুর্ভেদ্য চৈতন্যের

আলিঙ্গনের বেষ্টন ভেদ করিয়া সে আসিতে পারে না। তাহার ইঙ্গিতে পর্ব্বত পথ ছাড়িয়া দেয়—সমুদ্র তলদেশ বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরে। পাষাণের নীরস গাত্র ভেদ করিয়া কুসুম-সম্ভার ফুটিয়া উঠে—সে চাহিবে কি ? চারি দিকের জড়াখ্য যাহা কিছু, তাহার সহিত চিন্ময়ের মত ব্যবহার করে। বায়ু তাহার জন্য মাতৃ-অঞ্চল বহন করিয়া আনিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দেয়—সলিল তাহার জন্য অমৃত—ক্ষিতি তাহার জন্য গন্ধ—জ্যোতিঃ তাহার জন্য প্রাণ—আকাশ তাহার জন্য মাতৃচুম্বন বহন করে। বৃক্ষ নতশাখ হইয়া—সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া—ব্রততী ফুলময়ী হইয়া তাহার অঙ্গে ঢলিয়া পড়ে। বিশ্বাসীর দর্শনে হিংস্রক হিংসা ছাড়ে, কুটিল সরল হয়, তস্কর সাধু হয়। মা মা করিয়া তাহাকে আর ছুটিতে হয় না, প্রতি জড় পরমাণু অবধি ভেদ করিয়া মা তাহার জন্য ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে, মা তাহার জন্য সর্ব্বত্র হইতে স্নেহের উৎস ছুটাইয়া দেয়।

এই বিশ্বাস সংস্থাপনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে এ ব্রহ্মাণ্ড যে যজ্ঞক্ষেত্র মাত্র, তাহা উপলব্ধি করিতে হয়। মায়ের স্নেহানন্দে বিভোর হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি বিকশিত হইয়া উঠেন। সে সকল শক্তিধরের শক্তি কর্ম্মময় হইয়া চারি ধারে বিকীর্ণ হয় ; সেই কর্ম্ম যজ্ঞরূপে প্রতিভাত হয়। যজ্ঞোদ্ভূত ব্রহ্মাণ্ডে পরমাণুসকল জীবরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। জীবের হৃদয় স্ফুরণ পায়, অন্তরাকাশ বিকাশ পায়। সে বিকাশে মহাবিকাশরূপিণী মা বিকশিত হয়েন। এইরূপে চারি ধারে বিকাশ—চারি, ধারে স্ফুরণ—চারি ধারে মাতৃবিম্ব বিম্বিত। বাহ্য হয় অন্তর—অচিৎ হয় চেতনা। প্রতি জীবের দেহের প্রত্যেক পরমাণুতে পর্য্যন্ত এই মাতৃযজ্ঞ প্রত্যক্ষীভূত হয়। এইরূপ যজ্ঞে অভ্যস্ত হইয়া, চারি ধারে এইরূপ আনন্দ-যজ্ঞের আভাস পাইয়া, জীব বিশ্বাসময় —কর্ম্মময় হইয়া পড়ে ; আনন্দময়ীতে বিশ্বাস সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় !

ভগবান্ "কৌন্তেয়" বলিয়া অর্জ্জুনকে এ স্থলে সম্ভাষণ করিলেন। কুন্তী যেমন ধর্ম্ম, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবর্গের সহিত সহবাস করিয়াও স্বীয় সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, পরপুরুষ-সহবাসেও যেমন তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অপনীত হয় নাই, জীবসংঘও তদ্রূপ কর্ম্মসকল মুক্তসঙ্গ হইয়া করিতে পারিলে বন্ধনজালে জড়ীভূত হয় না। যজ্ঞার্থে করিতে পারিলে, ভগবৎপ্রীতি উদ্দেশে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে সে কর্ম্ম মুক্তিই বহন করে।

যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর—মা। আমার দেহ যেমন মাতৃস্নেহমাত্র, মাতৃস্নেহরূপ উপকরণে যেমন আমার দেহত্রয় সঞ্জীবিত, যজ্ঞের দ্বারা বা আমাদিগের প্রাতির দ্বারা তদ্রূপ মাতৃদেহ প্রকটিত। মা আমার নিরাকারা হইয়াও সাকারা শুধু সন্তানের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে। সূর্য্যরশ্মি বা আলোক যেমন যত ক্ষণ না প্রতিহত হয়, তত ক্ষণ তাহার রূপ উপলব্ধ হয় না, তদ্রূপ যত ক্ষণ না জীবহৃদয়ে মাতৃস্নেহ প্রতিঘাত করে,

অর্থাৎ প্রীতির আকারে উহা মাতৃমুখে প্রত্যাবর্ত্তন না করে, ততক্ষণ মাকে জানা যায় না, এবং তত ক্ষণ মা আমার সেথা অদৃশ্য, অননুভাব্য। এই প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসই যথার্থ যজ্ঞ। এই যজ্ঞই বন্ধনহীন কর্ম্ম, এই যজ্ঞই মায়ের রূপ—দেহ। অন্য যজ্ঞ সাধারণ কর্ম্মশ্রেণীর অন্তর্গত। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র যজ্ঞ নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমাদিগের দেহের সর্ব্বত্র যজ্ঞ চলিতেছে ; আমরা সেইগুলিকে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতারূপ ভাবের দ্বারা পরিদর্শন করিলেই উহারা আমাদিগের ইষ্টদায়ক হইবে, আমরা যজ্ঞরূপ কর্ম্ম করিয়াও বন্ধনহীন থাকিব।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০

সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞসহিতাঃ প্রজাঃ জীবান্ পুরা পূর্ব্বং সৃষ্ট্বা প্রজাপতিঃ ব্রহ্মা উবাচ, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং, প্রসবো বৃদ্ধিঃ, উত্তরোত্তরমতিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ, এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকং ইষ্টকামধুক্ ইষ্টকামপ্রদঃ অস্তু।

ব্যবহারিক অর্থ।—পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজাসৃষ্টি করিয়া কহিয়াছিলেন, তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও, এই যজ্ঞ তোমাদিগের ইষ্টকামপ্রদ হউক।

যৌগিক অর্থ।—জীবসকল সহযজ্ঞ প্রজা। কর্ম্মশূন্য, যজ্ঞশূন্য জীব হইতে পারে না। কর্ম্ম মাত্র চঞ্চলতা, মাত্র যজ্ঞ। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যজ্ঞ অর্থে মা। উহাই যথার্থ যজ্ঞপদবাচ্য যজ্ঞ। সাধারণ যজ্ঞ অর্থে মাতৃ উদ্দেশে বা মাতৃশক্তিবিশেষ-সকলের উদ্দেশে কৃত কর্ম্মসকল। এবং ইহা ছাড়া আমাদিগের সাধারণ উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্মসকল আর এক প্রকারের যজ্ঞ। এই তিন প্রকারের যজ্ঞের দ্বারা আমরা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছি। সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ শেষোক্ত প্রকারের যজ্ঞের দ্বারা আমাদিগের প্রধানতঃ ভৌতিক উন্নতি হয়, মাতৃশক্তি উদ্দেশে কৃত বা দেবতা উদ্দেশে কৃত কর্ম্মসকলের দ্বারা দৈবিক এবং মাতৃ উদ্দেশে কৃত কর্ম্মসকলের দ্বারা আত্মিক উন্নতি সংসাধিত হয়। "উন্নতি হয়" কথাটি সাধারণ ভাবে বলিলাম। "উন্নতি হয়" বলিলে বুঝিতে হইবে, অবনতিরূপ আবরণ বা অবিদ্যার প্রহেলিকা ঘুচিয়া যায় মাত্র ; নিজ উর্দ্ধতর ক্ষেত্রে জীব বিচরণ করে। এইরূপে ক্রমশঃ আমরা পরমাত্মাভিমুখে চলিয়াছি। যখন সমস্ত কর্ম্মই এইরূপে আমাদিগকে ব্রহ্মত্বের দিকে, মায়ের দিকে লইয়া চলিয়াছে বুঝিয়া, কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞরূপে, মাতৃপ্রীতিরূপে হৃদয়ে প্রকটিত হইতে থাকিবে, তখন কর্ম্মমাত্রই আত্মিক, দৈবিক ও ভৌতিক উন্নতিতে লইয়া যাইবে। কর্ম্মমাত্রকে যখন মায়ের দ্বারা আমাদিগের সোহাগের পেষণ বলিয়া প্রতীতি হইবে, তখন একমাত্র মাকেই সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিতা দেখিবে। তখন মা রূপময়ী হইয়া তোমার সম্মুখে আসিতেছেন বুঝিতে পারিবে।

কিন্তু সকল কর্ম্ম মাতৃসোহাগ বলিয়া উপলব্ধ যখন না হয়, তখনও কর্ম্মে কর্ম্মে

মাতৃ-আগমন হইয়া থাকে। যে উদ্দেশেই কৃত হউক, যে প্রকারেই সম্পাদিত হউক, মা আমার আসেন। তিনিই কর্ম্মরূপিণী হইয়া তোমাকে পরিচালিত করিয়া, আবার বরপ্রদারূপে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কিন্তু আমরা শিবহীন যজ্ঞ করি বলিয়া তিনি আসিয়া দেহত্যাগ করেন। শিব বা মঙ্গল আসেন পরে। আমরা কর্ম্মসকল সাধারণতঃ দক্ষের মত করি। আমাদিগের কর্ম্মে কর্ম্মে দেবশক্তি-সকল আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু মহা-আত্মমঙ্গলস্বরূপ চৈতন্যের আবাহন আমরা করি না; কর্ম্মসকল ভৌতিক ও দৈবিক শক্তি উদ্দেশেই কৃত হয়। সেই জন্য মা আমার আমাদিগের যজ্ঞে আসিয়া, শিবহীন যজ্ঞ দর্শন করিয়া, শিবকর্ত্তৃত্বের অপলাপ ও জীবকর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্র সন্দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করেন, নির্জীব হইয়া পড়েন, মরণের ভাণ করেন, আমরা মৃত্যু লাভ করি। তখন শিব আসেন রুদ্রবেশে। সেই যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া আমাদিগকে স্থূলতঃ অশিব-বিভীষিকা ও ধ্বংস ভোগ করাইয়াই সূক্ষ্মতঃ মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জন্যই জগতে অশুভ বলিয়া কিছু নাই, থাকিতে পারে না। শিব যে মূর্ত্তিতেই আসুন, তিনি শিব—মঙ্গলময়। সুতরাং তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তিও মঙ্গলপ্রদ, তবে ক্ষণিক বিভীষিকাময়। দক্ষযজ্ঞে রুদ্রবেশে মহেশ্বর সতীর দেহ-ত্যাগের পর আসিয়া যেমন রুদ্রকণ্ঠে আরক্তনেত্রে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "অহো দক্ষ! অহো দক্ষ! ভিক্ষাং মে দেহি ভিক্ষবে"—দাও দক্ষ, সতী ভিক্ষা দাও, আমি ভিক্ষুক!" তদ্রূপ জীব! তোমার প্রতি কর্ম্মে কর্ম্মে রুদ্রবেশে মঙ্গল আসিতেছে। সেই জন্য তুমি জগতের ঘাত প্রতিঘাতে ব্যথিত পীড়িত জর্জ্জরিত হইতেছ! তুমি চারি ধারে বিভীষিকা মাত্র পরিদর্শন করিতেছ! বস্তুতঃ সমস্ত কর্ম্মই তোমার ইষ্টপ্রদ জানিও।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত সংবর্দ্ধয়ত, তে দেবাঃ বো যুষ্মানেবং ভাবয়ন্তু আপ্যায়ন্তু, পরস্পরং যূয়ঞ্চ দেবাশ্চ (এবম্প্রকারেণ) পরং শ্রেয়ঃ ভগবদ্‌যোগং অবাপ্স্যথ প্রাপ্স্যথ।

ব্যবহারিক অর্থ।—এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে সম্বর্দ্ধিত কর, দেবতারা তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করুন; এইরূপে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া শ্রেয় গতি লাভ কর।

যৌগিক অর্থ।—দেবতা ও মনুষ্য, ইহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত; পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকামী ও মুখাপেক্ষী; দেবতা না থাকিলে মনুষ্য থাকিতে পারে না, মনুষ্য না থাকিলে দেবতারও স্থিতি শ্রীহীন হয়। মনুষ্য-দেহের ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণ ও মন দেবতাদিগের আধার, আশ্রয়স্বরূপ, লালাক্ষেত্র। বাহিরে অনন্ত তেজোময় আকাশ, প্রাণময় বায়ু-সমুদ্র, রসময় জলদ-বিস্তার, এ সমস্ত দেবতার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে মাত্র; বায়ুর মৃদু মৃদু

প্রবাহ অথবা প্রলয়ঙ্করী প্রঝ্ঝটিকা, মেঘখণ্ড-সকলের ইতস্ততঃ সঞ্চালন অথবা নিবিড় কৃষ্ণ জলদ-জালের বিভীষণ আবির্ভাব, সূর্য্যের প্রদীপ্ত রশ্মিজাল, বিজলীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গিমা, এ সমস্ত দেবতাদিগেরই লীলাবিলাস মাত্র। আবার অন্তরে চিদাকাশে বিচিত্র ভাবরঞ্জনা-সকল সেই দেবশক্তিরই বিকাশ। দেবতার সহিত হৃদয়ের আদান প্রদান করিতে, দেবলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে, স্বর্গের আলোক মর্ত্ত্যে আনিতে, মর্ত্ত্যের পুষ্পাঞ্জলি স্বর্গে প্রেরণ করিতে, পারিজাতের গন্ধে গন্ধতত্ত্বের আধার এই ধরণীকে সৌরভান্বিত করিতে আমাদিগকে বাহিরে কোথাও যাইতে হয় না। আমাদিগের দেহের অভ্যন্তরে দেবতা আছেন, দেবলোক প্রতিষ্ঠিত আছে; আমাদিগের ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, এই সমস্তের উপর দেবতাবর্গ অধিষ্ঠিত। সমুদ্রের তরঙ্গ-মালার ন্যায় মহাশক্তির তরঙ্গরাজি দেবতা-রূপে আমাদের দেহের কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিরাজিত; আমরা চিনি না বলিয়া, জানি না বলিয়া সমুদ্রে অবস্থিত হইয়াও বারির জন্য অন্যত্র চক্ষু বাড়াইয়া থাকি। সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তির নিয়ন্ত্রীস্বরূপ মা আমার অধিষ্ঠিতা থাকিয়া আমাদিগের ভোগের জন্য ব্রহ্মাণ্ড সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাহা না বুঝিয়া এই সকল ছাড়িতে চাহি, মোক্ষের জন্য মোক্ষদাকে উপেক্ষিতা করি, মাকে পাইবার জন্য বৈরাগ্যের ছলে কার্য্যতঃ মাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই। আমরা ভ্রান্ত। কোন সময়ে একজন ঋষি মাতৃচরণ প্রাপ্তির আশায় সাধনার জন্য অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছু কাল কঠোর সাধনা করিবার পর একদিন অনিন্দ্যসুন্দরী একটি বালিকা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; মনুষ্যদেহে তত রূপ ঋষি পূর্ব্বে কখনও আর দেখেন নাই। অলোকসামান্যা সে কন্যার রক্তচরণ দুখানি যেন সাধকদিগের হৃদয়ের সুবিমল ভক্তিরাশি জমাইয়া রচিত হইয়াছে; উজ্জ্বল শ্যাম বরণে নবারুণের নির্ম্মল বিকাশ ও শশাঙ্কের স্নিগ্ধতা একত্রে যেন মাখান। মুখখানি যেন হাসি দিয়া গড়া, চক্ষে সুনীল আকাশের উদার বিস্তার-ভাব, স্নেহের জলদে যেন ভরা; আকর্ণবিশ্রান্ত সে চক্ষু অচেতনকেও চেতন করিতে, মুগ্ধ করিতে সমর্থ; নিখিড় কৃষ্ণ উজ্জ্বল অসংলগ্ন-বিস্তৃত কুন্তলজাল সে রূপরাশিকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। ঋষি কন্যারূপে ভগবানের সাধনা করিতেন; কুমারী কন্যার আকার পরিগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মময়ী আসিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিবেন, ইহাই তাঁহার সাধনার লক্ষ্য। সুতরাং সাধক সে দেব-বিনিন্দিত রূপলাবণ্যময়ী বালিকাকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন ও তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পথভ্রান্তা আশ্রয়হীনা বিপন্না বলিয়া বালিকা আপনার পরিচয় দিল এবং ঋষির নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে বলিয়া সানুনয় প্রার্থনা করিল; রূপমুগ্ধ ঋষি সে প্রার্থনা পূরণে দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না; বলিকা ঋষির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কিছুদিন যায়। বালিকা কন্যার মত ঋষির সেবা করে, তাঁহার নিত্যক্রিয়ার আয়োজন করিয়া দেয়; আহারাদির উদ্‌যোগ, বিশ্রামের সময় পদসেবা, সর্ব্বতোভাবে

তাঁহার পরিচর্য্যাই বালিকার একমাত্র লক্ষ্য ; প্রতি মুহূর্ত্তে বালিকা মাতৃস্নেহে ঋষিকে প্লাবিত করিত ; ঋষি বালিকার স্নেহে বা ভক্তিতে দিন দিন আবদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন সাধনায় বিচ্যুতি ঘটিতেছে।

একদিন ঋষির সুপ্রভাত হইল ; তাঁহার কঠোর সাধনা পূর্ণ হইতে চলিল ; সাধনায় উপবিষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব ব্রাহ্মী স্থিতিতে তাঁহার হৃদয় নিস্তব্ধ হইল, তরঙ্গহীন সমুদ্রবক্ষের মত তাঁহার চিত্ত-সাগর স্থির অবিকম্পিত প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল ; ভাবের আবেগে ঋষি "কন্যে" বলিয়া ব্রহ্মময়ীকে সম্ভাষণ করিলেন। মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত বালিকা সম্মুখে উপস্থিত ; ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হইল ; ব্রহ্মময়ীর পরিবর্ত্তে তাঁহার আশ্রিতা বালিকাকে সম্মুখে দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, এবং তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন।

আবার ঋষির হৃদয় নিস্তরঙ্গ হইল, আবার জ্যোতিতে চিদাকাশ উদ্ভাসিত হইল, আবার ঋষির প্রাণ ভাবের আবেগে স্ফীত হইয়া উঠিল। ঋষির ওষ্ঠাধর কাঁপিল, আবার "কন্যে" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন।

"কেন বাবা, কি চাহি"—পূর্ব্বোক্ত আশ্রিতা বালিকা এই কথা বলিতে বলিতে ঋষির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঋষির ধ্যান ভাঙ্গিল ; ব্রহ্মময়ীর পরিবর্ত্তে আবার বালিকাকে সম্মুখে দেখিয়া বিরক্ত হইলেন ; "মায়া মায়া, কিছু চাহি না, চলিয়া যাও।" এই বলিয়া বালিকাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

আবার ঋষি ধ্যানস্থ। আবার বহু যত্নে মনপ্রাণ একত্র সম্বদ্ধ করিয়া, সূর্য্যে চক্ষু, চন্দ্রে মন স্থাপিত করিয়া, হিমগিরির ধবলশেখরের মত সে মহাপুরুষ ধীর গম্ভীর অচল। ঋষির অন্তর্বাহ্য রোধ হইয়াছে, আদি অন্ত এক হইয়াছে, অতীত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে মিলাইয়া আসিয়াছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আমিত্ব পুঞ্জীভূত হইয়া এক বিরাট্ আমিত্বে সেই বিরাট্ পুরুষকে ডুবাইয়া দিয়াছে ; ভূর্ভুবাদি সপ্ত লোক সে ঋষির কণ্ঠে মণিমেখলার মত উদ্ভাসিত ; প্রণবের গভীর গর্জ্জনে জগতের সমস্ত নাদ বিলুপ্ত, সে প্রণবগর্জ্জন আলোড়িত করিয়া ঋষি আবার ডাকিলেন—"কন্যে!"

"কেন বাবা, আসিয়াছি" বলিতে বলিতে সেই আশ্রিতা বালিকা আবার সম্মুখে উপস্থিত ; আবার ধ্যান ভাঙ্গিল, সূর্য্যাবদ্ধ চক্ষু আবার উন্মেষিত হইল, আবার সেই বালিকাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া থর থর কাঁপিয়া হুঙ্কার করিলেন, তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল ; বার বার ভগ্নোদ্যম হইয়া তাঁহার হৃদয় ধিক্কারপূর্ণ হইল, পর্ব্বত-পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া যেন আগ্নেয় প্রস্রবণ উত্থিত হইল ; ঋষি বলিলেন—"কিছু চাহি না, কিছু চাহি না, দূর হও ; মৃত্যু চাহি—মৃত্যু চাহি।"

"আমি মৃত্যু, এই দেখ!" সেই ক্ষুদ্র শ্যামা-মূর্ত্তি ভীমা কালীমূর্ত্তিতে পরিণত

হইল ; ললাটে চক্ষুত্রয় জ্বলিয়া উঠিল, কণ্ঠে নরমুণ্ডের মেখলা দুলিল ; বিস্তৃত বক্ষে স্তনযুগল শোভা পাইল, দুই বাহু খড়গমুণ্ডবরাভয়ধারী চারি বাহুতে পরিণত হইল ; ভ্রূদ্বয়ে ভীষণ ভ্রূকুটী খেলিল, জিহ্বা রক্তলোলুপার ভীমা মূর্ত্তিকে আরও ভীমা করিয়া তুলিল, কটির বসন স্খলিত হইল, উলঙ্গিনী বিভীষণা বালিকা প্রলয়-হুঙ্কারে দিগন্ত কম্পিত করিয়া প্রলয়ঙ্করীবেশে সাধকের নয়নসমীপে আবির্ভূতা হইলেন। সাধকের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। কিন্তু তাঁহার আরাধ্য দেবতা কন্যারূপে আসিয়া কত যত্নে কত দিন ধরিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, অথচ তিনি চিনিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিতেছেন বুঝিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

মা আমার প্রতি ক্ষণে আসেন ; কিন্তু আমরা চিনিতে পারি না, দেখিতে পাই না। প্রতি ইন্দ্রিয়পথে আসিয়া, হৃদয়ে পদার্থরূপে পরিণতা হইয়া আমাদিগের বাসনা পরিপূর্ণ করেন, আমাদিগের চিৎক্ষেত্রে রঙ্গভঙ্গিমার তরঙ্গে তরঙ্গে চৈতন্যময়ী ক্রীড়া করেন, আমরা সেগুলিকে ভাব বলিয়া অভিহিত করি, ভবানী বলিয়া বুঝি না ; 'পদার্থ' বলিয়া চিনি, 'পদ' বলিয়া চিনি না। আমরা পদার্থের আদর করি, ভাবের সোহাগ করি, আবার কখনও পদার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করি, ভাবের ধ্বংসের জন্য কৃতসঙ্কল্প হই, কিন্তু যে 'পদ' পদার্থরূপে প্রতিফলিত হয়, যে ভবানী ভাবরূপে প্রকটিতা হন, সে মাকে আমরা চিনিয়া উঠিতে পারি না।

খুলিয়া বলি ; ক্ষিতি, অপ্, তেজস্তত্ত্বের অন্তর্গত যত কিছু আছে, সমস্তই রূপ ও আকারবিশিষ্ট বলিয়া আমরা রূপজগৎ বলি ; বাহ্য জগৎ বলিলে আমরা যাহা ধারণা করি, তন্মধ্যে বায়ু ও আকাশ, এই দুই অরূপ পদার্থ তেজস্তত্ত্বের ঊর্দ্ধস্থ মরুৎ ও ব্যোম-তত্ত্বের বলিয়া অরূপ জগৎ বলিয়া আমরা অভিহিত করিলাম। যাহা হউক, রূপজগৎ ও অরূপজগৎ লইয়া আমাদিগের যে বাহ্য জগৎ পরিদৃষ্ট হয়, সে বাহ্য জগৎ বস্তুতঃ বাহিরে নহে, ভাবজগতের মত আমারই ভিতরে। বাহ্য জগৎ বলিয়া আমরা কতকগুলি পদার্থের সমষ্টি বুঝি। জল, স্থল, বায়ু, আকাশ ইত্যাদির সমষ্টিকে আমরা বাহ্য জগৎ বলি। যদি আমাদিগের বাহ্য জগতের ধারণা হইতে একে একে পদার্থ-সকলকে মুছিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর আমরা আমাদিগের বাহিরে কিছু খুঁজিয়া পাই না। চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ জল, পৃথিবী মনুষ্য, বৃক্ষ ইত্যাদি যদি আমরা একে একে সব কোন উপায়ে ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব আর আমাদিগের হৃদয়ে থাকে না। এমন হইবার কারণ, আমরা যাহা কিছু উপলব্ধি করি, সেগুলি 'পদার্থ'—পদ নহে। বাহিরে বস্তুতঃ পদার্থ নাই—'পদ' আছে ; সে পদ নানারূপ অর্থযুক্ত হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র। বৃক্ষ, মনুষ্য, জগৎ ইত্যাদি 'পদার্থ' মাত্র, 'পদের' বিশেষ বিশেষ অর্থরাশি মাত্র, পদের বিশেষ ভাবরাশি মাত্র, পদের বিশেষ উদ্বেলন মাত্র, 'পদ' নহে। এক অপূর্ব্ব পদ মাত্র অন্তর্বাহ্য ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। সে পদ

কি, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে কেহ সমর্থ হয় না। আবার সেই পদ বুঝিতে বুঝিতে জীব দ্রবীভূত হইয়া, পদার্থত্ব ছাড়িয়া ‘পদে’ মিশিয়া যায় ; সেই পদ একবারে বুঝা যায় না বলিয়া অগ্রে পদের অর্থ বা পদার্থরূপে সে পদের মহিমাসকল বুঝি। মহিমা বুঝিতে বুঝিতে পদ বুঝিবার ক্ষেত্র বা পদসান্নিধ্য লাভ করি। যখন আমি সূর্য্য সন্দর্শন করিতেছি, মনে হইতেছে, যেন আকাশে বহু উর্দ্ধে আমার নিকট হইতে বহু যোজন দূরে একটি পদার্থ রহিয়াছে। বস্তুতঃ ওই সূর্য্য বলিলে যাহা বুঝি, তাহা সেই পরম পদের এক প্রকার ভাব, যাহাকে পরিচিত করিয়া রাখিবার জন্য সূর্য্য বলিয়া সে পদের একটি অর্থ করিয়া লইয়াছি। ‘বৃক্ষ’ এইরূপ একটি অর্থ মাত্র, সে অর্থকরণ আমার ভিতরে, বাহিরে নহে। বাহিরে কোন অজ্ঞেয় পদ আছে, যাহা আমরা ইন্দ্রিয়-সাহায্যে আমার ভিতর বৃক্ষরূপ একটি অর্থ বা ভাব জন্মাইয়া দিতেছে। নদ নদী, গিরি প্রস্রবণ, ভূধর সাগর, আকাশ ইত্যাদি সমস্তই অর্থ মাত্র এবং আমার ভিতরে—বাহিরে নহে। এই জন্যই ইহাদিগের নাম পদার্থ (পদ+অর্থ) হইয়াছে। তবেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বাহ্য জগৎ বলিয়া যাহা আমরা ধারণা করি, তাহা বস্তুতঃ বাহিরে নহে—আমার ভিতর। আমি কি মহান্ পুরুষ! গ্রহ উপগ্রহদলমালা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ধুলিকণাটি পর্য্যন্ত এ সমস্ত পদার্থ আমার অভ্যন্তরে! আমার আমিত্বের গণ্ডী বস্তুতঃ তবে এই সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত দেহে মাত্র পর্য্যবসিত হয় নাই—যত কিছু পদার্থ বলিয়া আমার অনুভূতিতে আসে, যে সমস্ত আমার আমিত্বের ভিতর। ‘আমি’ বলিলে এক আকাশ-পাতালব্যাপী অর্থ বা পদার্থ বুঝা যায়।

আবার এই সমস্ত পদার্থ লইয়াই আমার ‘আমিত্ব’। যদি পদের এই অর্থসমষ্টি বা পদার্থসমষ্টি মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হওয়া যায়, তাহা হইলে আর এরূপ পদার্থসম্বলিত ‘আমিত্ব’ থাকে না—অন্তর্বাহ্য থাকে না ; মাত্র এক ‘পদ’ থাকে। অন্তর্বাহ্য থাকে না, —দূর নিকট থাকে না, ভূত ভবিষ্যৎ থাকে না—এক চিরবর্ত্তমান সত্য পদমাত্র প্রতিভাত হয়।

মনে কর, তুমি মনে মনে ভাবিতেছ, তোমার মস্তকের উপরিভাগে আকাশ রহিয়াছে। তুমি বস্তুতঃ সে আকাশ কোথায় দেখিতেছ ; তোমার ভিতরে, না বাহিরে? অবশ্য ভিতরে; অথচ তোমার মস্তক হইতেও বহু দূরে—বহু উচ্চে। ভিতরে অথচ তোমার দেহগণ্ডীর বহু উর্দ্ধে! ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে ; তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা “পদ” নহে, পদের অর্থ মাত্র বা পদার্থ মাত্র, যাহা তোমার তুমিত্বের ভিতরে অভিব্যক্ত হইতেছে। তবেই অন্তর্বাহ্য ধারণা কোথায় চলিয়া যায়। ভাবিতেছ, আকাশ তোমার উর্দ্ধে। আবার তোমার পদতলে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে অবস্থিত মনুষ্য তোমার শিরোদেশের এই আকাশই ভাবিতেছে পদতলে—নিম্নে। বস্তুতঃ তবে তোমার শিহরের এই আকাশ উর্দ্ধেও নহে, নিম্নেও নহে ; উর্দ্ধ

নিম্ন ধারণা তোমার ভাব মাত্র, অর্থের ব্যবধান-প্রতিপাদক মাত্র। ধীর চিন্তার সহিত এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়; বাহিরের কোন আপাতসম্পূর্ণ অজ্ঞেয় পদ, ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বিশ্লেষিত হইয়া, ব্যবধানযুক্ত হইয়া, অর্থরাশি হইয়া সত্য পদরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইহারা পদের অর্থরাশি মাত্র। পদ নহে, পদের অর্থরাশি মাত্র, এই ধারণা উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত করিয়া তুলিতে পারিলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন একটি ক্ষুদ্র পুলিন্দার মত হইয়া গুটাইয়া আমার আমিত্বের এক কোণে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে; এবং তখন পদার্থশূন্য পদরূপী 'আমি'র একটা বিশাল স্বচ্ছ, আকাশ অপেক্ষা বৃহৎ অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়। একটা মহাবিকাশ, যাহা 'অর্থ' বা পদার্থের দ্বারা আচ্ছাদিত নহে, যাহা জ্ঞানের সংকীর্ণ আলোকের দ্বারা প্রকাশিত নহে; যাহা কোন গণ্ডীর দ্বারা পরিব্যাপ্ত নহে, যাহাকে মাপিতে দিক্ ধারণা নাই, যাহার দুই দিক্ আচ্ছাদন করিতে ভূত ভবিষ্যৎ নাই, এইরূপ এক মহাজ্ঞানবিকাশক্ষেত্রে আপনি সংযুক্ত হইয়া পড়িতে হয়। সেই বিকাশক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত পদই ব্রহ্মময়ীর বিকাশ মাত্র—আমার মায়ের প্রথম আবিষ্কার মাত্র। পদার্থসকল মাতৃমহিমা!

এই পদকে বা মাকে প্রকাশ করিবার জন্য মাতৃ-বিকাশ ইন্দ্রিয়াদিরূপে বা ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গরূপে আমাতে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। দেবতাসকল মাতৃবিকাশের অংশ মাত্র। এই বিকাশশক্তি-সকল বা দেবতাসকল স্ব স্ব বিকাশধর্ম্ম বা শক্তি অনুযায়ী মাতৃ-বিকাশকে অর্থ-বিকাশে পরিণত করিয়া আমার আমিত্ব রচনা করিতেছে—একটা অর্থময় বা ভাবময় 'আমি' প্রকটিত করিয়া তুলিতেছে। যেন সেই পরম পদের প্রত্যেক পরমাণু বিকাশরূপ স্বীয় মহিমা বা দেবতার দ্বারা অর্থময়রূপে বা পদার্থময়রূপে বিশ্লেষিত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে।

দেবতাদিগকে 'বিকাশ' শব্দে উল্লেখ করিলাম বলিয়া বুঝিতে হইবে না যে, দেবতা গুণ মাত্র বা ভাব মাত্র; দেবতা চৈতন্যময় শক্তি। ইহাঁরা কি প্রকারে আমাদিগের দেহের কেন্দ্রে কেন্দ্রে থাকিয়া আমাদিগকে তমে আচ্ছন্ন হইতে দেন না এবং সমধিক বিকাশযুক্ত করিতে থাকেন, আমাদিগের ধীশক্তির সম্মুখে বিকাশের বিশাল ক্ষেত্র ধরিয়া আমাদিগকে পূর্ণ বিকাশময় করিয়া তুলেন, তাহা বুঝিতে হইলে এবং প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, আগে মহাশক্তির মহাবিকাশের কথঞ্চিৎ আভাস হৃদয়ে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই মহাবিকাশ কতকটা উপলব্ধি করিবার বিশেষ আবশ্যকতা বলিয়াই আমাদিগের সকল প্রকার ক্রিয়ার প্রারম্ভে আচমন করিতে হয়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥"—ইহাই আচমনের মন্ত্র। ইহার অর্থ,—"দেবতাবর্গ বা ঋষিবর্গ সেই বিষ্ণুর পরম পদ আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় দর্শন করেন।" চক্ষুই বিকাশ। আমি পূর্ব্বে যে পদের কথা বলিতেছিলাম, যে পদের মহিমা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পদার্থরূপে আমাদিগের হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয়, সেই পরম পদকে বিকাশরূপে আচমনের সময় ধারণা

করিতে হয় ; এই বিকাশ ধারণা না আসিলে আচমন করাই হয় না ; এবং বিকাশ ধারণা গভীরতর হইলে আমাদিগের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গ কি প্রকারে কার্য্য করিতেছেন, উপলব্ধি করিতে পারা যায়—তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ ঘনীভূত হয়।

মাকে ভাবনা করিলে সমস্ত দেবতারই ভাবনা করা হয়, মাকে পূজা করিলে সমস্ত দেবতার পূজা করা হয়, মাতৃ-বিকাশ ঘনীভূত হইলেই দেবতাগণের বিকাশ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তাঁহারা আমাদিগের পরিবর্দ্ধনে যত্নবান্ হন। এইরূপে আমরা দেবতাদিগের দ্বারা এবং দেবতারা আমাদিগের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া পরস্পর পরস্পরের শ্রেয়োলাভে সাহায্য করিতে পারি। মাতৃ-স্নেহধারা পদার্থরূপে, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেহ ইত্যাদিরূপে আমাদিগকে কর্ম্মী করিয়া তুলিতে অহর্নিশ সচেষ্ট।

মাকে ডাকিলেই সমষ্ট দেবতাকে ডাকা হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দেবতাসকল এইরূপে আমাদিগের দ্বারা ভাবিত হইলে আমাদিগের বিকাশ লাভ ঘটেই, দেবতাদিগেরও অধিকারক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত হয় বলিয়া তাঁহারা প্রসন্ন হন।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

হি যতঃ দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ সন্তঃ ব ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে, তৈর্দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায় যঃ ভুঙ্‌ক্তে, স এব স্তেনঃ চৌরঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—দেবগণ যজ্ঞদ্বারা ভাবিত হইলে তোমাদিগকে ইষ্ট ভোগসকল প্রদান করিবেন ; তাঁহাদিগের প্রদত্ত দ্রব্য তাঁহাদিগকে না দিয়া যে নিজে ভোগ করে, সে চোর মাত্র।

যৌগিক অর্থ। সমস্ত ভৌতিক পদার্থের দেবতাবর্গই অধিপতি ; প্রাণেরও অধিপতি দেবতা ; আমাদিগের দেহস্থ কেন্দ্রে কেন্দ্রে বা মূলাধারাদি প্রধান প্রধান চক্রে এবং অন্যান্য অপ্রধান চক্রে এই দেবতাবর্গ অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদিগকে স্বাভাবিক ভোগ-সকল প্রদান করিতেছেন। স্বাভাবিক ভোগ অর্থে আমাদিগের ভৌতিক ও দৈবিক স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ও তত্তৎপোষণকারী শক্তির অধিকার—এই সমস্ত তাঁহারা সততই দেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়া ভোগ করিলে তাঁহারা অস্বাভাবিক ভোগসকল প্রদান করেন ; অলৌকিক শক্তি বা বিভূতি-সকল তাঁহাদিগের কৃপায় লাভ করিতে সমর্থ হই ; এবং সেই সমস্ত দেবতাবর্গ যে একই মহতী দেবতার অংশ বা বিকাশ, একই মা স্বীয় বিভূতিসকল আমাকে দেখাইতে ও ভোগ করিতে দিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিময়ী হইয়া অধিষ্ঠিতা, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহাকে দিতে, তাঁহার প্রদত্ত ভোগ-সকল তাঁহাকে অর্পণ করিয়া ভোগ করিতে দুই প্রকারে সক্ষম হওয়া যায়। প্রথম আমরা স্থূল অন্ন, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ

যাহা ভোগ করি, তাহাতে তাঁহারই সত্তা ও আধিপত্য হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিয়া ভোগ করিব ; এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের দেহাভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রে কেন্দ্রে আমাদিগের আমিত্বটুকুকে লইয়া গিয়া, সেই মহাসমষ্টিসত্তার চরণে উৎসর্গ করিব। এই দুই প্রকার অন্তর্বাহ্য ক্রিয়ায় যথাসাধ্য নিযুক্ত হইয়া থাকিতে পারিলেই মাতৃপ্রসন্নতা বা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইব। কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার কৌশলরূপ ক্রিয়া অবলম্বন করিলে দেহে সুধা বিনিঃসৃত হইতে থাকিবে এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ নিরাময় হইবে। দেহ যত নির্ম্মল হইতে থাকিবে, ততই চিদ্‌ঘন জ্যোতি অনুভবে আসিতে থাকিবে। আপনার আমিত্বটুকুকে যে পরিমাণে গুটাইয়া লইয়া কেন্দ্রস্থ করিয়া তাঁহার চরণে দিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তিনি প্রত্যক্ষীভূতা হইবেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে এইরূপে আমিত্বকে লইয়া যাইবার জন্য গুরুমুখ হইতে উপায় জানিয়া লইতে হয়। সদ্‌গুরু প্রাপ্তির জন্য মায়ের নিকট প্রার্থনা করিলেই তিনি অচিরেই সদ্‌গুরু পাঠাইয়া দেন এবং এ ক্রিয়া জীব লাভ করে।

এইরূপে নিজসত্তাকে ব্রহ্মসত্তার সংস্পর্শে বার বার আনিতে আনিতে আপনার সত্তার ভিতর একটি মহাসত্যের উপলব্ধি হয় ; হৃদয় তখন যেন অমৃতময় হইয়া উঠে। অন্তর্বাহ্য ব্যাপিয়া মহাজ্যোতির্ম্ময় বিকাশ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায় ; জগতের পদার্থনিচয় আবৃত করিয়া অচল সত্যজ্যোতি প্লাবিত হইতে থাকে। তখন আকাশ, সূর্য্য, বায়ু, জল, স্থল—সমস্ত সত্য, সমস্ত চৈতন্যময়, সমস্ত অমৃতময় সাধক দেখিতে পান। সাধকের প্রাণ সর্ব্বত্র হইতে সত্যরূপ সুধা পান করিতে থাকে। ইহাই ইষ্ট ভোগ।

এইরূপে দেবতাকে না দিয়া, তাঁহাদিগের প্রদত্ত ভোগ তাঁহাদিগকে না অর্পণ করিয়া সাধারণ জীব ভোগ করে বলিয়া, জীব ভোগের সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির জ্বালায় জ্বলিতে থাকে। জীব অপহারক পদবাচ্য হয় ; সেই অপহরণরূপ কার্য্যের ফলস্বরূপ ভোগসকল অমৃতময় না হইয়া, বিষময় হইয়া তাহাকে রোগগ্রস্ত করে, তাহার দেহত্রয় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তাপত্রয়ে অহর্নিশ জ্বলিতে থাকে, ভোগে 'রোগভয়, রোগভয়' বলিয়া জীব চীৎকার করিয়া থাকে ; এ সমস্ত চুরির শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। চুরি করা ভোগে ও প্রসাদ ভোগে আমাদিগের শরীরত্রয়ের উপর দুই বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া চলে। চুরি করা ভোগে দেহের পরমাণুসকল সঙ্কুচিত ও মাতৃপ্রসাদ ভোগে প্রসারিত হয়। সেই সংস্পর্শের ফলস্বরূপ তাপ উদ্ভূত হয়। দেহত্রয়ের তাপই ত্রিতাপপদবাচ্য। মাতৃপ্রসাদ ভোগে পরমাণুসকল প্রসারিত হয় বলিয়া আকাশ ও চিদাকাশ তাহাদিগের ভিতর সম্যক্ বিকাশ পায় ও শান্তির স্নিগ্ধতা অনুভবে আসে ; ইহাই রস, অমৃত ও সত্যপদবাচ্য।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ যজ্ঞশেষভোজিনঃ সাধকাঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্বপাপৈঃ মুচ্যন্তে, যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি, তে পাপাঃ পাপাচারিণঃ অঘং ভুঞ্জতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যজ্ঞশেষভোজী সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন ; যাহারা আত্মচরিতার্থতার জন্য পাক করে, সেই পাপীরা পাপই ভোজন করে।

যৌগিক অর্থ।—যজ্ঞের অবশিষ্টভোজী হইয়া সাধুরা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা নিজের জন্য পাক করে, সেই পাপীরা পাপ ভক্ষণ করে মাত্র। যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া সাধুরা পাপ হইতে মুক্ত হন, এই কথা বলায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, সাধুদিগেরও পাপ থাকিতে পারে ; উপস্থিত কোন পাপকার্য্য না করিলেও পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের সংস্কার থাকা বিচিত্র নহে ; সাধু হইয়া যজ্ঞাবশিষ্টভোজী হইলে তবে সে সমস্ত পাপ ধ্বংসীভূত হয়। সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তার পর জীব সাধু হয় না, সাধু হইয়া তার পর জীব সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। অনন্যচিত্তে ভগবানের ভজনা করিলে জীব সাধুপদবাচ্য হয়, এ কথা ভগবান্ পরে বলিয়াছেন। পাপ থাকিতে সম্পূর্ণ অনন্যচিত্তে ভগবানের ভজন করা যায় না সত্য, কিন্তু অনন্যচিত্তে ভজন করিবার ইচ্ছা হইতে পারে ; এইরূপ ইচ্ছা করিলেও তাহার ভজনা করা হয়। তোমাকে ভালবাসিব, মাত্র এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিলেই মা সন্তুষ্টা হন। তাঁহার নয়নে স্নেহাশ্রু বহিতে থাকে, স্তনে দুগ্ধধারা নামে, তাহার স্নেহরাগরঞ্জিত অধরে চুম্বন ঝরিতে থাকে, তাঁহার প্রাণের সাধ মিটিয়া যায় ; তাই তিনি জীবকে সাধু বলিয়া সম্ভাষণ করেন। মা তোমার ভালবাসা চাহেন না, ভালবাসার ইচ্ছার প্রত্যাশা করেন মাত্র। এইরূপ ভালবাসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তবে জীব যজ্ঞাবশিষ্টভোজী হইতে থাকে।

জীব, তুমি যজ্ঞ করিবে কি ? যজ্ঞ করিয়া, যজ্ঞের শেষ অমৃত লাভ করিবে কি ? তোমার দেহের অভ্যন্তরে মাতৃপূজার কি আয়োজন স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি ? তোমার প্রাণ-সমুদ্রের পদ্মের কলিসকল মাতৃচরণের রশ্মি বিহনে নতশিরে শুকাইয়া যাইতেছে দেখিয়াছ কি ? সূর্য্যের অনুদয়ে কমলিনী যেমন প্রস্ফুটিতা হইতে পায় না, মূলাধারাদি পদ্মসকল তেমনি সবিতৃমণ্ডলবর্ত্তিনী জগদ্ধাত্রী জননীর হিরণ্ময় কিরণ বিহনে অফুটন্ত পড়িয়া রহিয়াছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহ না পাইলে সরোজিনীর সৌগন্ধ যেমন চারিধারে বিস্তৃত হইতে পায় না, তোমার প্রাণবায়ুর কোমল স্পর্শ না পাইয়া ঐ পদ্ম-সকলের সৌগন্ধ তদ্রূপ মাতৃমন্দির সৌগন্ধান্বিত করিতে পায় না। ভ্রমর যেমন মধুর আশায় পদ্মে পদ্মে ভ্রমণ করে, এস জীব, তুমি তদ্রূপ পদ্মে পদ্মে পরিভ্রমণ কর। তৃষ্ণার আগুন বুকে লইয়া, প্রাণের আকুলতা চক্ষে মাখাইয়া, বিচ্ছেদের দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ে চাপিয়া, এস জীব ! গুরুপ্রদর্শিত উপায়ে পদ্মে পদ্মে পরিভ্রমণ কর ; তোমার কাতর মন্ত্রজপরূপ গুন্‌গুন্ রবে ক্ষীরোদার্ণব-

শায়িনী পদ্মালয়া জননীর আমার নিদ্রাভঙ্গ হইবে ; পদ্ম ফুটিবে, অমনি সুধা ঝরিবে, অমনি সুগন্ধে দিক্‌সকল ভরিয়া যাইবে, অমনি মধুলুব্ধ তুমি জীব, মধুর লোভে গিয়া বসিবে, অমনি তোমার চরণ সে মধুতে জড়াইয়া যাইবে—তোমার গতিরোধ হইবে।

মাতৃপূজার—মাতৃযজ্ঞের এই কুসুমক্রীড়ার অব্যবহিত পরেই দেখিবে, রক্তিম রাগে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া, তোমার মণিপুরে মণিময় দেশকে মণিময় কিরণে মণ্ডিত করিয়া ত্রিলোকের বরেণ্য সবিতৃমণ্ডল উদিত হইবেন, আর তোমার ললাটদেশে সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র উদ্ভাসিত হইবেন। জীব, চন্দ্র সূর্য্যের একত্র সমাবেশ কখনও দেখিয়াছ কি ? চাঁদের কিরণে রবির আলোক মাখামাখি হইলে যে নবঘনশ্যাম প্রাণ-মাতান রূপের মেঘ আবির্ভূত হয়, সে আলো-মাখা কালো রূপ তোমার নয়নে কখন পড়িয়াছে কি ? যার চরণভঙ্গিমায় মদন মূর্চ্ছিত হয়—যার লাবণ্যজ্যোতিতে দেবলোক বিলীন হইয়া যায়—যাহার নয়নভঙ্গিমায় মহেশ্বরের যোগভঙ্গ হয়, সেই ত্রিবঙ্কিমঠামের অপূর্ব্ব শোভা যদি হৃদয়ে দেখিতে চাও, তবে চাঁদ হইতে কিরণ সংগ্রহ করিয়া সূর্য্যে ঢালিয়া দাও। পদ্মে পদ্মে চল। যত ক্ষণ না পদ্মের সুধায় তোমার মনোরূপ ভ্রমরের চরণ জড়াইয়া যায়—গতিরোধ হয়, তত ক্ষণ চন্দ্রের কিরণ আনিয়া সূর্য্যে আহুতি দাও। সূর্য্য প্রখর হইবে—পদ্ম ফুটিবে।

মনের অধিপতি দেবতার নাম চন্দ্র ; এই চন্দ্রকে ইহার স্বস্থান অর্থাৎ ললাটে ধারণা করিতে পারিলে জীব চন্দ্রশেখর হয় ; তখন ইহা হইতে স্নিগ্ধ কৌমুদীরাশি বিকীর্ণ হইয়া দিঙ্‌মণ্ডলে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, অপূর্ব্ব হৈম জ্যোতিতে প্রাণ পূর্ণ হয়, এই জ্যোতির অগ্নিধারা সুষুম্না-পথে আকাশমার্গে নাভিস্থ বৈশ্বানরে বা সূর্য্যে ঢালিয়া দিতে হয়। রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে সর্পসকল যেমন চারি দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিয়া যজ্ঞাগ্নিতে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হইয়াছিল, তদ্রূপ বিষয়সকলের সংস্কাররাশি ঐ চন্দ্রকিরণ ধরিয়া বৈশ্বানর আগুতে ঝাঁপাইয়া পড়ে ও দগ্ধীভূত হয়। আমাদিগের মেরুদণ্ডের মধ্যস্থল দিয়া এই সুষুম্নাপথ প্রবাহিত ; ইহার অভ্যন্তরে সুনীল স্বচ্ছ আকাশ বিদ্যমান ; এই আকাশে প্রবেশ করিতে পারিলে ব্রহ্মময়ীর সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়াই ইহার অপর নাম ব্রহ্মনাড়ী ; আর ঐ পথে এইরূপে মনের কর ছুটানোর নামই সূর্য্যে চন্দ্রকিরণ ঢালিয়া দেওয়া। কিন্তু এই যজ্ঞের কথা বলিবার পূর্ব্বে যে স্বাভাবিক যজ্ঞ অহর্নিশ আমাদের দেহের ভিতর হইতেছে, সেই যজ্ঞের কথা বলি ; ভগবান্ সেই যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়াই জীবকে যজ্ঞশিষ্টভোজী হইতে বলিয়াছেন।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্মসমদ্ভবঃ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

অন্নাৎ ভূতানি ভবন্তি; পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ, যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ ভবতি; যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি; ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবম্; তস্মাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বগতং নিত্যং চ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।

ব্যবহারিক অর্থ।—অন্ন হইতে ভূতসকল সঞ্জাত হয়, মেঘ হইতে অন্ন হয়, যজ্ঞ হইতে মেঘ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যজ্ঞসকল কর্ম্মসমুদ্ভব, কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্ম অক্ষর পুরুষ হইতে সম্ভাবিত। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বগত এবং নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

যৌগিক অর্থ।—এই মহাযজ্ঞ লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ জীবকে চলিতে আদেশ দেন। এই যজ্ঞাবশিষ্টভোজী হইয়া জীব পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহা তিনি ইচ্ছা করেন। এই যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলিতে যজ্ঞ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এ যজ্ঞ বিরাট্, এ যজ্ঞ অনন্ত, এ যজ্ঞ জীবসকলের পরিত্রাতা।

প্রথমতঃ স্থূল জগতে মায়ের আমার সে মহাযজ্ঞ কিরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে দেখা যাউক। অন্ন হইতে ভূতসকল সঞ্জাত হইতেছে। জীবসকল অন্নের দ্বারা পুষ্ট ও প্রতিভাত হইবার অবসর পায়। স্থূল শরীর ভূত বা জীবাণুসমষ্টি মাত্র। সেই ভূতসকলও অন্নের দ্বারা উৎপন্ন হয়। অন্ন হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, শুক্র, ক্রমান্বয়ে সৃজিত হয়। সেই শুক্র হইতে সাধারণ জীবসকলের উৎপত্তি। আবার আহারের দ্বারা ভূত বা জীবাণুসকল ও স্বেদজ জীবসকলের উৎপত্তি ও পুষ্টিসাধন হয়। আমাদিগের দেহের রক্তকণাদি সকলই জীবাণু; বহির্জগতের যাহা কিছু সবই জীবাণু এবং সে সমস্তই অন্নের দ্বারা গঠিত ও বর্দ্ধিত হয়। যাহা পোষণ করে, তাহারই নাম অন্ন। প্রত্যেক জীব বা জীবাণু কোন না কোন প্রকারের অন্ন বা পোষণকারী শক্তি আহার না করিয়া সঞ্জাত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। উদ্ভিদ্‌জগৎ প্রত্যক্ষভাবে জীবজগতের আহার প্রদান করে। এই উদ্ভিদজগৎ পর্জ্জন্য-বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন। অনেক জীব আছে, যাহারা মৃত্তিকা ভক্ষণ করে সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ মৃত্তিকাতে সাধারণতঃ যে উদ্ভিজ্জ রস আদি মিশ্রিত থাকে, তাহাই তাহাদিগের আহার, মৃত্তিকা মাত্র নহে।

এই বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন। সে যজ্ঞ কোথায় উৎপন্ন হইতেছে? সূর্য্যে। ব্রাহ্মণেরাও অগ্নিমুখে যে যজ্ঞ করেন, তাহাও আদিত্যমুখে যায়। এই আদিত্যের অন্য নাম বিষ্ণু এবং সমস্ত আহুতি এই বিষ্ণুমুখে ধাবিত হয় বলিয়া যজ্ঞেরও অপর নাম বিষ্ণু। সূর্য্যদেব সৌর জগতের কেন্দ্রশক্তি। তিনি পৃথিবীর জলরাশির মধ্যে কর প্রসারিত করিয়া দিয়া বাষ্পাকারে জলকণারূপ আহুতি সংগ্রহ করিতেছেন। সেই বাষ্পসকলকে স্বীয় তাপপরিচালিত বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে যেখানে যেখানে অভাব বা যেখানে যেখানে স্বীয় কর উপযুক্ত আহুতি সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, সেই সকল

ক্ষেত্রে আশীর্ব্বাদ আকারে বরিষণ করিতেছেন। 'আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা' ইতি শ্রুতিঃ। সেই বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে ভূত উৎপন্ন হইতেছে।

এই যে যজ্ঞ, ইহার উদ্ভব কর্ম্ম হইতে, এবং সে কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। সূর্য্যদেবের কর প্রসারণরূপ কর্ম্মই ইহার কারণ। ব্রাহ্মণ যে যজ্ঞ করেন, তাহারও কারণ ভগবৎকর প্রসারণ। দ্বিজগণের হৃদয়ে ভগবদ্‌ভাবরূপ রশ্মিজাল মা আমার বিকীর্ণ করেন বলিয়াই তাঁহারা যজ্ঞে নিযুক্ত হয়েন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা মাকে তত চাহি না, মা আমাদিগকে যত চাহেন। মা আমাদিগকে আপনার মায়ার দ্বারা ও স্নেহের দ্বারা সংগ্রহ করেন ; যখন উহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, তখন হইতে স্বেচ্ছায় "মা মা" করিতে আরম্ভ করি। তাহার পূর্ব্বেও অর্থাৎ যত দিন সাধারণ জীব মাতৃস্নেহের ধারণা করিতে পারে না, তখনও যে শঙ্কটাদিতে পড়িয়া "মা মা" করে, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, মনে না জানিলেও প্রাণে আমাদিগের মাতৃস্নেহের আভাস সতত আমাদিগের অজ্ঞাতভাবে ভোগ হইতেছে। যাহা হউক স্নেহের রশ্মি হৃদয়ে বিকীর্ণ হওয়া রূপ যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম হইতেই আমরা যজ্ঞে অনুপ্রাণিত হই। বাহ্য জগতে সূর্য্য-রশ্মিরূপে সেই স্নেহ বিকীর্ণ হইয়া পর্জ্জন্য সংগ্রহ করিতেছে। সুতরাং কি চৈতন্য, কি জড় জগৎ, সর্ব্বত্র রশ্মি বিকিরণ বা মাতৃ-কর প্রসারণরূপ কর্ম্ম হইতেই রসরূপ আহুতি মা সংগ্রহ করিতেছেন বা বিরাট্ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। কর অর্থে কিরণ, কর অর্থে পাণি বা হাত। সূর্য্য-রশ্মি—মায়ের হস্তপ্রসারণ, মাতৃস্পর্শ! এই স্পর্শ প্রাণময়, স্নেহময়, তেজোময়। উহা পুণ্য পবিত্র অমৃতবর্ষণ। ওই কিরণে অভিস্নাত হইয়াই জীব, তুমি জীবত্ব রক্ষায় সমর্থ। উহা চৈতন্যময়, উহারই পরশে তুমি চৈতন্য বা ধীশক্তি পাইয়াছ, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। মায়ের যজ্ঞ মা-ই করিতেছেন। যজ্ঞ মাতৃকর্ম্ম হইতে উৎপন্ন—মাতৃস্নেহ উদ্বেলনরূপ ক্রিয়ার ফল।

সুতরাং বুঝিলাম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, এবং সে কর্ম্ম—ব্রহ্ম বা বিরাট্ গুণময়ী স্নেহময়ী কর্ম্মময়ী মায়ের! বেদবিহিত যজ্ঞ-সকল বেদ হইতে উদ্ভূত, প্রবর্ত্তিত। এই বেদ বা মাতৃবেদনই ব্রহ্ম পদবাচ্য। সাম ঋক্ আদি বেদ-সকল মাতৃবেদন ছাড়া কিছুই নহে। মাতৃকর-প্রসারণরূপ কর্ম্ম সেই বেদনের ফল। আমাদিগের যজ্ঞাদিও সেই বেদনের অভিব্যক্তি। এই বেদই অপৌরুষেয়, ইহা মায়ের বেদন—সন্তানের জন্য আকুলতা! এ বেদন সর্ব্বব্যাপী—এই বেদন হইতে সৃষ্টি স্থিতি লয় সংঘটিত হইতেছে। এ বেদনশূন্য স্থান বা কাল হইতে পারে না। বেদচতুষ্টয়ে যাহা আছে, তাহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে ; মা বলিতেছেন—"আমায় ডাক, আমায় বোধ কর।" ইহা ছাড়া বেদের অন্য তাৎপর্য্য নাই। এই বলিয়া ডাকিলেই তুমি মাতৃময় হইবে—ব্রহ্ম হইবে বা আপনার তদ্রূপ স্বরূপ বুঝিবে।

যাহা হউক, এই বেদন, বেদ বা ব্রহ্ম, অক্ষর হইতে অভিব্যক্ত। যে মায়ের

হৃদয়ের বেদন প্রসৃত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া চারি ধারে কর্ম্মাকারে, পরিণামাকারে প্রবাহিত—মায়ের যে বিরাট্‌ বেদন ব্রহ্ম বা বৃহত্তম আকারে চারি ধার পরিব্যাপ্ত করিতে সূর্য্যরূপ কেন্দ্র সংগঠন করিয়া লইয়া কর্ম্ম ও যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছে, যাহা মনুষ্য-হৃদয়েও অভিব্যক্ত থাকিয়া বেদবিহিত বা সমবেদনযুক্ত যজ্ঞসকল নিষ্পন্ন করিতেছে, সে বেদন কি তবে পরিণামযুক্ত, অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, অচিরস্থায়ী ? তাহা হইতে পারে না। অক্ষর হইতে তাহা উৎপন্ন, প্রকাশিত। অক্ষর অর্থে যাহার ক্ষরণ নাই—যাহা ক্ষরিত হইয়া ফুরাইয়া যায় না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, নঙ্‌তৎপুরুষ সমাসকৃত শব্দসকলের ধর্ম্ম—ইহা অপ্রধান ভাবে বিপরীত স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। 'যাহা ক্ষরণ হয় না' বলিলে ক্ষরণহীন অবস্থা প্রধান ভাবে এবং ক্ষরণের সামান্য ভাবে আভাস দেয়। "ক্ষরণ বলিয়া যেন একটা কিছু আছে, যাহা ইহাতে নাই" এইরূপ ভাব ফুটাইয়া তুলে। ক্ষরণের একটা স্মৃতি, একটা ছায়া প্রাণে জাগে। এমন একটা কেন্দ্র আছে, শক্তির এমন এক অবস্থা আছে, যাহা অক্ষর হইলেও ক্ষরণের আভাস আছে ; ইন্দ্রিয়াদি না থাকিলেও ইন্দ্রিয়াদির আভাসযুক্ত, গুণ বলিয়া কিছু নাই, অথচ সর্ব্বগুণের আভাসময় ; সেখান হইতে ওই বেদন বা শক্তি ক্ষরিত। অক্ষর অর্থে মা। সেই মা হইতে বা অক্ষর হইতে বেদন বা বেদ-সকল উদ্ভুত। প্রণব সেই বেদনের প্রথম অভিব্যক্তি, উহা বৃহত্তম ব্রহ্মের প্রথম কম্পন। ইহা হইতে এক দিকে চতুর্ব্বেদ, এবং অন্য দিকে স্থূল জগৎ, স্থূল শক্তিবিস্তার উৎপন্ন। উহা হইতে চৈতন্যক্ষেত্রে ভগবদ্‌ভাবরূপ কর্ম্ম এবং স্থূলে আদিত্য বা বিষ্ণুশক্তির করপ্রসারণরূপ কর্ম্ম, ওইরূপ কর্ম্ম হইতে স্থূলে রসাকর্ষণরূপ যজ্ঞ, এবং চৈতন্যে ভগবৎস্মরণরূপ যজ্ঞ চলিতেছে ; স্থূলে আবার সেই রস প্রত্যাগত হইয়া অন্ন, এবং চৈতন্যে সেই ভাব উদ্দীপিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি সাত্ত্বিক স্ফুরণ করিতেছে। স্থূলে সেই অন্ন হইতে জীবসকল রক্ষিত এবং চৈতন্যে সেই স্ফুরণ দ্বারা চৈতন্যক্ষেত্র বিকশিত। ইহাই স্থূলতঃ বিরাট্‌ যজ্ঞ।

এইবার মনুষ্যরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে এই যজ্ঞ কিরূপে অনুষ্ঠিত বা প্রতিবিম্বিত, তাহা বলি। অন্ন বলিতে ক্ষিতিতত্ত্ব বুঝায় ; পর্জ্জন্য বলিতে রসতত্ত্ব, যজ্ঞ বলিতে তেজস্তত্ত্ব, কর্ম্ম বলিতে বায়ুতত্ত্ব, ব্রহ্ম বলিতে ব্যোমতত্ত্ব এবং অক্ষর বলিতে ঈশ্বর পুরুষকে বুঝায়। ক্ষিতিতত্ত্বের দ্বারা আমাদিগের দেহ সংরক্ষিত এবং স্থূল জগতে অবস্থানোপযোগী দেহ পাই বলিয়া অন্ন হইতে ভূত-সকল উৎপন্ন, এই কথা বলা হইয়াছে। এই ক্ষিতিতত্ত্ব গুহ্যদ্বারস্থ মূলাধার চক্রে সম্যক্‌ কার্য্যকারী। ইহার উৎপত্তি পর্জ্জন্য বা রসতত্ত্ব হইতে, ইহার ক্রিয়াস্থল স্বাধিষ্ঠান। যজ্ঞ বা তেজস্তত্ত্ব হইতে ইহা উৎপন্ন। এই যজ্ঞের স্থল মণিপুর চক্র বা নাভিদেশ। নাভিস্থলে যজ্ঞকুণ্ড জ্বলিতেছে। আমাদিগের মাতৃস্নেহ সূর্য্যকররূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহার তেজ বর্দ্ধিত করিতেছে। আমাদিগের দ্বারা ভুক্ত পীত যত কিছু পদার্থ পাকস্থলীতে পড়িয়া ওই অগ্নিতেজে দ্রবীভূত হইতেছে ; বহি-

র্জগতে সূর্য্যকর যেমন জলাধার হইতে বাষ্পরূপ আহুতি আকর্ষণ করিয়া লন, মনুষ্যদেহেও তদ্রূপ তিনি উক্ত রস আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। বাহ্য জগতে উক্ত বাষ্পসকল সূর্য্যতাপ-চালিত বায়ুপ্রবাহের দ্বারা যেখানে প্রয়োজন, সেই সেই স্থলে সঞ্চালিত হইয়া যেমন বরিষণ করে, মনুষ্যদেহেও তদ্রূপ উহা নাভিস্থ তাপের দ্বারা পরিচালিত শ্বাসপ্রশ্বাস-সঞ্চালক বায়ু-যন্ত্রের সাহায্যে দেহের চারি ধারে প্রবাহিত হইতেছে। বৃষ্টিপাতে জলরাশি যেমন চারি ধার পরিপূর্ণ করে, ও উদ্বৃত্ত অংশ আবার জলাশয়ে গিয়া সঞ্চিত হয়, আমাদিগেরও দেহের সর্ব্বস্থান রসময় করিয়া অবশিষ্ট অংশ স্বাধিষ্ঠান চক্রের কর্ত্তৃত্ববিধানে গিয়া পড়ে। এই জন্য "যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ" বলা হইয়াছে।

তার পর সূর্য্য পৃথিবীর উপর স্বীয় আকর্ষণ-শক্তি ও করপ্রভাব বিস্তার করিয়া পৃথিবীকে যেমন কর্ম্মময় করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সেই তাপ, আকর্ষণ ও প্রাণশক্তির কার্য্যের সম্যক্ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য যেমন রসপ্রবাহ আকর্ষণ ও বিতরণ করিতেছেন, তদ্রূপ আমাদিগের হৃৎপিণ্ডের উপর নাভিদেশস্থ সূর্য্য স্বীর প্রভাব বিস্তার করিয়া, তাহাকে কর্ম্মময় করিয়া রাখিতেছে, এবং তৎফলস্বরূপ আবার সূর্য্য বা নাভিতে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ বা রসাকর্ষণ ও পুনরায় উহার প্রতিদানক্রিয়া অহর্নিশ সম্পন্ন হইতেছে। এই জন্য নাভিস্থল প্রধান কর্ম্মপরিচালক হইলেও, হৃৎপিণ্ড সাক্ষাৎভাবে কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মপ্রবর্ত্তক। হৃৎপিণ্ড শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম্মের যন্ত্র ফুসফুসের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া সমগ্র দেহকে সাক্ষাৎভাবে কর্ম্মময় করিতেছে, আপনি অহর্নিশ ছেদহীন বিরামহীন সুনিয়মিত কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত, সেই কর্ম্মের অনুপাতে নাভিতে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম বা আহুতিরূপ প্রতিদান চলিতেছে। সূর্য্যের শক্তিতে পৃথিবী শক্তিশালিনী হইয়া যেমন সূর্য্যকে রস প্রতিদান করে, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। আমাদিগের দেহের স্থূল অংশের কর্ম্মের সাক্ষাৎ কেন্দ্রই যেন এই হৃৎপিণ্ড; পরম্পরা ভাবে যজ্ঞের প্রধান কারণ নাভি হইলেও সাক্ষাৎভাবে হৃদয়ই প্রধান।

এই অবধি বেশ বুঝা গেল। কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করা গেল। কর্ম্ম "ব্রহ্মোদ্ভব।" এইটি একটু বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। ব্রহ্ম শব্দে ব্যোম-তত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। স্থূল জগতের স্থূলত্ব হিসাবে ব্যোমই বৃহত্তম, এবং ব্যোম হইতেই পঞ্চীকরণের দ্বারা সমস্ত ভূতের উৎপত্তি। মনুষ্যদেহে এই ব্যোমতত্ত্বের প্রধান কেন্দ্র কণ্ঠ বা বিশুদ্ধ চক্র। এই বিশুদ্ধ চক্রের প্রভাবের উপর হৃৎপিণ্ডের কর্ম্মপ্রবণতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। হৃদয়দেশের কথা আর একটু খুলিয়া না বলিলে উহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে না। হৃদয়দেশে কর্ম্ম দুই প্রকারে হয়—এক স্থূল হিসাবে স্থূল শরীরযন্ত্রের স্থূল পরিচালন এবং আর এক ভাবপ্রবাহ দ্বারা দেহের পরিচালন। স্থূল শরীরের কর্ম্মকেন্দ্র হৃৎপিণ্ড এবং ভাবপ্রবাহের কর্ম্মকেন্দ্রের নাম হৃদয়। স্থূল কার্য্য হিসাবে আমি পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, কি প্রকারে

হৃৎপিণ্ড হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হইতেছে। ভাব হিসাবেও দেখিতে গেলে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ভাবসকল আমাদের দেহযন্ত্রের পরিচালনে, সংগঠনে ও নিয়োগে কিরূপ কার্য্যকারী। যত কিছু কার্য্য মনুষ্যের দ্বারা কৃত হয়, হৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে তাহার ভাব ফুটিয়া তবে সে কার্য্য স্থূলে সম্পাদিত হয়। মানসিক বৃত্তিসকল হৃদয়ে বিম্বিত হইলে হৃদয় ভাবময় হয় এবং তখন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। শরীরসম্বন্ধীয় কার্য্য-সকলও ভাবের সাহায্য ব্যতীত চলে না। পরিপাক, হৃৎপিণ্ড সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি দেহের স্বাভাবিক কার্য্য-সকলও ভাবের আবেগে অনুষ্ঠিত হয়। তবে সে সকল ভাবের স্ফুরণ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না; সেই সব কার্য্যে অত্যধিক অভ্যস্ত বলিয়া তাহা আর আমাদিগের গ্রাহ্যে আসে না। আমি যখন কোন অনাহারক্লিষ্ট জীবকে আহার্য্য দিয়া থাকি, তখন আমার হৃদয়ে যেমন আবেগ আসে, আমি আমার নিজের ক্ষুধার সময় আহার করিতেও তদ্রূপ হৃদয়ে আবেগযুক্ত হই। অপরের অভাবের মত আমার দেহের অভাবও আমার হৃদয়ে ভাব ফুটাইয়া তুলিতে থাকে, এবং তাহারই বশে আমি অন্য জীবকে পরিপালন বা পরিতুষ্ট করার মত স্বীয় দেহকে পরিপালন ও পরিতুস্ট করিয়া থাকি। আমার নিজ বাসগৃহে আবর্জ্জনারাশি দেখিলে যেমন আমার হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হয় ও আমি উহা পরিষ্কার করিবার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পরিষ্কার করা রূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়ি, আমার নিজের দেহের মল মূত্র ও ঘর্ম্মাদি আকারের আবর্জ্জনাসকল দূর করিবার জন্যও আগে আমার হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার হয় ও তার পর ওই সকল শারীরিক কার্য্য সম্পাদিত হয়। তবে দৃঢ় অভ্যস্ত বলিয়া উক্ত ভাব-সকলের আবির্ভাব আমরা ধরিতে পারি না। সমস্ত কর্ম্ম, কি স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ, কি চেষ্টিত—সমস্তই আগে ভাবাকারে হৃদয়ে কর্ম্ম করে, তার পর দেহকে তৎকর্ম্মময় করিতে থাকে। ভাবে আগে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তার পর স্থূলাকারে বিকাশ লাভ করে। বস্তুতঃ আমার দেহযন্ত্রের, কি অন্নময়, কি প্রাণময়, কি মনোময়, কি বিজ্ঞানময়, সমস্ত কোষের সমস্ত কার্য্য আগে হৃদয়ে ভাবরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তার পর কর্ম্মরূপে। মা আমার এই হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া রহস্যের লীলাভূমিরূপে হৃদয়কে সজ্জিত করিতেছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাবময়ী হইয়া ফুটিতেছে, আমায় মজাইতেছে, কর্ম্মময় করিতেছে, প্রাণময় করিতেছে। হৃদয় যখন যে ভাবে রঞ্জিত হইতেছে, শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তি-সকল তখন সেই ভাবে স্ফুরিত ও কর্ম্মশীল।

তবেই স্পষ্ট বুঝা গেল যে, হৃদয় ও হৃৎপিণ্ড, সাক্ষাদ্‌ভাবে ইহারাই কর্ম্মাধিপ। কিন্তু এই ভাবরূপ হার্দ্দ কর্ম্ম ও হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির যে স্থূল কর্ম্ম, এই দুই প্রকার কর্ম্মের জনক কে? ভগবান্ বলিতেছেন, ইহা ব্রহ্মোদ্ভব; আকাশতত্ত্ব হইতে ইহার উৎপত্তি। বাহ্য আকাশতত্ত্ব যাঁহার শরীর, শব্দ এবং অন্তরাকাশ যাঁহার স্বরূপ, সেই শব্দব্রহ্ম ইহার জনক। স্থূল আকাশ হইতে হৃৎপিণ্ড এবং শব্দচৈতন্য হইতে হৃদয় স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা

লাভ করে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের দ্বারা সম্যক্ভাবে পরিরক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইলেও আকাশে বা ব্যোমে ওতপ্রোতভাবে নিমজ্জিত থাকিয়া স্বীয় বিকাশ লাভ করে, সূর্য্য নিজে যে আকাশে স্বীয় বিকাশ ও শক্তি সংগ্রহ করে, পৃথিবীও সেই আকাশ হইতে বিকাশ ও শক্তি সংগ্রহ করে, তদ্রূপ নাভিদেশ দ্বারা হৃৎপিণ্ড চালিত হইলেও আকাশ উহাকে বিকাশশক্তি দিয়া থাকে। কণ্ঠদেশে আকাশতত্ত্বের স্থান। কণ্ঠদেশ হইতে ব্যোম-তত্ত্ব হৃৎপিণ্ডের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের ভিতরকার আকাশ বা শূন্য গহ্বর—যাহা অনবরত রক্তপ্রবাহের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতেছে, সেই শূন্য গহ্বরের এক অপূর্ব্ব শক্তি আছে; সেই শক্তিবলে আমাদিগের প্রাণের ভাবপ্রবাহ রক্তকণাকে এবং পরম্পরা ভাবে সমস্ত দেহকে অনুপ্রাণিত করিয়া যথাযথভাবে সংঘটিত হইতে অবসর বা আশ্রয় দেয়। জীবের স্ব স্ব ধর্ম্ম বা প্রকৃতি অনুযায়ী যে দেহ গঠিত হয়, এই আকাশই তাহার সাক্ষাৎ কারণ।

তায় পর ভাব। ভাবগুলির উৎপত্তি শব্দ হইতে এবং বাহ্য প্রকাশ ও বাহ্য শব্দরূপে বা বাক্যরূপে। শব্দ হইতে ভাব উৎপত্তি লাভ করিয়া হৃদয় গঠিত করে। হৃদয় ভাবসমষ্টি মাত্র। ভাব শব্দসমষ্টি মাত্র। শব্দশূন্য ভাব হইতে পারে না। আবার সেই ভাবব্যঞ্জনার উৎপত্তিস্থান কণ্ঠ বা বিশুদ্ধ চক্র। সুতরাং কণ্ঠের উপর হৃদয়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

শব্দ না হইলে ভাব জন্মায় না। আগে শব্দ, তার পর ভাব। তুমি যত প্রকারের অর্থযুক্ত শব্দ জান, যদি সেইগুলিকে ভুলিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার ভাবরূপ কোন উপলব্ধি থাকিবে না, তোমার হৃদয় থাকিবে না। আধুনিক বিজ্ঞান যাহাই বলুক, আমরা জানি—আগে শব্দের উৎপত্তি, তার পর ভাবের, তার পর পদার্থের উৎপত্তি হয়। বৃক্ষ বলিলে যে পদার্থটি বুঝায়, অনেকে হয় ত মনে করেন, ঐ পদার্থ দর্শন ও উহাকে অনুভব করিয়া জীবভাষা উহাকে বৃক্ষ আখ্যা দিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আগে বৃক্ষ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তার পর বৃক্ষরূপ একটি ভাবের, তার পর বৃক্ষের—ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি বৃক্ষরূপ শব্দটিরই আগে উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত প্রাণী, অন্ততঃ সমস্ত মনুষ্য বৃক্ষকে বৃক্ষ নামেই অভিহিত করিত। নানা জাতীয় লোক নানা শব্দে বৃক্ষকে যখন অভিহিত করে, তখন অগ্রে পদার্থের উৎপত্তি না হইয়া শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? কিন্তু ব্রহ্মের সৃষ্টি অনুকরণে শব্দের উৎপত্তি যথার্থই অগ্রে হয়; তবে ঠিক, এ “বৃক্ষ”রূপ শব্দটি না হইতে পারে। এমন একটি শব্দ হয়, যাহা বৃক্ষের ভাব সর্ব্বহৃদয়েই ফুটাইয়া তুলে এবং সেই শব্দটি সেই ভাবময় হইয়া নানাজাতীয় জীবের কণ্ঠাদি শব্দোচ্চারণ-যন্ত্রের গঠনের বিভিন্নতাবশতঃ বৃক্ষাদি বিভিন্নরূপ শব্দাকারে প্রকাশ পায় বা উচ্চারিত হয়। 'গো' একটি শব্দ। আমরা একটি গাভী দর্শন করিলে গো শব্দে তাহাকে অভিহিত করি, অন্য জাতীয়

লোক: অন্য প্রকার শব্দে সেই একই পদার্থকে অভিহিত করে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম আমাদিগের ও অন্যজাতীয় মনুষ্যের কণ্ঠে বা বিশুদ্ধ চক্রে একটি সাধারণ শব্দতরঙ্গ রচিত হয়, এবং তাহা প্রকাশ হইবার কালে আমাদিগের যান্ত্রিক তারতম্যবশতঃ 'গো' শব্দাকার গ্রহণ করে। বিশুদ্ধ চক্রে মাতৃ-বেদন বা প্রণবরূপ নাদ আকার গ্রহণ করিয়া অহর্নিশ ধ্বনিত হইতেছে। সেই নাদ মাতৃবেদনেরই সংঘাতের তারতম্যে বিভিন্ন শব্দে বিশেষিত হইয়া বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন পদার্থের জনক হইবার জন্য যে প্রকার শব্দাকার গ্রহণ করে, সেই প্রকার ভাব হৃদয়ে পরিপুষ্ট হয় এবং পরম পদকে আমরা সেই পদার্থরূপে দেখি বা হৃদয়ে অনুভব করি। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, পদার্থ বলিয়া বাহিরে কিছু নাই, পদমাত্র আছে; পদার্থ যথার্থ হৃদয়ে। সেই অর্থ বা পদার্থ বিভিন্ন বিভিন্ন শব্দ-তরঙ্গ মাত্র।

আমরা যখন কোন বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহির হইতে প্রাপ্ত হই, অর্থাৎ যখন কোন তরঙ্গ আসিয়া ইন্দ্রিয়পথ সাহায্যে আমার মনে তরঙ্গ উৎপাদন করে, তখন উহা পূর্ব্বানুভূত তদ্রূপ যে সংস্কার আছে অর্থাৎ পূর্ব্বে উক্ত প্রকারের অথবা উক্ত প্রকারের মত যাহা আমার অনুভূতিতে আসিয়াছিল, সেই সমধর্ম্মীয় তরঙ্গ বা সংস্কারগুলি আকৃষ্ট করে —ইহারই নাম স্মৃতি। আর সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ চক্রে নাদ শব্দাকার রচিত করে ও উক্ত তরঙ্গকে উপাধিযুক্ত করে; উহাকে যেন দেহবান্ করে, উহাকে যেন সৃষ্টি করে। বুদ্ধির সাহায্যে তার পর উহা প্রতিভাত হয়। যতক্ষণ শব্দ সংযোজনা না হয়, ততক্ষণ উহা কোন প্রকারে গ্রাহ্যে আসে না। এই প্রকারে পদার্থ বা অর্থ সৃজন করে বলিয়াই শব্দের নাম ব্রহ্ম এবং শব্দ হইতেই সমস্তের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। শব্দ উজ্জীবিত না হইলে কোন প্রকারে কিছুই আমাদিগের উপলব্ধিতে আসিতে পারিত না। স্মৃতি বা সংস্কারগুলিও শব্দেরই আকারে মনে উদয় হয়। কেন না, সেগুলিও শব্দেরই আকারে গঠিত হইয়াছে। মনঃক্ষেত্রে দর্শন মাত্র হয়, বিকাশ মাত্র প্রাপ্ত হয়; তপোলোকের ধর্ম্ম বিকাশ। সে বিকাশ হইতে সৃষ্টির সূচনা বিশুদ্ধ চক্রের সাহায্যে হয়। সেই জন্য বিশুদ্ধ ব্রহ্মাখ্যেয়। মনে বা ললাটচক্রে বিকাশ, বিশুদ্ধ চক্রে শব্দাকার সৃজন, তার পর বুদ্ধির দ্বারা তাহা সংগৃহীত ও হৃদয়ে ভাবাকারে উদ্বেলিত হওয়ারূপ কার্য্য ঘটে।

যাহা হউক, বিশুদ্ধ চক্রে ওই যে শব্দ প্রকাশ হয়, শব্দ সৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি? এ শব্দ শুধু কি কোন আণবিক পরিণতি মাত্র? তাহা নহে। কণ্ঠ—বেদনের স্থান, জড় ও চৈতন্যের সন্ধিস্থল। জড় ও চৈতন্য বলিয়া সাধারণে যে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বশবর্ত্তী, সেই উভয়বিধ বিজ্ঞানের সম্মিলনস্থান কণ্ঠ। নাদ সেই চৈতন্য-বেদন হইতে সঞ্জাত হইয়া শব্দাকার বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, মায়ের বেদন হইতেই সমস্তের উৎপত্তি। সেই বেদনই বেদাকারে মাতৃনিশ্বাসবৎ প্রবাহিত হয়। এই বেদনই সেই জন্য ব্রহ্মপদবাচ্য। পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টির ইহাই সাক্ষাৎ সর্ব্বপ্রথম বিকার। আবার এই বেদন হইতেই ভাব সৃষ্টি ও অপর দিকে বাহ্যসৃষ্টি হয়। বেদন শব্দাকার

গ্রহণ করিয়া ললাটস্থানে মনোরূপ একটি গণ্ডী রচনা করে। মন বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহা কতকগুলি শব্দসমষ্টি দ্বারাই আমাদিগের গ্রাহ্যে আসে। বস্তুতঃ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মায়ের মনের যে মহাসমুদ্র আছে, আমরা তাহারই অংশমাত্রকে এইরূপ শব্দসমষ্টির দ্বারা চিহ্নিত করিয়া লইয়া "আমার মন" বলিয়া অধিকার করি। কণ্ঠের নিম্নে যেমন বিরাট্ ভৌতিক বিস্তার হইতে আমার ভাবানুযায়ী পরমাণুসমষ্টি সংগ্রহ করিয়া আমার স্থূলদেহ রচনা করি, কণ্ঠের ঊর্দ্ধে তদ্রূপ বিরাট্ মনোবিস্তারের কতকাংশ শব্দসংস্কার দ্বারা চিহ্নিত করিয়া "আমার মনকে" নির্ম্মাণ করি। গঙ্গাপ্রবাহে কোন স্থানে যদি কোন জলজ উদ্ভিদ্ মাথা জাগাইয়া ভাসিয়া থাকে, এবং সেই উদ্ভিদচিহ্নিত স্থানটুকুকে যদি আমরা গঙ্গা বলি, তাহা হইলে "আমাদিগের মনের" ঠিক উপমা হয়। বস্তুতঃ গঙ্গার প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। যে প্রবাহ এ মুহূর্ত্তে আমার ওই উদ্ভিদ্গুলিকে বিধৌত করিয়া বহিয়া যায়, পর মুহূর্ত্তে সে প্রবাহ যেমন আর সেখানে থাকে না, তাহার স্থান অন্য জলস্রোত দ্বারা পরিপূরিত হয়, অন্য জলরাশি আসিয়া সে স্থান অধিকার করে, অথচ যেমন গঙ্গার অভাব সেখানে এক মুহূর্ত্তও হয় না, তদ্রূপ আমার শব্দাত্মক সংস্কারগুলি ধরিয়া আমি দাঁড়াইয়া আছি, বিরাট্ মনঃপ্রবাহ সেগুলির অঙ্গ বিধৌত করিয়া বহিয়া চলিয়া যাইতেছে; অথচ আমি মনের অভাব কখনও বুঝিতে পারিতেছি না। আমার অধিকার অনবরতই মনোময় হইয়া রহিয়াছে। উদ্ভিদের পত্রাবলীর মত আমার সংস্কারগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ডুবিয়া ভাসিয়া, সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে আন্দোলিত হইয়া "আমার মনের" চঞ্চলত্বের পরিচয় দিতেছে। মন স্থির করা অর্থে এই সংস্কারগুলিকে স্থির করা। নতুবা মনকে ধরিবার সাধ্য একমাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী ব্যতীত জীবের নাই। জীব মনে ডুবিতে পারে, মনে বিলীন হইতে পারে, সাগরে চিরতরে শান্তি-শয্যা লাভ করিতে পারে, কিন্তু জীবত্ব থাকিতে মনের বিরাট্ প্রবাহ রোধ করিতে সমর্থ হয় না। সমাধি আদি অবস্থায় বিরাট্ মন স্থির হয় না, মনের উপর ভাসমান সংস্কারগুলি ডুবিয়া স্থির হইয়া "আমার মন" স্থির হয় মাত্র। মনের বৃত্তিগুলি আর কিছুই নহে, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার-প্রবাহ মাত্র। স্থূলদেহ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। আমরা ভৌতিক পরমাণুসমুদ্রে নিমগ্ন। নিজ সংস্কার অনুসারে, তাহাদিগের উপর যে যে প্রকারের বিস্তার লাভ করিয়াছি, সেই সেই প্রকারের পরমাণুসমষ্টি আমার দেহ বলিয়া অধিকার করিতেছি। মনের ব্যাপারের মত এ ক্ষেত্রেও নূতন নূতন পরমাণুপুঞ্জের দ্বারা স্বীয় দেহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছি, গঙ্গাপ্রবাহের মত ভূত-সমুদ্র বহিয়া চলিয়াছে, আমার দেহ-সংস্কার তাহাতেই ভাসমান থাকিয়া আমার দেহরূপ একটি গণ্ডী রচনা করিতেছে; অথচ এ আণবিক পরিবর্ত্তনপ্রবাহ বুঝিতে পারিতেছি না; যোগী হইলে এই সব তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্তরূপে শব্দ দ্বারা মনকে লাভ করিতেছি। মন হইতে ইন্দ্রিয়-

সকল প্রস্তুত হইতেছে, পরিপুষ্ট হইতেছে। ইন্দ্রিয়-সকল প্রস্তুত হইতেছে বলিলে এই বুঝায় যে, বিরাট্ মাকে আমরা স্ফুটতররূপে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইতেছি। তাহার প্রতিদানে সেই বিরাট্ মা আবার আমাদিগের ইন্দ্রিয় সাহায্যে আমার আমিত্বের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া সংস্কার আকারে "আমিত্বের গণ্ডী" বাড়াইয়া দিতেছেন, আমায় বৃহত্তর করিয়া তুলিতেছেন বা বড় আমি হইয়া আপনি আমায় সাজাইতেছেন; চৈতন্যসাগরের অনেকটা দূর অবধি আমার সংস্কারের দ্বারা আবৃত হইয়া যাইতেছে, আমি যেন বৃহত্তম বা ক্রমশঃ ব্রহ্ম হইতেছি। আমি বৃহৎ হইতেছি অর্থে কতকগুলি সংস্কারপুঞ্জ ক্রমে বহু বহু সংস্কারে বর্দ্ধিত হইয়া, আবার সেইগুলি বহুদিন একত্রে বদ্ধ থাকায় বহুত্ব ছাড়িয়া এক "আমিত্বের" সংস্কারে পরিণত হইয়া, চৈতন্য-সমুদ্রের অনেক দূর অবধি বিস্তার লাভ করিতেছে, ঘেরিয়া ফেলিতেছে। জলের উপর যেমন জলজ উদ্ভিদ্-সকল দল বাঁধিয়া যায় ও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও পুঞ্জীভূত হইয়া ভাসমান দ্বীপে পরিণত হইয়া জল ছাইয়া ফেলে, ইহাও প্রায় তদ্রূপ। তবে দল-গঠিত এ দ্বীপ যেমন জল হইতে সম্পূর্ণ বিধর্ম্মী, আগাদিগের আমিত্বের প্রসার বৃদ্ধি সেরূপ নহে। প্রথম অবস্থায় ঠিক সেইরূপ হইলেও, তামস ও ও রাজসিক পরিবর্দ্ধন ঘুচিয়া যখন সাত্ত্বিক পরিবর্দ্ধন ঘটিতে থাকে, তখন উহা বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে আবার চৈতন্য-ধর্ম্ম বা যে সাগরে উৎপন্ন, সেই সাগরের ধর্ম্ম লাভ করিতে থাকে। সত্য—অমৃত—আবার সত্যে—অমৃতে পরিণত হইতে থাকে।

কিন্তু কি বলিতেছিলাম। বেদন হইতে এক দিকে ভৌতিক অধিকার, অন্য দিকে চেতন্ অধিকার এইরূপে আমরা লাভ করিতেছি। তাই বলিতেছিলাম, এই কণ্ঠদেশ জড় ও চৈতন্যের সন্ধিস্থল। কণ্ঠের নিম্নভাগে ভৌতিক অধিকার, ভৌতিক শৃঙ্খলা ও শক্তি এবং কণ্ঠের উপরিভাগে আত্মিক অধিকার ও শক্তি; সেই ভৌতিক অধিকার ও শক্তির সহিত ব্যবহার করিতে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও ঊর্দ্ধে সেই আত্মিক অধিকার ও শক্তির সহিত সম্বন্ধ বাঁধিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়-সকল প্রতিষ্ঠিত। যত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান কণ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধভাগে, যত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্থান কণ্ঠ হইতে নিম্নভাগে; অবশ্য ত্বক্‌রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় নিম্নেও আছে, কিন্তু ত্বকের ধর্ম্ম যে স্পর্শসুখ, তাহা সর্ব্বাঙ্গীন হইলেও মুখেই উহা প্রধানভাবে কার্য্যকারী। চুম্বনই স্পর্শধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান প্রধান। উহা কণ্ঠের উর্দ্ধে ই অবশ্য সংসাধিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, আবার ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগে সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে মস্তিষ্ক ও চক্র-সকল শিরোদেশ হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত এক শৃঙ্খল আকারে গঠিত হইয়া রহিয়াছে ও সেই বেদন সর্ব্বত্র এই চক্রাদি অবলম্বনে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

তাহা হইলে আমরা স্থূলতঃ বুঝিলাম, শব্দ হইতে বা শব্দব্রহ্ম হইতে বা বেদন হইতে বা বেদ হইতে এক দিকে ভৌতিক সৃষ্টি বা ভৌতিক বিকাশ ও অন্য দিকে আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্পাদিত হইতেছে। আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্বন্ধে মন পর্য্যন্ত বলিয়াছি, বিশেষভাবে বুদ্ধি বা বিজ্ঞান ও আনন্দের কথা বলিলাম না; উপস্থিত আমাদিগের

বক্তব্য বিষয় হইতে তাহা হইলে বহু দূরে গিয়া পড়িতে হয়। বুদ্ধি সম্বন্ধে বলিবার সময় বিশদভাবে বলিব।

আর একটি কথা বলিয়া রাখি। কণ্ঠদেশ এইরূপে জড় ও চৈতন্যরাজ্যের সন্ধিস্থল বলিয়াই আমাদিগের শাস্ত্রে শক্তিপূজাদিতে যে পশু বলির ব্যবস্থা আছে, তাহার নিয়ম —কণ্ঠদেশ ছেদন। চৈতন্যকে জড়ত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার নিদর্শনস্বরূপ কণ্ঠদেশে পশু ছেদিত হইয়া থাকে। নতুবা হত্যা করিবার জন্য হইলে অন্য প্রকারে সহজে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যাইত।

যাহা হউক, এই যে ব্রহ্ম, বেদ, বেদন, শব্দ, চৈতন্য, ইহা অক্ষর হইতে উদ্ভূত। অক্ষর—মা। বেদন ক্ষরিত হয়, কিন্তু মা—অক্ষরা। ললাটের আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে এই অক্ষর বিকাশের স্থান। আজ্ঞাচক্র দ্বিদল। পূর্ব্বে যে ভূত ও চৈতন্যশক্তির কথা বলা হইল, উভয় শক্তিরূপে বেদন বা আকাশতত্ত্ব আসিয়া এই স্থলে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ললাটক্ষেত্র তপোলোক। বিকাশই এ স্থলের ধর্ম্ম। বাহির হইতে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যাহা কিছু আসে, সে সমস্ত এই মনোময় ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কণ্ঠস্থ চক্রের শব্দ-তন্মাত্রা আসিয়া তাহাতে সংলিপ্ত হইলে তবে উহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু আমাদিগের মনে প্রবিষ্ট হয়, মা যেমন সন্তানমাত্রকে বক্ষে ধরিবার জন্য লালায়িতা, তেমনি লালায়িত হইয়া কণ্ঠ হইতে শব্দাকারে মাতৃবেদন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া ধরে এবং তখন বিকাশ লাভ করে ও আমরা মনের দ্বারা উহাকে অনুভব করি। মনোময় ক্ষেত্র বা তপোলোকের ধর্ম্মই যদিও বিকাশ, তথাপি বিকাশ করিবার পদার্থ না পাইলে ও তাহাতে সে শক্তি প্রতিফলিত না হইলে, ওই বিকাশকে বুঝিতে পারা যায় না। যেমন সূর্য্যকিরণ ও জ্যোতি পৃথিবীতে বা পদার্থে পদার্থে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় বলিয়া আমরা উহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি, তদ্রূপ আজ্ঞাচক্রের বিকাশধর্ম্মও পদার্থের সাহায্যে তবে অনুভূত হয়; কিন্তু যোগী হইলে পদার্থের সাহায্য না লইলেও ঐ বিকাশ স্বতঃ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। এই বিকাশই মাতৃসত্তার জ্বলন্ত আভাস বা স্থূল হিসাবে মাতৃসত্তা। স্থূল জগৎ বলিয়া যাহা বুঝি, তাহার ইহাই আধারক্ষেত্র ও কারণ। ইহাই অক্ষর-পদবাচ্য চিদাকাশ।

এই ক্ষেত্রের উপর অহর্নিশ আমাদিগের বাহ্য জগৎ পরিস্ফুট হইয়া ভোগ হইতেছে। বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে এই বিকাশ-ক্ষেত্রের উপর যেমন লোকনিচয় প্রতিষ্ঠিত—ফুটিতেছে, থাকিতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে, আমাদিগের দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে লোকসকল বা পদার্থসকল বা বিষয়সকল তদ্রূপ জন্মিতেছে, থাকিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড বলিতে ব্রহ্মের এই আজ্ঞাক্ষেত্রের ছবি-সকলকে বুঝায়। আমাদিগের এ আজ্ঞা বা তপঃক্ষেত্রে যেমন বিষয়সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিম্বিত হইয়া স্থূলরূপে বাহিরে ও অন্তরে দিক্ ও কাল ব্যবধানযুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়, ব্রহ্মেরও তদ্রূপ এ বিরাট্

জগৎ। তবে প্রভেদ এই, আমি যাহা যেরূপ দেখি বা অনুভব করি, আমার মনঃক্ষেত্রে যাহা স্ফুরিত, বিকশিত, অনুভূত হয়, তাহা আমি ছাড়া অন্যের উপলব্ধিতে আসে না, আমার মনের ছবি মাত্র আমিই পরিদর্শন করিতে পারি, অথবা আমি মনে যে সঙ্কল্প করি, তাহা স্থূলস্বরূপে পরিগ্রহণ করিতে সাধারণতঃ অন্য কেহ পারে না, কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্কল্প, ব্রহ্মের অনুভূতি, ব্রহ্মের বিকাশক্ষেত্রের ছবি জীবসকলের চক্ষে স্থূল আকারে পরিদৃষ্ট হয়, সকলের উপলব্ধিযোগ্য হইয়া পড়ে; স্থূল জগৎরূপে প্রতিভাত হয়। বিরাট্ ব্রহ্মের সঙ্কল্পের প্রগাঢ়তাই ইহার কারণ। মুক্ত হইলে ইহা জীবেরও অধিকারে আসে। আমাদিগের সঙ্কল্প, আমাদিগের অনুভূতি তত ঘন নহে বলিয়া উহা ভাবাত্মকই প্রায় থাকিয়া যায়, জড়াত্মক হইতে পারে না। আমার জগৎসংস্কার আমার ভোগ্য, ব্রহ্মের সংস্কার জীবেরও ভোগ্য। অথবা জীবও তাঁহার সংস্কার মাত্র। এ পার্থক্য শুধু অধিকারের তারতম্য।

যাহা হউক, এ তপঃক্ষেত্রে—আমার বা বিরাট্ ব্রহ্মের অধিকৃত বিকাশক্ষেত্রে বিষয়সকল অনবরত ফুটিতেছে। যেখানে বিকাশ যত অধিক, সেইখানে এ বিষয় সৃজনও তত অধিক; মনের চঞ্চলতা তত অদমনীয়। চাঞ্চল্যের দ্বারা বিকাশ বার বার আমাদিগের উপলব্ধিতে আসিয়া শেষ যখন আমরা বিনা পদার্থের সাহায্যেও বিকাশ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, তখন মনের এ চঞ্চলতা কমিবে। মনের চাঞ্চল্য ঘুচিতে অনেক সময় লাগে। মন বড় চঞ্চল, কিছুতেই মন স্থির হয় না, ধ্যানাদিতে অভিনিবিষ্ট হইতে পারা যায় না, সাধনা এই মনের দোষেই হইতেছে না, অনেক সময়ে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বস্তুতঃ মন এইরূপ চঞ্চল না হইলে সাধারণ অবস্থার জীবের গতি কি হইত, তাহা আমরা বুঝিয়া দেখি না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনে যাহা একবার বিম্বিত হয়, তাহা আর সহজে অপসৃত হয় না; বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা ছবির মত সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে বিষয় যত অধিক বার বিম্বিত হইয়াছে, তাহা ততই ঘন ঘন উদিত হয়। মন যদি এইরূপ চঞ্চল ভাবে সংস্কাররাশিকে ঘুরাইয়া না তুলিত, তাহা হইলে সাধারণ অবস্থায় জীব চৈতন্য হারাইত; নিদ্রার মত অথবা তাহা অপেক্ষাও গভীরতর তমসাচ্ছন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইত। স্থির ভাবে কোন বিষয়ে মনকে অভিনিবিষ্ট করিতে গেলে সচরাচর জীবের নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বালকেরা, এমন কি, বয়স্ক লোকেও কোন পুস্তকাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই অমনি নিদ্রা আসিয়া চাপিয়া ধরে; ভগবান্‌কে আরাধনা করিতে বসিলে একটু চিত্ত স্থির হইবামাত্র অমনি নিদ্রার আবেশে সাধারণ জীবকে ছাইয়া ফেলে। ইহা হইতে এই বুঝিতে হইবে, সে সকল ক্ষেত্রে বিকাশশক্তি বা চৈতন্য এখনও এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই যে, বিষয়ের প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত হইতে না পাইলেও বিকাশময় থাকে। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রতিঘাত ও তজ্জনিত জ্যোতির চঞ্চলতা হ্রাস হইলেই অমনি তমঃ

আসিয়া আবৃত করিয়া ফেলে। তবেই মনের চঞ্চলতা সাধারণ অবস্থায় তোমার চৈতন্য-বিকাশের অন্তরায় নহে, সাহায্যকারী—এ কথা যেন বিশেষভাবে স্মরণ থাকে। ইহা ব্যতীত মনের চাঞ্চল্য আর এক প্রকারে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মন যদি চঞ্চল না হইত, তাহা হইলে বিষয়-সকল পরিগ্রহণ করিবার জন্য আমাদিগকে অতিরিক্ত বেগ পাইতে হইত। একটি বিষয় অনুভূত হইবার পর আবার অন্য বিষয় পরিগ্রহণের জন্য পূর্ব্ববিষয় অতি কষ্টে অপহৃত করিয়া তবে নবাগত বিষয়ের অনুভূতি লাভ করিতে হইত। একটি শোককর ঘটনা অথবা একটি সুখময় অনুভূতি লইয়াই হয় ত কত কাল ভোগ আস্বাদন করিতে হইত। ইহা কিরূপ বিরক্তিকর, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভগবান্ ছাড়া এমন বিষয় নাই, যাহা চির নূতন ভাবে, চির মধুময় ভাবে প্রাণকে মত্ত করিয়া রাখিতে পারে। সুতরাং ভগবদ্ভাব যত দিন প্রাণে স্ফুরিত না হয়, ভগবদ্ভাবানুভূতির জন্য প্রাণ যত দিন না কাতর হয়, তত দিন মনের এ চাঞ্চল্যের সাহায্যকারিতা কত গুরুতর, ইহা বুঝা যায়। তার পর বিষয়ানুভূতির স্পৃহা যে সময়ে জীবের প্রাণ হইতে মুছিয়া যাইতে আরম্ভ হয় এবং ভগবদনুভূতির জন্য প্রাণ ব্যস্ত হয়, তখন এ চাঞ্চল্যকে অনেকে বড়ই অনিষ্টকারী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ এই চাঞ্চল্যই তখন আবার সর্ব্বপ্রধান সহায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনের চঞ্চলতা না থাকিলে মন জড়ভাবাপন্ন হইলে, পূর্ব্বের বিষয়সংস্কার-সকলকে দূরে সরাইয়া, তাহাদিগের স্থলে ভগবৎ-সংস্কার প্রতিষ্ঠা করিতে কত কাল ব্যয়িত হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু কি অপূর্ব্ব কৌশল! আমরা জানি, মনে যাহা একবার অঙ্কিত হয়, তাহা আবার ফিরিয়া অনুভূতিতে আসিবেই আসিবে। সুতরাং ভগবদনুভূতিরূপ বিষয়টি একবার মনে বিম্বিত করিলে উহা নিশ্চয়ই আবার ঘুরিয়া আপনি আসিবে; আমায় আর চেষ্টা করিতেও হইবে না। এক বার, দুই বার, চারি বার এইরূপ করিয়া অভ্যাস একটু ঘন করিয়া লইলেই মন ওই জিনিষটা দ্রুতভাবে বহিয়া লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তুমি চেষ্টা না করিলেও ভগবদ্বিম্ব আপনা হইতে তোমার প্রাণে ফুটিতে থাকিবে। বিষয়-সকলের বেলায় যেমন ঘটিত বা ঘটে অর্থাৎ ইচ্ছা না করিলেও যেমন উহারা স্বতঃ মনে আসিয়া দেখা দেয়, সেই ভাবে ভগবদ্বিষয়ও স্বতঃ মনে আসিয়া পড়িবে। মনের চাঞ্চল্যই তোমার অনুকূলতা করিবে। তার পর ভগবদ্ভাবের সাত্ত্বিক বিকাশধর্ম্ম উহাকে দৃঢ় প্রকাশশীল করিবে; চঞ্চল না হইয়াও চৈতন্যময় থাকিতে পারে, এইরূপ অবস্থায় ক্রমশঃ মন যত আসিতে থাকিবে, ততই স্থিরতা লাভ করিবে।

তাই বলি, মন চঞ্চল বলিয়া দুঃখিত বা ভগ্নহৃদয় হইও না। বরং এমন সুবিধা মা তোমাকে দিয়াছেন ভাবিয়া আনন্দময়—আশ্বাসময় হও।

যাহা হউক, আমরা বিরাট্ যজ্ঞ বা বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মচক্র এবং ব্যষ্টি বা ক্ষুদ্র মনুষ্য-দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মচক্র—এই উভয় দিক্ বিচার করিয়া দেখিলাম, অক্ষর ব্রহ্ম

হইতে কি প্রকারে সমস্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে ও কার্য্যব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম সমস্ত কর্ম্মে বা যজ্ঞে কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কণ্ঠদেশ সগুণ ব্রহ্ম বা বেদের প্রকাশস্থান। উহা কি প্রকারে ঊর্দ্ধ চৈতন্য-রাজ্যে এবং নিম্নে জড়-রাজ্যে ধাবিত হইয়া কর্ম্ম সূচনা করান, তাহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। নাদ কণ্ঠস্থ হইয়া সর্ব্বক্ষেত্রে আসিতেছে, এবং সেই জন্য ভূত হইতে চৈতন্য অবধি সর্ব্বক্ষেত্রে বেদনরূপে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। প্রণবনাদই সমস্ত শব্দের মূল। আবার এ জগৎ শব্দের দ্বারাই রচিত ও পরিচালিত। এই নাদই চৈতন্যের প্রথম অভিব্যক্তি। শব্দ চৈতন্যময়, শব্দই চৈতন্য বহন করে—পরিস্ফুটিত করে। এই জন্যই চৈতন্যের এই শব্দদেহকে চৈতন্যস্বরূপ বুঝিয়া তাঁহার সাধনা করা হয়।

আর একটি প্রধান কথা বলিলেই এ ব্রহ্ম-যজ্ঞের কথা বিশদভাবে বলা হয়। মনুষ্যদেহে এই ব্রহ্ম-যজ্ঞের কেন্দ্র—নাভিস্থল। বিরাট্ জগতে ইহার কেন্দ্র—সূর্য্য। এই কেন্দ্র হইতেই অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী কর্ম্মসকল সম্পাদিত হয়। এই কেন্দ্র হইতে শক্তি লাভ করিয়া আমরা বাহ্য জগতে ভোগ ও কর্ম্মময় হইয়া থাকি। আবার অন্তর্জ্জগতে যাইতে হইলে এই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। বহির্জ্জগতের সূর্য্যের সহিত ইহার একান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়া নাভিস্থলের অন্য নাম সৌরকেন্দ্র। এই কেন্দ্রত্বটুকু লক্ষ্য করাইবার জন্য ভগবান্ মূল শ্লোকটি ব্যক্ত করিবার সময় সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। শ্লোকটির রচনা-প্রণালী দেখিলেই উহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। “অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি” হইতে “যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জ্জন্যঃ” পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নের স্তর বা ভিতর হইতে বাহিরের স্তর লক্ষ্য করা হইয়াছে। এবং “যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ, কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি” ইত্যাদি শ্লোকের অবশিষ্ট অংশটুকুতে বাহির হইতে ভিতরের স্তর লক্ষ্য করা হইয়াছে। অন্ন হইতে ভূতসকল, মেঘ হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে মেঘ, এই ভাবে বলিতে বলিতে যজ্ঞস্থলে অর্থাৎ নাভিক্ষেত্রে আসিয়া, তার পর যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে, কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে, এইভাবে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ স্তরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। স্বাধিষ্ঠান হইতে মূলাধার, মণিপুর হইতে স্বাধিষ্ঠান, এই ভাবে নিম্নদিক্ বলিয়া, তার পর ‘‘মণিপুর অনাহত হইতে, অনাহত বিশুদ্ধ হইতে, বিশুদ্ধ আজ্ঞা হইতে” এই ভাবে বলা হইয়াছে। যজ্ঞস্থল বা নাভিক্ষেত্রকে কেন্দ্রস্বরূপ বুঝাইবার উদ্দেশ্য না থাকিলে এইরূপ বিশিষ্টভাবে শ্লোকের রচনা-কৌশল হইত না।

সাধনা করিতে হইলে বা অন্তর্মুখে জীবনগতি ফিরাইতে হইলে প্রথমে এই কেন্দ্র অবলম্বন করিতে হয়। এই কেন্দ্র অবলম্বন না করিয়া সাধনা অবলম্বন করিলে সিদ্ধি লাভ হওয়া দুষ্কর। বহির্জগতের সূর্য্যরূপ কেন্দ্র এবং এই দেহরূপ ক্ষুদ্র জগতের এই নাভিরূপ কেন্দ্র, এই উভয় কেন্দ্রই অন্তর্জগতে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ। এই জন্য আমাদিগের পূজা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার সময় আসনশুদ্ধি করিতে হয়। এই আসনশুদ্ধি

আর কিছুই নহে, বহির্জগতের কেন্দ্রস্বরূপ সূর্য্যকে লক্ষ্য করা ও তাঁহার সহিত নিজ সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করা। আসনশুদ্ধি করিতে আমরা যে মন্ত্র পাঠ করি, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"মা বসুন্ধরে! তুমি লোক-সকলকে ধারণ করিয়া আছ, তুমি বিষ্ণু দ্বারা পরিধৃতা হইয়া রহিয়াছ, তুমি আমাকে নিত্য ধারণ করিয়া থাক, আমার আসনকে পবিত্রতাময় কর।" মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির দ্বারা আমরা পৃথিবীর বক্ষে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছি। বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে চলিয়া যাই না, ইহার কারণ—পৃথিবী-হৃদয়স্থিত মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি মাত্র। পৃথিবী এই মহাশক্তির দ্বারা আমাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া, মহাকেন্দ্র সূর্য্যকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছেন। মা যেমন সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করেন, তেমনই ভাবে পৃথিবী জননী আমাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া মহাকাশ-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে সেই আকাশ-সমুদ্রস্থিত হিরণ্ময় মন্দির সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। বিরাম বিশ্রামহীন গতিতে স্বীয় কক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে আমাদিগকে শক্তি-কেন্দ্রের চারি ধারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। দিবা ও রাত্রি, আলোক ও অন্ধকার, জীবন ও মরণ, সুখ ও দুঃখ, আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে এই উভয়বিধ ভোগ অহর্নিশ লাভ করিতেছি।

মা এই যে পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইহা আবার ঐ মহান্ সূর্য্যদেবতার আকর্ষণ-শক্তি-বলে। মহান্ বিষ্ণুশক্তির কেন্দ্র-স্বরূপ সূর্য্য স্বীয় শক্তিপ্রভাব বিস্তার করিয়া, স্বীয় অঙ্গ বিক্ষিপ্ত গ্রহ উপগ্রহ-সকলকে স্ব স্ব কক্ষে আকৃষ্ট করিয়া স্বীয় প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সেই আকর্ষণশক্তির বলে এই গ্রহদলমালা শক্তিময়ী হইয়া ধীর সংযত গতিতে, স্থির নিয়মিত ভাবে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্যস্থ বিষ্ণু-শক্তিই পৃথিবী-হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া আমাদিগকে আবার পৃথিবীবক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই ভাবে মাতৃস্নেহাকর্ষণ শক্তিরূপিণী হইয়া স্থূল জগতে সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। আমরা শক্তিসাগরের সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্বদ্ধ, সম্পূর্ণভাবে তাহাতে নিমজ্জিত। আমরা শক্তিহীন নহি, শক্তি-সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত নহি। আমাদের এই মহান্ সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া শক্তি সঞ্চার করিবার জন্যই আসনশুদ্ধি করিতে হয়। আসনশুদ্ধিরূপ ক্রিয়া করিবার সময় মহান্ শক্তিধর সূর্য্যদেবতাকে বা মায়ের মহাশক্তির কেন্দ্রকে যথাযথ ভাবে ধ্যান করিতে না পারিলে আসনশুদ্ধি হয় না। শুধু আসনশুদ্ধি কেন, গায়ত্রীরূপে সে মহামায়াকে আরাধনা করিতে হইলেও এই জন্য সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী বলিয়া ভাবিতে হয়। বস্তুতঃ সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য দিয়া মায়ের আমার যে মহাশক্তি স্ফুরিত হইয়া আমাদিগের দেহ, প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গে চৈতন্য সঞ্চার করিতেছে, সেই চৈতন্যশক্তির উপাসনা ও সংগ্রহ করাই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম। সূর্য্যকেন্দ্র দিয়া শুধু জড়শক্তি প্রবাহিতা হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে না, চৈতন্য-শক্তিও ওই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই জন্য সূর্য্যকে আমরা প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জানি।

চৈতন্য হইতে সূচনা করিয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মদায়িনী মহাশক্তির আধার বুঝিয়া আমরা মায়ের ওই কেন্দ্র পূজা করি। শুক্লপথে বা জ্যোতিঃপথে জীবন-গতি ফিরাইতে হইলে এই কেন্দ্রদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতে হয়।

সূর্য্যের এই মহাশক্তি আধুনিক বিজ্ঞানেও স্থির সিদ্ধান্তরূপে পরিগৃহীত। চৈতন্য-শক্তির কথা পূর্ণভাবে এখনও বুঝিতে না পারিলেও উহার মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণশক্তির আবিষ্কার বিজ্ঞান করিয়া লইয়াছে। চৈতন্য সম্বন্ধে বুঝিতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন, আধুনিক বিজ্ঞান সে সাধনা এখনও শিক্ষা করে নাই। আধুনিক বিজ্ঞান নাই বুঝুক, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ইহা অপৌরুষেয় জ্ঞান বা বেদরূপে জানেন এবং ইহার সাধনা করেন।

জীব; যে মুহূর্ত্তে তোমার জীবন অবসাদময় হইয়া উঠিবে, যে মুহূর্ত্তে তুমি আপনাকে শক্তিহীন ভাবিয়া জগতের কর্ত্তব্য পালনে সাধনাক্ষেত্রে অক্ষম বলিয়া বোধ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি এই মহাশক্তিকেন্দ্র সূর্য্যের মধ্য দিয়া মায়ের মুখপানে চাহিও; কিরূপে মা আমার আমাদিগকে কর্ম্মে বা সাধনায় প্রবৃত্ত রাখিবার জন্য বিরাট্ কর্ম্মযজ্ঞ এই সূর্য্যের মধ্য দিয়া সংসাধিত করিতেছেন, সেই কথা হৃদয়ে ফুটাইয়া তুলিও। তুমি নব বলে বলীয়ান্ হইবে, জীবনের সমস্ত অবসাদ বিদূরিত হইবে; তোমার অন্ধকারময়ী জীবন-নিশার অবসান হইবে, নব জ্যোতির্ম্ময় প্রভাতী আলোকে তোমার হৃদয় জাগ্রত হইবে; তুমি তোমার প্রতি কর্ম্ম যজ্ঞ বলিয়া বুঝিয়া, মায়ের কৃত কর্ম্ম মায়ের দিকে ফিরাইতে সক্ষম হইবে। মূলধনহীন ব্যবসায়ী মূলধন পাইলে, যেমন ব্যবসার দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সত্বর সিদ্ধ করিতে পারে, এই অফুরন্ত মূলশক্তি-ধন লাভ করিলে অচিরে স্বীয় অভীষ্ট পূরণে তুমিও তদ্রূপ সমর্থ হইবে। মায়ের নিকট হইতে তোমাতে যে অহর্নিশ অবিরাম শক্তি প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহা বুঝিতে পারিবে; অসীম শক্তি তুমি স্বীয় সাধনরূপ বা কর্ম্মরূপ ব্যবসায়ে নিয়োগ করিতে পারিবে ও মহাফল লাভ করিবে। তোমায় শক্তিহীন বলিয়া আর বিলাপ করিতে হইবে না। তোমার জীবন আলস্যময় না হইয়া কর্ম্মময় হইবে।

এই স্থলে আর একটি কথা বলি। আলস্যপরায়ণ মনুষ্য অনেক সময়ে বলিয়া থাকে, ভগবান্ যাহা করিতেছেন, তাহাই হইতেছে; সুতরাং আমাদিগের আর চেষ্টার কি আছে? তাহাদিগের হৃদয় এখনও তমসাচ্ছন্ন। মা যাহা করিতেছেন, তাহাই হইতেছে—এ মহাজ্ঞান মনুষ্যকে কর্ম্মময় করে, কর্ম্মশূন্য করে না। জীবের যখন যথার্থ ভাবে হৃদয়ে প্রতীতি জন্মে যে, মা যাহা করিতেছেন, তাহাই হইতেছে, তখন সে মাকে কর্ম্মময়ী দেখে ও আপনাকে মহাশক্তির মহাকর্ম্মস্থল বলিয়া বুঝিতে পারে। সে সাধক। সে তখন দেখে, অসীম শক্তি তাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়কে কর্ম্মময় করিতেছে। তবে ভাবনা কিসের? তবে তার হৃদয়ক্ষেত্রে কিসের অভাব থাকিতে পারে? তাহার হৃদয়ে বলরূপে মা রহিয়াছেন; তবে ত তাহার দ্বারা অসম্ভব

সম্ভব হইবে, অথবা অসম্ভব বলিয়া তাহার নিকট কিছু প্রতিভাত হইবে না ; সে যাহা অভিলাষ করিবে, তাহাই ত পরিপূর্ণ হইবে। আমি যাহা করিতেছি, তাহা একটি দুর্ব্বল শক্তিহীন “আমির” কার্য্য নয়, মহাশক্তিময়ী মায়ের কার্য্য। তবে সে শক্তিমুখে বাধা সাধিতে পারে কে ? এই ভাবের উদ্দীপনা তাহার প্রাণে স্ফুরিত থাকিবে। এই উদ্দীপনা যত ঘনীভূত হইবে, তত তাহার অভিলাষ-সকলও ক্ষুদ্র হইতে মহতে পরিণত হইবে এবং অবশেষে স্বীয় অভিলাষ বলিয়া আর কিছু খুঁজিয়া পাইবে না, বিরাট্ অভিলাষে তাহার অভিলাষ মিশাইয়া যাইবে, অনন্ত ব্যাপ্তিতে সে নিজে ছড়াইয়া পড়িবে, শুধু আনন্দময়, সত্য অস্তিত্বময় এক নবীন জীবন সে লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। তখন সে নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিবে। তড়িৎপ্রবাহ স্পর্শ করিয়া কাহারও অঙ্গ যেমন স্থির থাকে না, মা করিতেছেন বুঝিলে তদ্রূপ কেহ আলস্যময় থাকিতে পারে না।

শাস্ত্রের যে জ্ঞান তোমার হৃদয়ে কার্য্যকারী হয় না, সে জ্ঞান লইয়া বাক্যব্যয় করিতে নাই। এই জন্য জ্ঞান—গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়। কোন্ জ্ঞান কোন্ অবস্থার উপযোগী, তাহা না জানিয়া কতকগুলি জ্ঞান-বাক্য সংগৃহীত হইলে তাহা কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনকে একটা যেন বিসদৃশ জটিল ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলে।

যাহা হউক, সর্ব্বশক্তির দ্বার সূর্য্যকে বাহিরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবসাদে অবসাদে স্মরণ করিবে। আবার তোমার দেহের মধ্যে যে নাভিকেন্দ্রের কথা বলিয়াছি, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধনা করিবে। বহির্জগতে সূর্য্য, দেহজগতে নাভিস্থল—একই জিনিষ, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমাদিগের ধ্যানাদি ক্রিয়া সর্ব্বপ্রথম নাভিস্থলেই করিতে হয়। নাভিস্থল উন্মুক্ত না হইলে ঊর্দ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সূর্য্য হইতে শক্তি আমাদিগের দেহে নাভি দিয়া প্রবিষ্ট হয় এবং সেই শক্তি আমাদিগের হৃদয়ের ভাবানুযায়ী চক্রে চক্রে পরিচালিত হয়। অন্তর্মুখী পুরুষের ঊর্দ্ধ চক্রসকল, সাধারণ জীব-সকলের নিম্ন চক্রসকল অধিক পরিমাণে ওই সূর্য্যজ্যোতি প্রাপ্ত হয়। ঊর্দ্ধ চক্রসকলে গুরূপদিষ্ট উপায়ে যাতায়াত করিতে অভ্যস্ত হইলে ঊর্দ্ধ চক্রের পরিপোষণ করান যাইতে পারে। এবং ঊর্দ্ধ চক্রে উক্ত জ্যোতি অধিক পরিমাণে যাইলে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়। সময়ে সময়ে সাধক দেখে, যেন সে ঘন জ্যোতির সমুদ্রে নিমজ্জিত। আর কোথায় কিছু নাই, একমাত্র অতি সত্য স্থির শুভ্র জ্যোতিঃসাগর বিদ্যমান। নাভিদেশের ঊর্দ্ধস্থ চক্র বা কেন্দ্রচতুষ্টয় ব্রহ্মলোকের অন্তর্গত। এই ব্রহ্মলোক-সকলে যাতায়াত করিতে করিতে ব্রহ্মময়ীর মহাশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

মাকে যদি চাহ, তবে সাধক, বাহিরে ও দেহাভ্যন্তরে মাতৃমন্দিরের সূর্য্যরূপ নাভিদ্বারে করাঘাত কর। মা বলিয়া সূর্য্যের দিকে চাহ, মা বলিয়া নাভিস্থলে সূর্য্যজ্ঞানে

লক্ষ্য স্থাপনা কর—অনন্ত শক্তির গুপ্ত ভাণ্ডার প্রকাশ হইয়া পড়িবে। প্রত্যক্ষভাবে এই যে যজ্ঞ বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য সাহায্যে সংঘটিত হইতেছে, ইহা সাধারণ লোকে গ্রাহ্যে না আনিয়া দুরূহ জটিল বুদ্ধির সংঘর্ষণে মাতৃতত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিতে ধাবিত হয়। মাতৃতত্ত্ব দুরূহ সমস্যাময় নহে, সহজ শৈশবীয় সরলতাময়। মনুষ্য-বুদ্ধি সহজ প্রত্যক্ষ কর্ম্মময় সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া জটিল মস্তিষ্কসঞ্জাত ভাবের দ্বারা তাহাকে অন্বেষণ করে; সেই জন্য ভগবৎতত্ত্ব জটিলতাময় বোধ হয়। মনুষ্য, চৈতন্যের উপর যে পরিমাণে বিশ্বাস হারাইয়াছে, সেই পরিমাণে তাহাকে জটিল বুদ্ধিশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। যেমন চক্ষু শক্তিহীন হইলে কাচ সাহায্যে দর্শন করিতে হয়, তদ্রূপ বিশ্বাস শ্লথ হইলেই মস্তিষ্কের সাহায্যের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহার সাহায্য গ্রহণ জগতে গৌরবের সম্পত্তি হইলেও, উহারা সাধনাক্ষেত্রের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাকে বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় না। তোমার চক্ষে যদি উহা বিরূপ ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়, তবে তোমার অভীপ্সিত রূপে প্রতিভাত হইবার জন্য তাহাকে আরাধনা কর; অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র-সকল মাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য রচিত হয় নাই, মাকে পাইয়া তার পর ব্রহ্মাণ্ড যেরূপে সাধকদিগের চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই অভিব্যক্ত করিতে দর্শনশাস্ত্র রচিত।

আবার বলি, বেদ বলেন,—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।" সূর্য্যের দ্বারাই ব্রহ্মজ্যোতি আচ্ছাদিত। সূর্য্যমণ্ডলই ব্রহ্মজ্যোতির স্থূলতম স্তর। দেবশক্তি-সকল বিশ্ব প্রকাশের জন্য এই মহাব্রহ্মমণ্ডলকে ঊর্দ্ধে বহন করিতেছেন। জাতবেদ সূর্য্য সমস্ত দেবশক্তির মূল আধার—বায়ু, বরুণ, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতার প্রাণ; সমস্ত দেবতার একমাত্র আশ্রয় স্থল। সাক্ষাৎ ভাবে এই আবরণ অবলম্বন করিয়া সাধনা কর; তেজ, প্রাণ, অমৃত যথার্থরূপে যদি পাইতে চাহ, যদি সুস্থ কায়, প্রশান্ত মন, নির্ম্মল জ্ঞান, উদার প্রাণ পাইতে ইচ্ছা কর ও যদি সর্ব্বত্র মাতৃঅস্তিত্ব ফুটাইয়া সাধনা করিতে অক্ষম হও, তবে প্রত্যক্ষ এই মাতৃআসন লক্ষ্য করিয়া সাধনার সূচনা কর। অতি সত্বর তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া আপনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইবে।

যজ্ঞ-চক্রের কথা বলা হইল। নাভি বেষ্টন করিয়া চক্র বিঘূর্ণিত হয়; এই নাভি বা সূর্য্য বেষ্টন করিয়া তেমনই সৃষ্টিচক্র ঘূর্ণিত হইতেছে। বিরাট্ হইতে ক্ষুদ্রে, ক্ষুদ্র হইতে বিরাটে মাতৃস্নেহের সংক্রমণ প্রতিনিয়ত চলিতেছে। মা হইতে সন্তানে, সন্তান হইতে মায়ের এ স্রোত প্রবাহিত। জড়ে যেমন চলিয়াছে, চৈতন্যেও ঠিক তেমনই চলিয়াছে। অনেকে মনে করেন, সাধারণ মনুষ্য-জীবনে যে সমস্ত কার্য্য ও ভাব অহর্নিশ স্ফুরিত, সেগুলি সব যেন বৃথা, যেন সে মাতৃউদ্দেশ্যের অন্তর্গত ঘটনাবলী নহে, সাধারণ

মনুষ্য-জীবনগতি যেন একটি পণ্ডশ্রম, যেন পথভ্রান্ত পথিকের বিপথে ভ্রমণ, যেন মাতৃহীন অনাথ সন্তানের হতাশপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস, যেন স্বামিবিতাড়িতা কুলটা স্ত্রীর বিভীষণ মর্ম্মদাহময় নির্জ্জন অরণ্যবাস।

বস্তুতঃ তাহা নহে। এরূপ উপলব্ধি হইবার কারণ, আমরা এই বিরাট্ স্নেহচক্রের আবর্ত্তন লক্ষ্য করি না বলিয়া; আমরা আমাদিগের জীবনগতি যে মায়ের দ্বারা নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা ভাবি না বলিয়া। মোট কথা, মায়ের অস্তিত্বটিকে একটি অস্তিত্বের মধ্যেই ধর্ত্তব্য করি না বলিয়া। অবশ্য ইহা মাতৃইচ্ছার অনুরূপেই সংঘটিত হইতেছে; সুতরাং ইহাও অকৃতকার্য্যতা নহে। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তিতার পরই মায়ের দিকে লক্ষ্য পড়ে এবং মায়ের এই স্নেহের কথা প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিতে থাকে। এবং তখন জীব বুঝিতে পারে, সাধারণ অবস্থার সাধারণ কার্য্যসকল ও ভাবসকলও মাতৃস্নেহের পুনঃ মাতৃমুখে প্রত্যাবর্ত্তন মাত্র। ব্রহ্মময়ী হইতে নামিয়া যাহা স্থূলে আসিয়াছে,—তমোময় বিশ্বভোগ রচনা করিয়াছে, তাহাই আবার মাতৃমুখে ছুটিবার হেতু।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬

হে পার্থ! এবং পরমেশ্বরবেদনাখ্যব্রহ্মণঃ ভাবরূপকর্ম্মাণি, ততো যজ্ঞস্ততঃ পর্জ্জন্যস্ততোঽন্নং ততো ভূতানি, ভূতানাং পুনঃ তথৈব ভাবরূপকর্ম্মাণি ততঃ যজ্ঞ ইত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো ন অনুবর্ত্তয়তি অনুতিষ্ঠতি, অঘায়ুঃ পাপজীবন ইন্দ্রিয়ারামঃ ইন্দ্রিয়পরায়ণঃ স মোঘং ব্যর্থং জীবতি।

ব্যবহারিক অর্থ—এইরূপ প্রবর্ত্তিত যজ্ঞ বা কর্ম্মচক্র যে অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপজীবন সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে।

যৌগিক অর্থ—ব্রহ্ম হইতে ভাবরূপ কর্ম্ম, ভাব হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে ভূত, ইহার অনুবর্ত্তনে আবার ভূত হইতে ভগবদ্‌ভাব, ভগবদ্‌ভাব হইতে যজ্ঞ বা ঈশ্বরমুখী আশ্রমোচিত সমস্ত কর্ম্ম, তাহা হইতে শুক্র, তাহা হইতে ভূত। অথবা যেমন আজ্ঞা হইতে বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ হইতে অনাহত, অনাহত হইতে মণিপুর, মণিপুর হইতে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান হইতে মূলাধার, তদ্রূপ আবার মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান হইতে মণিপুর, মণিপুর হইতে অনাহত, অনাহত হইতে বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ হইতে আজ্ঞা, এই নিম্নোর্দ্ধভাবে চক্রবৎ গতি যে না অনুধাবন করে, তাহার জীবন বৃথা।

কর্ম্ম হইতে শুক্র উদ্ভূত হয়। মন বহির্ম্মুখী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে বাহ্য শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় ও শুক্র সঞ্জাত হইয়া থাকে। এই শুক্র বাহ্য বা স্থূল শক্তির আধার—গুরু। আসুরিক শক্তি ইহা হইতে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। এই জন্য শুক্রাচার্য্য অসুর-

কুলের গুরু বলিয়া পুরাণে বর্ণিত। আবার মন ভগবন্মুখী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে তাহা হইতে ধীশক্তি বা চৈতন্যশক্তি পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইহার অন্য নাম দেবশক্তি। ইহার গুরু বৃহস্পতি। মন বা চন্দ্র সাধারণতঃ বহির্মুখী অবস্থার প্রলোভনে মুগ্ধ থাকিয়া এই চৈতন্যশক্তির কার্য্যকারিতা অপহরণ করে ও বাহ্য কর্ম্মে সঙ্গত হয়; ইহাই পুরাণের চন্দ্রের গুরুপত্নী হরণ। ইহা হইতে সাধারণ বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ইত্যাদি সঞ্জাত হয়, যাহার অধিপতি বুধ। ইহারই নাম চন্দ্রের ঔরসে, গুরুপত্নী-গর্ভে বুধের জন্ম। পুরাণে আছে, চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে হরণ ও সম্ভোগ করিয়া, অসুরকুলগুরু শুক্রের শরণাগত হইয়াছিলেন। পরে বৃহস্পতি, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের শরণাগত হওয়ায় তাঁহারা শুক্রাচার্য্যকে চন্দ্র ও তারাকে তন্মুহূর্ত্তে তাঁহাদিগের সম্মুখে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। মহেশ্বর কোপাবিষ্ট হইয়া চন্দ্রকে ধ্বংস করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করায় শুক্রাচার্য্য স্তবস্তুতির দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিলেন। উদারহৃদয় আশুতোষের সমস্ত ক্রোধ দূরীভূত হইল; এবং শরণাগত চন্দ্রকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক অংশ নিজ ললাটে ধারণ করিলেন—অপরাংশ দেবসভার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত রহিল। তারার অভিশাপে চন্দ্র তদবধি ক্ষয়রোগগ্রস্ত। পক্ষে পক্ষে চন্দ্রে যে হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই তারার অভিশাপই তাহার কারণ। মন ধীশক্তিকে অপহরণ করিয়া বহির্মুখে কার্য্যকারী হইলে শুক্র স্থানে শক্তি সঞ্চিত হয়, অর্থাৎ মনঃশক্তি দৈহিক শক্তিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। দেহশক্তির আধার শুক্র; শুক্রই সমস্ত দৈহিক শক্তি-সম্পত্তির মূল। যাহা হউক, ধী বা চৈতন্যের কার্য্যকারী শক্তিকে পুনরায় লাভ করিতে হইলে জীবকে সৃষ্টিশক্তি ও লয়শক্তি বা ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের শরণাগত হইতে হয়। অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট উপায়ে একবার সৃষ্টিমুখে, একবার লয়মুখে,—এইরূপে সাধনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। তাহা হইলে শুক্রের আশ্রয়স্থিত চৈতন্য বা ধীশক্তি পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মনাধিপতি চন্দ্র তখন দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক অংশ লয়রূপ সাধনার শিরোভূষণরূপে শোভা পায়। জ্যোতির অন্তর্গত এই মন সাধকদিগের উপলব্ধিতে আসে। ক্ষয় ও বর্দ্ধনধর্ম্মী অন্য অংশ স্বস্থানে থাকিয়া কার্য্য করে বা সাধারণ মনোময় ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য করে। মনুষ্যের মন কখনও ইচ্ছানুযায়ী সত্ত্ব স্ফুরণশীল, আবার কখনও যেন অবসাদগ্রস্ত জ্যোতিহীনরূপে প্রতীয়মান হয়; উক্ত ক্ষয় ও বর্দ্ধনই উহার কারণ। জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থাও মনের এই ক্ষয় ও বর্দ্ধনরূপ উভয়বিধ গতির লক্ষণ।

মনাধিপতি চন্দ্রের গুরু বৃহস্পতি। মন যখন উর্দ্ধমুখে কার্য্য করে, তখন গুরুপত্নীর সেবক; যখন নিম্নমুখে কার্য্য করে, তখন গুরুপত্নীর অপহারক মাত্র। এই জন্য সাধারণ জীব-জগতের মন কলঙ্কিত, ক্ষয়রোগগ্রস্ত। লয়শক্তির সাধনায় মনকে উর্দ্ধমুখে পরিচালিত করিলে তবে মহেশ্বরের কৃপায় উহা আবার বর্দ্ধনশক্তি লাভ

করিবে। মনের তখন ক্ষয় ও বর্দ্ধন-ধর্ম্ম সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে। মনোময় ক্ষেত্র কখন ক্ষয়যুক্ত, কখন বর্দ্ধনশীল, তাহা মনের অবস্থা পরিদর্শন করিলেও সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

চন্দ্রের এই গুরুপত্নী হরণ গ্রহবিজ্ঞানেও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু উহা আমাদিগের আলোচ্য নহে। আমরা আমাদিগের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইব। হে দেবগুরু চৈতন্য! তোমার ধীশক্তি-রূপিণী পত্নী, তোমার প্রিয় শিষ্য মনের দ্বারা অপহৃতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া কলঙ্কিনীর মত অপদস্থা রহিয়াছে। সৃষ্টির ও লয়শক্তির শরণাগত হইয়া তোমার পত্নীর উদ্ধার সাধন কর; তোমার প্রিয় শিষ্যের উদ্ধার সাধন কর। তুমি শক্তিযুক্ত হইয়া স্বীয় গুরুত্ব রক্ষা কর।

এ কথা এত করিয়া বলিলাম, তাহার প্রধান কারণ, সৃষ্টি ও লয়শক্তির শরণাগত হওয়ার আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য। উর্দ্ধমুখী ও অধোমুখী গতিতে নিজেকে পরিচালিত না করিলে অথবা প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্র অবলম্বন করিয়া জ্ঞানসমুচ্চিত কর্ম্ম দ্বারা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম রক্ষণ ও পরমাত্মতত্ত্বানুশীলন না করিলে অঘায়ু হইয়া থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা নিত্যক্রিয়া করিবার সময় এই অঘ বা পাপ দূর করিবার জন্য অঘমর্ষণ করিয়া থাকেন। সে অঘমর্ষণ এই লয় ও সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তন,—মায়ের আমার সৃষ্টি ও লয়কৌশল অনুধাবন মাত্র। মাকে চিন্তা কর, মায়ের অস্তিত্ব অতি দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে প্রতিফলিত কর; মায়ের দান তোমাতে যে পথপ্রবাহ ধরিয়া আসিতেছে, সেই পথপ্রবাহ ধরিয়া আবার তুমি মায়ের দিকে বিষয় বা পদার্থ-সকল ঘুরাইয়া দাও। যে শক্তিস্রোত যে পথ দিয়া আসিয়া তোমায় মাতৃঅঙ্কে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেই শক্তিস্রোত অনুভব কর ও তাহার শরণাগত হইয়া মায়ের দিকে তোমার শক্তিস্রোত সেই পথে চালিত কর। মা "পুত্র" বলিতে অধীরা, তুমি "মা" বলিতে অধীর হও। বিরাট্ জগৎচক্র, বিরাট্ মাতৃকর্ম্মক্ষেত্র অহর্নিশ প্রাণে ফুটাইয়া তুলিতে থাক। বৃক্ষবৃন্তে পুষ্পসকল সংলগ্ন থাকে, তোমরা মাতৃরূপ বৃক্ষে স্ফুটিত কুসুমের মত সজ্জিত রহিয়াছ, মনুষ্য এ কথা ভুলিও না। তুমি তোমার সৌরভ মাতৃলক্ষ্যে বিকীর্ণ কর; অথবা অন্ততঃ ধারণা কর, তুমি সত্যে সঞ্জাত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্য নিত্য সংযুক্ত, সত্যে ওতপ্রোত ভাবে নিমজ্জিত, সত্যের অপলাপ নাই, তুমি মহাসত্যস্বরূপ। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সত্যপথে চলিয়াছে, সত্য মাত্র স্ফুরণ করিতেছে, সত্যের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া সত্য স্মরণে যেন রোমাঞ্চিত হইয়া সৃষ্টিচক্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে, মাতৃবেদনের কোমল পরশে শিহরিয়া উঠিয়া যেন আনন্দের জাগরণে উল্লসিত হইয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। কেহ বিপথে নাই, কেহ মিথ্যায় নাই—সব সত্য, সব সত্য, সব সত্য ঠিক—নির্ভুল! মা মহাসত্য—তোমারই জয়!

এ কর্ম্মচক্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার দুইটি উপায় বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত সত্য

ধারণায় নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়া বিরাট্ কেন্দ্র সূর্য্যমুখে যে যজ্ঞ সংসাধিত হইতেছে, তাহার চিন্তন ও পুনঃ সূর্য্যমুখেই মাকে আবাহন করা। দ্বিতীয় স্বীয় দেহস্থ চক্রে চক্রে ঊর্দ্ধ ও নিম্নগতির প্রতিষ্ঠা করা—আর ইহার সহকারী আশ্রমধর্ম্ম পালন। এইরূপে মাতৃপ্রেরিত মহাশক্তি লাভ ও পুনরায় মাকে তাহা অর্পণ, এই ভাবাবর্ত্তন অহর্নিশ অনুধাবন কর। তোমার সংসারাশ্রমোচিত সমস্ত কর্ম্ম মায়ের সহিত, মহাবিশ্বকেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া নিষ্পন্ন কর। ইহা না করিলে নিজ স্বরূপ বোধগম্য হইবে না। ইহা করিলে তোমার কোন কার্য্যই ব্যর্থ হইতেছে বলিয়া মনে হইবে না। অপূর্ব্ব সংসারাশ্রমে থাকিয়া ইহার সুবিধা ও সুযোগ পরিগ্রহণ কর। সংসারে যে ভাবে তুমি আত্মত্যাগ কর, যে ভাবে আপনার সমস্ত প্রাণ মন দেহ ঢালিয়া আত্মোৎসর্গ কর, তাহার তুলনা নাই; এরূপ আত্মত্যাগ যথার্থই তুমি করিতেছ। অবশ্য মা স্বীয় ভালবাসার মোহে তোমায় নিমগ্ন করিয়া, তোমায় মায়ায় অভিভূত করিয়া তোমাকে এইরূপ করাইয়া লইতেছেন সত্য, কিন্তু তোমার দ্বারা যে আত্মত্যাগ সংঘটিত হইতেছে, এ কথার ত বিরোধ নাই; সুতরাং বাহ্যিক হিসাবে কার্য্য তোমার ঠিক হইতেছে; অভাব তোমার মনোময় ক্ষেত্রে। তুমি ভাবিতেছ, আমি মোহবদ্ধ—মোহসাগরে নিমজ্জিত, সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপখণ্ডবৎ চারি ধারে মোহ-সলিলে বেষ্টিত, মাতৃভূমি হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন, আমি আশ্রয়হীন, শক্তিহীন, সহায়হীন, দীন, অধঃপতিত কাঙ্গাল, আমি চক্ষুহীন, ভগবদ্ভাবহীন নরাধম, আমার গতি নাই। এরূপ ভাবিও না। এইটুকুই তোমার আর ভাবিবার আবশ্যক নাই। তুমি মা হইতে বিচ্ছিন্নসম্বন্ধ হইও না। সূর্য্যের দ্বারা গ্রহসকল যেমন পরিধৃত থাকিয়া স্ব স্ব কক্ষে তাহারা বিচরণ করে, তদ্রূপ মায়ের দ্বারা পরিধৃত হইয়াই তোমরা স্ব স্ব কক্ষে বিচরণ করিতেছ মাত্র। তোমরা পরের কথায় ভুলিও না। অপর কক্ষে অপরে কি ভাবে ঘুরিতেছে, তাহা দেখিবার তোমার আবশ্যকতা নাই। যে আশ্রমেই যে থাকুক, এবং যে আশ্রমেই যে যত কৃতিত্ব প্রদর্শন করুক, তোমার সংসারাশ্রমের মত জ্বলন্ত ত্যাগের ছবি অন্য কোন আশ্রমে নাই, হইতে পারে না। অন্য আশ্রমে জিনিষই নাই—ত্যাগ করিবে কি? "দরিদ্র যেমন সর্ব্বত্যাগী, অশক্ত তস্কর যেমন সাধু"—অন্য আশ্রমের জীব ত্যাগী বলিলে তদ্রূপ বুঝায়। তোমার অভ্রান্ত মহাত্যাগধর্ম্ম যথার্থই তুমি সংসারে অনুষ্ঠান করিতেছ। তবে ব্রাহ্মণ্যবলে বলীয়ান্ হইয়া তাহা কর। তুমি দেবতাস্বরূপ, তুমি মাতৃশক্তি-সাগরের অংশ, এই ভাব বুকে ধরিয়া থাক। হৃদয়ের ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল কার্য্য-সকল অবধি যাহা কিছু স্ফুরিত হইতেছে, এ সমস্ত যে অনন্ত শক্তি-সাগরের স্ফুরণ, ইহা যে পর্ব্বতান্তর্গত বদ্ধ স্রোতোধারা মাত্র নহে, এই ভাব তুমি হৃদয়ে পোষণ কর। ওই ক্ষুদ্র ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মে সংকীর্ণ ভাবসকল ও তাহা হইতে ওইরূপ সংকীর্ণ ভাবযুক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়-সকল স্ফুরিত হইয়াছে। মনুষ্য

যেন দীন অনাথ, আর ভগবান যেন অনাথের নাথ, যেন কাঁদিয়া তাঁর শরণাগত হইলে তবে তিনি ভালবাসিবেন ও কৃপা করিবেন, সুতরাং এস, তাঁহার শরণাগত হই—ইহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম নহে ; ইহা বৈদিক ধর্ম্ম নহে ; ইহা অপৌরুষেয় ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম তাঁকে পাইবার জন্য কাঁদে না, তাঁহাকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করে ; তাঁহাকে পাইয়া, বুকে চাপিয়া ধরিয়া, আরও পাইবার জন্য কাঁদিয়া আকুল হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম কৃপা প্রেম ভিক্ষা করে না, কৃপা প্রেম অহর্নিশ অনুভব করিয়া, কৃপাময়ী—প্রেমময়ী বলে। স্নেহময় পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া, তবু যেমন মা “কইরে আমার ননীর পুতলি” বলিয়া সোহাগ করিয়া ফেলে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সেইরূপ তাঁহাকে বক্ষে লাভ করিয়া “কই রে” “কই রে” করে। সে বল—সে অপৌরুষেয় অনাদি মাতাপুত্রের বন্ধন খুঁজিয়া না পাইয়া জীব নানা পথে ঘোরে, নানা সঙ্ঘে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তুমি সেই বন্ধন ধরিয়া থাক ; অগাধ বিশ্বাসে ধারণা কর, “আমি মায়ের অঙ্গে যুক্ত, মাতৃশক্তি ও মাতৃইচ্ছার দ্বারা চালিত। যাহা কিছু পাইতেছি, যে কোন কায়িক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অথবা সাংসারিক, সামাজিক অবস্থায় পড়িতেছি, সে সমস্ত দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া নহে—তুফানের তাড়নায় নহে—মাতৃইচ্ছার মঙ্গলময় প্রণোদনে, আপনার সুখ-সন্তরণের পরিতৃপ্তির আবেগে। আমারই ইচ্ছা ; মায়ের ইচ্ছা আমার ইচ্ছারূপে বিম্বিত হইয়াছে ; সর্ব্বজ্ঞা মায়ের সর্ব্বজ্ঞ পুত্র আমি মঙ্গল-পথে চলিয়াছি। ভাল না লাগে, অন্য ইচ্ছা করিব ; আমার শক্তি-ভাণ্ডারের অভাব নাই, আবার অন্য পথে স্বচ্ছন্দে ফিরিব ; আমার অনন্ত জীবন, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, অনন্ত শক্তিসম্পন্না বিশ্বজননী আমার মা! আমার অভাবরূপ ভাব কেন ?

এইরূপ তেজ বুকে বাঁধ। মায়ের সহিত তোমার যে নিত্য সত্য সম্বন্ধ, যাহা তুমি ভুলিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবিতেছ, সেই সম্বন্ধ জাগাইয়া তুল এবং সাহসে আশ্বাসে বিশ্বাসে বলীয়ান্ হইয়া আশ্রম-ধর্ম্ম সম্পাদন কর ; নতুবা যেখানেই যাও—যে আশ্রমেই আশ্রয় গ্রহণ কর, মাত্র ইন্দ্রিয়সেবক, অঘায়ু থাকিয়া যাইবে।

আবার বলি, মা তোমাকে যে মায়া দিতেছেন, তাহাই আবার স্ত্রী পুত্র, মাতা পিতা বন্ধু, সমাজ বিষয় ইত্যাদিরূপে তোমার নিকট হইতে ঘুরাইয়া লইতেছেন, তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। দিতেছেন যে মা, আবার লইতেছেন যে মা, এ কথা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। নাই পার, কিন্তু মা এইরূপ আদান প্রদান করিয়া তোমার শক্তিস্রোতে একটা চক্রবৎ গতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেছেন। আদান প্রদানরূপ কার্য্য অবাধে নিষ্পন্ন হইতেছে এবং হইয়া আসিতেছে। তুমি সেইটুকু ধারণায় ফুটাইয়া লও ও স্বেচ্ছায় আনন্দে সে চক্রের অনুবর্ত্তন করিতে থাক। তুমি যে সর্ব্ববিষয়ে সকল সময়ে একমাত্র মায়ের সহিত আদান প্রদান করিতেছ, ইহা প্রত্যক্ষ কর। জগতের সমস্ত অবস্থার সন্তাপসকল অতি তুচ্ছ, ক্রীড়ামাত্ররূপে প্রতীত হইবে। গোপীরা

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে আনন্দে অধীরা হইয়া উঠিতেছে ; যাহারা হারিতেছে, তাহারাও আনন্দে অধীরা, যাহারা জিতিতেছে, তাহারাও আনন্দে অধীরা। সেইরূপ মায়ের সহিত আদান প্রদান হইতেছে ধারণা করিতে পারিলে, তুমি এ সংসারে দুঃখপেষণেও হাসিয়া অধীর হইবে সুখালিঙ্গনেও হাসিয়া অধীর হইবে। তোমার সর্ব্বাবস্থা হাস্যময়, আনন্দময় হইবে।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

(যদা) তু যঃ মানবঃ আত্মরতিঃ এব আত্মতৃপ্তঃ চ, আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ, (তদা) তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যখন কিন্তু যে মনুষ্য আত্মাতেই রত, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট হইয়া যান, তখন তাঁহার কার্য্য থাকে না।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্র কি চিরদিনই তবে অনুবর্ত্তন করিতে হইবে ? ইহাই কি জীবনের সার্থকতা ? লয় হইতে সৃষ্টিতে, সৃষ্টি হইতে লয়ে, এ যাতায়াত কি অনন্ত কাল করিতে হইবে ? সাধারণতঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন থাকিয়া যাহা করিতেছি, তাহার অনুকরণেই কি আমাদিগের মহাযাত্রা চিরদীর্ঘ রহিবে ? না, তাহা নহে। আমাদিগের জন্ম মৃত্যু আমাদিগকে সাধনার পথ দেখাইয়া দিতেছে মাত্র। মা জীবসঙ্ঘকে জন্ম মৃত্যুর দ্বারা সাধনা করাইতেছেন মাত্র। মা আমাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া জন্ম ও মৃত্যু-চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এইরূপ জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন চৈতন্য উন্মেষিত হয়, যখন নিজ জন্ম-মৃত্যুর উপর্য্যুপরি সংঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে, এ যন্ত্রণার ক্রোড় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, কাঁদিয়া যখন মায়ের পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন সদ্‌গুরু লাভ হয় ; তখন সদ্‌গুরুরূপে মা বলিয়া দেন,—"বৎস ! এই জন্ম-মৃত্যুই তোমার সাধনা ; ইহার দ্বারাই তোমার চৈতন্য উন্মেষিত হইয়াছে, আমি বৃথা কার্য্যে তোমায় এত দিন নিযুক্ত করিয়া রাখি নাই ; এখন জ্ঞান হইয়াছে, এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সাধনা অহর্নিশ করিতে থাক। প্রত্যহ বার বার জাত ও মৃত হও, গুরূপদিষ্ট উপায়ে একবার সৃষ্টিমুখে, একবার লয়মুখে, বার বার এইরূপ যাতায়াত কর। আমি সাধনাতেই তোমায় নিযুক্ত রাখিয়াছি, তুমি সেই সাধনাপথ স্বেচ্ছায় অবলম্বন কর ; এ মরলোকে জন্ম ও মরণরূপ সাধনচক্রে এক এক আবর্ত্তন পরিভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ এক একবার জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যাইয়া যাহা লাভ করিয়া আসিতেছ—যত চৈতন্য উন্মেষিত হইতেছে, রীতিমত করিতে পারিলে, ইহার অনুকরণে সাধনা করিলে প্রত্যহ ততটুকু লাভ করিতে, তত চৈতন্য উন্মেষিত করিতে সক্ষম হইবে। "জন্ম মৃত্যু বৃথা নহে, ইহাই সাধনা।"

জীব তখন বুঝিতে থাকে, বস্তুতঃ জন্ম ও মরণরূপ কঠোর কালাবর্ত্ত আমাদিগের

কল্যাণ সাধনাই করিয়া আসিতেছে ও তখন তদ্রূপ সাধনার অনুকরণ করিতে থাক। ওইরূপ করিতে করিতে এমন অবস্থায় আসিয়া পড়ে, যখন সে এ জন্ম-মৃত্যুস্রোতের মধ্যে নিজের অবিনশ্বর, অপরিণামী, এক অনন্ত সত্তার সন্ধান পায়। সে সত্তা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ; সে সত্তা অমৃতময়, আনন্দময়, নিশ্চিন্ততাময়, সত্য। সে সত্তার বিমল আলোকে সমস্ত ছাইয়া যায়, সমস্ত সে আলোকে প্লাবিত হইয়া আনন্দময়, অমৃতময়, চিরসত্তাময় হইয়া পড়ে। নবীন জাগরণের উল্লাসে জাগ্রত হইয়া, সে অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া আপনার সত্তাকে ভালবাসিতে থাকে। যে আপনাকে লইয়া সে এত দিন বিব্রত হইয়াছিল, যে আপনার সত্তাকে হারাইবার আশঙ্কায় অহর্নিশ চমকিত হইয়া উঠিত ও আপনাকে রাখিবার জন্য কত হাস্যাস্পদরূপে স্থূল সাহায্য সংগ্রহ করিতে ব্যতিব্যস্ত হইত, এখন দেখে, সে সত্তা হারাইবার উপায় নাই ; সে সত্তা মহান, সে সত্তা জগতের আধার—তাহার জগদ্‌জ্ঞানের আধার। মরীচিকার মধ্যে বারি লাভের মত সে যেন মরলোকের ভিতর অমরত্বের আস্বাদ পায়। অকিঞ্চিৎকর বলিয়া আর কিছু প্রতিভাত হয় না। সে সাধক তখন সে অপূর্ব্ব অবস্থায় অহর্নিশ রমণ করিতে থাকে। পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে সে দিবানিশি অন্তরে নিমগ্ন থাকে ; সন্তোষের জন্য আর তাহাকে কোন ভাব বা বিষয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। সুতরাং কার্য্য বলিয়া আর তাহার কিছু থাকে না ; কেন না, ভাবই কার্য্যের উৎপাদক।

ইহাই জন্ম-মৃত্যু-সাধনার সিদ্ধির অবস্থা। আর তাহার সাধনার আবশ্যকতা থাকে না ; সুতরাং জন্ম-মৃত্যু রোধ হইয়া যায়। রতি, তৃপ্তি ও সন্তোষ, এই তিনই সেই একই অবস্থায় এককালীন ভোগে আসে। অর্থাৎ নিজে সে সাধক রতি, তৃপ্তি ও সন্তোষস্বরূপ হইয়া পড়ে। রতি—আসক্তি ; তৃপ্তি—সম্ভোগ ; সন্তোষ—সম্ভোগজনিত তুষ্টি বা আনন্দময় স্থৈর্য্য। রতি, তৃপ্তি ও সন্তোষ, এই তিন শব্দের দ্বারা ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই তিন লক্ষিত হইতেছে। রতি—ভক্তি ; তৃপ্তি—জ্ঞান ; সন্তোষ—কর্ম্ম। সাধারণতঃ আসক্তির ফল রমণ, জ্ঞানের ফল পরিতৃপ্তি, কর্ম্মের ফল সন্তোষ ; এইরূপ কার্য্যকারণ ব্যবধান উহাদিগের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু সে অপূর্ব্ব আত্মমিলন অবস্থায় ব্যবধান ঘুচিয়া আসক্তি নিজেই পূর্ণ রমণ-সুখময়ী, জ্ঞান নিজেই পূর্ণ পরিতৃপ্তিময়, কার্য্য নিজেই পূর্ণ সন্তোষময় হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের চরম পরিণতি, উক্ত তিন আকারে সাধক হৃদয়ে সংসাধিত হয়। সত্ত্বগুণাত্মক আসক্তি, রজোগুণাত্মক তৃপ্তি, তমোগুণাত্মক সন্তোষ, এই তিনই গুণাতীত অবস্থায় আত্মত্ব লাভ করিয়া, রতি-স্বরূপ, তৃপ্তি-স্বরূপ, সন্তোষ-স্বরূপ বা সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ হইয়া যায়।

অনেকে কর্ম্মকে রজোগুণাত্মক বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। সত্ত্বগুণের বিকাশ হইতে আসক্তি বা ভক্তি সঞ্জাত হয় ও রজোগুণ উৎক্ষিপ্ত করে। রজোগুণের চঞ্চলতা জ্ঞান আহরণ করে ; যে বস্তুর জন্য আসক্তি, সেই বস্তুর ভাব-

সকল মথিত করিয়া তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ফুটাইয়া তোলে ; এবং তখন তমোগুণ উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্থূলতম ভাব বা কর্ম্মরূপে প্রকটিত হয়। আমরা যখন কোন বস্তুর কোন ইন্দ্রিয়-বাহিত গুণে মুগ্ধ হই, তখন হৃদয়ে সত্ত্বগুণ সংক্ষুব্ধ হইয়া তাহার লাভের জন্য বিকাশ বা ভাবময় হইয়া পড়ে ; এইরূপে আবার যে পরিমাণে হৃদয় তাহার জন্য বিকশিত, বিস্তৃত হইয়া সে বস্তুর প্রতিষ্ঠার জন্য আসন রচনা করে, সেই পরিমাণে রজোগুণ সংক্ষুব্ধ হইয়া, সেই সকল ভাবকে মন্থন করিতে থাকে ; বার বার সে আলোড়নের ফলস্বরূপ সে পদার্থসম্বন্ধীয় জ্ঞান ফুটিয়া উঠিতে থাকে ; ভিতর ও বাহির হইতে তৎপদার্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ঘনীভূত হইয়া একটা ধারণায় বা স্থূলতর প্রতিষ্ঠায় পরিণত হয়। যে পরিমাণে সে পদার্থ এইরূপে আমার হৃদয় অধিকার করে, সেই পরিমাণে তখন তমোগুণ উদ্বুদ্ধ হইয়া হৃদয়কে তৎপদার্থ সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন বা আত্মহারা করে ; এবং তখন তৎপদার্থ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে কর্ম্মই স্থূলতম অবস্থা বা তমোগুণাত্মক, এবং সাময়িক হইলেও কর্ম্মেই সন্তোষ ভোগ হয়।

একটী কথা। আত্মমিলন অবস্থায় কর্ম্মশূন্যতাই পরম লক্ষণ ; তবে আবার সে অবস্থায় কি কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া চরম সন্তোষরূপে পরিণত হইবে ? কর্ম্মই যদি উৎপাদিত হইবে, তবে নৈষ্কর্ম্ম্য কেমন করিয়া হইল ? তাহার উত্তর—নৈষ্কর্ম্ম্যই সে অবস্থার কর্ম্ম। কর্ম্মহীনভাবে স্বরূপে অবস্থান করারূপ ক্রিয়া তখনকার একমাত্র কর্ম্ম। আমি স্বরূপে বা মাতৃসমুদ্রে অবস্থিত ; ইহাই পরম কর্ম্ম—ইহাই পরম সন্তোষ, ইহার তুলনা নাই। রতি, তৃপ্তি ও সন্তোষ, এই তিনটি ভাব লইয়া একটু বিচার করিলেই এই পার্থক্যগুলি বেশ বুঝা যায়। বলিতে পার, কর্ম্ম—শক্তির চঞ্চলতা না ঘটিলে হইতে পারে না ; তবে কি সে সময়ে শক্তি লীন না থাকিয়া স্ফুরিতা থাকে ? চৈতন্য-শক্তি বিকাশধর্ম্মী। একমাত্র বিকাশ স্ফুরণ সে অবস্থার কর্ম্ম। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি,—মুক্তিও শক্তির অবস্থান্তর মাত্র।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

ইহ কৃতেন কর্ম্মণা তস্য অর্থঃ প্রয়োজনং ন এব (অস্তি), অকৃতেন (কর্ম্মণা) কশ্চন ন (অস্তি)। সর্ব্বভূতেষু অস্য কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয় ন বিদ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—ইহলোকে কৃত কর্ম্মে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, না করাতেও কোন প্রত্যবায় নাই। সর্ব্বভূতে কিছুই তাঁহার আশ্রয়ণীয় নাই।

যৌগিক অর্থ।—আত্মরতিতে আত্মভোলা চির-সন্তোষময় পুরুষের কর্ম্ম হইল, বা হইল না, ইত্যাদি ভাবনা থাকে না। অভাব বোধ হইতেই বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত ; অভাব বোধ হইতেই কর্ম্মে জীবের ভ্রমণ। আত্মারাম উপস্থিত হইলে সে অভাব বোধ আর থাকে না ; সুতরাং "করিব," "করিব না" বলিয়া কোন স্পৃহা বা বিরক্তি সে শুভ্র

চিৎক্ষেত্রকে লাঞ্ছিত করে না। "সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক" ভাবে সে সুখে পরিপূর্ণ—তাহার অভাব জ্ঞান কোথায়? চেতন হইতে জড় জগৎ অবধি ইহার মধ্যে তাহার অবলম্বনীয় কিছু নাই; সে স্বাবলম্বী। মাতৃঅবলম্বন যে পাইয়াছে, তাহার সহায়স্বরূপ আর আশ্রয়ণীয় কি হইতে পারে? সহস্রারের উর্দ্ধে যে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে অক্ষর হইতে ভূলোক বা মূলাধার অবধি কোন চক্রের কোন ক্রিয়ারই আর আবশ্যকতা বুঝিতে পারে না। সে সেই সকল কর্ম্মচক্রে পরিভ্রমণ করিলেও, আত্মারামরূপ একই প্রকার সম্ভোগ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহার অন্য কোন সম্ভোগে আসক্তি আসে না। সমস্তই তখন আনন্দে সংপ্লুত হইয়া যায়, সকল কর্ম্মাশক্তি আপনা হইতে খসিয়া পড়ে।

তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯

তস্মাৎ (আত্মস্বরূপাবস্থায়াং যতঃ আসক্তিঃ ন বিদ্যতে, তস্মাৎ ইতি ভাবঃ) সততং অসক্তঃ (সন্) কার্য্যং (কর্ত্তব্যবিহিতং) কর্ম্ম সমাচর হি যতঃ অসক্তঃ (সন্) কর্ম্ম আচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষম্ আপ্নোতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—সর্ব্বোচ্চতম অবস্থায় কোন বিষয়ে আর আসক্তি থাকে না বলিয়া এখন হইতে অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কর। কেন না, অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিয়াই পুরুষ পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—যাহার জন্য দুই দিন বাদে প্রাণ আর কাতর হইবে না, তাহার জন্য বৃথা আসক্তি রাখিবার প্রয়োজন কি? যাহা দুই দিন পরে উপেক্ষিত হইবে, তাহার ক্ষণস্থায়ী আদর করিয়া লাভ কি? যে সকল কর্ম্মে বা ভাবে আর আগ্রহ থাকিবে না, এখন হইতে তাহা হইতে আগ্রহ উঠাইয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। সেই জন্য কোন কর্ম্মে আসক্তি রাখিও না। তবে সে সকল কর্ম্ম না করিলে যখন নয়, সেই সকল কর্ম্মের দ্বারাই যখন নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে হইবে, তখন অনাসক্ত ভাবে সেই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর। অথবা অনাসক্ত ভাব প্রাপ্তির জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর; কর্ম্মের আচরণের দ্বারাই অনাসক্ত ভাব প্রাপ্ত হইবে।

বস্তুতঃ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা যায় না। পরম পদ লাভ করিবার আসক্তিও থাকে; এবং উহাও আসক্তিপদবাচ্য। মাতৃপদে সম্পূর্ণ আসক্তিযুক্ত হইলেই তবে বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত হওয়া যায়; মাতৃভাবে মোহাচ্ছন্ন হইলে, তবে অন্যান্য মোহসকল বিদূরিত হয়; মাকে ভালবাসিলে তবে অন্য ভালবাসার মায়া তিরোহিত হয়। ইহারই সাধারণ নাম অসক্ত।

চক্রে চক্রে যাতায়াত কর; যত দিন না সহস্রারের উর্দ্ধে স্থিতিলাভে ও তন্ময় হইতে সক্ষম হও, তত দিন কর্ম্ম করিতে থাক; কিন্তু ওইটুকু করিয়াই নিশ্চিন্ত হইও

না। যত দিন না পরম পদ প্রাপ্ত হও, যত দিন না মাতৃঅঙ্কে সংযুক্ত হও, তত দিন চক্রের কোন সিদ্ধিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বা আসক্তি বিজড়িত না করিয়া কর্ম্ম করিতে থাক। এই কর্ম্মে সম্পূর্ণ ভাবে নিমজ্জিত হও। কোন সিদ্ধির আকাঙ্খায় নহে—মায়ের টানে পড়িয়া মায়ের দিকে ছুটিয়া চল। এই গতি তোমার শৈশবের মাতৃক্রোড়, এই গতি তোমার যৌবনের সুখ-বিলাসময় কুঞ্জবন, এই গতি তোমার বার্দ্ধক্যের কল্পবাস। ভুলিও না—ছাড়িও না, আশ্বাস হারাইও না; আপনার কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। সহস্রারের উর্দ্ধে অর্থে সর্ব্ববিজ্ঞানের বাহিরে, ইহা মনে রাখিও।

এইরূপ আবার সাধারণ কর্ম্মপ্রবাহে। আমরা পরের কর্ম্মের অবহেলাসকল সম্যক্ ভাবে পর্য্যালোচনা করি, আমার নিজের কর্ম্মের আলোচনা করি না। আমরা পরের দুঃখ মোচন করিতে পরহিতব্রত গ্রহণ করি, আপনার দুঃখ ঘুচাইবার কোন চেষ্টা করিতে পশ্চাদপদ হই। ঘরের পিতামাতা ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী সাজিয়া, পরের পিতামাতার সেবা করি, এবং ত্যাগী বলিয়া, অসক্ত বলিয়া আত্মঘোষণা করি। এ সমস্ত সঙ্কর উন্মার্গগতি উদ্ভট আবেগ-প্রসূত তামসিক ধর্ম্ম। অনাসক্ত ভাবের গন্ধও ইহাতে নাই। আলস্য-প্রসূত ঔদাস্য ও হতাশের অন্ধকারে নিমগ্ন, দুর্ব্বল ভগবৎসংযোগ-হীন হৃদয় সাধারণতঃ একটু পরদুঃখকাতর হয়; নিজের হৃদয় ভগ্ন বলিয়া অন্যের ভগ্ন হৃদয় দেখিলে সমবেদনায় কাতর হয়; আবার যৌবনকালে যখন সমস্ত মানসিক বৃত্তি সম্যক্ স্ফুরিত ও শক্তিযুক্ত হইয়া বিকশিত হইতে থাকে, সেই সময়ে সাধারণতঃ পরহিতেচ্ছা একটু বিকাশ প্রাপ্ত হয়; যৌবনের নব জাগরণে সংসারের চারি ধারে শুধু স্বার্থপরতার বীভৎস চিত্রসকল যখন মনের উপর প্রতিফলিত হইতে থাকে, যখন স্ফুটনোন্মুখ হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথম মনুষ্যসমাজের সংকীর্ণতার গ্রন্থিসকল প্রতিঘাত করিতে থাকে, সেই সময়ে পরহিত, পরোপকার আদি ভাবসকল হৃদয়গহ্বরে জন্মাইতে থাকে। তাহার সহিত যশোলিপ্সা যুক্ত হইয়া সেই সময়ে মনুষ্যকে পরহিতরত করিয়া তুলিতে থাকে। ক্রমশঃ চারি ধারেই ওইরূপ স্বার্থপরতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও কাহারও উক্ত ভাবসকল সুপ্ত হইয়া পড়ে এবং নিজেও অতিশীঘ্র বিশিষ্টতা হারাইয়া সাধারণ অবস্থায় নিমজ্জিত হইয়া যায়; কেহ বা ওই ভাবসকল লইয়া, অন্যান্য সমস্ত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, সমস্ত কর্ত্তব্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, যশের বা অন্য স্বার্থের মোহে মুগ্ধ হইয়া, জগতে পরোপকারী ধার্ম্মিক বলিয়া অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করে। এবং ইহাই যথার্থ কর্ম্মযোগ বলিয়া ধর্ম্মমত ঘোষণা করে। ইহা ধর্ম্ম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্মের একাংশ প্রতিপালন মাত্র; কর্ম্মযোগের একটী ক্ষুদ্র কাণ্ড মাত্র। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী আত্মীয় প্রভৃতি সাজিয়া যেরূপ আত্মহারা ভাবে, কর্ম্মযোগের এ অংশটুকু সংসারী সাধারণ লোকে নিষ্পন্ন করে, তাহার শতাংশের একাংশ হৃদয় দিয়া ইহারা সহস্র চেষ্টাতেও করিতে পারে না। ইহা ছাড়া কর্ম্মযোগের অন্যান্য শত সহস্র শাখা

প্রশাখা সংসারীকে প্রতিপালন করিতে হয়; সে সকল কর্ত্তব্যের দিক্ হইতে পূর্ব্বোক্ত পরোপকারী নামধেয় পুরুষবৃন্দ ধর্ম্মযুক্তির কুটিল কৌশলজাল বিস্তার করিয়া, আত্মপ্রবঞ্চক হইয়া স্বচ্ছন্দে দূরে অবস্থান করে। সংসারী তুমি, আশ্বাস অবলম্বন কর; ধর্ম্মের বিজয়পতাকা যে যত উড্ডীয়মান করুক, তোমার নীরবে প্রতিপালিত মহাধর্ম্মের তুলনায় সকলেই খর্ব্ব। তুমি শুধু মায়ের সহিত যুক্ত হইয়া, মাতৃভালবাসার উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইয়া, মায়ের সহিত সমস্ত ভাবের আদান প্রদান করিতে করিতে তোমার গুরু কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ কর।

এই অবস্থায় অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমী যখন ক্রমশঃ মাতৃভাবে সংযুক্ত হইয়া পড়িতে থাকে, তখন একটি বড় শঙ্কটাপন্ন অবস্থা তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। যশ মান, ধন সম্পদ্ যখন সম্যক্ ভাবে প্রাণ হইতে উপেক্ষিত হয় নাই, অথচ ভগবৎলাভে প্রাণ সমধিক আগ্রহযুক্ত, যখন নূতন বৈষয়িক সঙ্কল্প প্রাণে কিছু স্ফুরিত হয় না, অথচ সঞ্চিত যশাদি বিনষ্ট হইতে দেখিলেও প্রাণ তাহা বহন করিতে চাহে না, মাতৃভালবাসার জ্বলন্ত বিশ্বাস মন ছাড়াইয়া প্রাণকে যখন সম্যক্‌ভাবে নিমজ্জিত করিয়া তুলে নাই, সেই অবস্থায় সেই গৃহী সাধককে মা কতকগুলি অবস্থাচক্রে নিক্ষিপ্ত করেন; যেন তাঁর সেই সমস্ত বিষয় মা ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্পা। এমন কি, সত্য সত্যই কোন ক্ষেত্রে মা সেগুলি প্রহত করিয়া দেন। সেই অবস্থায় স্থির হইয়া থাকা একান্ত কঠোর বলিয়া সে আশ্রমী বিবেচনা করে।

জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলেও এইরূপ শঙ্কট সেই সময়ে প্রত্যক্ষীভূত হয়। সেই অবস্থায় জ্ঞান, করণীয় অকরণীয় বলিয়া কিছু বুঝিতে পারে না, সকল কর্ম্মই মাতৃ-উদ্দীপনায় সংসাধিত হইতেছে, তবে 'কু' বা 'সু' বলিয়া কার্য্যের কোন উপাধি থাকিতে পারে না; জ্ঞান এইরূপ ধারণায় প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। প্রাণ যেন আশ্বস্ত হইয়া, একটু স্বাধীনতার উষাবায়ু সেবনে অগ্রসর হইয়া পড়ে। বহু দিন সংযমের গণ্ডীর ভিতর দিয়া ভীতিবিজড়িত, সন্তর্পিত পদে সাবধানে পা টিপিয়া চলিয়া, তার পর সহসা নির্ভীকতা ও নিশ্চিন্ততার ঈষৎ আভাস পাইয়াই, সেই অবস্থা ভোগের জন্য একটু প্রাণ লালায়িত হয়, সংযমের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যেন একটু হাত-পা ছড়াইতে চায়। এবং তখন সহসা দেখে, তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়, যেন তার এক পদ স্বর্গদ্বারে, অন্য চরণ নিরয়ের তীরে। মুহূর্ত্তে যেন সে স্বর্গের দেবতা; মুহূর্ত্তে যেন সে নরকের কীট; মুহূর্ত্তে যেন সে ব্রহ্ম, মুহূর্ত্তে যেন সে ধূলিকণা; মুহূর্ত্তে জ্যোতির আকুল পরিপ্লাবনে, মুহূর্ত্তে নিবিড় অন্ধকারগর্ভে! যেন নরকে নিমগ্ন হইল, আর রক্ষা নাই—পরিত্রাণ নাই! পরমুহূর্ত্তে এ কি! সাক্ষাৎ মা যেন নিজ হাতে ধরিয়া আবার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন! এইরূপ কার্য্য ও ভাবসকল তাহাকে অভিভূত করে। আর মনে হয়, বস্তুতঃ যেন তাহাকে কে বলপ্রয়োগে উক্তরূপ ভাবে

ও কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে। যেন জ্বলন্ত ভাবে, অতি প্রত্যক্ষ ভাবে কে দেখাইয়া দেখাইয়া ন্যায়-গম্ভীর স্বরে বলিতেছে; এই তোর পূর্ব্বপ্রচ্ছন্ন সংস্কার, তোকে নরকে টানিয়া আনিল। আরার পর মুহূর্ত্তে স্নেহের প্রাণ-জুড়ান হাসিমাখা নীরব মুখখানি কত আদরে সাধকের মুখ চুম্বন করিয়া, ইন্দ্রজালের মত সেই নরক সরাইয়া, সেই স্থলেই—সেই বিষয়েই যেন স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল। এইরূপ বিপরীত সংঘাত উপর্য্যুপরি ঘন ঘন সাধক-হৃদয়কে মথিত করিতে থাকে। সাধকের মনে হয়, যেন তাহার হৃদয়খানিকে ধরিয়া দুই দিক্ হইতে দুই জনে টানিতেছে। সে টানে মর্ম্ম ছিন্নপ্রায়; অবহনীয় আনন্দ ও বিষাদ! দুই অবহনীয়, দুই অতুল, দুই অভূতপূর্ব্ব; এমন আনন্দও কখনও হয় নাই, এমন বিষাদও কখনও ভোগে আসে নাই। শিশু পুত্রকে সময়ে সময়ে মা যেমন ফেলিয়া দিবার ছল করিয়া, বাহু ধরিয়া উর্দ্ধে উত্তোলিত করে, আবার ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করে, শিশু একবার সন্ত্রাসিত, একবার হর্ষোৎফুল্ল, স্নেহপ্লাবিত হয়, ইহা তদ্রূপ।

মোটের উপর এই অবস্থায় দুই দিক্‌কার টানে হৃদয় ছিন্ন হয় না—বিস্তৃত হয়—সম্প্রসারিত হয়। চিদাকাশ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, হৃদয়ের সংকীর্ণতা ঘুচিয়া যাইতে থাকে। সংকীর্ণ হৃদয়কে প্রসারিত করিবার জন্য মায়ের আমার এই অপূর্ব্ব কৌশল। অলৌকিক ঘটনা ও আনন্দ দিয়া উর্দ্ধদিকে এবং বহুপূর্ব্বকৃত সংস্কার ও ইচ্ছার পরিপূরণ করিতে ভোগ আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া নিম্নদিকে, দুই দিকে এই ভাবে টানিতে থাকেন। কবে—কোন্ সুদূর অতীতে কি চাহিয়াছিলাম, কি অতি তুচ্ছ ভোগের জন্য মায়ের কাছে কাঁদিয়াছিলাম, মা যেন সেইটী মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন; এত দিন তাহা ভোগ করিবার শক্তি ছিল না, এই সময় মা সেইগুলি দিতে থাকেন। কিন্তু এখন ত ভোগেচ্ছা নাই। সাধক, চাহি না চাহি না চীৎকার করে; মা তত চাপিয়া চাপিয়া সেই ভোগ অর্পণ করিতে থাকেন, আর যেন হাসেন! সে হাসি তখন কি মর্ম্মপীড়াদায়ক! কি সুখ দুঃখ সংমিশ্রণে বিষময়! কি হৃদয়পেষী! কি চাহিয়াছিলাম, মোহের ঘোরে মায়ের নিকট কি তুচ্ছ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, ছিঃ ছিঃ ধিক্ আমায়! তার আমিত্বটা চূর্ণ হইয়া যাউক, এই প্রার্থনা সে করিতে থাকে! মা তত খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই পূর্ব্বকৃত ভোগেচ্ছা পূরণে যত্নশীলা হয়েন; "মজ্ঞাইও না, মজাইও না" বলিয়া সাধক তত কাঁদে। রোগশয্যাশায়ী পুত্র রোগযন্ত্রণায় যদৃচ্ছা খাইতে চাহিয়াছে, মা সেইটী মনে করিয়া আছেন। পুত্র যখন সুস্থ হইয়াছে—মা সেই সকল আহার্য্য আনিয়া উপস্থিত। হয় ত তাহা অতি তুচ্ছ—অতি সামান্য, সুস্থ অবস্থায় তাহা খাইতে স্পৃহা নাই, পুত্র খাইতে চাহিতেছে না। কিন্তু মা তুচ্ছ সামান্য জানেন না; চাহিয়াছিলে, গ্রহণ কর। সর্ব্বতৃষ্ণাহারিণী মা আমার কোন তৃষ্ণা না মিটাইয়া ছাড়েন না। মর্ম্ম হইতে মর্ম্মের, প্রাণ হইতে প্রাণের, হৃদয় হইতে হৃদয়ের, আপনার হইতে আপনার—এমন আর কে আছে রে?

এরূপে পূর্ব্বসংস্কারজাত ইচ্ছা পূরণ করিয়া মা সেই অবস্থায় আর একটী উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন। প্রত্যক্ষভাবে তিনি বুঝাইয়া দেন, সাধক যাহা ভাবিতেছে, সে অবস্থা এখনও যথার্থ সে প্রাপ্ত হয় নাই। সাধক জ্ঞানের দ্বারা মনে করে, বুঝি আর তাহার কু সু বাছিবার প্রয়োজন্ নাই, বুঝি সে নির্ব্বিচারে সংসারে বিচরণ করিবার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মা গুপ্ত ইচ্ছাসকল তত ফুটাইয়া তুলিয়া দেখাইতে থাকেন, তাহার তখনও সে অবস্থা দূরে, আরও ঘনীভূত সাধনা ও বিশ্বাসের আবশ্যকতা আছে। সাধক সময়ে সময়ে মনে করে, যেন সে দেবতুল্য হইয়াছে—মা দেখান, এখনও প্রায় সে যে তিমিরে—সেই তিমিরে। সাধক ভাবে, বুঝি তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া আর কিছু নাই, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের সীমা সে অতিক্রম করিয়াছে; মা দেখান, যত ক্ষণ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বলিয়া কথাগুলিও স্মরণ থাকে, তত ক্ষণ বুঝিতে হইবে, জীবের সে উচ্চ অবস্থা লাভ হয় নাই। আমার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ভাবিবার আর কিছু নাই—এইরূপ জ্ঞানও যত দিন থাকিবে, তত দিন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আছে বুঝিতে হইবে। প্রাণে ওইরূপ জ্ঞানের উল্লাসমাত্রও না আসিয়া জীব যখন শুধু আনন্দে বিভোর থাকে, তখন সে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অতীত অবস্থায় গিয়া পৌঁছিয়াছে বুঝিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। একটী ঘটনা বলি।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা—সাধু সন্ন্যাসীর সমুদ্র। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন মুক্তিস্বরূপা মা আমার সাক্ষাদ্ভাবে পৃথিবীর শীর্ষস্থল সে পর্ব্বতশিখরে আবির্ভূতা হইয়াছেন। যেন পৃথিবী ব্রহ্মলোকে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্রে ভাসমান তৃণখণ্ডের মত একটি বালক সে সন্ন্যাসি-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। অতি কাতরভাবে সে এক একটি সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, প্রণামান্তর কি জিজ্ঞাসা করিতেছে ও যেন ভগ্নমনোরথ হইয়া পুনরায় অন্য সন্ন্যাসীর শরণাগত হইতেছে। এই ভাবে বার বার বিফলমনোরথ হইয়াও যেন নবোৎসাহে বলীয়ান্ হইয়া, সে সেই সন্ন্যাসি-সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ভ্রমণ করিতেছে। তাহার এই অলৌকিক বিচরণ-প্রণালী দর্শন করিয়া জনৈক সাধারণ ভদ্রলোক কৌতূহলযুক্ত হইয়া, সেই বালকের অনুসরণ করিয়া বুঝিলেন, বালক প্রত্যেক সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া প্রণামান্তর অতি কাতরভাবে শুধু জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"আপনি সাধু, আপনি ভগবানের সংবাদ জানেন; কৃপা করিয়া আমায় বলিয়া দিন, কেমন করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে, কি করিলে তাঁহার দর্শন লাভ ঘটিতে পারে।" সে সাধু-মণ্ডলীর কেহ তাহাকে সন্ন্যাস গ্রহণে পরামর্শ দিতেছে, কেহ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের উপদেশ দিতেছে, কেহ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইবার জন্য যুক্তি দেখাইতেছে, কেহ বালক বলিয়া উপেক্ষা করিতেছে ও কেহ বা বালক বলিয়া স্নেহের সহিত তাহাকে পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতেছে ও বিদ্যা শিক্ষার জন্য পরামর্শ দিতেছে। কেহ শিষ্য হইয়া থাকিবার জন্য আদেশ করিতেছে এবং দুই চারি

বৎসর সেবায় সন্তুষ্ট করিতে পারিলে পন্থা পাওয়া যাইতে পারে—এইরূপ ইঙ্গিত দিতেছে। কেহ উপহাসে, কেহ বিরক্তিতে, কেহ বা তাহার দুরাশা ও স্পর্দ্ধা ভাবিয়া অগ্রাহ্যে তাহাকে মর্ম্মবিদ্ধ করিতেছে। আবার কেহ বা তাহার ব্যাকুলতা ও আগ্রহের প্রশংসা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। বালকের কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। সে চাহে—সত্বর ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায়, সে চাহে ভগবৎদর্শন। সে মাতৃহারা শিশু, মায়ের আশ্রমে ফিরিবার পন্থার অন্বেষী; সে কি অপরের আদর অবহেলা গ্রাহ্য করে? তাহার তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণ প্রত্যেক শিলাখণ্ডকে, প্রত্যেক বালুকাকণাকে মাতৃসন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছে। প্রত্যেক নিঃশ্বাসে তার দুরন্ত অগ্নির জ্বালা উদ্গীরিত হইতেছে। প্রত্যেক পদবিক্ষেপে তার মাতৃমন্দির সন্নিকটস্থ হইতেছে। সে কি অজ্ঞ জীবের সংশয়াচ্ছন্ন কথায় সন্তুষ্ট হয়? সন্ন্যাসীদিগের উত্তরে তাহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না। ভদ্রলোকটি বালকের এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বৎস! তোমার কার্য্যাবলী আমি বহু ক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি বৃথা অন্য মনুষ্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ। যে পথের সন্ধান সন্ন্যাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি নিজে সেই পথেই চলিতেছ। উহারা সে পথ জানে না। তুমি যে অধ্যবসায়ের সহিত সন্ন্যাসীদিগের নিকট গিয়া মায়ের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই অধ্যবসায়ের সহিত মাকে ডাক— মাকে জিজ্ঞাসা কর। যেমন করিয়া মাতা পিতা, ভ্রাতা বন্ধু, আত্মীয়ের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা কর, তাহাদিগকে যেমন করিয়া ডাক, যেমন করিয়া তাহাদিগের নিকট কিছু প্রার্থনা কর, ঠিক তেমনি করিয়া মাকে ডাক, তেমনি করিয়া মাকে জিজ্ঞাসা কর, তেমনি করিয়া মায়ের নিকট প্রার্থনা কর। মা নিজে তোমার পথপ্রদর্শিকা হইবেন; মা নিজে আসিয়া তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করিয়া দিবেন।

বালকের যেন চমক ভাঙ্গিল। তাহার প্রাণ যাহা খুঁজিতেছিল, যেন তাহা পাইল। সে অনিমিষ লোচনে সেই ভদ্রলোকটির মুখের দিকে কিছু ক্ষণ চাহিয়া, সেইখানে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল। কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃতজ্ঞতার ভরে জড়িতকণ্ঠে বলিল,—আমি পথ পাইয়াছি, আপনি আমার গুরু; আপনাকে নমস্কার। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার উপদেশ ফলবান্ হয়। বালক ভদ্রলোকটির পদধূলি লইয়া দ্রুত সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

এই ঘটনার পর প্রায় ১৫ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। একদিন কোন ভদ্রপল্লীতে এক গৃহস্থের আশ্রমে বহু লোক সমাগত হইতেছিল। আগত বিপদের আশঙ্কায় সকলেই যেন বিষাদে আচ্ছন্ন। সকলেই যেন কি এক বিষম দুর্ঘটনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যেন কি একটা দুরন্ত দৈব দুর্ব্বিপাক সে আশ্রমটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। গৃহকর্ত্তা একাকী আপনার বাহিরের গৃহে উপবিষ্ট,—গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এ গৃহকর্ত্তা

পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক, যিনি হারদ্বারে সেই সাধক বালককে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র আজ মরণাপন্ন। চিকিৎসকেরা "আশা নাই" বলিয়া গিয়াছেন। আত্মীয় পরিবারবর্গ ভদ্রলোকটির সেই মুমূর্ষু পুত্রকে বেষ্টন করিয়া মহাকালের আবির্ভাব, জড় ও চৈতন্যের বিচ্ছেদ, মরলোকের সর্ব্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আর গৃহকর্ত্তা বহির্ব্বাটীতে একাকী বসিয়া ভাবিতেছেন—ভগবানের নিকট পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিবেন কি না। ভদ্রলোকটি জ্ঞানী পুরুষ। বিচারের দ্বারা তিনি অহর্নিশ মায়ে যুক্ত থাকেন বা থাকিতে প্রয়াস পান এবং সময়ে সময়ে অনুপম শান্তিতে প্লাবিত হয়েন। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে সাত্ত্বিক স্ফুরণ ঘটিয়াছে। তাঁহার জ্ঞান সাংসারিক ক্ষেত্রে "কু সু" বলিয়া কিছু দেখিতে পায় না। তিনি আপনাকে দ্বন্দ্বাতীত, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যহীন পুরুষ বলিয়া ধারণা করেন। জগতে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে কিছু তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, এইরূপ ধারণা প্রাণে পোষণ করেন এবং আপনাকে তদ্রূপ উচ্চাবস্থাপন্ন বলিয়া বোধ করেন এবং তজ্জনিত শান্তিসুখ সময়ে সময়ে অনুভব করেন। আজ মা তাঁহার এই জ্ঞান ও ধারণার বল পরীক্ষায় নিযুক্তা। একমাত্র উপযুক্ত পুত্র মৃতপ্রায়। এখনি তাঁহার সমস্ত সংসার অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে; নিবিড় বিষাদ এখনি তাঁহার আপনার বলিতে সকলকে গ্রাস করিবে। তাঁহার জাগতিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায় ও সম্পদ্ এখনি চিরদিনের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবে; তিনি ভাবিতেছেন—মায়ের নিকট পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিবেন কি না। এই সমস্যা লইয়া তিনি বুকের ভিতর দুরন্ত ঝটিকা ভোগ করিতেছেন। অবশ্য চাহিলেই যে ভগবান্ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিবেন—এ ধারণা তাঁহার নাই; এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি চিন্তাযুক্ত নহেন; তবে চাওয়া কর্ত্তব্য কি না—এই তাঁহার সমস্যা। কখনও ভাবিতেছেন,—তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছায় যাহা মঙ্গল, তাহাই সংঘটিত হইবে, আমার ইহাতে হর্ষ বা দুঃখযুক্ত হইবার কিছু নাই। আবার ভাবিতেছেন, আমি যদি প্রার্থনা করি, যদি ভগবান্ সে প্রার্থনা পূরণ করেন, পুত্র প্রাণ ফিরিয়া পাইবে। একটা সংসার দারুণ বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। পুত্রের উপর সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া আমি ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে সমর্থ হইব। সুতরাং কর্ত্তব্য হিসাবে দেখিতে গেলে ভগবানের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। আবার ভাবিতেছেন—তুচ্ছ পুত্র, তুচ্ছ সংসার; যাহা হয় হউক, আমি তুচ্ছ পদার্থের জন্য মায়ের নিকট প্রার্থী হইব? এই আমার হৃদয়ের বল, এই আমার আত্মিক উন্নতি? আমি আপনাকে সুখ-দুঃখের অতীত বলিয়া সময়ে সময়ে মনে করিতাম, সেই আমি আজ পুত্রবিয়োগের ভয়ে অধীর হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে যত্নবান্! বুঝিয়াছি আমি মোহগ্রস্ত। আমার প্রাণের গভীরতম তলদেশ হইতে প্রাণ ভিক্ষাই ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহারই প্ররোচনায় আমি ভিক্ষা করিবার যুক্তি অনুসন্ধান

করিতেছি। যাহা হয় হউক, আমি চাহিব না। আবার ভাবিতেছেন—এতগুলি জীবের বিষাদ দূর করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা, জীবের জীবন রক্ষার্থে মাকে কাতর ভাবে জানান—ইহা কি কর্ত্তব্য নহে? এ কর্ত্তব্য অবহেলায় কি পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে না? ছিঃ ছিঃ! আমি ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইয়াছি,—আমি স্বর্গ ভাবিয়া নরকে প্রবিষ্ট হইতে চলিয়াছি; আমি মঙ্গলময়, স্নেহময় ভালবাসা হৃদয় হইতে দূর করিয়া, তাহার আসনে ক্রূরতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমি অধার্ম্মিক, আমি পশু—বর্ব্বর! আমি কাহাকেও ভাল না বাসিয়া নিজে মায়ের ভালবাসা লাভ করিতে চাহি! না না ভগবান্—দাও, পুত্রের প্রাণভিক্ষা দাও—আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না, আমায় বুঝাইয়া দাও। আমি শুধু এই মাত্র বুঝিয়াছি যে, আমি যাহা ভাবিতাম, তাহা হইতে এখনও বহু বিলম্ব। আমি দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা হইতে এখনও বহু নিম্নে। জগতের সমস্ত অবস্থায় সানন্দে বিচরণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই; মা, আমায় রক্ষা কর, আমার পুত্রকে রক্ষা কর, আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর। আমি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছি—আমায় ক্ষমা কর। আমি অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়াছি—আমায় মার্জ্জনা কর। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া বিপদ সৃজন করিয়াছি, আমার সে নিজকৃত বিপদ্ হইতে আমায় রক্ষা কর। না না, কিছু চাহি না, কিছু চাহি না, তুমি যাহা হয় কর, তুমি আছ; আর ভাবিতে পারি না; আমায় মার, আমার আমিত্বটা ভাঙ্গিয়া তোমার পায়ে মিশাইয়া লইয়া, আমায় এ দুরন্ত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ কর। প্রাণ লও, যশ লও, সমস্ত আমার, আমার বলিতে যাহা কিছু সর্ব্বস্ব, তুমি লও। ধর্ম্ম চাহি না, জ্ঞান চাহি না, আনন্দ চাহি না, তুমি যাহা হয় কর। আমি তোমার চরণে অবসন্ন জীবনদণ্ড অর্পণ করিয়া শরণ গ্রহণ করিলাম।

গৃহদ্বার উন্মোচিত হইল। একটী সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া অতি বিনীত ও করুণ ভাবে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার অন্তঃপুরে এত গোল কিসের?

"আমার একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যাশায়ী!"

"আমি কি একবার দেখিতে পারি?"

ভদ্রলোক সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করিয়া, মুমূর্ষু পুত্রের শয্যাপার্শ্বে লইয়া গেলেন।

মুমূর্ষু—ঘোর অচৈতন্য। মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ সর্ব্বাঙ্গে দেদীপ্যমান। অঙ্গসকল নিস্পন্দ, চক্ষু দৃষ্টিহীন,—মৃতের চক্ষুর মত। সন্ন্যাসী সেই চক্ষুর উপর স্বীয় স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিয়া স্থির নিশ্চল মর্ম্মরবৎ দণ্ডায়মান। জনমণ্ডলী নিস্তব্ধ ভাবে সাগ্রহনেত্রে সন্ন্যাসীর সে স্নেহভারনত মুখখানির দিকে চাহিয়া।

কিছুক্ষণ এইরূপ থাকিবার পর সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—ভগবন্! তুমি সত্য, তুমি আমার সমস্ত

সাধনা, আমার সমস্ত পুণ্য, আমার বলিতে যাহা কিছু সমস্ত গ্রহণ কর—সমস্ত লও প্রভো! সমস্ত লইয়াও যদি হয়, তবে এই বালকের জীবন দান কর। বাঁচাও—বাঁচাও—জীবন ভিক্ষা দাও।

মুমূর্ষুর মলিন মুখমণ্ডলে জীবনের লক্ষণ ফুটিল। চক্ষুতে দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। মুখের নীলিমা ঘুচিল। যেন জীবনের নূতন প্রবাহ কে কোথা হইতে ঢালিয়া দিল। সকলে বুঝিল—বালক এ যাত্রা রক্ষা পাইবে।

ভদ্রলোক বাক্‌স্ফূর্ত্তিহীন জড়বৎ। ইনি কি স্বয়ং ভগবান্! আমার দুঃখ দূর করিতে, আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতে অথবা আমার নির্ভরতার পুরস্কার দিতে সন্ন্যাসিরূপে সমাগত? ইহা কি সম্ভব, ইহা কি সত্য দর্শন করিতেছি, অথবা স্বপ্ন? মৃত ব্যক্তি সত্যই কি ভগবানের নামে প্রাণ পায়?

সন্ন্যাসী সেই স্তব্ধ পিতার দিকে ফিরিয়া, যেন তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন,—বিশ্বাস! বিশ্বাস! বিশ্বাস স্থাপন করুন; এখনও বিশ্বাস ঘনীভূত হয় নাই। ভগবানের নামে মৃত ব্যক্তি প্রাণ পায়—ইহা এখনও ধারণা করিতে পারিতেছেন না। বুঝুন, আপনার সাধনা কত নিম্নে।

ভদ্রলোক বলিলেন,—বুঝিয়াছি, অতি দৃঢ়ভাবে বুঝিয়াছি। কিন্তু সন্ন্যাসী! আমার পুত্র, আমি পুত্রমোহে মুগ্ধ হইয়াও ভগবানের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিব কি না, এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারি নাই। আর আপনি মায়ামমতাহীনশূন্য-হৃদয় সন্ন্যাসী, আপনার এত পরদুঃখে মমতা কেন? আমি ত আপনাকেও আমার পুত্রের প্রাণদান করিতে প্রার্থনা করি নাই। বিনা প্রার্থনায় স্বীয় হৃদয়ের ভাবের তাড়নায় সন্ন্যাসী হইয়া এ মায়ার খেলা কেন খেলিলেন? আমায় বুঝাইয়া দিন। আমার বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না। আমি পিতা হইয়াও প্রাণ ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য কি না ইহার যুক্তি অনুসন্ধান করিতেছিলাম। ভগবানে নির্ভর করিয়া পূর্ব্বে পুত্রের চিকিৎসা করাই নাই; মৃত্যু সমাগত দেখিয়া অনুতাপে হৃদয় বিদগ্ধ হইতেছিল। বুঝি ধর্ম্মের ছল করিয়া বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দিয়াছি—এই ভাবিয়া আকুল হইতেছিলাম। আর আপনি সন্ন্যাসী হইয়া বিনা বিচারে, স্বচ্ছন্দে আমার জন্য, আমার পুত্রের জন্য প্রাণ ভিক্ষা করিলেন? কেন! কেন! এ “কেন” মীমাংসা করিয়া দিন।

সন্ন্যাসী হাসিয়া উত্তর দিলেন,—মহাশয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিয়া ছাড়িতে হয় না; ওইটুকুই আপনার ভুল বোঝা হইয়াছে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান স্বতঃ দূর হইয়া যায়, বিচার করিয়া দূর করিতে হয় না। যত ক্ষণ বিচার থাকে, তত ক্ষণ বুঝিতে হইবে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আছে এবং ততক্ষণ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। যখন যথার্থ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বলিয়া কিছু থাকে না, তখন “ইহা কর্ত্তব্য,—ইহা অকর্ত্তব্য, আমার কর্ত্তব্য

অকর্ত্তব্য বলিবার কিছু নাই” ইত্যাদি জ্ঞান প্রাণে স্ফুরিত হয় না। যত ক্ষণ ইত্যাকার জ্ঞান স্ফুরিত হইবে, তত ক্ষণ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। ইচ্ছা করিয়া বা চেষ্টা করিয়া কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিতে হয় না। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আপনি মিলাইয়া যায়। মস্তিষ্ক পরিচালিত করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হয় না। প্রাণের প্রণোদনে কর্ম্ম করিয়া যাইবেন।

ভদ্রলোক,—যদি কুকর্ম্ম আসে?

সন্ন্যাসী,—“কু” বলিয়া যত ক্ষণ ধারণা আসিবে, তত ক্ষণ নিশ্চয়ই উহা পরিত্যাজ্য, ইহাতে ভাবিবার কিছু নাই। “কু” “সু”র অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন “কু” “সু” ধারণাই থাকে না। আমি “কু” “সু”র অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি কি না—ইহা আমার বুঝিয়া দেখিতে হয় না। যত ক্ষণ ওইরূপ প্রশ্ন প্রাণে উঠিবে, তত ক্ষণ উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হই নাই বুঝিতে হইবে। যখন কোন সুখ-সম্পদ্ ভোগের সুবিধা সম্মুখে উপস্থিত হইলে নির্ব্বিচারে আনন্দে “কু” “সু” না ভাবিয়া প্রাণ উহা সংগ্রহ করিতে ধাবিত হইবে, নিজেকে উচ্চতম অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষ ভাবিয়া, উহা অবাধে গ্রহণ করিতে যত্নশীল হইবে, তখন ভাবিয়া দেখিতে হয়, আমি কোন দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় ওইরূপ অবাধে বিচরণ করিতে সক্ষম কি না। যদি নির্ব্বিচারে সানন্দে দুঃখভোগ করিতে আমার কুণ্ঠা না হয়, তবেই নির্ব্বিচারে আনন্দে স্বেচ্ছাচারিরূপে সুখভোগ করিবার আমি অধিকারী হইব। আপনি আপনাকে নৈষ্কর্ম্ম্যলব্ধ পুরুষ ভাবিয়া পুত্রের চিকিৎসা করান বা পুত্রের জন্য ভগবানের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করারূপ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন। ইহা মহত্ত্বের পরিচায়ক সত্য, কিন্তু যথার্থ নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা হইলে আপনার প্রাণে বিষাদ-সমস্যা, সন্দেহ অনুতাপ ইত্যাদি আসিত না। আমি সন্ন্যাসী—আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভাবিয়া আপনার পুত্রের জন্য ভগবান্‌কে জানাই নাই। প্রাণ চাহিল—করিলাম। যখন প্রাণ চাহিবে না, সহস্র প্রার্থনা আমায় এরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

ভদ্রলোক,—বুঝিলাম, সম্পূর্ণভাবে না হউক, আমি কতক পরিমাণে তাঁর উপর যে নির্ভর করিয়াছিলাম, তারই ফলস্বরূপ তিনি আমার পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন এবং সমস্যা দূর করিয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী,—সত্যই তাই, আর আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প পূর্ণ করিতে আমার উপস্থিত কোন বাসনা না থাকিলেও গুরুদক্ষিণা দেওয়াইলেন। আপনি আমার গুরু। আমি হরিদ্বারের সেই তৃষ্ণার্ত্ত বালক।

আমরা দুইটী অবস্থার কথা বুঝিতে পারিলাম। একটি কর্ত্তব্য-জ্ঞান যত দিন থাকিবে, তত দিন কার্য্য করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ সময়ে এমন এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে, যখন আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ থাকিবে না; আত্মাতেই সমস্ত রতি

বিজড়িত হইয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে এবং নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইবে। এই কর্ম্মাবস্থা হইতে নৈষ্কর্ম্ম্যে জীব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে অন্য একটি অবস্থা বা গতির ক্রম পরিদৃষ্ট হয়। স্থূল বিষয়াসক্ত কর্ম্মময় অবস্থা হইতে এবং পরম নিশ্চিন্ততাময় নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্তি হইতে অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করারূপ একটি মধ্যাবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

নৈষ্কর্ম্ম্য বা পূর্ব্বোক্ত কৃত অকৃত কর্ম্মধারণাশূন্য অবস্থা সহসা আসে না; ত্যাগী হইব বলিয়া মাত্র ত্যাগের লক্ষ্যে ফিরিলে ত্যাগী পুরুষ হওয়া যায় না। কর্ম্ম করিতে করিতে মাতৃভাব যখন প্রাণে সঞ্জাত হইতে থাকে, মা যখন ধীরে ধীরে আসিয়া প্রাণটুকুকে অধিকার করিয়া লইতে থাকেন, তখন আসক্তি অন্যান্য বিষয় ছাড়িয়া মাকে জড়াইয়া ধরে। যেমন কোন একটি বাহ্য বিষয়ে আমরা আসক্তিযুক্ত হইয়া পড়ি, অন্য সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করিয়া যেমন সেইটির চিন্তাতেই সমস্ত প্রাণকে অভিনিবিষ্ট করিয়া ফেলি, সেই রকম ভাবে মায়ের অস্তিত্বের ও মাতৃত্বের আভাস পাইতে পাইতে যত তাঁহাতে মায়াচ্ছন্ন হই, প্রাণ সমস্ত বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া যত মাতৃচরণে ধাবিত হয়, তত ইন্দ্রিয়বিষয়-সকল উপেক্ষিত হইয়া পড়িতে থাকে, তত অনাসক্ত ভাবে আমাদিগের প্রাণ ইন্দ্রিয়বিষয়-সকলকে পরিদর্শন করে। ক্রমশঃ মাতৃআভাস স্ফুটতর হইয়া সমস্ত প্রাণটুকুকে অধিকার করিয়া বসে, এবং সেই পরিমাণে ক্রমশঃ বৈষয়িক কার্য্যের দিক্ হইতে প্রাণ যেন চক্ষু ফিরাইয়া লয়। সাধারণ লোকে তখন তাহাকে জাগতিক বিষয়ে অনাসক্ত বলিয়া দেখে। এইরূপে ক্রমপরম্পরায় সে পরম অবস্থা আসে বলিয়া ভগবান্ অসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে আদেশ করিতেছেন। মাতৃঅধিকার প্রাণে বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বকর্ম্মে অনাস্থা আসিতে থাকে, প্রাণ মুহুর্মুহুঃ মাতৃচিন্তনেই নিযুক্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে উন্মুখী হয় ও সাধক মনে করে, বুঝি তাহার প্রাণ ইন্দ্রিয়বিষয়-সকল হইতে সম্পূর্ণভাবে মাতৃমুখে ফিরিয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ বহু বিষয়ে তখনও তাহার আসক্তি জড়িত বলিয়া, সেই সকল বিষয় হইতে প্রাণটুকু সংগ্রহ করিয়া লইতে সর্ব্বগ্রাসিনী মা আমার তাহাকে কর্ম্মে আরও নিযুক্ত থাকিতে বলেন। কর্ম্মে আস্থা নাই, ভাল; তবু কর্ম্ম করিতে থাক, অনাস্থাতেই কর্ম্ম সম্পাদন কর। কেন না, এখনও আমি তোমার সমস্ত প্রাণটুকু অধিকার করি নাই; যে সমস্ত বিষয়ে এখনও তোমার প্রাণ জড়িত, সেই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধীয় কর্ম্মে আমি তোমায় নিযুক্ত করিব; যত দিন না প্রাণ সেগুলির উপরও অনাস্থাসম্পন্ন বা অসক্ত হয় তত দিন বুঝিব, তুমি আমায় সম্যক্রূপে ভালবাস নাই, সম্যক্রূপে তুমি আমার স্নেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হও নাই। সেই সকল বিষয়সম্বন্ধীয় কর্ম্মের ভিতর হইতেও তোমার প্রাণটুকু আমি কাড়িয়া লইব। তুমি আমার—আমি সম্পূর্ণভাবে তোমাকে "আমিময়" করিতে চাহি। তাই বলি বৎস—কর্ম্ম কর; অনাস্থা আসিয়া থাকে, তবু কিছু দিন অসক্ত ভাবেই কর্ম্মক্ষেত্রে

বিচরণ কর। এইরূপই মায়ের আমার ইঙ্গিত। মাকে অন্তরে পাইলেই বিশ্বকেও অন্তরেই পাওয়া হয় এবং বিশ্বকে অন্তরে পাইলে তবে জীব বাহ্যে আসক্তিশূন্য হয়, সুতরাং অন্তর্যামিনীকে না পাইলে যথার্থ অসক্ত হওয়া যায় না।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০

কর্ম্মণৈব জনকাদয়ঃ সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। অপি লোকসংগ্রহমেব সংপশ্যন্ (কর্ম্ম) কর্ত্তুমর্হসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—জনকাদি পুরুষেরা কর্ম্ম করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আরও দেখ, লোক-সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

যৌগিক অর্থ।—অসক্ত হইয়াও শুধু কর্ত্তব্য হিসাবে কর্ম্ম করিয়াই জনকাদি ঋষিরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং নিজের দিক্ হইতে দেখিলে বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত অন্যান্য লোক-সকলকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত রাখিবার জন্যও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

জীব-জগতের মধ্যে তিনটি প্রধান স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এক—মনুষ্যেতর পশু বা তির্য্যক্ জাতি, দ্বিতীয়—মনুষ্য, তৃতীয়—পারলৌকিক দেবতাবর্গ। ইহাদিগের মধ্যে পশুজাতি ও দেবতা, ইহারা ভোগপ্রধান, একমাত্র মনুষ্যই কর্ম্মপ্রধান। ইন্দ্রিয়বর্গ, অন্তঃকরণ ও প্রাণ, এই সকলের মধ্যে পশুজাতিতে ভোগের জন্য ইন্দ্রিয় অতি প্রবল; দেবতাদিগের অন্তঃকরণ অতি প্রবল ; মনুষ্যে অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সামঞ্জস্য। বিশেষ বিশেষ পশুর বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় অতি প্রবল শক্তিসম্পন্ন বা অত্যধিক বিকশিত ; সেই জন্য উহারা তাহার বেগ সাধারণতঃ রোধ করিতে সমর্থ হয় না, ভোগ হইলে তবে নিবৃত্ত হয়, এই জন্য পশুকে ভোগ-প্রধান বা ভোগ-শরীরী বলা যায়। দেবতারা অন্তঃকরণপ্রধান। সাধারণতঃ তাঁহাদিগের চিত্তে বাসনা সঞ্জাত হইবামাত্র অবিলম্বে তাহা পূর্ণ হয়, ইচ্ছা হইবামাত্র কার্য্য সিদ্ধ হয় আর পরবর্ত্তী চেষ্টা করিতে হয় না। এই জন্য ইঁহারাও ভোগপ্রধান। পশুকে প্রবলতর ইন্দ্রিয় দিয়া, দেবতাকে প্রবলতর অন্তঃকরণ দিয়া, মনুষ্যক্ষেত্রের দুই ধারে দুই ভোগক্ষেত্র মা রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। কোন পশুর ঘ্রাণশক্তি, কোন পশুর দৃষ্টিশক্তি, কোন পশুর জননশক্তি, কোন পশুর শ্রবণশক্তি মনুষ্য অপেক্ষা অত্যধিক প্রবল। অন্য ইন্দ্রিয় অবিকশিত বা স্বল্প বিকশিত। দেবতাবর্গও ইচ্ছা মাত্রে দূরদর্শন, শ্রবণ, অন্যান্য জীবের মনোমধ্যে প্রবেশ, অন্য জীবের আকার পরিগ্রহণ ইত্যাদি করিতে সক্ষম। তির্য্যক্‌জাতি যেমন ইন্দ্রিয় রোধে সমর্থ নহে, দেবতাবর্গও তদ্রূপ ইচ্ছামাত্রে সমস্ত করিতে পারেন সত্য, কিন্তু একবার যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহা আর সহজে নিবারণ করিতে পারেন না। ইচ্ছা হইলে তাহা হইবেই। শক্তিশালী মনুষ্যও যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা নিশ্চয়ই সংঘটিত হয়, তিনিও তাহা সাধারণতঃ রোধ করিতে সমর্থ হয়েন না।

যাহা হউক, এই উভয় প্রকার ভোগপ্রধান স্তরের মধ্যে মনুষ্যশ্রেণী। মনুষ্যে ইন্দ্রিয়াদির সামঞ্জস্যই বিশেষত্ব। এই সামঞ্জস্যবশতঃ কোন ইন্দ্রিয় অত্যধিক প্রবল নহে ও তত প্রবলভাবে মনুষ্যকে ভোগের দিকে আকৃষ্ট করে না; কিন্তু আবার একান্ত অল্প নহে বলিয়াও অতীন্দ্রিয় ব্যাপার ভোগে স্বাধীনতা দেয় না। এইরূপে ভোগ আসিবার ও ইচ্ছা করিবার মধ্যে কালের একটা ব্যবধান সংঘটিত হয় এবং সেই অবসরে মনুষ্য হিতাহিত বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়। কোন একটি ভোগ সঙ্কল্প করিলে তাহা তির্য্যক্‌জাতিমুখী বা দেবজাতিমুখী ভোগ, ইহা মনুষ্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় এবং সেই বিবেচনা বা ভাবের উৎপত্তি হইতে ক্রমশঃ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, হিতাহিত ধারণা ইত্যাদি স্ফুরিত হয়। মনুষ্য তাহার সাহায্যে ভোগমুখে ছুটিতে অথবা ছুটিয়া আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে, অথবা পূর্ব্ব হইতেই সে ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

এই জন্য মনুষ্যক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র—নিম্নে অথবা উর্দ্ধে, দেবত্ব ভোগের দিকে অথবা পশুত্ব ভোগের দিকে, যে দিকেই গতি হউক, যেন চেষ্টা করিয়া করিয়া তবে যাইতেছি, সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিতেছি, স্বেচ্ছায় যেন নিজ গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছি, যেন ফিরিলে ফিরিতে পারি, যেন থামিলে থামিতে পারি, এই ভাব প্রত্যক্ষীভূত হইবার অবসর পায়। উদাহরণস্বরূপ মনে কর—লিখিতেছি। এই লেখারূপ কর্ম্মটুকু যখন প্রথম অভ্যাস করি, তখন একটি অক্ষর অঙ্কিত করিতে কিরূপ যত্নে ধীরে ধীরে চিন্তার দ্বারা ধারণা করিতে করিতে তবে সমর্থ হইতাম। এখন স্বচ্ছন্দে যেন বিনা আয়াসে সহস্র সহস্র অক্ষর দ্রুত অঙ্কিত করি, যেন তাহার ভিতর চিন্তা, স্মৃতি, লেখনী সঞ্চালনের কৌশল, এ সমস্ত কিছু নাই। কিন্তু বস্তুতঃ পূর্ব্ববৎ চেষ্টা, মনন, লেখনী সঞ্চালন, সমস্তই ইহার মধ্যে সম্পন্ন হইতেছে, তবে সে ক্রমসকল আর পূর্ব্ববৎ উপলব্ধিতে আসিতেছে না। মনে কর আহার। পাত্র হইতে আহার্য্য গ্রহণ হইতে গলাধঃকরণ অবধি ইহার মধ্যে যত প্রকারের চেষ্টা বা কৌশল আছে, তাহা এখন আর ধারণাতে আসে না; কিন্তু এক দিন এমন ছিল, যে দিন হাতখানি মুখের সমীপে লইয়া যাইতে হইলে কত আগ্রহ, কত যত্ন প্রকাশ করিতে হইত এবং তাহার প্রত্যেক ক্রমগুলি যেন প্রত্যক্ষীভূত হইত। এখন লেখা, আহার—ভোগপ্রধান, কিন্তু অভ্যাসের সময় ছিল কর্ম্মপ্রধান। এইরূপ মনুষ্য-ক্ষেত্র—কর্ম্মপ্রধান বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ ধারণা যেন না আসে যে, পশুসকল বা দেবতাসকল প্রত্যেকেই মনুষ্যস্তর হইতে তবে পশুত্ব বা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি এইমাত্র বলিতেছি যে, মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বে বা দেবত্বে আমরা যাইতে পারি এবং সে গতির ক্রমগুলি মনুষ্যক্ষেত্রে সুচারুরূপে পরিদৃষ্ট হয়। সেই জন্য মনুষ্য-ক্ষেত্র কর্ম্মপ্রধান।

যাহা হউক, মনুষ্যচরিত্র এই উভয় ক্ষেত্রের সঙ্গমস্থল বলিয়া ইহাতে উভয় প্রকার

কার্য্য পরিদৃষ্ট হয়। আমরা কতকগুলি কার্য্যে পশুধর্ম্মী, কতকগুলিতে দেবধর্ম্মী। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কার্য্যের ক্রমসকল বুঝিতে পারা যায় বলিয়া আমরা চিন্তা দ্বারা ধারণা করিতে সমর্থ হই—আমরা পশুমুখী কিম্বা দেবমুখী। ইহাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধারণা। কর্ম্মপ্রধান অভ্যাস কি প্রকারে ভোগপ্রধান প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হয়, ইহা আমরা বুঝিতে পারি, এই জন্য বিচার করিয়া পদক্ষেপ করাই অনিবার্য্য হইয়া উঠে। পরে অর্থাৎ বহু দিন এইরূপ বিচার করিয়া পদক্ষেপণ করিতে করিতে তখন আর একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। কর্ম্মপ্রধান অভ্যাস কি প্রকারে ভোগপ্রধান প্রকৃতিতে পরিণত হয়, তাহা এত দিন দেখিতেছিলাম, এখন আবার তাহার বিপরীত ক্রম দেখিতে পাই। এখন দেখি, ভোগপ্রধান প্রকৃতিই আবার কর্ম্মপ্রধান অভ্যাসের স্ফুরণ করে। অভ্যাস হইতে প্রকৃতি, আবার দেখি—প্রকৃতি হইতে অভ্যাস। পুরুষকার হইতে দৈব, আবার দেখি, দৈব হইতে পুরুষকার। বিন্দু লইয়াই সমুদ্র, আবার দেখি—সমুদ্র হইতে তবে বিন্দু। পুত্র লইয়া তবে মাতৃসত্তা বা মাতৃত্ব ; আবার দেখি, মাতৃত্ব লইয়া তবে পুত্রত্ব বা পুত্রসত্তা। তখন এ চক্রবৎ গতির আদি অন্ত অন্বেষণে না পাইয়া মনুষ্য কর্ত্তব্য জ্ঞান-বিমূঢ় হইয়া সেই চক্রগতির পদতলে আত্মসমর্পণ করে। তখন স্থির জলের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রকৃতি হইতে সমস্ত সংসাধিত হইতেছে, ইহা যত দিন না সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, এবং সেই জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া যত দিন না প্রাণকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততায় নিমগ্ন করে, তত দিন সেই জন্য কর্ত্তব্যজ্ঞানের দ্বারা চালিত হইতে এবং কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। কর্ত্তব্য সম্যক্ পালনের পর যথার্থ আত্মসমর্পণ, এবং “অশক্ত তস্কর সাধু” এই হিসাবে কর্ম্ম না করিয়াই আত্ম-সমর্পণের ছল, এই উভয়ের পার্থক্য স্বচ্ছন্দে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রথম প্রকারের সমর্পণে আনন্দ, নিশ্চিন্ততা, স্বাধীনতা ও প্রাণের লঘুতা স্ফুরিত হয় ; দ্বিতীয় প্রকারে নিরানন্দ, বিমর্ষতা, তমসাচ্ছন্নতা প্রকাশ পায়। প্রথম প্রকারে শিশু যেন মাতৃক্রোড়ে নির্ভীক চিত্তে নিশ্চিন্তে আনন্দে শায়িত ; দ্বিতীয়ে যেন বন্য পশু রজ্জুবন্ধনে সম্যক্ আবদ্ধ অবস্থায় শায়িত; প্রথম সমর্পণ—আনন্দে, প্রেমে, ভালবাসায়, প্রাণের মোহে প্রাণ আপনাকে আপনি ধরিয়া রাখিতে পারে না বলিয়া ; দ্বিতীয় সমর্পণ ক্ষোভে, বিফলতায়, অভিমানে, আশাভঙ্গে, বিরক্তিতে। প্রথম সমর্পণ আর বিচ্ছিন্ন হয় না ; দ্বিতীয় সমর্পণ নূতন আশার সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করে। প্রথম সমর্পণ সমস্তের শেষে হয় ; দ্বিতীয় সমর্পণ বিষাদযোগের সময় ; বিষাদ যোগরূপে না ফুটিয়া, বিকৃত হইয়া সমর্পণরূপে প্রতিভাত হয়। মনুষ্য অনেক সময়ে উহাকেই বিষাদযোগ বলিয়া ধারণা করে, ভগবানের জন্য বিষাদ আসিয়াছে বলিয়া অনুমান করে ; কিন্তু উহা আশাভঙ্গের বিষাদ মাত্র, কশাঘাতের বিষাদ মাত্র, বিরহের বিষাদ নহে। বিষাদযোগের সময় সাধক ভগবান্‌কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য গুরুরূপে বরণ করে, কর্ত্তব্য পরিত্যাগের জন্য নহে। সাধনাক্ষেত্রে এই বিপর্য্যয় প্রায় প্রত্যক্ষ হয়।

এই কর্ত্তব্য প্রতিপালনই—লোকসংগ্রহ। বাহিরে নিজে কর্ম্মসকল করিলে ধর্ম্ম্য কর্ম্মের অনুসরণে সমাজকে সাহায্য করা হয় এবং নিজের অভ্যন্তরেও তদ্রূপ শক্তিসকল সংগৃহীত হইতে থাকে। ভূ ভুবাদি সপ্ত লোক বা সপ্ত কেন্দ্র—যাহা আমাদিগের দেহে চক্ররূপে বিদ্যমান, সেই সকল শক্তিকেন্দ্র নিজের আয়ত্তীভূত হইতে থাকে। মনে করিতে পারি, শুধু ভগবান্‌কে প্রাণপণে ডাকিলেই তিনি যখন শুনিবেন, তখন আর পন্থাবিশেষের বা গুরুর আবশ্যকতা কি? নিত্যক্রিয়াদির প্রয়োজন কি? ভগবান্‌কে প্রাণপণে ডাকিলে সব হইতে পারে সত্য, কিন্তু সেরূপ প্রাণপণে ডাকিবার শক্তি চাই; এক মুহূর্ত্ত প্রাণপণে হয় ত ডাকিলাম, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আর পারি না, আবার সে ভগবন্মুখী গতি হারাইয়া প্রাণ তমসাচ্ছন্ন হয়, বহির্মুখে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে; কিম্বা উঠিতে হয় ত পারি, কিন্তু স্থিতিলাভ করিতে পারি না। সেই জন্য নিত্যক্রিয়ারূপ কর্ম্মশৃঙ্খলার বিশেষ আবশ্যক। আমাদিগের শক্তি স্থূল সূক্ষ্ম হিসাবে পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্র বা চক্রগুলিতে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। ভগবন্মুখী বা ঊর্দ্ধমুখী গতি লাভ করিতে হইলে সেই সকল স্থলকে ঊর্দ্ধমুখে উদ্রিক্ত করিতে হইবে। নতুবা শক্তি লাভ সাধারণতঃ সংসিদ্ধ হয় না। প্রাণপণে ডাকা অর্থেই—সর্ব্বস্থল হইতে সর্ব্বশক্তি সংগ্রহ করিয়া একমুখে প্রেরণা করা। সেই প্রেরণার জন্যই নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান আবশ্যক।

আমাদিগের দেহের প্রত্যেক পরমাণু—জীবাণু ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শুধু দেহ বলিয়া নহে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জীবাণুসমষ্টি মাত্র। জীব ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছু নাই। আমার এই দেহব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক জীবাণুর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা শক্তি আছে। প্রধানতঃ আমার ইচ্ছা ও শক্তিতে তাহারা পুষ্ট, জাত ও পরিচালিত হইলেও, তাহাদিগের আবার স্বাতন্ত্র্য আছে। সেই জন্য সাধারণতঃ আমাদিগের দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ড বহুজনাকীর্ণ নগরীর মত বিচিত্র কোলাহলময়। আমার ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছার প্ররোচনায় তাহারা সৃষ্ট ও উজ্জীবিত বলিয়া, আমার ভিন্ন ভিন্ন গুণান্বিত অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কল্পে তাহারা গঠিত বলিয়া, তাহাদিগের প্রকৃতি, গঠন, গতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের। সেই বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতি ও গতিতে আমাদিগের দেহ হট্টমন্দিরের মত বিশৃঙ্খল। সেই সমস্তকে সংগ্রহ করিয়া এক পথে চালিত, এক ভাবে অনুপ্রাণিত, এক শব্দে শব্দিত করিতে হইবে। চক্রে চক্রে উপস্থিত হইয়া, কেন্দ্রে কেন্দ্রে নিজে পরিভ্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে সৎসঙ্গ করাইতে হইবে। আমি নিজে এক ঊর্দ্ধমুখী গতি, এক মাতৃনামের ধ্বনি, এক মাতৃমুখী উচ্ছ্বাস লইয়া কেন্দ্রে কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করিব। আমার সেই তেজোময়, প্রাণময়, ভাবময় বিচরণ দেহস্থ সমস্ত জীবাণুকে একমুখী একশব্দী করিয়া তুলিবে। সুরে বাঁধা বীণার মত আমার দেহের সমস্ত তন্ত্রী হইতে মাতৃউচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে। তখন আমি "মা" বলিলে, সে ভাব হৃদয়ে মাত্র প্রকাশ পাইবে না;

সে ভাব আমার আপাদমস্তক সমস্ত শরীর হইতে যেন স্ফুরিত হইতেছে—এইরূপ অনুভূত হইবে। তখন বুঝিব, আমার লোকসংগ্রহ হইয়াছে। ইহারই নাম লোকসংগ্রহ। এইরূপ আধ্যাত্মিক লোকসংগ্রহের জন্যও বিহিত কর্ম্ম করা আবশ্যক।

যখন ক্রিয়া করিতে করিতে জীব সহস্রারে গিয়া উপস্থিত হয়, সত্যের বিমল শুভ্র জ্যোতি যখন তাহাকে প্লাবিত করে, সে আনন্দাপ্লুত অবস্থায় যথাসাধ্য থাকিয়া, যখন আবার নিম্নে নামিতে থাকে, তখন অমৃতস্বরূপ সে তরল ঢল ঢল জ্যোতিঃসুধা জলপ্রপাতের মত ঝরিতে থাকে। এবং তখন সে জীব প্রত্যক্ষ অনুভব করে, তাহার শরীর যেন অমৃতময়, আনন্দময়, সুখময় হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত শরীরই যেন সত্য অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময়। তাহার সমস্ত দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে সত্যযুগের অবতারণা ঘটে। ইহা ক্রিয়া করিতে করিতে বুঝিতে পারা যায়। সে আনন্দ অপার। একেবারে সিদ্ধিলাভ না ঘটিলেও অন্ততঃ এই আনন্দ সম্ভোগের জন্যও নিত্যক্রিয়া করা একান্ত কর্ত্তব্য। সেই জন্য মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে, কর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধিলাভ জনকাদি করিয়াছেন; এবং অন্ততঃ লোকসংগ্রহের জন্যও ক্রিয়া করা উচিত।

কর্ম্মবীর রাজর্ষি জনক সীতাকে পাইয়াছিলেন। কর্ম্মবীর না হইলে অযোনিসম্ভবা সীতাকে পাওয়া যায় না। কারণরূপ যোনি সাহায্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিস্ফুট হয় সত্য, কারণশূন্য কার্য্য হইতে পারে না সত্য, কিন্তু মাতৃলাভ ঠিক সেরূপ কারণশৃঙ্খলা ধরিয়া হয় না। কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার দ্বারা মাকে পাইবার উপযুক্ত জীব হইতে পারে; কিন্তু তার পর মাতৃআবির্ভাব—সেটা যেন শূন্য হইতে, যেন কুড়াইয়া পাওয়ার মত, যেন আকস্মিক—এই ভাবে ঘটে। জনক সীতাকে ভূমিকর্ষণের সময় লাভ করিয়াছিলেন। আমরা ক্রিয়ার দ্বারা মাকে পাইবার উপযুক্ত হইতে পারি; কিন্তু তার পর মাতৃলাভ, সে যেন কুড়াইয়া পাওয়ার মত; যদি পাই—সে যেন দৈবাৎ, যেন আকস্মিক, সে যেন কোথাও কিছু নাই—সহসা পাইলাম, এই ভাবে ঘটিবে। সেটি পরমাত্মরূপিণী মায়ের ইচ্ছাধীন। তিনি যাহাকে বরণ করেন, সেই তাঁহাকে পায়।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১

শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি, ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব (আচরতি ইতি), স যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে।

ব্যবহারিক অর্থ।—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদ্রূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোকসকল তদ্রূপ করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, লোকসাধারণ তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

যৌগিক অর্থ।—যাঁহার শ্রেয়োলাভ হইয়াছে, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলে। শ্রেয়োলাভ যত ক্ষণ না হয়, তত ক্ষণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। শ্রেয়োলাভ হইবার পর তিনি

ইতর সাধারণের আদর্শস্বরূপ, নেতাস্বরূপ হইয়া পড়েন ; এবং তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ও যে ভাবে আচরণ করেন, লোকসকলও তাহাই ধারণা করে এবং তদ্রূপ আচারবান্ হয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠ হইয়া যদি কেহ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাধারণের মধ্যে বিচরণ করেন, অথবা কর্ম্মে আবশ্যক নাই বলিয়া তাহাতে ঔদাস্য প্রকাশ করেন, তবে সাধারণ লোকসকল—যাহারা শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহারাও কর্ম্মত্যাগী যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িবে।

আমি এই ক্ষুদ্র দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্ম। আমি যদি সাধনারূপ কর্ম্মের দ্বারা বা গুরূপদিষ্ট ক্রিয়া দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকি, অর্থাৎ যদি আমার জ্ঞান সত্যভূমিতে বিচরণ করিতে ও সত্য সিদ্ধান্ত লাভে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমায় প্রত্যহ নিয়মিত ক্রিয়া করিতে হইবে ; যত দিন আমার এমন অবস্থাপ্রাপ্তি না হইবে যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি আমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ নহে ; মানসিক বৃত্তি দূরের কথা, দৈহিক বৃত্তিসকলও যত দিন বিজিত করিতে সক্ষম না হইব, তত দিন নিয়মিত কর্ম্মাচরণ প্রয়োজন। নতুবা পূর্ব্বোক্ত লোকসংগ্রহরূপ কার্য্য বিঘ্নযুক্ত হইবে, এবং কালে আমাকেও আর সত্যলোকে বিচরণ করিবার অবসর দিবে না। তাই মা বলিতেছেন,—"যদি তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবু মা বলা ছাড়িও না ; তোমার মুখের মা নাম শুনিয়া আরও কোটী পুত্র আমায় মা মা বলিতে তোমায় বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবে ; তোমার রসে রসময় হইয়া তাহারও মা নামের চিরপ্রিয় ঝঙ্কার করিতে থাকিবে। তোমার কর্ম্মাচরণ তারস্বরে তাহাদিগের প্রাণে তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া বলিবে—আয়, আমি মাকে পাইয়াছি ; মা বলিয়া ডাকিলেই মাকে পাওয়া যায়। আয়, ছুটিয়া আয়, আমার মত করিয়া মা বল—মাকে পাইবি—মাকে পাইবি—মাকে পাইবি।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২

হে পার্থ! মে কর্ত্তব্যং নাস্তি, যতস্ত্রিষু অপি লোকেষু অনবাপ্তং অপ্রাপ্তং অবাপ্তব্যং প্রাপ্তব্যং চ নাস্তি, তথাপি কর্ম্মণি বর্ত্ত এব, কর্ম্ম করোমি ইত্যর্থঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—পার্থ, আমার কিছু কর্ত্তব্য নাই ; কেন না, ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই ; তথাপি দেখ, আমি অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করিতেছি।

যৌগিক অর্থ।—ত্রিভুবনে মায়ের আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রথম লোক, মহঃ জন, তপঃ দ্বিতীয় লোক, তৃতীয়—সত্য ; এই তিন ভুবন ব্যাপিয়া নিজের কিছু কর্ত্তব্য নাই, অথচ আমি কর্ম্ম করিতেছি। আমি তোমাদের মুখ চাহিয়া, তোমাদের দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতা হইয়া কর্ম্ম করিতেছি। তোমাদিগকে সচেতন রাখিতে, তোমাদিগকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে আমি কর্ম্মময়ী হইয়া তোমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছি।

এমন প্রাণ-জুড়ান কথা আর শুনি নাই। সত্যই মা, তোমার কিছু প্রাপ্য অপ্রাপ্য নাই, শুধু আমাদের শ্রেয়োলাভের জন্য তুমি কর্ম্মময়ী। কর্ম্ম দুই প্রকারে হয়; করণীয় দুই প্রকারে নির্ণীত হয়। এক জ্ঞানের দ্বারা বিবেচিত হইয়া শ্রেয়ঃ সম্পাদনের ইচ্ছা। দ্বিতীয় প্রাণের তাড়নায় বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া। প্রথম প্রকারের করণীয়গুলিই কর্ত্তব্য পদবাচ্য, দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ প্রাণের তাড়নায় পড়িয়া যাহা করা যায়, সেগুলি কর্ত্তব্য বোধেও হয় ত ফলতঃ অকর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। তৃষ্ণা পাইলে জল পান করিতে প্রাণ ধাবিত হয়, সেখানে আর বিচারের অপেক্ষা থাকে না, এখানে প্রাণের তাড়নাই কর্ত্তব্য সত্য; কিন্তু আবার অগ্নি-দগ্ধ হইলেও প্রাণের তাড়নায় অনেকে শীতল হইবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইহা প্রাণের তাড়নায় কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে সত্য, বিচারের অপেক্ষা করিতে দেয় না, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা বিচারের অকর্ত্তব্য; কেন না, তাহাতে যন্ত্রণা ও ক্ষত বর্দ্ধিত হয় মাত্র। যাহার এ জ্ঞান আছে, সে অগ্নিদগ্ধ হইলে শীতল হইবার জন্য জলের নিকট না গিয়া অন্য ঔষধির সন্ধান করে। প্রাণের তাড়নায় করণীয় কার্য্যগুলি কার্য্যতঃ কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, দুই হইতে পারে। শুধু যেখানে জ্ঞান বলবৎ, সেখানে অকর্ত্তব্য হইবার অবসর পায় না। মা বলিতেছেন, বৎস! দেখ, আমার কর্ত্তব্য কিছু নাই, অথচ আমি কর্ম্ম করিতেছি—ইহা প্রাণের তাড়নায়, আকুল বেদনে সম্বেদিতা হইয়া। আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাই এবং বিচারেরও অপেক্ষা রাখি নাই, শুধু তোমাদিগের জন্য ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মময়া হইয়া পড়িয়াছি। আমার এ কর্ম্ম প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিচারসাপেক্ষ নহে। তাই বলিতেছি যে, আমার কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু নাই। প্রাণের তাড়নায় এগুলি করণীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমি যদি জ্ঞানময়ী না হইতাম, তাহা হইলে হয় ত এ তাড়নার মোহে অকর্ত্তব্য কার্য্যও তোমাদের জন্য করিয়া ফেলিতাম।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩

জাতু কদাচিৎ অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ সন্ যদি অহং কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং পার্থ, তর্হি মম বর্ত্ম মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যদি আমি অনলস ভাবে কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পন্থানুবর্ত্তী হইবে (কর্ম্মহীন হইয়া পড়িবে)।

যৌগিক অর্থ।—মা আমার অতন্দ্রিত ভাবে কর্ম্ম করেন। আমাদিগের জন্য ক্লান্তি আলস্য পরিহার করিয়া বিনা বিশ্রামে পরিশ্রম করেন। মুহূর্ত্তের জন্য ক্লান্তি বোধ না করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী মা আমাদিগকে উদ্বোধিত করিতেছেন, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিযুক্তা রহিয়াছেন। তাহাও আবার কর্ত্তব্য বোধে নয়, প্রাণের তাড়নে। প্রতি জীবকে,—জীবাণু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত প্রত্যেক কণাকে নিজ মহীয়সী শক্তির অঙ্কে ধারণ করিয়া, নির্গুণা হইয়াও উল্লাসময়ী মা সাজিয়াছেন। পূর্ণ সচ্চিদানন্দ

স্বরূপিণী হইয়া এইরূপে প্রত্যেক জীবকে ধারণ করিয়া রখিয়াছেন বলিয়া প্রত্যেক জীব সচ্চিদানন্দের অন্বেষণে ব্যস্ত। কৃমি কীট হইতে সূচনা করিয়া প্রত্যেক জীবই সাধক, সচ্চিদানন্দের অনুসন্ধানে অহর্নিশ নিযুক্ত, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কে সচ্চিদানন্দের অন্বেষণে বিভোর নহে? কে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অনুসন্ধান না করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্থির? সৎ বলিতে নিত্য অস্তিত্ব বুঝায়। দেখ, কে আপনার অস্তিত্বের জন্য অহর্নিশ লালায়িত নহে? আমি—আমি আছি ও থাকিব, ইহার অভাব বোধই মৃত্যুভীতি নামে অভিহিত। জীব মুহুর্মুহু আপনার অস্তিত্ব অনুভব করে ও উহা হারাইবার ভয়ে সন্ত্রাসিত থাকে। মৃত্যুতে অস্তিত্ব বুঝি হারাইব, এ ধারণাই জীবকে মুহূর্ত্তের জন্য সুস্থির হইয়া থাকিতে দেয় না ও মৃত্যুর দিকে জীব চাহিতেও সঙ্কুচিত হয়। সকল সময়ে বুঝিতে না পারিলেও, প্রতিনিয়ত প্রত্যেক জীব স্বীয় স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষণেই সম্যক্ যত্নশীল। "আমি থাকিব" ইহাই জীবের মর্ম্মগত ধারাবাহিক প্রার্থনা। এ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই জীব-জগৎ প্রধানতঃ আকাঙ্ক্ষাময়। তবেই সকলেই যে সৎ বা অস্তিত্বের সাধক, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

তার পর মনে কর, কেহ যদি আমায় বলিয়া দেয় বা এই স্থির বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয় যে, আমি নিত্য থাকিব, কিন্তু, বুঝিতে পারিব না যে, আমি আছি। "তুমি থাকিবে ইহা স্থির, কিন্তু তোমার সে সত্তা তুমি অনুভব করিতে পারিবে না।" এরূপ সত্তা লইয়া কেহ কি শান্তিলাভ করিতে পারি? না, প্রাণ তাহা চাহে না। প্রাণ চাহে—"থাকিব এবং বুঝিব যে আমি আছি" এইরূপ অনুভূতি এইরূপ চৈতন্যযুক্ত অস্তিত্ব। আমি থাকি, মৃত্যুতে আমাদিগের অস্তিত্ব আমরা হারাই না, অথচ অস্তিত্বের চৈতন্য বা অনুভূতি থাকে না বলিয়াই আমরা মৃত্যু মৃত্যু করিয়া কণ্টকিত হই। আমাদিগের অস্তিত্ব নাস্তিত্বের মত প্রতীয়মান হয়; সে থাকা ও না থাকা, উভয়ই তুল্যরূপে আমরা অনুভব করি। আমরা মরণের পরও থাকি ও যদি তাহা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে মৃত্যু আমাদিগকে শশঙ্কিত করিতে পারে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, শুধু এই অস্তিত্বের চৈতন্য উদ্বোধিত রাখিবার জন্যই আমাদিগের মন অহর্নিশ চঞ্চল, বিষয়ের পর বিষয়ে প্রতিফলিত হইয়া আমাদিগের চৈতন্য উদ্বোধিত রাখিতেছে। সুতরাং স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, আমরা শুধু অস্তিত্বের অন্বেষী নহি—চৈতন্যযুক্ত অস্তিত্বই আমাদিগের প্রার্থনা। আমরা সৎ ও চিতের সাধক। এই চৈতন্যের জন্য আমরা কর্ম্মময়।

ভাল, তার পর যদি এমন কেহ বলে যে, তুমি নিত্য থাকিবে ও বুঝিতে পারিবে যে, তুমি আছ, অর্থাৎ চৈতন্যযুক্ত অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিবে, কিন্তু উহা যন্ত্রণাদায়করূপে ভোগ করিবে; তোমার চৈতন্য, তোমার সে অস্তিত্ব যন্ত্রণার উপলব্ধি ফুটাইয়া তুলিবে—আমরা কি তাহা চাহি? কখনই নহে। থাকিব, বুঝিব—আমি আছি, এবং সে অস্তিত্ব আনন্দময়, আনন্দোল্লাসে পরিপূর্ণ। এইরূপ অস্তিত্বই আমাদিগের প্রাণের

স্পৃহার সামগ্রী। আনন্দের জন্যই আমরা ব্যতিব্যস্ত। এই আনন্দ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই আমরা ভোগময়। যখনি আনন্দ ফুরাইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ অন্য আনন্দের সন্ধানে আমরা ছুটি। শৈশবে ক্রীড়ায় সে আনন্দ সন্ধান করি, যৌবনে বিষয়সঙ্গে সে আনন্দের সন্ধান করি, বার্দ্ধক্যে সেই আনন্দ পাইবার জন্যই ধর্ম্মের ভিতর চক্ষু প্রবিষ্ট করিতে যত্নবান্ হই। আনন্দ-সন্ধান আমাদিগকে সময়ে সময়ে অস্তিত্ব ও চৈতন্য সম্বন্ধেও আত্মহারা করিয়া ফেলে। সুতরাং আমরা শুধু অস্তিত্ব ও চৈতন্যের অন্বেষী নহি ; আমরা অস্তিত্ব, চৈতন্য ও আনন্দের উপাসক। অর্থাৎ আমরা সচ্চিদানন্দের অন্বেষী—উপাসক—সাধক।

প্রত্যেক জীব এইরূপে মায়ের সচ্চিদানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চলিয়াছে; অথবা প্রত্যেকের অন্তরে মা আমার লুকাইয়া নিজের সচ্চিদানন্দস্বরূপ উপলব্ধিরূপ কর্ম্ম করিয়া, প্রত্যেককে কর্ম্মময় করিয়া রাখিয়াছেন। মা আমার যে মুহূর্ত্তে আপনাতে আত্মহারা হইবেন, অর্থাৎ মহৎ ব্রহ্মত্বে ভুলিয়া আপন রসে আপনি নিমগ্ন হইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই জীবেরও কর্ম্মরোধ হইবে। যে ক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাধনা পরিপূর্ণ হয় নাই, সে ক্ষেত্র সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যাইবে। সেই জন্য মা আপনাতে আত্মহারা না হইয়া জীবে আত্মহারা, জীবের জন্য ব্যাকুলা হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন। যে জীবে যে ভাবে প্রয়োজন সে জীব-শ্রেণীতে সেইরূপ স্থূলভাবে প্রতিফলিত হইয়া মা সচ্চিদানন্দরূপিণী, সচ্চিদানন্দদায়িনী ক্রীড়ায় নিযুক্তা। আমাদিগের পক্ষে ক্ষিতিতত্ত্বই স্থূলতম রূপে উপলব্ধ বলিয়া আমরা ক্ষিতিকেই স্থূলতম তত্ত্ব বলি ; কিন্তু বস্তুতঃ মনুষ্যলোক, পিতৃলোকে দেবলোক, সিদ্ধর্ষিলোক প্রভৃতি বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন বিভিন্ন স্তর স্থূলরূপে উপলব্ধ হয় এবং বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে আনন্দ ও চৈতন্য উৎপাদন করে। স্থূল সূক্ষ্ম বলিয়া বস্তুতঃ উপলব্ধির তারতম্য ছাড়া আর কিছু নহে। আমাদিগের পক্ষে যাহা স্থূল, অন্যের পক্ষে তাহা সূক্ষ্ম। তদ্রূপ সৎ ও অসৎ। যাহা যেখানে স্থূলতম ভাবে প্রত্যক্ষীভূত, তাহাই সৎরূপে এবং যাহা সে ক্ষেত্রে অব্যক্ত, তাহা অসৎ ভাবে কার্য্যতঃ উপলব্ধ হয়। সৎ ও অসতে ইহাই প্রভেদ,—নতুবা সৎ ও অসৎ বলিয়া অন্য পার্থক্য কিছু নাই। অসৎ অর্থে যাহা অব্যক্ত—অপ্রতীয়মান। তবে সর্ব্বক্ষেত্রেই সকল ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্বরূপ মা আমার সমান রূপে প্রতীয়মানা বলিয়া সাধারণতঃ মাই সৎপদবাচ্য।

যাহা হউক, স্তরে স্তরে কতকগুলি ব্যক্ত, কতকগুলি অব্যক্ত করিয়া রাখিয়া মা সচ্চিদানন্দ স্ফুরণশীল কর্ম্মে ব্যাপৃতা। এ কর্ম্মে মায়ের বিরাম নাই। আনন্দকে ঘনীভূত করিয়া দেখাইবার জন্য, মা ইচ্ছাময়ী হইয়াও কর্ম্মময়ী হইয়াছেন। নিজের এক মুহূর্ত্তকে অনন্ত কালবিস্তাররূপে বিস্তৃত করিয়া এবং ইচ্ছাকে কর্ম্ম-পরম্পরারূপে ব্যাপকতা দিয়া, ইচ্ছাতেই যাহা মুহূর্ত্তে সংঘটিত হইতে পারে, তাহাকে দীর্ঘ করিয়া আনন্দকে দীর্ঘব্যাপী করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এক মুহূর্ত্ত ব্রহ্মাদির হয় ত কত যুগ,

ব্রহ্মাদির এক দিন দেবলোকাদির কত যুগ, দেবতাদিগের এক দিন মনুষ্যাদির পক্ষে কত কাল, এইরূপে মুহূর্ত্তকে বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভিন্ন দীর্ঘতা দিয়া কর্ম্মময়ী যেন কত কর্ম্মই করিতেছেন, এইরূপ সাজিয়াছেন। এমন কীট আছে, যাহাদিগের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবন, বংশোৎপাদন, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু পর্য্যন্ত মনুষ্যের মাপের এক মিনিটের মধ্যে ঘটিয়া যায় ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা জানে না বা বোধ করে না যে, আমরা মাত্র এক মিনিট বাঁচিয়াছি বা বাঁচি। আবার দেবতাদিগের ক্ষেত্র হইতে দেখিলে মনুষ্যজীবন কত স্বল্পকালব্যাপী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু মনুষ্য বস্তুতঃ সে মাপকাঠিতে জীবন মাপিবার ধারণা পায় না। মনুষ্য জানে, আমরা শতবর্ষব্যাপী, এবং এইরূপে সকল জীবই স্ব স্ব ক্ষেত্রের পূর্ণ আয়ুষ্কাল অপেক্ষা দীর্ঘায়ুর ধারণা বা আশা করে না। স্ব স্ব ক্ষেত্রনিয়মিত পূর্ণ পরমায়ুতেই তাহারা পূর্ণত্ব ভোগ করিতে প্রয়াস পায়। অবশ্য মনুষ্য সাধক হইলে সময়ের এই রহস্যময় বিভাগ উপলব্ধি করে ও এই কালস্রোত যেথা রুদ্ধ বা অপ্রবাহিত, সেই ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া আপনাকে নিত্য বলিয়া ধারণা করিতে অভ্যস্ত হয়। এই কাল-রহস্য ও দেশরহস্য নিরাকৃত করিতে পারিলেই জীবের আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সে কথা পরে আলোচ্য।

যাহা হউক, এই সচ্চিদানন্দ লাভরূপ সাধনকর্ম্ম স্থূলতঃ যেমন বুঝিলাম, যেমন বুঝিলাম, মা কর্ম্মময়ী না থাকিলে জীব কর্ম্মহীন হয়, গতিহীন হয়, তদ্রূপ স্বীয় শরীর অভ্যন্তরে ইহার অনুকরণে সাধনা করিতে হয়। হৃদয়ে আনন্দ, ললাটে চিত্ত, সহস্রারে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ অস্তিত্ব বিকাশ পায়। সহস্রারে আপ, ললাটে জ্যোতি, হৃদয়ে অমৃত, এই তিন প্রকারে অন্তর্যোগাবস্থায় বিভূতি প্রকটিত হয়। অন্তরে এই ভোগানন্দ মা সাধককে ভোগ করিতে দিয়া সাময়িক চরিতার্থতা সন্তানকে দিতে থাকেন এবং স্বরূপে অবস্থান করিবার অবস্থায় যাইতে পুত্রকে আশ্বাসময় করেন। জীব অন্তর্দ্দৃষ্টিতে ইহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়। দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের এই পরম শান্তিময় ভোগ লাভ করিতে জীবকে কত জন্ম পরিশ্রম করিতে হয়, মাকে অন্তরে পাইতে কত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। কর্ম্মের অসীম অপার তরঙ্গ-বিভ্রমে কত বিভীষিকায় পড়িয়া জীবকে মা মা বলিয়া মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ করিতে হয়। শুধু মায়ের ধারণা করিতে—মা আছেন, এই তত্ত্বটুকু অবধারণ করিতে জীবকে কত কঠোরবৎ প্রতিপন্ন কর্ম্মবিচারের ভিতর দিয়া অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়! অতন্দ্রিত ভাবে অবিরাম মা পুত্রকে বক্ষে লইয়া সেই অগ্নি-দাহনের মধ্য দিয়া বিচরণ করেন। মা যে আমার হৃদয়-কূপে অনুপ্রবিষ্টা হইয়া রহিয়াছেন, আমি যে তাঁর অঙ্ক হইতে মুহূর্ত্তের জন্য বিচ্যুত হই নাই, এইরূপে মাকে অন্তরে যত ক্ষণ না পাই, তত ক্ষণ উক্ত আনন্দরূপ বিভূতি উপলব্ধি হয় না। মায়ের কর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪

চেৎ যদি অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্, ইমে লোকা উৎসীদেয়ুঃ নশ্যেয়ুঃ চ সঙ্করস্য কর্ত্তা স্যাম্, ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্।

ব্যবহারিক অর্থ।—আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে লোক-সকল বিনষ্ট হইবে—আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব ও প্রজাগণকে মলিন করিব।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মা প্রত্যেক লোককে বা প্রত্যেক ক্ষেত্রকে তত্তৎক্ষেত্রস্থ জীবসকলের হৃদয়ে স্থূলবৎ প্রতীয়মান করিয়া জীবকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। লোকসকলকে স্থূলবৎ প্রতীয়মান না করিলে কর্ম্মসকল স্বপ্নবৎ বিবেচিত হয়। আমাদিগের পক্ষে এই ভূলোক যেমন স্থূল, অন্যান্য লোকসকল অন্যান্য জীবসকলের পক্ষে তদ্রূপ স্থূল। ভুব, স্বঃ আদি লোকসকলের পক্ষে ভূলোক সূক্ষ্ম। এইরূপ স্থূলবৎ প্রতীয়মান হওয়াই আমাদিগকে কর্ম্ম-বন্ধনে বিজড়িত করিবার মায়ের একটি প্রধান উপায়। যে ক্ষেত্র যত স্থূলভাবে আমাদিগের চক্ষে প্রকটিত হইবে, আমরা সেই ক্ষেত্রের কর্ম্মসকল তত স্থূলভাবে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইব।

ক্ষেত্রকে এইরূপে স্থূলভাবে প্রতিপন্ন করিবার জন্যই কর্ম্ম। আমরা যখন কোন কর্ম্ম করি, তখন সেই কর্ম্মের দ্বারা তৎকর্ম্মের বিষয়টি জ্ঞানে ঘনীভূত হইয়া যায় বা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। বার বার কোন কর্ম্ম অভ্যাস করিলে আমাদের স্বভাবে সেই বিষয়টী স্থূলতররূপে প্রতিভাত হয়। এই জন্য আমাদিগের দেহস্থ ভূ ভুব আদি কেন্দ্রসকলে কর্ম্ম একান্ত করণীয়। বার বার ঐ সকল কেন্দ্রে কর্ম্ম করিলে অসাধারণ ভাবে উহারা ঘনীভূত হয় বা আমাদিগের উপলব্ধিতে আসিয়া পড়ে। আমরা এই দেহে থাকিয়াই ঐ সকল চক্রের সাহায্যে উক্ত লোকসকলের বৃত্তান্ত অবগত হইতে সমর্থ হই। আমাদিগের দেহেরই যে সমস্ত যান্ত্রিক ক্রিয়া স্বতঃ সংঘটিত হইতেছে, যাহার উপলব্ধি সাধারণ অবস্থায় আমরা করিতে পারি না, অভ্যাসের দ্বারা বা কর্ম্মের দ্বারা সেই সকল দৈহিক ক্রিয়াও আমাদিগের অনুভূতিতে আসিতে থাকে, তখন আমরা ইচ্ছা দ্বারা তাহাদিগের গতি নিয়মিত করিতে সমর্থ হই। আর কর্ম্ম না করিলে ঐ সকল ক্রিয়া আমাদিগের আয়ত্তের বহির্ভূত থাকিয়া যায়। আমাদিগের চেতনার বহির্ভূত যে বিষয় থাকে, তাহা ক্রমশঃ ম্লান ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মৃতদেহের মত তাহারা বর্ণজ্যোতি হারাইয়া ক্রমশঃ আমার কাছে লয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে লয় হইবার পূর্ব্বে বর্ণসঙ্করতা আসিয়া উপস্থিত হয়। বর্ণসঙ্কর কি, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিধিবদ্ধভাবে গুণানুসারে অর্থাৎ অধিকার অনুসারে কর্ম্মে ধারাবাহিক ভাবে নিযুক্ত না থাকিলে সেই গুণ স্ফুটতর ও বিশুদ্ধ হয় না ও যাঁহার সে গুণ বা মহিমা, তাঁহাকে সে কর্ম্মের বা গুণের মূলে পাওয়া যায় না। অবিচারে কর্ম্ম করিলে মিশ্র গুণ সঞ্জীবিত হয়; তাহারই নাম বর্ণসঙ্কর। তাহাতে গুণতত্ত্ব ধরা যায় না। সুতরাং তাহার মূলে পরম তত্ত্বও প্রকাশ পান না।

এই জন্যই মা কর্ম্মময়ী ; প্রতি ক্ষেত্রকে আমাদের স্থূল ভোগে আনিবার জন্যই কর্ম্মের আবশ্যকতা, সমস্ত ক্ষেত্রে জ্ঞানময় হইবার জন্যই কর্ম্ম। সর্ব্বত্র চৈতন্যের প্রতিষ্ঠাই কর্ম্মের আন্তরিক উদ্দেশ্য। আমাদিগের চৈতন্যে সমস্ত পদার্থ যাহাতে আলোকিত করিতে পারি,—সমস্ত বিষয় আমাদের সম্মুখে আসিয়া যাহাতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাই কর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য। আমি যখন কোন পদার্থ দর্শন করি, তখন ইহাই বুঝা যায় যে, আমার চৈতন্যে সেই পদার্থের স্থূল অংশটি মাত্র প্রতিফলিত হইতেছে। যদি কর্ম্মের দ্বারা উহার ভিতর আমার সত্তা অধিকতররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলে উহা উহার পদার্থস্বরূপ হারাইয়া আমার চৈতন্যে কতকগুলি পরমাণুসমষ্টি মাত্র বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। চৈতন্য আরও অধিক প্রতিষ্ঠিত হইলে সে পরমাণুসমষ্টিও লুপ্ত হইয়া একটি শক্তির চাঞ্চল্য মাত্র পরিলক্ষিত হইতে থাকে ; এবং আরও অধিক চৈতন্য স্ফুরিত হইলে শেষ সেখানে চৈতন্যসত্তা ব্যতীত আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। এক মহান্ স্বয়ংপ্রকাশ মাত্র পদার্থে প্রকটিত হন এবং পদার্থে পদার্থে এইরূপ পাইয়া মাকেই যে আমরা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা দেখিতেছি, ইহা জীবের উপলব্ধিতে আসে।

ইহাই কর্ম্মের শেষ পরিণতি। সুতরাং চৈতন্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কর্ম্মসকল কৃত হইলে, এ পদার্থময় জগৎ চৈতন্যময় হইয়া পড়ে। আমরা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই, আমাদিগের চারি ধারে এই অনন্ত জগৎ শুধু চৈতন্যময়—শুধু প্রাণময়—বিকাশময়। আমরা দেখিতে পাই, চৈতন্যময় বৃক্ষসকল ফল পুষ্পে পরিশোভিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান—চৈতন্যময় আকাশ উদার বক্ষ বিস্তার করিয়া আমাদিগের শিরে অবস্থিত—চৈতন্যময় জলরাশি স্নেহ বিতরণে জগতের চারি ধারে নিযুক্ত—চৈতন্যময় বায়ু জীবে জীবে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিতে নিবিষ্ট। অসীম অনন্ত চৈতন্য আমাকে চারি ধার হইতে বেষ্টন করিয়া বিবিধ মূর্ত্তিতে আমাকে বরাভয় বিতরণ করিতেছে, অমৃতের উৎস ছুটাইয়া আমাকে অমরত্বের বা আমার চিৎস্বরূপতার সন্ধান বলিয়া দিতেছে।

মাকে এইরূপ কর্ম্মকরী দেখিতে হয়। মা কর্ম্ম করিতেছেন বলিলে মায়ের এই স্বরূপ উপলব্ধিতে আনিতে হয়। এই স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে জগৎ অনিত্য, ধ্বংসশীল, মৃত্যুপথে ধাবিত বলিয়া আমাদের হৃদয়ে ভীতিপ্রদ হইয়া উঠে না। মাকে বা চিদ্রূপাকে সর্ব্বময়ী কল্পতরুরূপে দেখিয়া, প্রাণ সেই কল্পতরুর তলে শিবত্ব দেখিতে পায়।

বহির্জগৎ সম্বন্ধে যেরূপ, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে ; কেন না, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কিছু নাই। চক্রে চক্রে বা দেহের কেন্দ্রে কেন্দ্রে এইরূপে মাতৃসত্তা উপলব্ধি করিতে হইবে বা মায়ের এই সত্তা বুঝিতে হইবে।

আমি যত ক্ষণ কর্ম্মময় থাকিব, অর্থাৎ যত ক্ষণ কর্ম্ম না করিলে আমার কোন

সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না, তত ক্ষণ মাও এইরূপ কর্ম্মময়ীরূপে আমাদিগের চক্ষে প্রতিফলিতা হইবেন; এবং মায়ের সক্রিয় অবস্থা আমাকেও কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে থাকিবে। আমি যখন ইচ্ছাময় হইব অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে যখন আমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে থাকিবে, তখন মাকেও আমি ঐরূপ ইচ্ছাময়ীরূপে দেখিব। আমার নিজের অবস্থানুযায়িরূপেই মা আমার হৃদয়ে প্রতিফলিতা হইয়া থাকেন। আমরা এখন জগতের চারি দিকে ধ্বংস আদি পরিণতিসকল দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই মাকেও আমরা কর্ম্মময়ীরূপে বুঝিতেছি, এবং মাও কর্ম্মময়ী বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন; নতুবা এ কর্ম্মময় রূপের তলে মায়ের নিষ্কল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে মাকে নিষ্কলারূপে চিনিব। আমাদিগের অবস্থাভেদে মাকে কখনও ইচ্ছাময়ী, কখনও কর্ম্মময়ী, কখনও জ্ঞানময়ীরূপে দেখিতেছি; সুতরাং মাতৃসম্বন্ধীয় আমাদের ধারণা এবং আমাদের জীবনের গতি যাহাতে আমাদের অবস্থা ও অধিকার অনুযায়ী হয়, তত্ত্বদর্শীরা তদ্রূপ উপদেশই দিয়া থাকেন। সেই কথাই ভগবান্ পর-শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন।

পরমেশ্বর এখানে কোন্ কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকটি বলিলেন, ইহা একটু বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। আশঙ্কা হইতে পারে, তিনি স্বীয় জগদ্ব্যাপাররূপ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক সর্ব্বপ্রধান ঐশ্বর কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু 'কর্ম্ম না করিলে বর্ণসঙ্করতা সৃষ্ট হইবে' এইরূপ বলায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে কর্ম্মের অনুশীলনে বর্ণবিশুদ্ধি সংরক্ষিত হয়, সেই কর্ম্মকেই তিনি এই শ্লোকে লক্ষ্য করিয়াছেন। জগদ্ব্যাপারাত্মক কর্ম্মের সহিত বর্ণবিশুদ্ধির গৌণভাবে সম্বন্ধ থাকিলেও সাক্ষাদ্ভাবে বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং তিনি যে শাস্ত্রবিহিত গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত কর্ম্মকেই এ স্থলে লক্ষ্য করিতেছেন, ইহাই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতেও আশ্রমোচিত কর্ম্মেরই প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক কর্ম্মের কথা হইলে পূর্ব্বশ্লোকে "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" এ কথা বলিতে পারিতেন না। কেন না, মানবোচিত কর্ম্মের সহিত জগদ্ব্যাপারাত্মক ঐশ্বর কর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

হে ভারত, কর্ম্মণি সক্তাঃ অনুরক্তাঃ অবিদ্বাংসঃ অজ্ঞাঃ যথা কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, অসক্তঃ সন্ লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ বিদ্বান্ তথা কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে ভারত! কর্ম্মানুরক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানিগণ লোক-সকলকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে সেইরূপই করিবেন।

যৌগিক অর্থ।—অজ্ঞান কর্ম্মাসক্তের সম্মুখে বিজ্ঞ যদি কর্ম্মহীন থাকে, তাহা হইলে সেই অজ্ঞানীরাও কর্ম্মে শ্রদ্ধা হারাইবে। এবং তাহাদের কর্ম্মময় অধিকার ও অবস্থা হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইবে। অধিকারের এই তারতম্যবশতঃ আমরা ধর্ম্ম

ক্ষেত্রে এত মতামত ও তর্ক বিতর্ক দেখিতে পাই। যাহার যেরূপ আধ্যাত্মিক অধিকার লাভ হইয়াছে, তাহার তদনুযায়ী মত লইয়া সে অন্যাধিকারীর সহিত ধর্ম্মবিচারে নিযুক্ত ও কার্য্যতঃ উভয়ে কোন মীমাংসায় উপস্থিত না হইয়া মতের প্রাধান্যে উপনীত হইয়া পড়ে ও বৃথা তর্কে তাহাদিগের সেই ধর্ম্ম-চর্চ্চা পরিণত হয়। এই জন্য সাধারণের সহিত বিচার করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম-মতের প্রতিষ্ঠা করিতে বা স্বীয় ধর্ম্মমত ধার্য্য করিয়া লইতে চেষ্টা করা বিপদ্‌সঙ্কুল, এবং এই জন্য শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমানুমোদিত কর্ম্ম করা ও উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে স্বীয় সাধনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়াই আমাদিগের শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপে বিহিত।

যাহা হউক, লোক-সকলকে ধর্ম্ম-চর্চ্চায় নিযুক্ত রাখিবার জন্য, নিজের সমস্ত ক্ষেত্রে স্থূলরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য এবং বিষয় বলিয়া যাহা কিছু, সমস্তে চিদ্রূপাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য বিজ্ঞের পক্ষেও কর্ম্ম বিধেয়। লোকসংগ্রহ কথাটার ইহাই তাৎপর্য্য।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ, বিদ্বান্ যুক্তঃ (ব্রহ্মণি ইত্যর্থঃ) সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ অজ্ঞান্ যোজয়েৎ।

ব্যবহারিক অর্থ।—অজ্ঞ কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না অর্থাৎ পরা বুদ্ধির রহস্য বলিবে না। বরং ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি নিজে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অজ্ঞদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন।

যৌগিক অর্থ।—মা আমার প্রতি জীবের অবস্থানুযায়ী বুদ্ধিরূপে জীবে জীবে অধিষ্ঠিতা হইয়া প্রত্যেককে আত্ম-মঙ্গলের পথে লইয়া চলিয়াছেন। সে বুদ্ধি ভেদ করিয়া, সর্ব্বত্র এক প্রকার বুদ্ধি বা পরা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতে নাই। যখন ব্রহ্মত্বের বুদ্ধিতে একমাত্র ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত আর কোথাও কিছু উদ্ভাসিত হয় না, তখন তিনি যদি তাঁর সেই চরম উপলব্ধি অন্যান্য সাধারণ জীবশ্রেণীকে বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে উহা যেমন বৃথা চেষ্টা মাত্র হইয়া পড়ে, তদ্রূপ তাঁহার নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইয়াছে বলিয়া তিনি সাধারণকেও কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিতে পারেন না। ধর্ম্মোপদেশ এই জন্য মূলতঃ একলক্ষ্য হইলেও উহাদিগের আকারসকল ব্যক্তিবিশেষে স্বতন্ত্র। এমন কি, একমাত্র চিৎস্বরূপাবস্থান ব্যতীত অন্য অবস্থায় দুইটি মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাদের অবস্থা সর্ব্বাংশে তুল্য। সুতরাং ধর্ম্মমতে যে সম্প্রদায় গঠিত হইতে পারে, তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কর্ম্মসঙ্গী দুই প্রকারের—অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গী ও জ্ঞানী কর্ম্মসঙ্গী। তত্ত্বদর্শীরাই জ্ঞানী কর্ম্মসঙ্গিপদবাচ্য, ব্রহ্ম উপলব্ধিশূন্য কর্ম্মীদিগকেই অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গী বলা যায়।

সেই অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গীদিগের কর্ম্মবুদ্ধি ভেদ করিতে যাইলে উহা সম্যক্‌ভাবে সম্পন্ন করিতেও পারা যায় না, অথচ তাহার কর্ম্মস্পৃহাতেও অযথা একটা বিরাগ জন্মাইবার সূচনা করা হয় মাত্র। তাহাকে বরং কর্ম্মে উৎসাহ দিতে হইবে, এবং সেই কর্ম্মের ভিতর দিয়াই, তাহার জ্ঞান বিকাশের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে।

বস্তুতঃ ভগবদ্‌লাভ কর্ম্ম ও জ্ঞানসাপেক্ষ হইলেও কথঞ্চিৎ উহা প্রধানতঃ আগ্রহসাপেক্ষ। বাহিরের আকার কর্ম্মময় হউক বা জ্ঞানময় হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। মাত্র কর্ম্মে বা কর্ম্মত্যাগে ভগবৎলাভ হয় না। প্রাণের তাড়নায় ভগবৎসান্নিধ্য লাভ হয়, এবং সেই সান্নিধ্য লাভের লক্ষণস্বরূপ এবং তাহার পোষকরূপে কখনও কর্ম্মময় অবস্থা, কখনও ত্যাগময় অবস্থা লক্ষিত হয়। সুতরাং যাঁহারা বাক্যগত জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হঠকারিতার সহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রয়াস পান বা উপদেশ দেন বা উপলব্ধি-শূন্য হৃদয়ে জ্ঞানময় ব্রহ্মভাব প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহারা বিপরীত-প্রয়াসী। জ্ঞান অনুভূতির ফল; অনুভূতিগুলি বিশ্লেষিত করিয়া দেখাই জ্ঞানের ধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য। সেই জন্য যে পরিমাণে ভগবদনুভূতি প্রাণ পাইতে থাকে, শুধু সেই পরিমাণে জ্ঞান বা বুদ্ধি বিশ্লেষিত বা ভেদিত হইতে পারে; সেই দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া জ্ঞানালোক চালিত করিতে হয়। নতুবা বৃথা বাক্যগত জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলে জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয় হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ইদানীং সংসারে বহুল।

অন্তঃক্রিয়া সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বুদ্ধির বিকাশ সহস্রারক্ষেত্র হইতে সমুৎপন্ন। যত ক্ষণ সাধক অজ্ঞ থাকে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের অনুভূতি লাভে অসমর্থ থাকে, তত ক্ষণ সহস্রারের বিশেষ ক্রিয়ায় বা সহস্রারতত্ত্ব ভেদ করিতে দেওয়া চলিতে পারে না। এই সহস্রারচক্রের ক্রিয়ার নামই বুদ্ধিভেদ। যে পরিমাণে আজ্ঞাচক্র আয়ত্তে আসিতে থাকে, সেই পরিমাণে ধীরে ধীরে সহস্রারের দিকে ভেদযত্ন বা লক্ষ্য স্থাপিত করিতে হয়।

বস্তুতঃ মায়ের অনুকম্পার উপর এ সমস্ত সম্যক্ নির্ভর করে। সহস্রারের বিমল অমৃতজ্যোতিঃ, সৌম্য স্নিগ্ধোজ্জ্বল সত্যপ্রকাশ, মনে হয় যেন, সম্পূর্ণরূপে মাতৃইঙ্গিতে অনুষ্ঠিত হয়। সমস্তই মা করেন সত্য, কিন্তু এইটী যেন আরও দৈবকৃত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি বুদ্ধিভেদ করিতে চাহ, যদি সে অমৃতালোকের চিত্তোন্মাদকারী আস্বাদ লাভ করিতে চাহ, তবে অজ্ঞ থাকিতে পারিবে না, ইহা স্থির। অজ্ঞ কর্ম্মশালী করিয়া যত দিন মা তোমায় রাখিবেন, তত দিন বুদ্ধিভেদ করিয়া উঠা দুঃসাধ্য। আবার বুদ্ধিভেদ না হইলেও জ্ঞানী হইতে পারা যায় না, অজ্ঞত্ব ঘুচিতে পারে না; অথচ মা বলিতেছেন, অজ্ঞের বুদ্ধিভেদ করিবে না। এ মায়ের কেমন কথা? জ্ঞানের অভাবই ত অজ্ঞতা। এ হিসাবে অজ্ঞেরই ত বুদ্ধিভেদ হওয়া আবশ্যক। যে জ্ঞানী, তার আবার বুদ্ধিভেদ কি প্রকারে করিবে?

ইহার উত্তর আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তবু খুলিয়া বলি। জ্ঞানী অর্থে অনুভূতিযুক্ত সাধক। মাতৃঅনুভূতি যত দিন না পাওয়া যায়, তত দিন মাত্র সাধক অজ্ঞ। মাতৃঅনুভূতি যখন ঘনীভূত হয়, তখন মাত্র সে অজ্ঞতা বুদ্ধি দ্বারা ভেদ্য। মা আমার অনুভূতিময়ী, ব্রহ্ম অনুভূতিময়। সূর্য্য যেমন আলোকময়, সূর্য্যোদয়ে যেমন মাত্র সূর্য্য পরিদৃষ্ট হয় না, দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সূর্য্যজ্যোতিঃ চারি ধার হইতে বিকীর্ণ হইয়া তাহার উদয়বার্ত্তা প্রাণকে বুঝাইয়া দেয় এবং সেই আলোক ধরিয়া যেমন সে আলোকের কেন্দ্র সূর্য্য পরিদৃষ্ট হয়েন, সাধকের হৃদয়ও তদ্রূপ সর্ব্বপ্রথম অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। মা রহিয়াছেন, মাতৃস্নেহ আমাকে পরিপালন করিতেছে, মা আমাকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা, পোষণ ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, এই সকল ভাব প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে, যেন সাক্ষাৎ মাতৃময় বলিয়া সাধক জগন্মণ্ডলকে, আপনার অস্তিত্বকে বোধ করিতে থাকে; এবং সেই বোধ বা অনুভূতিসকল লক্ষ্য করিয়া ও সেই সকলের সাহায্যে পরা বুদ্ধি প্রকাশ পায়। অনুভূতির অনুপাতে এই পরা বুদ্ধি প্রকাশ পাইতে থাকে, এবং সেই পরা বুদ্ধি আপনি আপনার অজ্ঞতাকে ভেদ করে।

সুতরাং যত ক্ষণ না অনুভূতি আসে, তত ক্ষণ তাহার বুদ্ধিভেদ করিতে যাওয়া, আর নূতন নূতন কল্পনা সৃজন করা, ইহা একই কথা। অনুভূতিশূন্য অজ্ঞের কর্ম্মবুদ্ধি ভেদ করিবে না, ইহাই মায়ের আদেশ। স্বভাবতঃ যে কর্ম্মে যে নিযুক্ত, সেই কর্ম্মেরই মধ্য দিয়া তাহার ভগবদনুভূতি ফুটাইয়া তুলিবার উপদেশ দিবে, ইহাই তাৎপর্য্য। কর্ম্মে অনাস্থা আনিয়া দিবে না। আমি নিজে কর্ম্ম করিতেছি; যত ক্ষণ আমার কর্ম্মময়ী মূর্ত্তি সাধক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, যত ক্ষণ পুত্র না বুঝিবে যে, আমিই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা ও প্রভু, তত ক্ষণ আমি সেই সাধকক্ষেত্রে কর্ম্ম করিব। ইহা ভেদ করিবার জন্য কাহারও ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। আমি প্রকৃতিস্বরূপে তোমাদিগকে পরিচালিত করিতেছি, এই অনুভূতিলাভের চেষ্টা করিলেই যথেষ্ট।

এইটুকু বুঝার নামই সাধনা। সাধনা বস্তুতঃ কর্ম্মমাত্র নহে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সাধনা আনন্দ অনুভব মাত্র, সাধনা প্রাণের আবেগের উল্লাস-তরঙ্গ মাত্র। তুমি রহিয়াছ, আর আমার চিন্তা কি, এইরূপ আনন্দের উদ্বেলনই সাধনা। উহাই অনুভূতি এবং উহা প্রাপ্ত হইলে তবে বুদ্ধিভেদ সম্ভব হয়। মায়ের এই কর্ত্তৃত্বের কথাই মা পরশ্লোকে বলিতেছেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭

প্রকৃতেগুণৈঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি অহঙ্কারেণ বিমূঢ়াত্মা অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়াত্মা আপনাকে কর্ত্তা মনে করে।

যৌগিক অর্থ।—প্রকৃতির গুণে সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতেছে; আবার সেই প্রকৃতিরই প্রথম অভিব্যক্তি অহঙ্কার দ্বারা আমাদিগের কর্ত্তৃত্ব ধারণা আসিতেছে। সাংখ্য-শাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়া জ্ঞানের পরিণামী ও অপরিণামী প্রকাশদ্বয়কে বিভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে বলিয়া বস্তুতঃ কেহ যেন প্রকৃতিকে সাধারণ জড় বলিয়া ধারণা না করেন। ব্রহ্মবাদীর নিকট পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই এক জ্ঞানস্বরূপের মহিমাগত বিভাগ মাত্র। সাধক উহা লইয়া মাথা ঘামাইবে না। কেন না, বিচার সাহায্যকারী হইলেও বিশেষ সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই এবং বস্তুতঃ চৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, পঞ্চ ভূত ও তদাত্মক যাহা কিছু, সমস্তই চিচ্ছক্তির লীলায়ন মাত্র। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে পূর্ণ চৈতন্যময় অবস্থায় অর্থাৎ যোগশাস্ত্রে যাহাকে কৈবল্য বলে, সেই অবস্থায় মাত্র চিৎস্বরূপ পরিদৃষ্ট না হইয়া প্রকৃতিও পরিদৃষ্টা হইত; কেন না, চিৎ প্রকাশধর্ম্মী। অগ্নিশিখা যেমন আলোক বিকীর্ণ না করিয়া থাকিতে পারে না, চৈতন্যধর্ম্মও প্রায় তদ্রূপ। সুতরাং চৈতন্যই প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতি বস্তুতঃ চিৎ হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহারই মহিমা। এ বিষয়ে বহুতর বাদানুবাদ আছে, কিন্তু সাধকের সে সমস্ত লইয়া মস্তিষ্ক পরিচালনার আবশ্যক নাই। পরমাত্মার কল্পিত পদার্থসকলও চৈতন্য, এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। আলোকের বিভিন্ন তরঙ্গ যেমন আলোক, বায়ুর বিভিন্ন তরঙ্গ যেমন বায়ু, আত্মার বিভিন্ন প্রকাশও তদ্রূপ আত্মপ্রকাশ। শুধু নাম ও ভাবের অন্তর্গত যাহা কিছু আত্মার মহিমা, তাহা প্রকৃতি নামে অভিহিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগের কথা বলিয়া ভগবান্ সাধককে আত্মার স্বরূপ সর্ব্বাগ্রে ধারণা করিয়া লইতে বলিয়াছেন। আত্মা অজর, অপরিণামী, নিত্য, এই ধারণা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ধরিয়া, তবে সাধনা আরম্ভ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেইরূপ ধারণা বুকে লইয়া তার পর কর্ম্মযোগ বুঝিতে হয়। কর্ম্মযোগ বুঝিতে গিয়া, আত্মমহিমাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই প্রকৃতি বা শক্তিময়ী আত্মমহিমা বুঝিতে হইলে চৈতন্যসম্বলিত শক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমিত্ব, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি প্রকৃতি; এবং চৈতন্যশূন্য আমিত্ব, চৈতন্যশূন্য বুদ্ধি, চৈতন্যশূন্য মন বলিলে বুঝিবার কিছু থাকে না। চৈতন্যও শক্তিবিশেষ।

এইবার প্রকৃতির গুণে কার্য্যসকল কি প্রকারে সংঘটিত হইতেছে, বুঝিয়া দেখা যাউক।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বস্তুতঃ জগৎ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বিষয় বলিয়া আমরা যাহা উপলব্ধি করি, সেই বোধ ও উপলব্ধি বাহিরে নহে, আমাদিগের ভিতরে।

বাহিরে অজ্ঞেয় পদ আছে—উহা জগৎ ; কিন্তু পদার্থ-সকল, জগদনুভূতি আমাদিগের অভ্যন্তরে, বাহিরে বলিবার কিছু নাই ; আমাদিগের আচমনের মন্ত্র ইহাই আমাদিগের লক্ষ্যে আনিয়া দেয় ; আমরা আচমন করিবার সময় এই মহাভাবই স্মরণ করি মাত্র। ইহা যদি হয়, তবে সর্ব্বপ্রথম দেখা যাউক, এই জগৎ প্রভৃতি কি ভাবে আমাদিগের ভিতরে অঙ্কিত ও অবস্থিত। আমি যখন কোন বস্তু দর্শন করিলাম বলি, তখন বুঝিতে হইবে, সেই অজ্ঞেয় পদের কোন এক বিশেষ প্রকার কম্পন আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় সাহায্যে আমার মনে উক্ত প্রকার একটী তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছে। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, সকল প্রকার অনুভূতিই এইরূপ ; ইন্দ্রিয়-প্রবিষ্ট একটী কম্পন আমার মনে প্রতিফলিত হইয়াছে মাত্র। ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। আমাদিগের ইন্দ্রিয়পথে আগত সকল কম্পনই কিন্তু আমরা অনুভবে আনি না বা আনিতে পারি না। যে কম্পনগুলি অবলম্বন করিয়া আমার "আমিত্ব" তদাকারে গঠিত করি, সেইগুলি আমার অনুভূতিতে আসে। কোন কিছু অনুভব করিলাম অর্থে বুঝিতে হইবে, আমি বা আমার "আমিত্ব" তৎসারূপ্য লাভ করিল। একটী ফুল দেখিলাম অর্থে, আমি অন্তরে ফুলের সারূপ্য লাভ করিলাম ; সুন্দর সঙ্গীত শ্রবণ করিলাম অর্থে আমি অন্তরে সঙ্গীত করিলাম। যখন কাহারও গান শুনি, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তখন বস্তুতই গায়ক হইয়া আমিও অন্তরে গান গাহিতেছি। যাহা হউক, আমার অন্তরে এইরূপ আমি নিজে পদার্থস্বরূপ হইতেছি এবং উহার দ্রষ্টা হইয়া দর্শন করিতেছি। আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মায়ের আমার বিভিন্ন স্বরূপে সারূপ্য লাভ করিতেছি, মায়ে সর্ব্বতোভাবে বার বার সংযুক্ত হইতেছি। মাতাপুত্রের এ অপূর্ব্ব আলিঙ্গন, সর্ব্বতঃ সংমিশ্রণ অহর্নিশ সংঘটিত হইতেছে।

ভাল, এই যে আমার অভ্যন্তরে আমি নিজে বহু পদার্থের সারূপ্য লাভ করিতেছি, অর্থাৎ চলিত কথায় বিষয় ভোগ করিতেছি, সে সকল পদার্থস্বরূপগুলি কি ? সেগুলি সত্য, না মিথ্যা ? সেগুলি ছায়াবাজীর মত মিলাইয়া যায়, না সত্যস্বরূপে অবস্থান করে ? সেগুলি থাকে, আমার মনে সংস্কারাকারে থাকে ; অস্তিত্ব হারায় না, সুতরাং সত্য। কল্পনা বল, অনুভূতি বল, প্রত্যক্ষীকরণ বল, সব থাকে—সত্য। কিন্তু সেগুলি আমার আমিত্ব দিয়া নির্ম্মিত। চিনির যেমন খেলনা তৈয়ারি হয়, সেগুলি তদ্রূপ আমিত্ব দিয়া গঠিত। অর্থাৎ আমিই তদাকার ধারণ করিয়া আমারই অভ্যন্তরে অবস্থান করি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু আমি উপলব্ধি করিয়াছি—আকাশ চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র, বায়ু জল স্থল, পশু পক্ষী মনুষ্য, যাহা কিছু, এ সমস্ত আমার ভিতরে অনুভূত হইতেছে। বহু যোজন দূরে সূর্য্য রহিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই দূরত্বের বিস্তৃতি অবধি আমার ভিতর অনুভূত। আমি কি মহান্! আমি বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছি। ইহাই আত্মমহিমার জগন্মূর্ত্তি।

আমার ভিতরের এই যে চিত্র বর্ণনা করিলাম, কার্য্যতঃ এই সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ মায়ের আমার উক্তরূপ কল্পনা বা অনুভূতি। মা আমার নিজ "আমিত্ব" দিয়া এই বিচিত্র অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গঠিত করিয়াছেন বা আপনি বিশ্বেশ্বরী বিশ্ব সাজিয়া বিরাজ করিতেছেন। আমার মনের ছবিগুলি যেমন আমি ছাড়া অন্য কিছু নহে, এ ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থটি, প্রত্যেক পরমাণুটী তদ্রূপ "মা" ছাড়া অন্য কিছু নহে। আমরা জীব, আমরা তদ্রূপ মা ছাড়া অন্য কিছু নহি। আত্মমহিমা ও আত্মা ব্রহ্মবাদে এক।

একটু প্রভেদ আছে। আমি যাহা অনুভব বা মনে প্রত্যক্ষ করি, তাহা দুই প্রকারের। এক—বহির্জ্জগতের কল্পনা ইন্দ্রিয়পথে প্রত্যক্ষভাবে আসিয়া উপলব্ধ হয়, আর এক—পূর্ব্বাগত অনুভূতি স্মৃতি আকারে থাকিয়া তাহাই আবার ঘুরিয়া অনুভূতিতে আসে। মায়ের আর বহিরাগত বলিয়া কিছুই নাই, সমস্তই যথাপূর্ব্ব স্মৃতির উদ্দীপনা। আর এক প্রভেদ, আমার কল্পনা বা মনের ছবি, প্রত্যক্ষভাবে অপরের অনুভূতিতে আসে না, তত স্থুল জড়ত্ব লাভ করিতে পারে না; মায়ের কল্পনাগুলি সকলের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইহা জীবত্বের লক্ষণ। অনেকে যোগশক্তিবলে অনেক বস্তু ইচ্ছায় সৃজন করিতে পারেন। মোহনাদি শক্তির দ্বারাতেও আমার নিজের মনের ছবি আমি অন্যকে উপলব্ধি করাইতে পারি। এ সমস্ত শুধু আমিত্বের ঘনীভূতির তারতম্য। "আমি" বিরাট্ "আমির" ভিতরে একটা "বিরাট্ আমিময় কল্পনা।" বিরাট্ "আমি" দিয়া আমারও আমিত্ব গঠিত। "আমি" বলিয়া একই জিনিষে তবে সমস্ত নির্ম্মিত। এই আমিকে যে উপলব্ধি করে, সেই ধন্য।

যাহা হউক, আমরা উক্ত বিচার হইতে ব্রহ্মসিদ্ধান্তে স্বচ্ছন্দে গিয়া উপনীত হইতে পারিলেও, উহা আমাদিগের এ স্থলে বিচার্য্য নহে। আমরা প্রকৃতির কথা বুঝিতেছিলাম। এই যে আমির কথা বলা হইল, ইহাই প্রকৃতির বিরাট্ অভিব্যক্তি। বিরাট্‌রূপে বাহিরে এবং তদ্রূপ বিরাট্‌রূপে অন্তরে "আমি" দিয়া গড়া মা আমার বিরাজিতা। আমিও যাহা দিয়া নির্ম্মিত, আমার দশ দিকে বিরাজিত ব্রহ্মাণ্ড-সকল, পদার্থ-সকল, সমস্তই সেই চৈতন্যময় আমিত্ব দিয়া গঠিত। মস্তিষ্ক যদি কল্পনার ক্ষেত্র হয়, তবে এই ব্রহ্মাণ্ড যেন মায়ের মস্তিষ্ক, আমরা তাঁহার কল্পিত ছবি। ঠিক যথাযথ ভাবে এই ভাবটী ধারণা করিতে পারিলে আর বুঝিবার কিছু বাকী থাকে না; অপ্রাপ্য বলিয়া কিছু থাকে না। কিন্তু বিশদভাবে এ বিষয়ে এ স্থলে আলোচনা করা সম্ভব নহে। পরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহা হউক, আমরা পাইলাম—আমাদিগের বাহিরে বিরাট্ প্রকৃতি এবং অন্তরে তদনুকরণে তাহারই অংশ আমার নিজের প্রকৃতি। বিরাট্ চৈতন্যময়ী বিশ্বজননী, অনন্ত কোটী পুত্রের মাতা আমার একার মা হইয়া, আমার একার আদরের, ভক্তির, ভালবাসার অধিকারী হইয়া, আমার একার পূজার দেবতা হইয়া, আমার একার সারথী, আমার

একার গুরু হইয়া আমার হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা। যাহাকে তোমরা সহজ কথায় স্বভাব বল, যাহাকে তোমরা জীবের প্রকৃতি বল, আমিও সেই প্রকৃতিরই কথা বলিতেছি। তাহাকেই গুরু ও দেবতা বলিয়া, তোমার চিরসঙ্গিনী বলিয়া, তোমার সুখ দুঃখের নিয়ন্তা বলিয়া বুঝিও। এই প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করান বা করিয়া থাকেন। বাহ্য বিরাট্ প্রকৃতি ও ইহা যে এক, সে কথা বলিয়াছি। বাহ্য জগৎ হইতে যে প্রকার কম্পন বা অনুভূতি বা ইঙ্গিত অন্তঃপ্রকৃতি গ্রহণ করিতেছে, সেই প্রকারেই যে আমরা অনুভব করি, ভাবময় হই, কর্ম্ম করি, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। বাহ্য প্রকৃতির স্নেহাভিব্যক্তি, যথাপ্রয়োজিত ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে অনুভব করিতেছে এবং ভাব ও কার্য্য জীবে জীবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকাশ পাইতেছে। বাহ্য প্রকৃতির অধীনে বা বিরাট্ চৈতন্যময়ী মায়ের অধীনে এইরূপে আমরা পরিচালিত হইতেছি। মনে কর, আমি একদিন সহসা কোন সৎসঙ্গ অথবা অসৎসঙ্গে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তৎসঙ্গগুণে আমার স্বভাব বা প্রকৃতি সম্পূর্ণ সৎ বা অসতে পরিণত হইল। অথবা মনে কর, আমার প্রকৃতির জ্ঞানের প্রভাব আমাকে একদিন সৎসঙ্গের জন্য চেষ্টিত করিল এবং আমি বহু চেষ্টায় সৎ হইলাম; এই সমস্তই বিরাট্ প্রকৃতির অনুশাসনে সংঘটিত হইল বুঝিতে হইবে। আমি নিজের ভিতর জ্ঞান ও বিচারের দ্বারা যখন নিজ জীবন-গতির কোন কোন অংশ নিয়মিত করি বা করিতে প্রয়াস পাই, মনে করিও না, তাহা বাহ্য প্রকৃতির অনুশাসনের অধীন নহে। আমার সে জ্ঞান, সে বিচারশক্তি বাহ্য হইতেই ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বহিরাগত অনুভূতি সঞ্চিত হইয়া আজ তাহা আমার স্বীয় প্রাকৃতিক জ্ঞান বা বিচাররূপে প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র। সুতরাং চৈতন্যময়ী প্রকৃতি বা মায়ের দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত।

তবেই দেখ, বাহিরে ওই যে একটী কুসুম বিকশিত হইয়া তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল ও তোমার প্রাণে ফুলের ভাব সাঞ্চত করিয়া দিল। ভাবিও না, উহা উদ্দেশ্যহীন একটী সহজ ঘটনা মাত্র; উহার তলে চৈতন্যময়ী মায়ের উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। নতুবা উহা তোমার দৃষ্টিপথে কখনও পড়িত না। মনে করিও না, ইহা আমার দৃষ্টিতে পড়িতে বাধ্য, উহাতে চৈতন্যময় কোন উদ্দেশ্য আছে, কেমন করিয়া বুঝিব? পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহা যদি দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হও, তবে বুঝিবে, সহজ জড়বৎ ক্রিয়া বা ঘটনা বলিয়া কিছু নাই। বস্তুতঃ প্রত্যেক জাগতিক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর মহৎচৈতন্যময় উদ্দেশ্য-সকল রহিয়াছে। আমার ইন্দ্রিয়পথে যাহা আমি পাইতেছি, ভাবিও না—উহা সহজ জড় উদ্দেশ্যহীন, আমার একার জন্য বিশিষ্ট উদ্দেশ্যশূন্য ঘটনা মাত্র। তাহা নহে। যাহা কিছু আমি উপলব্ধি করি, সমস্তই আমার জন্যই মঙ্গল উদ্দেশ্য বহন করিয়া আনে। বায়ুর ক্ষুদ্র তরঙ্গ

অনুভব, গলিত পত্রের ঈষৎ মর্ম্মর শব্দ, ধূলিকণার বায়ুভরে আমার অঙ্গে পতন, এইরূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনাও চৈতন্যময়ীর উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্ম্ম। আমার অনুভূতিতে যেগুলি আসে, সেগুলি আমারই জন্য, তোমার অনুভূতিতে যাহা আসে, সেগুলি তোমারই জন্য। মেঘের কৃষ্ণ বক্ষ ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ চমকিল—আমারই জন্য, রবিকর-সংপৃক্ত কুসুমস্তবক উন্মেষিত হইল আমারই জন্য, শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, ক্রমম্বয়ে ঋতু পরিবর্ত্তন আমারই জন্য। হইতে পারে, হয় ত অধিকাংশ বিরাট্ কার্য্য সাধারণের জন্য; কিন্তু তবুও তাহাতে আমার মুখাপেক্ষী উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া মাতৃচক্ষু আমার দিকে চাহিয়া আছে; কেন না, আমিও সাধারণের মধ্যে একজন। আমার জন্য মা আমার এত পরিবর্ত্তনশীলা, এত চাঞ্চল্যময়ী, এত কর্ম্মময়ী। দিকে দিকে আমার মুখ চাহিয়া মা আমার স্নেহচঞ্চলা! দেখ জীব, মাকে দেখ; রবির উদয়ে, চন্দ্রের কলাবিবর্ত্তনে, প্রভাতের শ্যাম ছায়ায়, মধ্যাহ্নের খর দীপ্তিতে, সায়াহ্নের ক্লান্ত মুখে মাকে আমার দেখ। তোমার ইন্দ্রিয়াগত প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনায় উদ্দেশ্যপূর্ণ মায়ের আমার মুখ চাওয়া পরিদর্শন কর। মায়ে ভুবন ছাইয়া রহিয়াছে, মাকে আবার খুঁজিবে কোথায়? এই ছবি দেখিয়াই সনাতন ঋষিবর্গ পাশ্চাত্ত্যের চক্ষে জড়োপাসক বলিয়া প্রখ্যাত! আবার এই ছবি দেখিয়াই তাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত। লুটাও প্রতি তরুর পদতলে, লুটাও প্রতি শিলার বক্ষে, লুটাও প্রতি ধূলিকণায়, প্রতি জলধারায়, প্রতি পদার্থে—বল, এস—এস স্নেহময়ি—তোমায় পাইয়াছি, তোমায় দেখিয়াছি, তোমার সত্য অমৃত জ্যোতিঃস্বরূপ আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। লহ মা, প্রণাম লহ মা! প্রণাম লহ আমার দিক্‌দিগন্তব্যাপিনী মা রে! প্রণাম লহ আমার অন্তর্বাহ্যব্যাপিনী মা রে! প্রণাম লহ আমার স্নেহতরঙ্গবিহ্বলা, উন্মুক্তবক্ষা, ক্ষীরধারার নির্ঝরিণী মা রে! অথবা বল—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্ব্বং আবৃত্য তিষ্ঠতি॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিরাট্ প্রকৃতির বা মায়ের কর্ত্তৃত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে করিতে নিজ ক্ষুদ্র আমিত্ব বা ক্ষুদ্রবৎ প্রতিপন্ন সারথীরূপী প্রকৃতি বিরাটত্ব লাভ করে এবং বিরাট্ কর্ত্তৃত্বে ক্ষুদ্র কর্ত্তৃত্ব বিলীন হইয়া যায়। যত ক্ষণ বিরাট্ প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব উক্ত প্রকারে ধারণায় না আসে, তত ক্ষণ ক্ষুদ্র কর্ত্তৃত্ব বলবৎ থাকে। সে কর্ত্তৃত্বের চরম লক্ষ্য, ওই বিরাট্ কর্ত্তৃত্ব অনুভব, বিরাট্ স্বরূপ পরিগ্রহণ এবং তাহার অন্তরে অপরিণামী প্রত্যগাত্মারূপে নিজ অবস্থান।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

হে মহাবাহো! তু কিন্তু গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ গুণেভ্যঃ কর্ম্মভ্যশ্চ আত্মনো বিভাগঃ

এতয়োঃ, তত্ত্ববিৎ গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে, কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—কিন্তু হে মহাবাহো! গুণ ও কর্ম্ম হইতে অপরিণামী আত্মার বিভাগতত্ত্ববিৎ, গুণ গুণে প্রবর্ত্তিত হইতেছে বা ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, এইরূপ বুঝিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান রাখেন না।

যৌগিক অর্থ।— পূর্ব্বে মা আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন, কিরূপে ক্ষুদ্র প্রকৃতি ও বিরাট্ প্রকৃতি পরস্পর আলিঙ্গিত ও সংমিশ্রিত হইতেছে, গুরুতে ও দেবতাতে কি প্রকারে সংমিলন সংঘটিত হইতেছে, ক্ষুদ্র আমি কিরূপে বিরাট্ আমির সহিত সাযুজ্য লাভ করিতেছে। সেই উপলব্ধিটুকু হৃদয়ে যখন ঘনীভূত হয়, যখন সম্যক্‌রূপে এই দুইয়ের একত্ব মাত্র অনুভূতিতে আসিতে থাকে, তখন 'আমির' মিলন দেখিতে দেখিতে সাধক তন্ময় হইয়া যায়, তখন 'অহমেব ইদং সর্ব্বং' এইরূপ বোধ হয়। তখন সেই অবস্থায়, সেই গুরু ও ব্রহ্মের একত্ব লাভের অবস্থায় আমিত্বশূন্য একটি নিজবোধ, একটা পূর্ণ নিশ্চিন্ততার আভাসযুক্ত আনন্দঘন আকাশবৎ অপরিণামী সত্তারূপে সাধক আপনাকে ওই 'অহং'এরও মূলে দেখিতে থাকে। গুরুমুখে দেবতা ছুটিতেছে, দেবতামুখে গুরু ছুটিতেছে, ইন্দ্রিয়মুখে বিষয় ধাবিত হইতেছে, বিষয়মুখে ইন্দ্রিয় ধাবিত হইতেছে, স্নেহমুখে প্রীতি, প্রীতিমুখে স্নেহ, করুণামুখে কাতরতা, কাতরতামুখে করুণা, নির্ভরতা মুখে সাহচর্য্য, সাহচর্য্য মুখে নির্ভরতা, এ আদান প্রদান, এ একীকরণ, এ মিলন, এ গুণে গুণে সংমিশ্রণ সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বত্র সংঘটিত, আমি কোথায়—আমার কি আছে! শুধু রহিয়াছি, শুধু স্বীয় সত্তা, শুধু নির্ম্মল সৌম্য পুণ্যবিধৌত শুভ্র আকাশের বিকাশভাব-সম্বলিত নিত্য সনাতন অবস্থান! আঃ! জ্বালাহীন, উচ্ছ্বাসহীন, শান্ত শ্যামচ্ছায়াবৎ প্রাণ-জুড়ান অনুভূতি, শুধু নব প্রভাতের নবীন জাগরণ! কি সুন্দর, কি সুন্দর! শুধু গুরু ও দেবতার রমণের তলে নিজ শিবসত্তাকে এই ভাবে সে সাধক সম্ভোগ করিতে থাকে। সে অবস্থার স্মরণেও প্রাণ পুণ্যস্নাত হইয়া পড়ে, উপলব্ধির কথা লিখিয়া কি প্রকাশ করিব।

যাহা হউক, স্থূলতঃ তখন জাগতিক সমস্ত ব্যাপার মাত্র বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মিলন মাত্র বলিয়া অনুমিত হয়; মূল আত্মাতে লিপ্ত নহে, আমার তাহাতে কর্ত্তৃত্বাদি নাই, ওই বিরাট্ 'অহং'রূপী মহিমার বা প্রকৃতির লীলা, এইটী ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। গুণে গুণে সংমিশ্রণ; যেন মাতার সম্মুখে পুত্র ও পুত্রবধূ-মিলন! অথবা শিশু পুত্রের সম্মুখে পিতামাতার আনন্দালাপ। সত্ত্বগুণ সত্ত্বে, রজোগুণ রজে, তম তমে গিয়া মিলিতেছে। আমি দ্রষ্টা মাত্র। বাহিরে যে গুণের বিকাশ দেখিতেছি, আমার অন্তরে সেই গুণ অমনি উদ্দীপিত বা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। সেই যে গুণের উদয়, উহা মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়াই উদিত হইল বুঝিতে হইবে।

আমি তোমাকে ক্রোধান্ধ দেখিলাম, আর অমনি আমার ক্রোধের স্মৃতি জাগরিত হইল কেন? তোমার সে গুণ আসিয়া আমার ক্রোধে মিলিত হইয়াছে বলিয়া। হয় ত উহা আমাকে ক্রুদ্ধ করিতে পারিল না, কিন্তু একটু পুষ্ট নিশ্চয় হইয়াছে, নতুবা আমার স্মৃতিতে উদিত হইত না। এইরূপ সত্ত্ব, রজ ও তম-আত্মক যত কিছু ব্যাপারে বুঝিতে হইবে।

এই জন্য আপনাকে মহাভাবাপন্ন রাখিয়া জগতে বিচরণ করিতে হয়। নতুবা জগতের সমস্ত গুণ আমাতেই সংক্রমিত হয়। গুণে গুণে মিলন হইতেছে, আমি দ্রষ্টা, অপরিণামী—এই মহাভাব ফুটাইবার এই জন্যই এত আবশ্যকতা। এবং সেই জন্যই সাংখ্য হিসাবে জ্ঞানের পরিণামী ও অপরিণামী অবস্থা বিভাগ করিয়া অপরিণামী সত্তায় অবস্থান করিবার উপদেশ প্রতিপাল্য। ওইরূপ অপরিণামী সত্তায় অবস্থান সিদ্ধ হইলে তখন তাহাকে আত্মানাত্মতত্ত্ববিৎ বলে।

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ যে জনাঃ গুণকর্ম্মসু গুণেষু ইন্দ্রিয়াদিষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে, কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞঃ তান্ অকৃৎস্নবিদঃ অজ্ঞান্ মন্দান্ ন বিচালয়েৎ।

ব্যবহারিক অর্থ।—প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণে মুগ্ধ হইয়া যাহারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়কার্য্যে অনুরক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও নিম্নাধিকারীদিগকে বিচালিত করিবেন না।

যৌগিক অর্থ।—প্রকৃতি অংশে ক্রিয়া, আত্মবোধাংশে ক্রিয়া নাই। প্রকৃতির দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইতেছে। মা আমার সমস্ত করিতেছেন; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ তাহা উপলব্ধি করে, নিম্নাধিকারী তাহা পারে না। নিম্নাধিকারী সাধক মায়ের কর্ত্তৃত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়া, আপনি কর্ত্তা সাজিয়া, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মিলনে উদ্যোগী হয়, আপনি কর্ত্তৃত্বাভিমানে পূর্ণ হইয়া যেন আমি সমস্ত করিতেছি, এইরূপ ভাবিয়া ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে, বিষয়ে বিষয়ে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। মা বলিতেছেন, এইরূপ নিম্নাধিকারীদিগকে তাহাদিগের এই কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে বিচালিত করিতে প্রয়াস পাইবে না। যত ক্ষণ কর্ত্তৃত্বজ্ঞান থাকিবে, তত ক্ষণ চেষ্টা বলিয়া জিনিষ থাকিবে; এবং তত ক্ষণ তাহাকে কর্ম্ম হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র হইবে। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও চেষ্টা একত্রে অবস্থান করে, একত্রে বিলুপ্ত হয়; এবং উহাদিগের প্রযত্নেই আমরা ইন্দ্রিয় ও বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকি। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব থাকিতে কর্ত্তব্যের অবসান নাই।

প্রকৃতিরূপিণী মা আমাদিগকে যত ক্ষণ ইন্দ্রিয়মুগ্ধ করিয়া রাখিবেন, তত ক্ষণ তাহাতে সাধারণতঃ নিরস্ত হইতে পারা যায় না। তবে তখনকার উপযুক্ত কর্ম্ম কি? সে চেষ্টাকে মাতৃমুখী চেষ্টায় পরিণত করাই প্রশস্ততর কর্ম্ম। একেবারে ত্যাগ

করিতে প্রয়াস পাওয়া অপেক্ষা মাতৃউদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বহন করাই সমধিক যুক্তিযুক্ত। সেই কথা পরশ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন।

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য অধ্যাত্মচেতসা আত্মনি অর্পিতেন চেতসা নিরাশীঃ নিষ্কামঃ নির্ম্মমো মমতাশূন্যো ভূত্বা বিগতজ্বরঃ সন্ যুধ্যস্ব।

ব্যবহারিক অর্থ।—সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্থাৎ প্রকৃতিযুক্ত পুরুষোত্তমে বা ঈশ্বরীতে সমর্পণ করিয়া, আমাতে মন রাখিয়া নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া, বিগতজ্বর হইয়া যুদ্ধ কর।

যৌগিক অর্থ।—নিরাশী, নির্ম্মম কি মুখে বলিলেই হয়! আশার প্রবল সঞ্জীবনী শক্তি কি আপনি সহজে জীবাত্মাকে ছাড়িতে চায়! মমতা কি তপ্ত বালুকার মাঝে জলবিন্দুর মত সহজে শুকাইয়া যায়! জীবের চক্ষে আশার দৃষ্টি নিত্য প্রতিষ্ঠিত, মমতার আকুল উদ্বেগ হৃদয়ের অভ্যন্তরে ব্রহ্মাণ্ডকে জড় করিয়া আনিবার জন্য নিত্য লালায়িত। নিরাশী, নির্ম্মম কি বলিলেই হওয়া যায়? তবে ভগবান্ এ অসম্ভব কথা বলিলেন কেন? ভগবদ্‌বাক্য কি শুধু মনোহর শব্দবিন্যাস মাত্র? তাহা নহে। নির্ম্মম নিরাশী বস্তুতঃই হওয়া যায় বা জীব হয়। বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিলে, বুদ্ধিযোগে দুই-চারি পদ অগ্রসর হইলেই বুঝা যায়, জাগতিক বিষয় হইতে আশা ও মমতা গুটাইয়া, অন্য এক উচ্চতর ক্ষেত্রে সংন্যস্ত হইতেছে। মায়ে বুদ্ধি নিবিষ্ট হইলেই সমস্ত আশা এক মহতী আশায় পর্য্যবসিত হয়, সমস্ত মমতা এক মহামমত্বে গিয়া মিলাইয়া যায়। সে আশা ও মমতার একমাত্র কেন্দ্র—মা। মাতৃ-পদলাভের আশা, মাতৃ-পদে মমতা, ইহাই সাধকের হৃদয়ে পর্ব্বতবৎ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। মা! তোমাকে চাই—মা! তুমি আমার, ইহাই সাধকপ্রাণের আকুল অভিব্যক্তি। এইরূপ অভিব্যক্তি প্রাণে না হইলে জীব বিগতজ্বর হইতে পারে না; এবং বিগতজ্বর না হইলে যুদ্ধ করা চলে না। জ্বর কি?—বিষয়চিন্তা। মনুষ্যের চিন্তাই জ্বর; যত ক্ষণ আশা ও মমতা, তত ক্ষণ চিন্তা; আশা ও মমতা দূর হইলেই চিন্তাও চলিয়া যায়, মহাজ্বরেরও মহাবিরাম আসে; বহু কাল পরে জীব শান্তিলাভ করিয়া, অমৃতাভিষেকে নবস্নাত হইয়া মাতৃচ্ছায়ায় জুড়াইয়া যায়। চিন্তা থাকে না—চিত্ত মায়ে সংস্থাপিত হয়। তখন জীব যুদ্ধের উপযুক্ত হয়; তখন জয় মাত্র তাহার অঙ্কশায়ী হয়। তখন ক্ষুদ্র সংস্কার আসিয়া আবির্ভাব হইলেই, দীপ্ত অরুণে তুষারের মত কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন সে সাধক দেখিতে পায়, যথার্থ যুদ্ধ তাহাকে করিতে হইতেছে না, সে যেন উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া রহিয়াছে; এক মহতী শক্তি—যাহার দ্বারা সে নিজে গঠিত,

অনুপ্রাণিত, চৈতন্যযুক্ত, সেই মহাশক্তি তাহাকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া লইয়া যেন রণক্রীড়া করিতেছেন। এ কথা ভগবান্ একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন।

অনেকে মনে করিতে পারে, যদি বিগতজ্বরই হইল—যদি নির্ম্মম ও নিরাশী হইল, তবে আর কিসের যুদ্ধ—কাহার সহিত যুদ্ধ? যুদ্ধ ত বিষয়-মায়ার সঙ্গে। তাহাই যদি না হৃদয়ে রহিল, তবে আর যুদ্ধ কি? বাস্তবিক পক্ষে বিষয় হৃদয়ে যে থাকে না, তাহা নহে; বিষয়সংস্কার থাকে, তাহার উদ্বেলন থাকে না, অপরিণামী নিজবোধ দর্শনে তাহার অভিব্যক্তি থাকে না। যত দিন বিষয়জ্ঞানাত্মক জীবদেহ ধারণ করিতে হয়, তত দিন বিষয় থাকে। বাহ্য জগৎ বার বার সে বিষয়-সকলকে ফুটাইয়া দিতে থাকে, বার বার সে বিষয়ের মূলীভূত কারণ অহংকার হৃদয়ে লিপ্ত হইতে প্রয়াস পায়, কিন্তু বার বার তাহা ওই আত্মদর্শনে বিশুষ্ক হইয়া অস্তিত্ব হারায়। সাধক বিষয়কে যত দিন বিষয় বলিয়া বুঝিতে পারে, যত দিন চন্দ্র সূর্য্য, বৃক্ষ তৃণ চক্ষে অচিৎরূপে প্রতিভাত হয়, যত দিন পদার্থ জ্ঞান থাকে, তত দিন বিষয় আছে বা বিষয়সংস্কার আছে বুঝিতে হইবে। তত দিন ওইরূপে আত্মদর্শনপ্রয়াসই যুদ্ধ। সমস্তই ওই বিরাট্ ঈশ্বরীর নিজ অহংকার, উহাও তোমার মা—আমার নহে, এই ভাবে অর্পণ করা ও নিজ স্বরূপ দর্শন করা, ইহাই যুদ্ধ।

যাহা হউক, মায়ে চিত্ত সংন্যস্ত হইলে, মায়ে আত্মসমর্পণ হইলে, তবে এরূপ নিরাশী ও নির্ম্মম হইতে পারা যায়। মায়ের জন্য সমস্ত কর্ম্ম করিতেছি, অথবা মাকে পাইবার জন্যই আমার সমস্ত কর্ম্ম, আমার আহার নিদ্রা, জীবনধারণ, রোগ, শোক, ভোগ, কর্ম্ম, চেষ্টামাত্র সমস্তই মায়ের, এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইলেই তবে মায়ে কর্ম্ম সম্যক্ সমর্পিত হয়। অবশ্য একবারে ইহা হয় না, কিন্তু ইহা অভ্যাসের দ্বারা লব্ধ হইতে পারে। আমি যাহা কিছু করিতেছি, সমস্ত মাকে পাইবার জন্য; আমার শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সমস্ত চেষ্টা একমাত্র মায়ের নিকট আমায় লইয়া যাইবার জন্য অর্থাৎ মায়ে অহং সমর্পণের জন্য, এ সত্যজ্ঞান হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। আমি সত্য, আমার প্রত্যেক উদ্যম সত্য, আমার প্রত্যে কর্ম্ম সত্য, আমার নিশ্বাসটী হইতে মাতৃপূজা পর্য্যন্ত সমস্ত সত্য, সফলতাময়,—আমি মাকে পাইতেছি, আমার সহিত মহাসত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতেছে—আমি কুসুমাঞ্জলি লইয়া মাতৃ উদ্দেশ্যে জলে অর্পণ করিলাম, ইহা জলে অর্পিত হয় নাই, মায়ের শ্রীপাদপদ্মে সত্য অর্পিত হইয়াছে, সত্যই উহা মহাসত্যে প্রদত্ত হইয়াছে, সত্যই উহা মহাসত্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে বিচার নাই, প্রমাণ-প্রয়োগ নাই, ইহা অনুমানসিদ্ধ নহে, সর্ব্বব্যাপিনী মায়ে—সর্ব্বব্যাপী মহসত্যে সত্য কুসুমাঞ্জলি সত্য সত্যই অর্পিত হইয়াছে—এইরূপ সত্য ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল না থাকিলে মায়ে কর্ম্ম অর্পিত হয় না,—উহা কথার কথা মাত্র হইয়া পড়ে। যত ক্ষণ নিজকর্ম্মে সংশয় থাকিবে, তত ক্ষণ সাধনায় অগ্রসর হইতে কেহ পারে-না।

মাকে যত ক্ষণ সর্ব্বময়রূপে ধারণা করিতে না পারা যায়, তত ক্ষণ সর্ব্ব কর্ম্ম মায়ে সমর্পণ বা মায়ের সহিত আদান-প্রদান অথবা মায়ের সহিত সম্যক্‌ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায় না। সুতরাং মাকে সর্ব্বময় ধারণা করিবার জন্য প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় কি? উপায় আবার কি, যাহা সত্য, অবিসম্বাদিত, তাহার লাভের জন্য আবার উপায় স্থির কি? ঘোরতর অবিশ্বাসে প্রাণ পুরিয়া রাখিয়াছ বলিয়াই এত উপায়ের আবশ্যকতা কল্পনা কর, এত পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়, এতই সংকীর্ণ সংশয়-মর্দ্দিত হৃদয়ে মড়ার মত জীবন অতিবাহিত কর। এই সমস্ত বিশ্বকে মা বলিয়া বুঝ; ইহাই উপায়। ইহা কাল্পনিক কথা নহে, সত্য—মহাসত্য; সেই মহাসত্যের ধারণা কর। এই কথা শুনিলেই অনেকে হয় ত পশ্চাৎপদ হইবে, না হয় নাসা কুঞ্চিত করিবে। "সাদা কথা" অথবা "বড় কঠিন" ইত্যাদি মত প্রকাশেই অন্য কিছু শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। তাহারা যথার্থ অন্বেষী নহে। বস্তুতঃ ইহা কঠিন নহে, সরল সত্য, এবং সাধনার সরল সত্য পথ। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের গৌরব এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ আবিষ্কার। ব্রাহ্মণের একমাত্র সত্য সম্পত্তি এই মহাসত্য। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মা ভিন্ন কেহ নহে, তোমার চিন্ময়ী আশ্রয়দাতা—চৈতন্যময়ী। প্রতি পদার্থকে এই ভাবে পরিদর্শন করাই সাধনার আরম্ভ ও শেষ।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যেমন আমাদিগের মস্তিষ্কের মধ্যস্থ ভাবরাশি আমারই অভ্যন্তরে, আমার আমিত্ব দিয়া গঠিত হয়, তদ্রূপ এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মায়ের ভাবরাশি মাত্র, ভাবের লহর মাত্র। আমার ভাবরাশি আমি অনুভব করি, মায়ের ভাব-সকল জীব-জগৎ উপলব্ধি করিতে পায়, এই মাত্র প্রভেদ। এই কথাটী মর্ম্মে মর্ম্মে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিয়া লইতে হইবে। সাধনার ইহাই প্রকৃত রহস্য। ব্রহ্মাণ্ড বলিলেই যেন মনে পড়িয়া যায় যে, এ সমস্ত একটী বিরাট্ হৃদয়ের বা বিজ্ঞানের ছবি মাত্র। আমি তুমি, বৃক্ষ লতা, পর্ব্বত আকাশ জ্যোতিষ্কপুঞ্জ মায়ের মস্তিষ্কের ছবি, মায়ের আমিত্ব উক্ত আকারে প্রস্ফুরিত; মা আমার এত রূপে সাজিয়াছেন। আর আমরাও যখন উহা দেখিতেছি অর্থাৎ বিষয়-সত্তার ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে, তখন আমরাও উক্তরূপে সাজিতেছি মাত্র। কেন না, পদার্থ বলিয়া আমাদিগের অনুভূতিগুলি আমাদিগের ভিতরের জিনিষ, বাহিরের নয়; ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, এ পদার্থ-সকল কার্য্যতঃ মায়ের ভিতরে। মা আমার ভাবময়ী হইয়া স্বীয় আমিত্বের দ্বারা আপনাকে এইরূপে গড়িয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জননীর ভিতরে এই সমস্ত জিনিষ। স্বীয় মহিমাতেই তিনি আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিতা।

এই ধারণাটী সুচারুরূপে করিয়া লহ। যেমন কোন বিস্তৃত প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার সাজসজ্জা পরিদর্শন কর, এবং গৃহগুলি কেমন সজ্জিত বলিয়া মনে মনে প্রশংসা কর, তদ্রূপ তোমার যত ধারণা-শক্তি, যত বহুদর্শিতা ও জ্ঞান

আছে, ব্রহ্মাণ্ড বলিলে যত কিছু বুঝ, সেই সমস্তকে একসঙ্গে লইয়া মনে কর, মায়ের ভিতর কি অপরূপ দৃশ্য। যেমন মানুষ গৃহে প্রবেশ করে, তুমি যেন "মা" বলিয়া একটী জিনিষে তদ্রূপ প্রবেশ করিয়াছ, এবং তাহার ভিতরে এই সমস্ত দেখিতে পাইতেছ। মা বলিয়া একটী গৃহের মধ্যস্থ প্রদর্শনীক্ষেত্রে বিচরণই যেন তোমার জীবন। অথবা যেমন কোন একটী ফলকে চিরিয়া ফেলিলে তাহার মধ্যে শস্য বীজ আদি সব দেখিতে পাও, তদ্রূপ যেন মা বলিয়া একটী জিনিষ চিরিয়া ফেলা হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে এই সমস্ত আকাশাদি পদার্থ পরিদৃষ্ট হইতেছে, এবং তুমিও তাহার মধ্যে আজীবন পরিভ্রমণ করিতেছ।

এই ভাবে মায়ের অভ্যন্তরে অর্থাৎ নিজের ভিতরে অহর্নিশ বিচরণ অভ্যাস কর। প্রত্যেক পদার্থকে চৈতন্যময় বলিয়া বুঝ। সব যেন চক্ষুময়—সব যেন তোমার ভিতরেই তোমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। মাতৃদৃষ্টি যেন চৈতন্যময় পদার্থরূপে চারিধার হইতে তোমার মুখ চাহিয়া। বিষয়-ভোগের স্থালী হাতে লইয়া মা অবস্থান করিতেছেন। চন্দ্র সূর্য্য হইতে সূচনা করিয়া তৃণগাছটী অবধি সকলই তোমার ভোগের জন্য—সব তোমার একার জন্য, তোমার একার যে মা, তোমার একার ভোগের জন্য বিশ্ব-রূপিণী হইয়াছেন। তুমি শুধু বিষয় দেখিতে চাহ বলিয়া মায়ের কর অন্তরালে লুক্কায়িত ; তুমি মাকে দেখিতে চাহ, মায়ের কর দেখিতে পাইবে ; মা কেমন করিয়া হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া তোমায় ভোগ-সকল দিতেছেন, তাহার উপলব্ধি হইবে। আর সেই মায়ের মধ্যে তুমি ভোক্তা ও অভোক্তা আত্মা।

বস্তুতঃ তোমার প্রকৃতি যেরূপ, তুমি সেই ভাবেই বিষয় ভোগ কর ; সুতরাং জগৎকে তুমি ঠিক যেরূপে দেখ—ভোগ কর, ঠিক সেইরূপে দেখিতে, ভোগ করিতে আর কেহ পারে না। সকল জীবের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিরূপে মা অবস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভোগাধিকার ভিন্ন ভিন্ন জীবকে দিতেছেন। তোমার জগৎদর্শন অন্য কাহারও সহিত মিলিতে পারে না। সুতরাং তোমার একার মা তোমার একার ভোগের জন্য তোমার একার ভোগের অন্তর্ম্মূর্ত্তি ধরিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহা কাল্পনিক কথা নহে, দার্শনিক সত্য। ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।

এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল কর ; এই মহাসত্যের সাধক হও। অনন্ত শক্তি, অনন্ত সত্যপ্রতিষ্ঠা, অনন্ত জ্যোতিঃপ্রকাশের সন্ধান পাইবে, এবং তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে। মুহূর্ত্তের জন্য পিছাইও না। ক্ষুদ্র অনুভূতিহীন শুষ্ক জ্ঞানের বিচারকালিমা আনিয়া এ সোনার ছবি কালিতে ঢাকিও না। মাকে আমার তোমার অন্তরের দশ দিকে জাগ্রতা, উদ্বুদ্ধা, স্নেহদৃষ্টি-সম্পন্না দেখ। বাহিরেও তোমরা যাহাকে জড় বল, সেই মৃত্তিকা, আকাশ, জল, অগ্নি, বায়ু, বৃক্ষ লতা ইত্যাদিতে সাধনার অভ্যাস আরম্ভ কর। কেন না, ভিন্ন ভিন্ন ভাবপ্রবাহে অহর্নিশ তরঙ্গিত মনুষ্যাদি জীব-জগতের উপর

তোমার এ সাধনা আরম্ভ করিতে প্রয়াস পাইলে তাহাদিগের ভাব-চাঞ্চল্য তোমার সাধনাকে চঞ্চল করিয়া তুলিবে। সেই জন্য জড়ে সাধনার প্রতিষ্ঠা কর। বিচার আনিও না। আকাশ, চন্দ্র সূর্য্য, জল স্থল, বৃক্ষ লতা, যখনই প্রাণে একটু নির্জ্জনতা পাইবে, তখনই এই সমস্তে সাক্ষাৎ সর্ব্বব্যাপিনী, বিশালনয়না, স্মেরাননা, স্নেহঘন-মূর্ত্তি মাকে দর্শন কর এবং পার যদি, অন্তর্জ্জগতেও ওইরূপ কর। যদি সহস্র যুক্তি আসিয়া সম্মুখে তাহার বস্তুত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়—গ্রাহ্য করিবে না। মা আমার—মা আমার বলিয়া, সত্যস্বরূপ আমি সত্য মায়ের সম্মুখে বা মাতৃবেষ্টনে অবস্থিত, এইরূপ ভাবিয়া তাহার সহিত সত্যভাবে প্রাণের আদান প্রদান কর। সত্য ধারণা প্রাণে থাকিলে আদান প্রদানের আর কিছু খুজিয়া পাইবে না। "বলিবার কিছু নাই, চাহিবার কিছু নাই, জানিবার কিছু নাই, প্রণাম লহ মা—প্রণাম লহ মা," শুধু প্রাণ সে বস্তুরূপিণী মায়ের পদতলে এই বলিয়া লুটিয়া পড়িতে চাহিবে। তখন শুধু সেই পদার্থটি মাত্র তোমার মনে থাকিবে না; তখন মহাশক্তির এক বিস্তারক্ষেত্র, মহাচৈতন্যের এক প্রকাশময় ব্যাপ্তিসংযুক্ত হইয়া সেই পদার্থ অনুভবে আসিবে। যেন সেই পদার্থ টী, সে শক্তি-বিস্তারের, সে চৈতন্যব্যাপ্তির কেন্দ্র, আর তুমি সেই শক্তিবিস্তার, সেই চৈতন্য-ব্যাপ্তির সেই কেন্দ্রসমীপে—তোমার দশ দিক্ শক্তিতে, চৈতন্যে, সত্য ঘন এক মহান্ অপরিণামী অস্তিত্বে ভরা, এই ভাব তোমায় স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া দিবে।

এইরূপে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ধর্ম্মবিচারে জীবের অধিকার নাই। এই সত্যপ্রতিষ্ঠার অভাবেই জীব শত শত শাস্ত্র পাঠে, শত শত সাধুর উপদেশেও ধর্ম্মরসে বঞ্চিত থাকে। সত্য অমৃতের আস্বাদ পাইতে হইলে এ প্রতিষ্ঠা, মায়ের সহিত এ সম্বন্ধ চাইই চাই। এই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই বাসুদেব আদি নামে তাহার সাধনার ব্যবস্থা আছে। এই সত্য ভাব অবলম্বন করিয়া যত্ন করিবে; শুধু বাসুদেবাদি নাম মুখে সহস্র বার বলিলে ফলাশা তদ্রূপ নাই।

শুন—আবার বলি; তুমি মধ্যস্থলে—আকাশ, নক্ষত্র, বৃক্ষলতাদি ভোগসম্ভার তোমারই জন্য তোমার চারি ধারে, মা মহাভোগের থাল লইয়া তোমার মুখ চাহিয়া। কি চাহ? ভোগ চাহ—না, যে মা এমন অপূর্ব্ব ভোগসম্ভার সাজাইয়া অপূর্ব্ব ভাবে তাহার অন্তরালে লুকাইয়া থাকে, সেই মাকে চাহ? মা মা করিয়া উঠ, সেই মাকে চাহ। তখন দেখিবে, তোমার সমস্ত কর্ম্ম মায়েই সংন্যস্ত হইতেছে; প্রতি কর্ম্মের ভিতর দিয়া তুমি মাকে শুধু বলিতেছ, আমায় সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর, আমায় প্রকাশক্ষেত্রে লইয়া চল; আমায় অমৃতের রাজ্যে লইয়া চল। সত্য তুমি, সত্য তুমি, সত্য আমি তোমার, আমি তোমাতে; কিছু নাই, কিছু নাই—কেবল তুমি। আত্ম অনাত্ম, উভয় মূর্ত্তিই একের—ইহাই ঈশ্বরীবোধ। পরিস্ফুট করিয়া উভয় লিঙ্গ দেখাই আত্মানাত্ম বিচারের উদ্দেশ্য।

শঙ্করাদি ভাষ্যকার বলিয়াছেন, এ কর্ম্মসন্ন্যাসের লক্ষণ দাস্যভাব। দাস যেমন প্রভুর কর্ম্ম সমাধান করে, সাধকও তদ্রূপ মায়ের কার্য্য ভাবিয়া জগতের কার্য্য সম্পাদন করেন। কিন্তু প্রকৃত সাধকের অবস্থায় তদ্রূপ হয় না। সাধকের অবস্থা মত্তাবস্থা; দাস্যভাবের কুণ্ঠা তাহাতে থাকে না। অপরাধ, ঔদাস্যের ভয় তাহাতে নাই। তাহা পূর্ণ প্রাণ, পূর্ণ প্রকাশ, পূর্ণ আনন্দের লীলা-চাঞ্চল্যময়। তাহা জগতে সরল শৈশবীয় বিচরণ। ভূত ও ভবিষ্যৎ, এই দুইটা তাহার প্রাণে আধিপত্য বিস্তার রাখিতে পারে না। কি হইল না হইল, সাধক তাহার ধারণা ধরে না। সাধক আনন্দেও দেখে মা, নিরানন্দেও দেখে মা। মা তার আনন্দময়ী—সে আনন্দময়।

অবশ্য এ আনন্দাবস্থা তত ক্ষণ আসে না, যত ক্ষণ পূর্ব্বোক্ত সত্য-প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে না হয়। সত্য পূর্ণরূপে যত প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, তত সাধক অন্তরে এক চৈতন্যময় সত্তার আভাস পাইতে থাকে। এক চিতের সন্ধান সর্ব্বত্র সে পায়, এক চিতের লীলাবিলাস সর্ব্বত্র সে পরিদর্শন করে। তখন সে আনন্দ পায়; তখন সৎ চিৎ আনন্দ লাভ হয়। প্রথমে সৎ বা সত্যের প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়তঃ এইরূপ করিতে করিতে সত্য-চৈতন্যের আভাস ও উপলব্ধি এবং তৃতীয়তঃ সেই সত্য-চৈতন্যের আনন্দময়রূপে প্রকাশ। এইখানে বলিয়া রাখি—সৎ বলিতে মাত্র সত্য অস্তিত্ব বুঝায়, চিৎ বলিতে চৈতন্যযুক্ত সত্য বুঝায় এবং আনন্দ বলিতে চৈতন্য ও আনন্দযুক্ত সত্য বুঝায়।

তাই বলিতেছিলাম—যদি সাধক হইতে চাহ, তবে সত্যের প্রতিষ্ঠা কর। অন্তঃক্রিয়া করিবার সময় মনে কর, সত্য মায়ের শ্রবণ-কুহরে তোমার আহ্বান প্রবেশ করিতেছে; অথবা সত্যই তুমি সত্যের শান্তিময় প্রকাশক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেছ। বাহ্য জীবনে সাধারণ কার্য্যও তদ্রূপ সত্যভাবে মণ্ডিত কর। এবং অবসর পাইলেই—বাহিরে বা অন্তরে নির্জ্জনতা পাইলেই—যে বস্তু সম্মুখে পাইবে, বৃক্ষ হউক, বায়ু হউক, আকাশ হউক, জল হউক, অগ্নি হউক, তাহার সম্মুখে লব্ধকাম নিশ্চিন্ত পুরুষের মত দাঁড়াও, কৃতজ্ঞতার নিবিড়তায় তুমি নমিত হইয়া পড়, তোমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে থাকুক, প্রাণের ভিতরে আকাশ প্রকাশ হইতে থাকুক, হৃদয় শ্যামচ্ছায়ায় শীতল হইতে থাকুক; তোমার প্রতি মাতৃস্মরণ তোমার প্রতি পরমাণুকে ঝঙ্কারময় করিয়া তুলুক। সত্যে বিচরণ কর, সত্য নিশ্বাস লহ—সত্যের ধারণায় মগ্ন হও; মহাসত্য অচিরে তোমায় সত্যক্ষেত্রে উঠাইয়া লইবেন।

যখন যে পদার্থের উপর এ ধারণা অভ্যাস করিবে, তখন বিচারের সাহায্য লইও না। ইহা সত্য নহে, ইহার অভ্যন্তরে সত্য আছে, ইহার রূপ নাম সত্য নহে, ইত্যাকার ভেদজ্ঞান বুকে আসিতে দিও না। তাহা হইলেই সত্যবিচ্যুত হইতে হইবে। যদি এ ধারণায় সমর্থ হও, যদি এ সাধনায় সফলকাম হও, তবে দেখিবে—বৃক্ষ সজীব হইয়া তোমায় আলিঙ্গন করিবে, হিংস্র পশু তোমায় দেখিয়া হিংসা ভুলিবে, আকাশ তোমার উপর সুধা বর্ষণ করিবে।

সাধক যে জড়ের হাত হইতে—যে মিথ্যার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, চৈতন্যের অন্বেষণ ও বিষয়-বিরক্তিতে নিযুক্ত হয়, সাধনার শেষে সেই ক্ষেত্রেই ফিরিয়া আসিয়া, আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে।

এইরূপে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তবে মায়ে কর্ম্ম সমর্পণ করা যায়। ইহা বাহ্য ক্ষেত্রের লক্ষণ, অন্তঃক্ষেত্রেও ঠিক এইরূপ বুঝিতে হইবে। ক্রিয়া করিবার সময়ে যথার্থই মাতৃপদ লাভ করিতেছি, এই সত্য ধারণা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছি, যে বস্তুর উপর যখন সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্ হইবে, তখন সেই বস্তুকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির ও চৈতন্যের কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। অন্তঃক্রিয়া সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ, অর্থাৎ স্বীয় দেহাভ্যন্তরস্থ অন্তরে সমস্তকে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি ও তন্মধ্যে অপরিণামী নিজস্বরূপ শিব বলিয়া বুঝিতে হইবে। যখন নিজের দেহস্থ যে অংশে ক্রিয়া করিবে, তখন বুঝিয়া লইতে হইবে—আমারই এই অংশ হইতে মা আমার এই চৈতন্য ও শক্তিসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড বা ভোগক্ষেত্র রচনা করিতেছেন।

এইরূপে অন্তরে ও বাহ্যে মাকে ধর। এ ধরিবার সার্থকতা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। প্রযত্নশীল মাত্রেই আপনি ইহার অমৃত-রস আস্বাদনে সমর্থ হইবে। সুষুম্নাপ্রবাহ উন্মেষিত করিবার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিবে—তোমার প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে স্নিগ্ধ বিমল আকাশ উদিত হইতেছে, তখন জানিবে, তোমার সুষুম্নাপ্রবাহ উন্মেষিত হইতেছে। কি বাহ্যক্রিয়া, কি অন্তঃক্রিয়া—প্রকাশধর্ম্মী, একান্ত প্রাণ-স্নিগ্ধকর এই আকাশ—উহা যেখানেই অনুভূত হউক না কেন, বুঝিতে হইবে, উহা বাহিরে নহে, ভিতরে; কেন না, বস্তুতঃ অনুভূতি বাহিরে হয় না, ভিতরেই হয়। তোমার মনে হইতে পারে, যেন বাহিরে সেই আকাশ দেখিলাম; কিন্তু বাহিরে দেখ নাই, অন্তরে দেখিয়াছ, ইহা স্থির। সে আকাশের উদয়ে প্রাণে এমন একটী পূর্ণ পরিতৃপ্তির আস্বাদন জাগিয়া উঠে—এমন একটী প্রাণ-জুড়ান ভাব—এমন একটী সর্ব্বজ্বালাহারিণী শান্তির ছায়া চিরবিদগ্ধ প্রাণকে আচ্ছাদিত করে যে, কামনা বলিয়া তখন আর কিছু থাকে না; সমস্ত সম্প্রাপ্তির পূর্ণত্বে প্রাণ পরিপূরিত হয়। এই সত্য! এই সত্য! আমার সত্য লাভ হইয়াছে—আমি লব্ধসত্য পুরুষ! ভাবের ভিতর এই ভাব ফুটিতে পারে; এবং যখন এইরূপ হইবে, তখন বুঝিবে, তোমার সুষুম্নাপ্রবাহ উন্মেষিত—তোমার নিজবোধ প্রকাশিত।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১

যে মানবাঃ মে ইদং মতং নিত্যং অনুতিষ্ঠন্তি, শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যে সকল মনুষ্য আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, শ্রদ্ধাবান্ অসূয়াশূন্য সেই মনুষ্য-সকলও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মমাত্রেই বন্ধনের কারণ; কর্ম্মের এই দোষ, সাধকের প্রাণকে বিচলিত করিতে পারে। ভগবৎসাধনাও যখন কর্ম্ম, তখন ইহাই বা বন্ধনের কারণ কেন না হইবে? এই আশঙ্কা অনভিজ্ঞ বিচারশীল মানবের প্রাণে স্থান পাইতে পারে ও সাধনায় অশ্রদ্ধা ও দোষদৃষ্টি জন্মাইতে পারে। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—সাধনারূপ কর্ম্ম করিয়াও জীব শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া, কর্ম্ম হইতে মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। কর্ম্মে শ্রদ্ধা ও দোষদৃষ্টিশূন্যতা, আমার মতানুযায়ী কর্ম্ম নিত্য অনুষ্ঠান করিতে করিতেই সঞ্জাত হয়। মাতৃশরণের এমনই মহিমা—মাতৃভাব উদ্দীপনার এমনই ওজস্বিনী শক্তি যে, মরু হৃদয়ও রসাভিষিক্ত হয়; কণ্টকারণ্যও নন্দন কাননে পরিণত হয়। মানুষের স্বভাব—দোষ গুণ দর্শন। সকল কর্ম্মেই, জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপেই, মনুষ্য দোষ গুণ দর্শন করিয়া অগ্রসর হইতে সাধারণতঃ সচেষ্ট হয়। শুধু যে কর্ম্মে আসক্তি জন্মিয়াছে—যে কর্ম্মে শ্রদ্ধা ঘনীভূত হইয়াছে, সেই কর্ম্মে মনুষ্য নির্ব্বিচারে পদক্ষেপে সমর্থ হয়। নতুবা সকল কর্ম্মেই মনুষ্য বিচারশীল। সুতরাং সাধনারূপ কর্ম্মেও অগ্রসর হইতে হইলে যে, মনুষ্যের দোষ দর্শন ঘটিবে না, ইহা বলা চলে না। লাভ লোকসান খতাইয়া দেখা সাধারণ মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। স্বল্প আয়াসে অভীষ্ট সিদ্ধ করিব, সহজ পন্থায় শীঘ্র উদ্দেশ্য সফল করিব, ইহা মনুষ্যের যেমন প্রাণের সহজাত কৌশলময় বিচার অভিব্যক্তি, তদ্রূপ সাধনা করিতে অগ্রসর হইবার সময়ও এই লাভ লোকসান খতান, এই সহজ পন্থায় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার উপায় অন্বেষণ মনুষ্য-প্রাণে ফুটিয়া উঠে। আর অনভিজ্ঞ অথচ বিচারশীল যে প্রাণ, সে প্রাণে পূর্ব্বোক্ত ঐ বিচারবৃত্তিই সাধনায় দোষদর্শনরূপে প্রকটিত হয়, অর্থাৎ কর্ম্মই যখন বন্ধন, তখন কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিব কেন? ইহাতেও বন্ধন হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা তাহাদিগের প্রাণে জাগে। বস্তুতঃ ইহা একান্ত অমূলক ও অসঙ্গত সন্দেহ নহে। জ্ঞান-মার্গের কূটদর্শনে ইহার ভিত্তি দৃঢ়। অনেক বিচারশীল পুরুষ এইরূপ ক্ষেত্রে পড়িয়া সাধনাভ্রষ্ট হয়। কর্ম্মমাত্রেই যখন বন্ধন, তখন বুদ্ধিযোগযুক্ত কর্ম্ম বা কর্ম্মযোগও বন্ধনশূন্য নহে, কর্ম্মের এইরূপ দোষ দর্শন করিতে গিয়া আপনাকে কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলে। কর্ম্মত্যাগে নিষ্কর্ম্ম হইব, এইরূপ ধারণা করিয়া কর্ম্ম হইতেও বঞ্চিত হয়, এবং ভাবহীন, অনুভূতিহীন বিশুষ্ক আমিত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন করিয়াও তাহাতে বিফলকাম হয়। উভয় দিকে বঞ্চিত হইয়া সাধনা সম্বন্ধে ভ্রান্তিসঙ্কুল ধারণাসকল হৃদয়ে পোষণ করিতে থাকে। অবশেষে তাহারা এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে—সাধনা অতি কঠোর ও দুঃসাধ্য। উহা সিদ্ধ পুরুষদিগের কৃপার উপর নির্ভর করে। মহাপুরুষের সাহায্য না পাইলে, মহাপুরুষ-নির্দ্দিষ্ট সাধনার সহজ

পন্থা অবলম্বন না করিলে সাধনায় পদার্পণ করা যায় না। এইরূপে উভয় দিকে ভ্রষ্ট হইয়া তাহারা সংসারের গড্ডালিকাপ্রবাহে পুনঃ প্রবিষ্ট হয়।

সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; তোমার প্রাণ যেমনই হউক, তোমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি থাক বা না থাক, ভগবৎপ্রেম তোমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র প্রস্ফুরিত নাই হোক্, কর্ম্মে যত দোষই পরিদর্শন করা তোমার অভ্যাস হোক, তথাপি তুমি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত হও, তত্রাপি তুমি আমাকে ডাক। আমার নামের এমনই মহিমা—নিত্য যদি এ অনুষ্ঠান রক্ষা কর, তবে অচিরে তুমি শ্রদ্ধাযুক্ত হইবে, অচিরে কর্ম্মের দোষ তোমার চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইবে, অচিরে আমার নামের অপূর্ব্ব রস, আমার স্নেহের হৃদয়প্লাবক উচ্ছ্বাস তুমি অনুভব করিতে সক্ষম হইবে। শ্রদ্ধা না থাকিলে শ্রদ্ধা আসিবে, দোষসকল গুণে পরিণত হইবে, তুমি ভক্তিরূপ বোধপ্রবাহে পরিপ্লুত হইবে—কর্ম্মময় হইয়াও অচিরে মোক্ষ লাভ করিবে।

সাধনা করিতে—সাধনায় পা বাড়াইতে কাহারও সাহায্য লইতে হয় না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি,—মা যত ক্ষণ না হৃদয়ে পদার্পণ করেন, তত ক্ষণ কেহ সাধনা করিব, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে না বা করিতে পারে না। মাতৃআবির্ভাবেই সাধনার সূচনা, সে সাধনায় অগ্রসর হইবার জন্য মাই গুরু জুটাইয়া দিবেন, অথবা মা নিজেই পথপ্রদর্শকরূপে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তাই বলি,—শ্রদ্ধা থাক্ বা না থাক্, বেদন আসুক বা না আসুক, যদি মুহূর্ত্তের জন্য তিলমাত্রও ইচ্ছা সঞ্জাত হইয়া থাকে, তবে মাকে ডাক। যদি যথার্থ মাতৃস্নেহের রসাস্বাদন করিতে চাহ, জগতের সমস্ত সুখ পুঞ্জীভূত করিলে যে সুখের কণামাত্রের সহিত তুলনা হয় না, যদি সেই সুখের অধিকারী হইতে চাহ—বিশ্বপ্রসবিনী জননীকে যদি তোমার একার মা-রূপে অধিকার করিতেও লাভ করিতে অভিলাষ থাকে, তবে মাকে ডাক। পাইবার জন্য যদি প্রাণে আগ্রহ আসিয়া থাকে, তবে মাকে ডাক। যদি প্রাণের পুঞ্জীভূত বেদনা ঢালিয়া দিবার জন্য ও আশ্রয়ের জন্য প্রাণ কাতর হইয়া থাকে, তবে মাকে ডাক। শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইবে, কর্ম্মে দোষ আছে, এ বিচারও প্রাণে উদিত হইবে না, তুমি মাতৃপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

এ শ্লোকের অনেকে এইরূপ অর্থ করেন যে—শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, তবে কর্ম্মী হইয়াও মোক্ষ লাভ করিবে; ইহা বলাই মায়ের অভিপ্রায়। কিন্তু শ্রদ্ধা থাকিলে ও দোষদর্শন না থাকিলে কর্ম্ম ত জীব না করিয়া থাকিতে পারে না। সে জীব কর্ম্ম ত করিবেই; শ্রদ্ধা আছে, অথচ কারণান্তরবশতঃ কর্ম্ম করিতে পারি না, ইহা শ্রদ্ধার স্বল্পতার লক্ষণ। "আমি তোমায় ভালবাসি, নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকার জন্য আসিতে পারি না—" ইহা যেমন স্বল্প ভালবাসার লক্ষণ, শ্রদ্ধা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অবশ্য আমি তীব্র শ্রদ্ধার কথা বলিতেছি এবং মাও শ্লোকে

তীব্র শ্রদ্ধাই লক্ষ্য করিয়াছেন ; কেন না, তীব্র শ্রদ্ধা না থাকিলে মোক্ষ আসিতে পারে না।

যাহা হউক, ইহাতে কিছু আসে যায় না। যদি শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপই হয় অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া—দোষদৃষ্টিশূন্য হইয়া মাতৃ-উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান কর, তুমি মোক্ষ লাভ করিবে, ইহাই যদি শ্লোকের তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলেও সাধনাভিজ্ঞ পুরুষ, পূর্ণ নির্ভীকতার সহিত বলিতে পারে, যদি শ্রদ্ধা না থাকে, যদি কর্ম্মে দোষদর্শন ধারণা থাকে, তাহা হইলেও ক্ষতি নাই ; প্রাণে যদি আগ্রহ আসিয়া থাকে, তবে তত বিচার করিয়া দেখিবার কোন আবশ্যকতা নাই ; তুমি মাতৃমুখে কর্ম্ম ফিরাও, শ্রদ্ধা পাইবে, দোষদর্শন ঘুচিবে, তোমার মহা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অনেক সময়েই আমরা সংসারক্ষেত্রে দেখিতে পাই, আগে যাহাকে প্রাণ স্থূলতঃ প্রত্যাখ্যান করিত, নিত্য সহবাসে, নিত্য ব্যবহারে তাহাই আবার কিছু দিন পরে প্রাণ ছাড়িতে চায় না, তাহা না হইলে আর চলে না ; তাহাই প্রাণের একটা মহা অবলম্বন হইয়া পড়ে। সামান্য বস্তু বা জীব সম্বন্ধে যখন এরূপ হইতে পারে, তখন মাতৃকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রাণ যে তাহার সমস্ত দোষ ভুলিবে না, প্রাণ যে তাহাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবে না, ইহা অসম্ভব। সুতরাং মা মা বলিতে বলিতে, মাতৃভাবের নিত্য সহবাস করিতে করিতে তুমি যে সে কর্ম্মে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবে না, ইহা বলা যায় না। অবশ্য অনেক সময় ওইরূপ কর্ম্ম অভ্যাসবশতঃ করি ; শ্রদ্ধা না থাকিলেও, আন্তরিকতা না থাকিলেও অনেক কর্ম্ম শুধু অভ্যাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া না করিয়া থাকিতে পারি না। এ ক্ষেত্রে সেরূপ হইবে না। সাধারণ কর্ম্মের বা সাধারণ বস্তুর সম্বন্ধে সেরূপ হইতে পারে ; ব্যবহারে বা সহবাসে গুণ খুজিয়া না পাইলে তাহাতে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা না আসিতে পারে ; কিন্তু মা আমার তেমন সাধারণ বস্তু নহেন। ওরে ! শুধু মা বলিতে গেলে, প্রাণ দেহ ছাড়িয়া যেন কোথায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহে, যেন কঠিন পদার্থের মত তাহার চরণ আলিঙ্গন করিতে চাহে। যদি আগ্রহরূপ পুঁজি থাকে, তবে মাতৃ স্মরণের, মাতৃকর্ম্মানুষ্ঠানের অপূর্ব্ব আস্বাদন অচিরে তুমি পাইবে ; শ্রদ্ধা উছলিবে, দোষ-দর্শন গুণদর্শনে পরিণত হইবে। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। মাতৃকর্ম্মানুষ্ঠান কেন বন্ধন করিতে পারে না, তাহা পরে বলিতেছি।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২

যে তু এতৎ মে মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি, অচেতসঃ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ তান্ নষ্টান্ বিদ্ধি।

ব্যবহারিক অর্থ।—যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতানুযায়ী কর্ম্ম না করে, সেই জ্ঞানান্ধদিগকে নষ্ট বলিয়া তুমি বুঝিবে।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মে দোষ দর্শন করিয়া সাধনায় নিশ্চিন্ত থাকা অজ্ঞ জীব ব্যতীত কেহ পারে না। মাকে ডাকিতে হইবে বলিয়া যাহার চৈতন্য উন্মেষিত হইয়াছে, সে কখনও নিরস্ত হইয়া থাকিতে পারে না। শুধু যাহার প্রাণ আলস্য ও সংশয়ে ভরা, সে ব্যতীত আর কেহ মনুষ্যের মত জ্ঞানময় জীবন লাভ করিয়া নিশ্চিন্তে থাকিতে পারে না। মায়ের বাক্যে সন্দেহ করিও না। মাতৃ-উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্ম বন্ধন আনিতে পারে না, ইহা স্থির সিদ্ধান্তরূপে হৃদয়ে গ্রহণ কর। কলহযুক্ত সংসার,—রোগযুক্ত শরীর—দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন—পাপযুক্ত প্রাণ—সংশয়যুক্ত সাধনা, ইহা অপেক্ষা দুঃখদায়ক আর কিছুই নাই। সাধনায় সংশয় রাখিও না। সাধনারূপ কর্ম্ম কেন বন্ধন আনিতে পারে না, তাহা বুঝিতে না পারিলেও মাতৃবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তবু আমি সাধনা-কর্ম্মের এ স্বাধীনতার—এ বন্ধন-হীনতার কারণ নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

কর্ম্মমাত্রেই কর্ম্মাশয় পরিবর্দ্ধন করে। আমরা যখন কোন কর্ম্ম করি, আমাদিগের সর্ব্বরূপ-পরিগ্রাহী মন তদ্রূপ সংস্কারাপন্ন হইয়া পড়ে; অর্থাৎ আপনার ব্যাপকতা হারাইয়া কিয়ৎপরিমাণে তদাকারে সঙ্কুচিত হয়। মনের ইহা সাধারণ ধর্ম্ম। ঐরূপ সঙ্কোচন-সকল কর্ম্মাশয়রূপে পুঞ্জীভূত হয়; অর্থাৎ উহারাই পুনরায় তদ্রূপ সঙ্কোচনের দিকে ধাবিত হয়—ইহারই নাম বন্ধন। বিশ্বব্যাপিনী চিদানন্দময়ী মাতৃউদ্দেশ্যে যখন কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন আমাদিগের মন তদ্রূপ বিশ্বব্যাপী চিদানন্দময় সংস্কার পরিগ্রহণ করে। অন্য কর্ম্মে মন যেমন সংকুচিত হয়, বিশ্বব্যাপিনী মায়ের চিন্তনে মন তদনুক্রমে বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িতে থাকে। সুতরাং মনের সংকোচ না হইয়া বিস্তার হইতে থাকে। মন কর্ম্মাশয়রূপে জড়ীভূত না হইয়া চৈতন্যময়রূপে প্রকাশধর্ম্মী হইয়া পড়ে—আনন্দময়রূপে আনন্দের উৎস হইয়া যায়; সুতরাং সাধনা-কর্ম্মে বন্ধনভয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩

জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে, ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—জ্ঞানবান্ পুরুষও আপনার প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করেন মাত্র, ভূতসকল স্ব স্ব প্রকৃতিরই অনুসরণ করে; অতএব নিগ্রহ কি করিবে?

যৌগিক অর্থ।—প্রকৃতির দ্বারা জীব পরিচালিত—প্রকৃতির অনুবর্ত্তনে জীব অহর্নিশ নিযুক্ত, প্রকৃতির সাধনায় জীব-জীবন সম্যক্‌রূপে অধিকৃত; প্রকৃতির আবার নিগ্রহ কি করিয়া করিবে? প্রকৃতি হইতে প্রকৃতি লাভ, জীব-প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম-প্রকৃতিতে জীবের পরিবর্ত্তন, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখে ভরা প্রকৃতি হইতে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ-রহিত, সচ্চিদানন্দময় প্রকৃতিতে জীবের পরিণতি, তরঙ্গ-সঙ্কুল চঞ্চল প্রকৃতি

হইতে নিস্তরঙ্গ সাক্ষিস্বরূপ মাত্র বা স্বরূপপ্রকৃতিতে জীবের আত্মাভিনিবেশ। প্রকৃতির নিগ্রহ কেমন করিয়া করিবে? প্রকৃতির নিগ্রহ হইতে পারে না। আত্মস্ফুরণ দেখিতে গিয়া আত্ম-সংকোচন ঘটে না। প্রকৃতিই ভূত—প্রকৃতিই ভূতের পরিচালিকা। প্রকৃতির নিগ্রহ অসম্ভব।

এই যে উভয়বিধ প্রকৃতির অবস্থার কথা বলিলাম, ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষ নামে শাস্ত্রে অভিহিত। উক্ত স্থির নিস্তরঙ্গ আত্মস্বরূপ অবস্থার নামই পুরুষ; এবং লীলা-চঞ্চল, সুখ-দুঃখ-জন্ম-মৃত্যুভরা—আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ কর্ম্মময়ী যে অবস্থা, অথবা উহার বীজসঙ্কুল যে নিস্তরঙ্গ অবস্থা, উহাই সাধারণতঃ প্রকৃতি-পদবাচ্য। প্রকৃতি নিগ্রহ অর্থে যদি এই শক্তিময়ী চঞ্চল প্রকৃতির কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহার নিগ্রহের উপায় নাই। বিরাট্ বিশ্বব্যাপিনী শক্তিকে নিগ্রহ করিতে পারে, এমন শক্তিমান্ কে আছে? এই চঞ্চলা প্রকৃতি মাতৃস্বরূপা হইয়া আমায় স্থিরত্বে পৌঁছাইয়া দিবে। এই চঞ্চল আমি, স্থির আমিত্বে পর্য্যবসিত হইব—এই স্বপ্ন ও শক্তি-চঞ্চল আমি, নির্গুণ অপরিণামী আমি হইয়া যাইব। আবার সেই নির্গুণ আমিও আমিত্ব হারাইয়া বোধমাত্ররূপে অবস্থান করিব।

যাহা হউক, আমার এই উভয়বিধ স্বরূপের যখন যে স্বরূপে আমি থাকি, তখনকার পক্ষে সেই স্বরূপই আমার স্বধর্ম্ম। সে কথা পরে বলিতেছি।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ, তয়োর্বশং ন আগচ্ছেৎ, তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ।

ব্যবহারিক অর্থ।—ইন্দ্রিয়-সকল বিষয়ে ধাবিত হইবেই। এই ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ের জন্য অনুরাগ বা দ্বেষ প্রকাশ করিবেই করিবে। তুমি এই অনুরাগ বা দ্বেষের বশে যাইবে না। এই দুইটীকেই সাধনার পরিপন্থী বলিয়া জানিবে।

যৌগিক অর্থ।—আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্ব স্ব প্রকৃতিকে গুরু বলিয়া সাধনা কর। বিরাট্ প্রকৃতির প্রতিবিম্ব গুরুরূপে, তোমার এই ইন্দ্রিয়জাল রচনা করিয়া, বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য—তোমারই আহার সংগ্রহের জন্য স্নেহের লীলা দেখাইতেছেন। তোমার যখন যাহা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে তোমার অনুরাগ এবং যখন যাহা অনাবশ্যক, তদ্বিষয়ে দ্বেষ কল্পিত করিয়া দিতেছেন। জগতের যে কোন ছবি যখন তোমার ভাল লাগে—জগতের যে ভোগের ভিতর তুমি পরিতৃপ্তি লাভ কর, জগতের যখন যাহা নির্ব্বিচারে সংগ্রহ ও ভোগ করিতে থাক, অথবা যাহা পাইবার জন্য তোমার প্রাণ অন্ধাকুলে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিতে থাকে—বুঝিও, সেই ভোগাধিকার বা তদ্রূপ ভোগাধিকারই তোমার মঙ্গল-পথের পান্থশালা। পথিক যেমন দূর যাত্রা অবলম্বন করিয়া পান্থশালা পাইবার

জন্য আকুল হয়, প্রান্তর মাঝে নিশাগমে পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করে—আবার প্রভাতে নব জাগরণে সেই একান্ত বাঞ্ছিত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখ-পথে অগ্রসর ও সম্মুখস্থ পান্থশালায় আকৃষ্ট হয়, এবং লব্ধ পান্থশালা স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমাদিগেরও মঙ্গল-যাত্রার পথে ভোগাধিকাররূপ পান্থশালা-সকল অবস্থিত। যখন যেখানে আসিয়া উপস্থিত হই, যখন যে ভোগে আনন্দ অনুভব করি—বুঝিও, তখন সেইখানে আমার প্রাণ বিহার ও বিশ্রাম লাভ-করিতেছে। যখন যে ভোগ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি অথবা পরিত্যাগ করি, অর্থাৎ যাহাতে দ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়, বুঝিও—প্রাণ সেখান হইতে নব যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং তুমিও পান্থশালার জন্য পথিকের মত অনুরাগ ও দ্বেষ প্রকাশ কর। কিন্তু ইহাতে মত্ত থাকিও না; পথিকের মত নিজ মঙ্গল-যাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে থাক। উদ্দেশ্য পান্থশালা লাভ নহে, উদ্দেশ্য মহাযাত্রা। সেই যাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে থাক; অনুরাগ ও দ্বেষ অবান্তর লক্ষণমাত্র।

এইখানে জিজ্ঞাসা করিতে পার—তাহা হইলে ত নির্ব্বিচারে নিশ্চিন্তে আমরা ইন্দ্রিয়-ভোগে রত থাকিতে পারি? সাধারণ জীব মাত্রেই ইন্দ্রিয়ানুরাগী—সাধারণ জীবের ইন্দ্রিয়ার্থে বা অভিলষিত বিষয়-প্রাপ্তিতে বিদ্বেষ নাই—বিষয়প্রাপ্তির অভাবেই বিদ্বেষ, আছে। সুতরাং সাধারণ জীব পূর্ব্বমতে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারে। তাহা নহে—ইহা সাধারণ জীবের জন্য নহে। যে ব্যক্তি সাধনা দ্বারা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-প্রতিপাদ্য অবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহারই জন্য এই ব্যবস্থা। মা আমার সমস্ত করিতেছেন, এ জ্ঞান যাহার প্রাণগত হইয়াছে, সে-ই এই বিচারের অধিকারী। যে ব্যক্তি প্রাণের সুদূর কোণ হইতে বলিতে পারে,—"তুমি বিশ্বেশ্বরী, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ; তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় যাহা মঙ্গল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, তাহাই করিতেছ। আমায় মহামঙ্গলে লইয়া যাইবার একমাত্র কর্ত্তা তুমি, আমার অজ্ঞানান্ধ চক্ষুতে প্রকাশের কজ্জলি পরাইয়া দিবার একমাত্র স্নেহময়ী জননী তুমি—আমার মলিন দেহের পাপ-পঙ্কিল ধূলিরাশি মুছাইয়া দিবার একমাত্র স্নেহময়ী জননী তুমি—আমার সর্ব্ব কর্ম্মের সারথি তুমি—আমায় সর্ব্বরকমে রক্ষা করিবার—আমায় সর্ব্বরকমে পালন করিবার—আমায় সর্ব্বরকমে শান্তি সম্ভোগ দিবার একমাত্র প্রাণময়ী চিন্ময়ী তুমি—আমায় বুকে ধরিয়া রাখিবার—আমায় বাহু-বেষ্টনে রোমাঞ্চিত করিবার, নির্নিমেষ-নয়নে স্নেহ ঢালিবার একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র গতি—একমাত্র মা তুমি। পতিতের উদ্ধারিণী—অনাথের পরিত্রাতা—তাপিতের তাপনাশিনী—ভবানী মা! তোমার প্রদত্ত ভোগ-সকলে বা অবস্থা-সকলে আমার বিচার করিবার কিছু নাই। তুমি হাসাইলে হাসিতেছি—তুমি কাঁদাইলে কাঁদিতেছি—তুমি খাইতে দিলে খাইতেছি—তুমি যখন মারিতেছ, তখন মৃত সাজিতেছি—তুমি যখন জীবন দান করিতেছ, তখন জীবিত সাজিতেছি, কিন্তু

আমি বুঝিয়াছি, এ সকলই তোমার স্নেহের দান—তুমি আমার মা।” যখন জীব এইরূপ বলিতে পারে—যখন জীবের প্রাণ যথার্থ এই ধর্ম্মী হইতে পারে, সেই অবস্থার পক্ষে ঐরূপ করণীয়। যত দিন এইরূপ অবস্থা না আসে, অর্থাৎ যত দিন স্বীয় কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান থাকে, তত দিন যাহাতে উক্তরূপ অনুরাগ ও বিদ্বেষ-সকলের বশীভূত হইয়া না পড়ে, এইরূপ চেষ্টা করিবে। যে পরিমাণে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব মায়ে অর্পণ করিতে সক্ষম হইবে, সেই পরিমাণে তুমি অনুরাগ ও বিদ্বেষের হাত এড়াইবে।

পূর্ব্বোক্ত অবস্থা, অর্থাৎ বিষয়-ভোগসকলকে পথিকের পান্থশালা লাভের মত ক্ষণস্থায়ী, সময়ানুবর্ত্তী পোষণকারী মাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলে, জীবের ভোগসকলে বা ইন্দ্রিয়সকলে অনুরাগ ও বিদ্বেষ আপনা হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতে থাকে। যত ক্ষণ তাহা না হয়, যত ক্ষণ আত্ম-কর্ত্তৃত্বজ্ঞান জীবের হৃদয়ে যে পরিমাণ অধিকার করিয়া থাকে, ততক্ষণ সেই পরিমাণে জীবকে শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে অনুরাগ ও বিদ্বেষের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় ও করা কর্ত্তব্য। অনুরাগ ও বিদ্বেষ উঠিবেই, ইহা মায়ের ব্যবস্থা, ইহা কেহ রোধ করিতে পারে না, কিন্তু জীব তাহার বশীভূত হইবে না।

এই স্থলে আমরা জীবসকলকে সাধারণতঃ দুই স্তরে বিভাগ করিয়া দেখিব। মা আমার দ্বিবিধ প্রকৃতিতে সাজিয়া, সাধারণতঃ দুই ভাবে জীবজগতে প্রকাশ পান। এক সচ্চিদানন্দময়ী প্রকৃতি, অপর ইন্দ্রিয়ময়ী বা বিষয়ময়ী প্রকৃতি। যখন জীব সাধক হয়, তখন বুঝিতে হইবে, মা আমার সচ্চিদানন্দময়ী প্রকৃতিতে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। সিদ্ধিরত্ন-কিরীটী দেবতাবৃন্দের ভক্তিপ্রণত শিরে চরণ রাখিয়া—আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য শক্তিমান্ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদিকে বিভাগ করিয়া দিয়া—আপনার বলিতে কিছু না রাখিয়া, চিদাকাশের নির্ম্মল তলদেশে, স্নিগ্ধ শ্যাম জলদবরণী রূপ ধারণ করিয়া হাস্যময়ী, নির্ম্মল নির্ব্বাক্ নগ্না মা আসিয়া দাঁড়ান। আনন্দময়ী সরলা বালিকার মত কোন ভাবের পঙ্কিলতা নাই—তেজের ভীতিপ্রদ মূর্ত্তি নাই—কিছু নাই—কিছু নাই, মাত্র মূর্ত্তিমান্ সত্য—মূর্ত্তিমান্ চৈতন্য—মূর্ত্তিমান্ আনন্দ বিরাজিত। আকাশরূপ প্রস্তরফলকের ব্রহ্মাণ্ডরূপ অঙ্কিত চিত্রসকল যেন মুছিয়া দিয়া, মাত্র সৎ চিৎ ও আনন্দ, এই তিনটি ভাবকে একীভূত করিয়া দিয়াছে। মা এই ভাবেই সাধক-হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে অমৃত পান করান। এই ভাব প্রতিষ্ঠাই “সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ” ইত্যাদি শ্লোকে লক্ষিত হইয়াছে।

আর এক ভাব—সাধারণ জীব-ভাব—সাধারণ ইন্দ্রিয়ময় বিষয়ময় ভাব, যে ভাবে জীব অহর্নিশ তাঁহাকে দর্শন ও ভোগ করে।

এই দুই ভাবের অবস্থায় জীবের চিত্ত-গতিও পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের। সচ্চিদানন্দময়ী প্রকৃতির অবস্থায় জীবের বিদ্বেষ মুছিয়া, অনুরাগ মহারাগে পরিণত হইয়া, মহামায়ার সঙ্গে সংলিপ্ত হইতে থাকে। যত ক্ষণ ইহা পূর্ণমাত্রায় সংসাধিত না

হয়, তত ক্ষণ বিষয়ানুরাগ ও বিষয়-বিদ্বেষ পরিদৃষ্ট হইলেও উহা পথিকের পান্থশালা লাভের মত ক্ষণস্থায়ী। সাধক সমস্তই মঙ্গলময় দর্শন করিয়া তাহার বশীভূত হয় না। কণ্টকারণ্যের ভিতর ক্ষুদ্র বিহঙ্গম যেমন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ সে সাধক স্বচ্ছন্দে বিষয়ারণ্যে অক্ষতশরীরে বিচরণ করে। কিন্তু যাহার প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ময়ী বা বিষয়ময়ী, তাহাকে অতি সাবধানে এই অনুরাগ-বিদ্বেষময় ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হয়। কেন না, তাহারা এখনও অরণ্যচর বিহঙ্গমের মত যথেচ্ছ বিচরণক্ষম হয় নাই। তাহাদিগের পদ-ক্ষেপণের অসাবধানতা হইলেই চরণ কণ্টকবিদ্ধ হয়—অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়; সুতরাং তাহাদিগের জন্য নির্ব্বিচারে আরণ্য পক্ষীর মত অরণ্য-ভ্রমণ ব্যবস্থিত নহে। মায়ের আমার এ ধর্ম্ম-শরীররূপ গহন অরণ্য বিষয়-জ্ঞানের দারুণ অন্ধকারে আচ্ছাদিত, অরণ্যের সমস্ত বৃক্ষই সাধনা-বৃক্ষ হইলেও, নব-প্রবিষ্টকে অতি সাবধানে বিচরণ করিতে হয়। কোন্ বৃক্ষের জ্ঞানকাণ্ড হইতে সংশয়রূপ কালসর্প কখন্ নির্গত হইয়া দংশন করিবে, তাহার স্থিরতা নাই—কোন্ বৃক্ষের যশঃকণ্টক কখন্ হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে, অন্ধকারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই—কোন্ বৃক্ষের রসময় ফল, কখন্ মত্ততা আনিয়া দিয়া বৃক্ষতলে শায়িত করিয়া রাখিবে, বিষয়ান্ধ জ্ঞানচক্ষু তাহা বুঝিতে অক্ষম। সুতরাং যত দিন না সেই অরণ্যের কেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হও—যত দিন না অরণ্যের কেন্দ্রস্থিত মণিমণ্ডপের উজ্জ্বল কিরণ তোমার চক্ষে উদ্ভাসিত হয়,—যত দিন না তুমি সেই বিষয়-তিমিরের মধ্যে তিমিরহরার সন্ধান পাও, তত দিন সে অরণ্যের কোন ফলে, কোন বৃক্ষে অনুরাগ বা বিদ্বেষ উদিত হইলেও তাহার বশীভূত হইও না। আপনি কোন্ শ্রেণীর জীব, নির্দ্ধারণ করিয়া লহ। কর্ত্তৃত্বজ্ঞান যত দিন থাকিবে—যত দিন বুঝিবে, তুমি আপনি উড়িতেছ, তত দিন সাবধানে উড়িবে; যখন বুঝিবে, তুমি সে আরণ্য বায়ুর তাড়নায় উড়িতেছ মাত্র, তখন নির্ব্বিচারে ভ্রমণ করিবে; অথবা বিচার তখন তোমার প্রাণ হইতে আপনি মুছিয়া যাইবে। নিজের ধর্ম্ম এইরূপে স্থির করিবে ও নিজ ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করিবে।

৩৩ ও ৩৪ সংখ্যক শ্লোকের এই দুই প্রকার প্রকৃতি বর্ণনই উদ্দেশ্য। নতুবা ইহার অর্থ করা চলে না। সাধারণ চক্ষে দুই শ্লোকের দুই বিপরীত ভাব লক্ষিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে ভগবান্ বলিলেন—জীবমাত্রেই প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে; আবার পরশ্লোকে বলিতেছেন, অনুরাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইবে না। যেন অনুরাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হওয়া না হওয়ারূপ স্বাধীনতা জীবের আছে। যদি জীবের প্রকৃতি অনুকূল হয়, তবেই ত জীব অনুরাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী না হইতে পারে। ভগবানের বাক্যের এ বিরোধ অখণ্ডিত, কি করিয়া মীমাংসা করিবে? দ্বিতীয় শ্লোকে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত প্রকৃতি-কর্ত্তৃত্ব-স্বীকার খণ্ডন করা ভগবদভিপ্রায় হইতে পারে না। সর্ব্বজীব যখন সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতিরই অনুবর্ত্তন করে, তখন "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" এ কথা বলার

পূর্ব্বকথিত অভিপ্রায় ব্যতীত অন্য কি অভিপ্রায় হইতে পারে ? বস্তুতঃ এই দুই শ্লোকে দুই প্রকার প্রকৃতির বা দুই প্রকার জীবের পরিচয় দেওয়াই ভগবানের অভিপ্রায়।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫

স্বধর্ম্মঃ বিগুণোঽপি অঙ্গহীনোঽপি ইত্যর্থঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ, স্বনুষ্ঠিতাৎ সম্যক্ সম্পাদিতাৎ পরধর্ম্মাৎ স্বধর্ম্মে নিধনং মরণং অপি শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা বিকৃতরূপে সম্পাদিত নিজধর্ম্ম শ্রেয়। স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া নিধনও বরং ভাল, তথাপি পরধর্ম্মে অবস্থান করিতে প্রয়াস পাওয়া অতীব ভয়ানক।

যৌগিক অর্থ।—স্বধর্ম্ম কি ? পূর্ব্বে যে দুই প্রকার প্রকৃতির কথা বলা হইল, উহারা স্বধর্ম্ম। আপনি কোন্ প্রকৃতির জীব, তাহা স্বয়ং নির্ব্বাচন করা কঠিন নহে; যখন যে জীব যে প্রকৃতিতে অবস্থান করে, তখন তাহার তাহাই স্বধর্ম্ম। ভগবানের চতুর্ব্বর্ণ-সৃষ্টি-বৈচিত্র্যই এই প্রকৃতি-নির্ব্বাচন। স্থূল প্রকৃতিতে জড়ভাবাদি যেমন প্রকৃতির অপ্রতিলঙ্ঘ্য নির্ব্বাচন, জীব-জগতে জীবাণু, কীট পতঙ্গ, পশু ও মনুষ্যাদি প্রাকৃতিক বিভাগ যেমন অপ্রতিলঙ্ঘ্য, মনুষ্য-জগতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনও তদ্রূপ অপ্রতিলঙ্ঘ্য; সাধনাক্ষেত্রেও বিষয়-সাধক ও সচ্চিদানন্দ-সাধক তদ্রূপ অপ্রতিলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। এ সকল প্রাকৃতিক স্তর মায়ের উচ্চ-নিম্ন স্বরের আহ্বান মাত্র। মায়ের আহ্বান যে, যে প্রকারে শুনিতে পাইতেছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম—মায়ের আহ্বানে অন্তরাত্মা প্রতিধ্বনিত হইয়া যেখানে যেমন করিয়া যাহার চমক ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সেখানে তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ জগদ্‌বৈচিত্র্য মাতৃআহ্বান ব্যতাত আর কিছু নহে। মাতৃআহ্বানে আনন্দময় জাগরণের নাম সৃষ্টি। মা ডাকিয়াছেন, তাই আকাশ বিশাল বক্ষ উদ্‌ঘাটিত করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—মা ডাকিয়াছেন, তাই সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহদল জ্যোতিহাসি হাসিয়া চক্ষু চাহিয়াছে—মা ডাকিয়াছেন, তাই বৃক্ষাদি পত্র-পুষ্পে পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া নির্ম্মল নীরব জাগরণে জাগরিত হইয়াছে—মা ডাকিয়াছেন, তাই সপ্ত সমুদ্রের স্নেহময় বক্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে—মা ডাকিয়াছেন, মায়ের আহ্বান আত্মায় পশিয়াছে, তাই সপ্ত লোক প্রকাশিত—তাই অনন্তকোটী জীব অনন্ত দিকে উজ্জীবিত—তাই ব্রহ্ম হইতে কীট পর্য্যন্ত মাতৃসেবায় বিভোর। আহ্বান সকলেরই কাণে বাজিয়াছে, কেহ সে আহ্বান-মুখে, কেহ বা বহির্মুখে, কেহ সুপথে, কেহ বিপথে চলিতেছে বলিয়া যে দেখিতে পাইতেছ, উহা সেই আহ্বানেরই তাড়নায়। মা জাগিয়াছেন, আনন্দময়ীর আত্মহারা ভাব ছুটিয়া গিয়াছে, আবার সন্তান বলিয়া মনে পড়িয়াছে। মা জাগিয়াছেন, জাগিয়া কই পুত্র—কই পুত্র বলিয়া উঠিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যে সুপ্ত ছিল—প্রলয়-

সাগরের যে কোণে যে পরমাণু নিমজ্জিত ছিল, সে আহ্বানে সব জাগিয়াছে—সে আহ্বানে সকলের চমক ভাঙ্গিয়াছে। ইহাই স্বধর্ম্ম।

শুধু তাহা নহে; প্রতি পদার্থ বা প্রত্যেকেই মাতৃআহ্বানে চমকিত, প্রত্যেক আহুতে আহুতে পুনরায় সে আহ্বানের ঘাত প্রতিঘাত—তাই কাহাকেও মায়ের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আহ্বান করে, কাহাকেও স্থূল বিষয়রূপ আহ্বান করে। তুমি যেমন জগদ্দর্শনে মুগ্ধ হও, জগতের অনেক জীব জগদ্দর্শনের সঙ্গে তোমাকেও দেখিয়া মুগ্ধ হয়। ইহাই আহ্বানের ঘাত প্রতিঘাত। মাতৃআহ্বানই ইহার মূল কারণ বলিয়া, আমরা জগৎকে না ডাকিয়া থাকিতে পারি না—জগৎ আমাদিগকে না ডাকিয়া থাকিতে পারে না। বহু দর্পণে সূর্য্যরশ্মি বিম্বিত হইলে যেমন এক দর্পণ হইতে প্রতিবিম্বসকল অন্যান্য দর্পণে গিয়া প্রতিবিম্বিত হয়, মায়ের আহ্বানও তদ্রূপ বিষয়ে বিষয়ে জীবে জীবে সম্পতিত। ঐ যে নবীন প্রভাতে জাগরিত হইয়া তোমার চক্ষু মেলিবার সঙ্গে সঙ্গে নবীন সূর্য্যের সঞ্জীবনী কর মাতৃআহ্বান বহন করিয়া আনিয়া তোমাকে ডাকিল—ঐ যে মাতৃপরশের কোমল তাড়না বহন করিয়া আনিয়া প্রভাত-সমীরণ তোমায় স্পর্শ করিল—ঐ যে মাতৃঅঙ্গের পুণ্য গন্ধ অঙ্গে মাখিয়া তোমায় কুসুমগন্ধ আমোদিত করিল—ঐ যে বহু জীবের প্রভাত-জাগরণের মৃদু কলরব মাতৃআহ্বানের উচ্ছ্বাস আনিয়া তোমার শ্রবণে ঢালিয়া দিল। তুমি কেমন করিয়া চুপ করিয়া আছ—তুমি কেমন করিয়া এ স্নেহময় আহ্বানের প্রত্যুত্তরে মা বলিয়া ডাকিতেছ না—তুমি সূর্য্যদর্শনে 'যাই মা, যাই মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠ—তুমি নব পল্লবের কুসুমস্তবক দেখিয়া 'যাই মা, যাই' বলিয়া উচ্চস্বরে ঝঙ্কার করিয়া উঠ—তুমি নির্ম্মল নীল আকাশের চাহনি দেখিয়া 'যাই মা, যাই' বলিয়া নয়ন বিস্তৃত কর—তুমি প্রভাত-বায়ুর মৃদু পরশে কণ্টকিত হইয়া 'যাই মা, যাই' বলিয়া কণ্টকিত হও—তুমি জগতের রূপে রসে গন্ধে সর্ব্বত্র চৈতন্যময় মাতৃআহ্বান শ্রবণ করিয়া, 'যাই মা, যাই' বলিয়া ছুটিয়া চল—আর স্থির থাকিও না—আর নীরবে পাষাণের মত মাতৃআহ্বান প্রত্যাখ্যান করিও না—আর মাতৃআহ্বানের প্রত্যুত্তর না দিয়া, মাতৃআহ্বানকে আকুল বেদনাময় করিও না—মাতৃবেদনে ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া গিয়াছে—মায়ের ডাকে জগৎ ভাসিয়া গিয়াছে—তুমি কি চুপ করিয়া থাকিতে পার?

তাহা পারে না। তাহা পারে না বলিয়াই জীব চঞ্চল—তাহা পারে না বলিয়াই জীব অহর্নিশ সচ্চিদানন্দের অন্বেষী। যে, যে প্রকার পারিতেছে, মায়ের আহ্বানের উত্তর দিতেছে। কেহ ভোগী সাজিয়া, কেহ যোগী সাজিয়া, কেহ পাপী সাজিয়া, কেহ পুণ্যবান্ সাজিয়া, কেহ সাধক সাজিয়া, একমাত্র 'যাই মা, যাই' এই উত্তরই দিতেছে। কেহ জীব, কেহ পতঙ্গ, কেহ জীবাণু, কেহ মনুষ্য, কেহ দেবতা সাজিয়াছে; ইহার অর্থ—"যাই মা, যাই।" কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র সাজিয়াছে, ইহার একমাত্র

অর্থ—'যাই মা, যাই।' এ সব স্বর-কম্পনের—স্বর-যন্ত্রের বিভিন্নতা মাত্র, মর্ম্ম একই। এই প্রকারান্তরগুলিই জীবের সত্তা; এই প্রকারান্তরগুলিই প্রত্যেকের নিজস্ব বা "স্ব"; এবং এই "স্ব" "স্ব" স্বত্বের ভিতর যে মাতৃআহ্বান লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাই উহার স্বধর্ম্ম। নিজ প্রকৃতি জীবকে যে প্রকার জাগতিক, প্রাদেশিক, সামাজিক, সাংসারিক, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার ভিতর রাখিয়া আহ্বানরূপ মহাধর্ম্ম প্রেরণ করেন, সেই সর্ব্বপ্রকার অবস্থার ভিতর উক্ত আহ্বান অনুবর্ত্তন করাই স্বধর্ম্মানুষ্ঠান।

আমরা স্থূলতঃ স্বধর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত দেখিলাম—মায়িক প্রকৃতিগত ও সচ্চিদানন্দ প্রকৃতিগত। এই দুই স্থূল ভাগের ভিতর আবার অসংখ্য প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগসকল প্রতিষ্ঠিত। জীবাণু হইতে সাধারণ মনুষ্য-জগৎ অবধি মায়িক প্রকৃতির অন্তর্গত এবং উহারই অভ্যন্তরে অসংখ্য প্রকারের বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। যথার্থ ভগবৎলাভের জন্য প্রাণের আকুলতাপ্রাপ্ত জীব হইতে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বা ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সচ্চিদানন্দ প্রকৃতির অন্তর্গত। ইহারও ভিতর বিভাগসকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বিভাগসকলের মধ্যে যখন যে জীব যে স্তরে থাকে, তখন তাহার সেই বিভাগ ও স্তরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, তাহারই অভ্যন্তর দিয়া মা তাহাকে কিরূপে ডাকিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করাই স্বধর্ম্মপালন। মায়িক প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং সচ্চিদানন্দ প্রকৃতি লাভ হইতেছে, এই সঙ্গমক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। এই অবস্থাতেই জীব পুরুষকার বলিয়া যে ভাব এত দিন পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহা ভগবৎপুরুষকার মাত্র বলিয়া ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকে। এত দিন যাহা নিজে করিতেছি বলিয়া ভাবিত, আপনি যেমন কর্ম্ম করিতেছি, তদনুযায়ী পুরুষকার রচিত হইতেছে ও তদনুযায়ী কর্ম্মভোগ লাভ করিতেছি, ইত্যাকার যে ধারণা ছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পুরুষকার জীবের নহে—মায়ের, মাই পুরুষকাররূপে প্রকটিত হইয়া যখন যে ক্ষেত্রে আবশ্যক, লইয়া যান; আবশ্যক অনুযায়ী পুরুষকার প্রকটিত হয়, তদনুযায়ী স্বধর্ম্ম লাভ হয়—তদনুযায়ী ভাবে জীব মা মা করে। অর্থাৎ তখন হইতে জীব চারি ধারে মাতৃআহ্বান শোনে। পদার্থসকল আহ্বানভাব-সূচক শব্দমাত্র, ইহা তখন জীব ধীরে ধীরে বুঝিতে থাকে। এবং সেই আহ্বানই পুরুষকাররূপে জীবত্বকে পরিণমিত করে, ইহাও সে বোঝে।

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

হে বার্ষ্ণেয়! অথ অনিচ্ছন্ অপি বলাৎ নিয়োজিত ইব অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ পাপং চরতি?

ব্যবহারিক অর্থ।—হে বার্ষ্ণেয়! অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়া এই পুরুষ কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া পাপ আচরণ করে?

যৌগিক অর্থ।—মাতৃকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে ভগবদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অর্জ্জুনের প্রাণের দারুণ সন্দেহসকল যেন অপসৃত হইয়া গিয়াছে। প্রাণের নিদারুণ অবসাদ, সূর্য্যোদয়ে হিমানীর মত যেন অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে; যেন সে সাধক আপনার ক্ষুদ্র সামান্য মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, অসাধারণ সাধকোচিত বিভু মাতৃঅবলম্বন লাভ করিয়াছে। সাধক হইবার পূর্ব্বে জীব আপনার নীতি, শিক্ষা, সমাজ ও ক্ষুদ্র প্রাণোপযোগী যে সাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান, তাহার রক্ষণে ও প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকে। সেই জ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বিচরণ করিতে করিতে, যখন সে সাধক হয়, তখন তাহার সেই সমাজ, নীতি ও শিক্ষাশ্রিত জ্ঞানের প্রসার বিরাট্ ব্রহ্মজ্ঞানে,—যে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডসকল উজ্জীবিত, পরিপালিত ও সংরক্ষিত হইতেছে—সেই মহাজ্ঞানে আসিয়া মিলাইয়া যায়; এবং সেই মিলনের মুখে আপনার পূর্ব্বসংস্কার অনুযায়ী জ্ঞানে এ বিরাট্ জ্ঞানপ্রসার প্রথমে একটু বিরোধভাবাপন্ন অনুমিত হয়। সাধারণ জ্ঞানে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের সীমা যে প্রকার প্রতীয়মান হয়, বিরাট্ জ্ঞান-চক্ষে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সীমা সেরূপ দেখায় না। এই অসামঞ্জস্য কিন্তু অচিরে ভগবৎকৃপায় বিদূরিত হইয়া যায়, এবং সাধক ভগবৎজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। জীব যে ভগবৎকর্ত্তৃত্বের দ্বারাতেই স্ব স্ব জাগতিক ক্ষেত্রে জাত, সংরক্ষিত ও কর্ম্মময় হইয়া রহিয়াছে, এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রানুযায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত রাখাই যে ভগবদভিপ্রায়, ইহা সাধক বোঝে। অধিকন্তু সাধক, প্রতি জীবের প্রতি কার্য্যের উপর মাতৃকর্ত্তৃত্বই পরিদর্শন করে। ইহাই সাধকে এবং সাধারণ মনুষ্যে প্রভেদ।

কিন্তু সমস্তই যদি মাতৃকর্ত্তৃত্ব, মায়ের মঙ্গল ইচ্ছায় পরিকল্পিত হইয়াই যদি জগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্যটি পর্য্যন্ত সম্পাদিত হয়, তবে কি সাধারণ চক্ষে—যাহা জীব পাপ বলিয়া পরিহার করিতে প্রয়াস পায়, তাহাও কি মাতৃইচ্ছার অনুমোদিত কার্য্য? পরিহার করিতে প্রয়াস পায়, অথচ যেন কেহ বলপ্রয়োগে জীবকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেয়। হৃদয়ের সুদৃঢ় জ্ঞান, প্রাণের শক্তি, মনের স্থৈর্য্য মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া যায়—যাহা করিবে না বলিয়া বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যাহা করিয়া অনুতাপে বার বার জর্জ্জরিত হইয়াছে—যাহার বিষময় ফল দর্শন করিয়া মর্ম্ম বার বার পীড়িত ও নিষ্পেষিত হইয়াছে—বার বার 'আর করিব না, আর করিব না' বলিয়া হৃদয় আকুল বেগে ক্রন্দন করিয়াছে, আবার কে যেন জোর করিয়া, কে যেন মুগ্ধ করিয়া সেই কলঙ্কিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ফেলে; ইহাও কি তবে মা? তাঁহার মঙ্গল কর্ত্তৃত্ববিধানে মঙ্গল কার্য্যই প্রসূত হওয়া সম্ভব, এ অমঙ্গলময় কর্ম্মসকল ঘটাইয়া জীবরূপ পুত্রদিগকে অগাধ জ্বালা-যন্ত্রণানলে

দগ্ধীভূত করিতে, স্নেহময়ী মা'ই কি নিযুক্তা? যাঁহার আস্বাদন মাত্রে সমস্ত জ্বালা দূরীভূত হইয়া যায়—যাঁহার স্মরণ মাত্রে জীবের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে অমৃতধারা নিঃসৃত হইতে থাকে—যাঁহার নাম উচ্চারণ মাত্রে প্রাণ মঙ্গল ও পুণ্যময় হইয়া পড়ে, সেই মঙ্গলময়ী মা'ই কি স্বীয় কর্ত্তৃত্বদর্পে পাপের গরল উদ্গীরিত করিয়া পুত্রগণকে কাঁদাইতেছেন? সেই পুণ্যময়ী আমার মা'ই কি এক স্তনে অমৃত, অন্য স্তনে গরল সঞ্চারিত করিয়া জগতে সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, আলো-আঁধারের ছায়া প্রকাশ করিতেছেন? স্নেহ-কোমলা জননি! তোমার এক নয়নে স্নেহের নির্ঝর, অন্য নয়নে ঘৃণার অভিব্যক্তি, ইহাই কি তোমার রূপ? তোমার অধরের এক প্রান্তে করুণার হাসি, অন্য প্রান্তে ক্রোধের কুটিল রেখা, ইহাই কি তোমার রূপ? তোমার এক ভ্রূ-ধনু স্নেহ-পীড়নে অবনত, অন্য ভ্রূ বিরাগ-ভঙ্গিমায় বিভঙ্গ, ইহাই কি তোমার রূপ? তোমার জিহ্বার এক দিকে অমৃতাস্বাদন, অন্য দিকে বিষপান, ইহাই কি তোমার রূপ? তোমার এক কর তোষামোদকারীকে অভয় দিতে, অন্য কর নিন্দাকারীকে শাসন করিতে নিযুক্ত, ইহাই কি তোমার রূপ? তোমার এক চরণ ভক্তের হৃদয়ে মোক্ষ ঢালিয়া দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত, অন্য চরণ অসুরপুত্রদলনে চির-কলঙ্কিত, ইহাই কি তোমার রূপ? বহু-রূপিণি! মঙ্গল ও অমঙ্গল, উভয়ই কি তুমি? আলো ও আঁধার, সুখ ও দুঃখ, এই উভয়ের সংমিশ্রণ কি তুমি? মিশ্রিত, অবিশুদ্ধ, সঙ্করতাপ্রাপ্ত, অহো! এই আমার মা!

সাধকের প্রাণ প্রথম মাতৃকর্ত্তৃত্ব-দর্শনে এই ভাবে আকুল হয়। মাতৃকর্ত্তৃত্বে পুণ্য হইতেছে, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু পাপ হইতেছে, ইহা মনে করিলে সাধক আপনাকে বিড়ম্বিত বলিয়া অনুমান করে। অর্জ্জুনেরও এই স্থলে সেই বিড়ম্বনা। সেই বিড়ম্বনার ছলেই অর্জ্জুন যেন কম্পিতকণ্ঠে তাঁহার হৃদয়-সারথিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে বার্ষ্ণেয়! জীব কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাপে বিচরণ করে?

সাধকরূপে আপনাকে জ্ঞাত হইবার সময় অর্থাৎ ভগবৎকর্ত্তৃত্বে আপনাকে মিশাইয়া দিবার কালে পাপাদি কু দর্শনগুলি ভগবৎকর্ত্তৃত্বে আরোপ করিতে জীব সহজে সক্ষম হয় না। যেগুলি ভাল, সেগুলি মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা বলিয়া ধারণা করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু যেগুলি জাগতিক চক্ষে অমঙ্গলময় বা পাপময়, সেগুলিও যে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্পাদিত হইতেছে, ইহা ধারণা করিতে সহজে সাধক পারে না। ইহা তাঁহার বিরাট্ কর্ত্তৃত্বদর্শনের অসম্পূর্ণতা মাত্র। তাঁহার বিরাট্ কর্ত্তৃত্ব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইলে মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল বলিয়া কিছু প্রতিভাত হয় না; সুতরাং সে অবস্থায় এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে না। যত ক্ষণ পাপ বা দোষ বলিয়া কোন কার্য্য বিমথিত করিতে থাকিবে, তত ক্ষণ ভগবৎকর্ত্তৃত্বের অসম্যক্ দর্শন হইতেছে বলিতে হইবে; এবং সেই অসম্যক্ দর্শনের ফলে, "তবে জীব কাহা কর্ত্তৃক পাপে নিযুক্ত হয়," এই প্রশ্ন উঠিতে থাকে। জ্ঞানের দ্বারা বুঝিলেও মঙ্গলময়ী মাকে এ কর্ত্তৃত্ব দিতে সাধকের প্রাণ চাহে না। যিনি সর্ব্বত

মঙ্গলময়ী, তিনি কি পাপে জীবকে নিযুক্ত করিতে পারেন? কর্ত্তৃত্ব জানিয়াও এই জন্য সাধকের প্রাণ বার বার জিজ্ঞাসা করিতে চাহে, এ পাপের কর্ত্তা কে?

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিরাট্ কর্ত্তৃত্ব সন্দর্শন করিতে সক্ষম হইলে, পাপ ও পুণ্য বলিয়া কিছু জানা যায় না। কিন্তু যত দিন উহা পরিদৃষ্ট না হয়, তত দিন বুঝিতে হইবে, সে জীব অসম্যক্‌দর্শী, সুতরাং কর্ত্তৃত্বজ্ঞান-বিমূঢ়। এ স্থলে বলিয়া রাখি, আমাদের শাস্ত্রে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মসকল লোক-সমাজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল যথাসম্ভব সুরক্ষিত করিবার জন্যই ব্যবস্থিত—জীব-কর্ত্তৃত্বকে বিরাট্ কর্ত্তৃত্বের দিকে লইয়া যাইবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু তাহাতেও জীবকর্ত্তৃত্ব আছে। কেন না, কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞানই জীবত্বের হেতু; সুতরাং সে জীবকর্ত্তৃত্ব ভাণ জীবের যত দিন সম্যক্‌রূপে তিরোহিত না হয়, তত দিন তাহাকে কথঞ্চিৎ মানিয়া চলা বিহিত এবং সেই জন্য তত দিন পাপ পুণ্য মানিয়া চলা আবশ্যক। মায়ের আমার উপদেশও সেই জন্য অধিকারী হিসাবে ব্যবস্থিত। জীব যত ক্ষণ পাপ বলিয়া কোন জিনিষ দর্শন করিবে, তত দিন মাও আমার বলিয়া থাকেন,—'বৎস! পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও।' জীবের যখন এমন অবস্থা হয় যে, পাপ ও পুণ্য তাহার জ্ঞান-চক্ষে উদ্ভাসিত হয় না, তখন মাও তাহাকে স্বেচ্ছাচারের অধিকার প্রদান করেন। অর্জ্জুনের মত সাধকও পাপ দর্শন করিতে বাধ্য, ইহাই এ স্থলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান; এবং সেই জন্য মা আমার অর্জ্জুনের জ্ঞান-চক্ষে যে ভাবে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইতেছে, সেই ভাবে তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন। সাধারণ মনুষ্য হইলে অর্জ্জুনের এ মহাপ্রশ্নকে বালকোচিত প্রশ্ন বলিয়া মাই সব করিতেছেন, সুতরাং পাপও মাই করিতেছেন, এই বলিয়া আভাসিত ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মায়ের উপদেশের ধারা অতীব বিচিত্র। অর্জ্জুনের জ্ঞানের ভিতর দিয়া যে ভাবে তাঁহাকে বুঝান যাইতে পারে, মা আমার সেই ভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। তাই তিনি বিরাট্ কর্ত্তৃত্বের কথা রুদ্ধ করিয়া, মাত্র তীব্র জ্ঞানীর মত বলিতেছেন,—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা এষ কামঃ এষ ক্রোধঃ, ইহ এনং বৈরিণং বিদ্ধি।

ব্যবহারিক অর্থ।—এইবার রজোগুণ-সমুদ্ভব মহাশন এবং মহাপাপস্বরূপ এই কাম ও ক্রোধ নামক শত্রুকে অবগত হও।

যৌগিক অর্থ।—কাম ও ক্রোধ বস্তুতঃ একই বৃত্তি, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কাম কোনরূপে প্রতিহত হইলেই উহা ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই কাম অতীব পবিত্র, নির্ম্মল মাতৃস্নেহধারা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। মায়ের মহা আকর্ষণ, মায়ের

আমার মহা আহ্বান কামাকারে জীবে জীবে প্রতীয়মান। একান্ত তৃষাতুর জীব, তৃষায় কাতর হইয়া তরল পদার্থমাত্রকে বারিজ্ঞানে গ্রহণ করিবার জন্য যেমন আকুল হইয়া উঠে, মাতৃআহ্বানের অন্তঃপীড়নে জীবও তদ্রূপ বিষয়মাত্রকে আকুলভাবে পরিগ্রহণ করে। পদার্থের পদার্থত্ব—রঞ্জনা মাত্র; উহা আমাদিগকে আকর্ষণ করে না, উহা মাতৃআহ্বানের বিকাশ-বিশেষ; এ জগৎ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু নহে; জাগতিক পদার্থসকল মাতৃআহ্বান-ভাবপূর্ণ শব্দ-বৈচিত্র্য মাত্র; বিভিন্ন শব্দে, বিভিন্ন সুরে মা ডাকিতেছেন, ইহাই জগৎ। বিভিন্ন চাহনীতে মা আমাদিগের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন—ইহাই জগৎ। বিভিন্ন পরশে মা আমাদিগকে কণ্টকিত করিতেছেন—ইহাই জগৎ। বিভিন্ন রসে রসময়ী হইয়া মাতৃআহ্বান উচ্ছ্বসিত হইতেছে—ইহাই জগৎ। সাধারণ চক্ষে ইহা কল্পনাজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু যে সেই আহ্বান শুনিয়াছে, যে সেই আহ্বান দর্শন করিয়াছে, যে সেই আহ্বান স্পর্শ করিয়াছে, যে সেই আহ্বানের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, যে সেই আহ্বানের অমিয়গন্ধ গ্রহণ করিয়াছে, শুধু সেই জানে, শুধু সেই প্রত্যক্ষ করে, ইহা বস্তুতঃ কল্পনা নহে, ইহা যথার্থ, ইহা সত্য, ইহা মহাসত্য; আমরা জগৎ বলিয়া যাহা জানি, তাহা মাতৃআহ্বান। মা ও মাতৃআহ্বান একই কথা, মায়ের মাতৃত্ব এই আহ্বানেই পূর্ণ প্রকটিত, আহ্বানশূন্য মা হইতে পারে না, সে সাধক ইহা উপলব্ধি করে। সে দেখিতে পায়, কেমন করিয়া পাদহীনা জননী আমার গমন করেন, কেমন করিয়া অচক্ষুঃ জননী আমার দর্শন করেন, কেমন করিয়া অকর্ণ মা আমার শ্রবণ করেন। কামনার তাড়নায় অজ্ঞানভাবে বিষয়ে বিষয়ে ছুটাছুটি করিতে করিতে যখন জীবের বিষয়-সকলে বিদ্বেষ আসিতে থাকে, যখন বিষয়-সকলে পাপ ও বৈরী বলিয়া ধারণা আসিতে থাকে, এবং উহা অপেক্ষা সুখময় সত্তার জন্য জীবের জীবত্ব আকুল হইয়া উঠে, জীবত্বের সেই মহাশুভমুহূর্ত্ত হইতে জীব এই মহাসত্তার আভাস পাইতে থাকে। মা বলিয়া, আশ্রয়স্থল বলিয়া, গতি বলিয়া, শান্তির বিরাম ক্রোড় বলিয়া একটা জিনিষ রহিয়াছে, ইহা তখন সে বুঝিতে পারে বা অনুভব করে। সেই অনুভূতি যত ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই বিষয়ের বিষয়ত্বরূপ সঙ্কীর্ণ উদ্ভাসন তিরোহিত হইয়া, যেরূপ কোরক বিদীর্ণ হইয়া কুসুমবিকাশ হয়, সেইরূপ অনুরাগ ও বিদ্বেষময় বিষয় বিদীর্ণ হইয়া, আহ্বানময়ী মা বিকশিত হইয়া থাকেন। সে মায়ের স্বরূপ—ইন্দ্রিয়হীন অথচ ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মময়, মনোহীন অথচ মনোধর্ম্মময়, জ্ঞান-হীন অথচ জ্ঞানময়, ব্যাপকতাহীন অথচ ব্যাপ্তিময়, শব্দহীন অথচ শব্দময়। সত্তা বলিয়া আমরা যাহা বুঝি, তাহার একান্ত ঘনীভূত বিকাশ এবং আনন্দ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার একান্ত ঘনীভূত বিকাশ, আমার সেই মা। আর সেই সত্তা, সেই ঘন চৈতন্য, সেই আনন্দঘনমূর্ত্তি—উহা পূর্ণ কামনার ঢল ঢল পূর্ণত্বে পরিপূর্ণ। যদি কেহ দেখিয়া থাকে, তবে সেই মাত্র ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। সেই মাত্র, অঙ্গহীনার সর্ব্বাঙ্গ কেমন ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মী, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কিরূপ দর্শন-শ্রবণ-মননপটু,

তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিবে। এবং সেই মাত্র বুঝিবে যে, তোমরা কাম নামক যে বৃত্তিকে মহাশন ও মহাপাপ বলিয়া বুঝ, তাহা অরূপ অব্যয় রূপের লীলাবিকাশ মাত্র—তাহা সেই পূর্ণতমের পূর্ণত্বের উদ্বেলন মাত্র।

রজোগুণ এ সৃষ্টি-রঞ্জনার প্রধান কারণ। কাম ইহার মূল অভিব্যক্তি। পূর্ণ অখণ্ড সেই মা, আপনাকে খণ্ডরূপে দর্শন করিয়া এই জগদ্বৈচিত্র্য রচনা করিয়াছেন। আপনি আপনার ভালবাসা সম্ভোগ করিবার জন্য—আপনি আপনাকে হারাইয়া খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য—আপনি আপনার বিচ্ছেদের পর মিলনের উদ্বেলতা অনুভব করিবার জন্য ভাবযুক্ত হইয়া এ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ভাবযুক্ত হওয়া অর্থে—খাণ্ডত হওয়া। আমরা যখন কোন ভাববিশেষের দ্বারা আবিষ্ট হই, তখন বুঝিতে হয়, আমাদিগের বিভু অন্তরে খণ্ডিত হইয়াছি মাত্র। এই ভাববিভিন্নতাই—জীব-বিভিন্নতা। মা যখন ভাবময়ী হন, তখন তিনি জীবাকারে খণ্ডিত বলিয়া আপনাকে দর্শন করেন। সচ্চিদানন্দ খণ্ড সৎ, খণ্ড চিৎ ও খণ্ড আনন্দরূপে আপনাকে সন্দর্শন করেন, ইহাই জীবভাব। আপনাকে ঐরূপ দর্শন করিয়া, পুনরায় সেই অফুরন্ত অসীম আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে—সেই অফুরন্ত অসীম আপনাকে পূজা করিতে—সেই অফুরন্ত অসীম আপনার সহিত আপনাকে মিলিত করিতে সচেষ্ট হয়েন। যে রজোগুণসমুদ্ভব কামের দ্বারা মা খণ্ডিতা হইয়াছেন বা আপনাকে খণ্ডবৎ অনুভব করিতেছেন, সেই রজোগুণসমুদ্ভব কামের দ্বারাই সেই খণ্ডরূপা মা অর্থাৎ জীব, আপনি আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করেন—সেই কামের প্ররোচনাতেই "কোথায় তুমি গো আমার আমি—কোথায় তুমি আমার আপনি" এই ভাবে জীব খুঁজিতে থাকে; এবং শেষে বহু অন্বেষণের পর সেই আপনার আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করে ও মিলিত হয়। আমরা আপনাকে যত ভালবাসি, এত আর কাহাকেও নয়—আমরা আপনার সেবায় যত নিযুক্ত, এত আর কাহারও নহে—আমাদিগের সমস্ত কামনা, আপনার সন্তোষ বিধানার্থেই নিযুক্ত। আপনার আপনাকে আমরা কত ভালবাসি, ইহাই তাহার লক্ষণ। জগতে আপনারই সন্তোষের জন্য, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই ব্যস্ত, আপনার পরিতোষ-সাধনেই জগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব হইতে সকলেই নিযুক্ত। শ্রুতি তাই বলেন—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি—ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ন্তবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" অহো! মহান্ "আপনি" আমার মা! এমন এক পরমাণু দেখি না, এমন এক মুহূর্ত্ত দেখি না, যেখানে তোমার পূজা, তোমার সেবা, তোমার পরিতৃপ্তি বিধান না চলিতেছে। লোকে ইহাকে স্বার্থপরতা বলিতে পারে; কিন্তু সাধক দেখে—ইহা তোমারই বিরাট্ পূজা। কেহ দয়া করিয়া, কেহ নিষ্ঠুরতা করিয়া, কেহ জ্ঞানীর মত কাজ করিয়া, কেহ অজ্ঞানীর মত ভান করিয়া, কেহ ভোগী হইয়া, কেহ ত্যাগী হইয়া, হে তুমি আপনি!

আমার মা! তোমারই পূজা সংসাধিত করিতেছে মাত্র। যে দয়া করিয়া পরহিতে রত থাকে, কার্য্যতঃ সে আপনারই আনন্দ লাভের জন্য ঐরূপ করে, যে নিষ্ঠুরতা করিয়া অপরের উপর অত্যাচার করে, সে আপনারই আনন্দের জন্য ঐরূপ করে। কেহ বলিতে পারে, জীব-সকল স্ব স্ব ক্ষুদ্র আমিত্বের সন্তোষ বিধানার্থ এরূপ করিয়া থাকে, মা বা বিরাট্ আমিত্বের জন্য করে না। তাহা নহে, আমিত্বের অর্থাৎ মায়ের যে যতটুকু অধিকার করিয়াছে, সে ততটুকুরই সেবা করিতেছে। মা যেখানে যে পরিমাণে আবির্ভূতা, সেখানে সেই পরিমাণের পূজা লইতেছেন; সুতরাং ইহাতে কিছু ব্যত্যয় ঘটে নাই। তবে সাধারণ জীবে ও সাধকে প্রভেদ এই—সাধক সেই আপনার আপনাকে বিরাট্ আপনি বলিয়াই দর্শন করে, মা বলিয়াই তাহা ধারণা করে; সাধারণ জীব তাহা পারে না, এই মাত্র প্রভেদ। সাধক পূর্ব্বোক্ত "আপন" জ্ঞানের রঞ্জনায় রঞ্জিত থাকে, সাধারণ জীব সেরূপ থাকে না।

এই যে পূজা—এই যে জীবের সচ্চিদানন্দ অন্বেষণ, ইহার একমাত্র কারণ দেখিলাম—কাম। ইহাই রজোগুণ-সমুদ্ভব। ইহাই জীবমাত্রের শক্তি, ইহা উদ্বোধিত রাখিবার জন্যই মা আমার কূটস্থ চৈতন্যরূপে বা গুরুরূপে, সখারূপে, সারথিরূপে জীবে জীবে অধিষ্ঠিতা। ঐ গুরুতে, ঐ সখাতে, ঐ মায়ে, যত দিন না কাম প্রত্যাবর্ত্তন করে, অর্থাৎ যত দিন না জীব বুঝিতে পারে যে, মা'ই আমার সমস্ত সম্পাদন করিতেছেন, আমি প্রতিবিম্ব বা ভোগবিম্ব মাত্র; অর্থাৎ যত দিন না জীব-হৃদয়ে মা গুরুরূপে প্রকটিতা হয়েন, যত দিন না জীব স্বীয় চৈতন্যকে গুরুরূপে অর্জ্জুনের মত সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তত দিন জীব জাগতিক কার্য্যকে বিচ্ছিন্ন বিষয়-মোহরূপে বুঝিতে থাকে। যত দিন না কুসুম-বিস্তারে কোরকত্বের তিরোধানের মত মাতৃত্ব-বিস্তারে বিষয়ত্বের তিরোধান হয়, তত দিন ঐ কামকে মহাশন, মহাপাপ ও মহাবৈরিরূপে না দেখিয়া থাকিতে পারে না।

সেই কাম অর্থে—বিষয়ে বিজড়িত কামনা বা বিষয়-বাসনা। কামনায় বিষয়-সকল যত ক্ষণ বিজড়িত থাকে, তত ক্ষণই উহা বৈরী ও মহাপাপ বলিয়া জীব চীৎকার করে। যখন মায়ে জড়িত হয়, তখন উহা পবিত্র ও নির্ম্মল। বিষয়-কামনায় জর্জ্জরিত হইয়া বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জীব ছোটে এবং প্রতি বিষয়ে অনিত্যতা ও অকিঞ্চিৎকরতা, তাহার সেই বিষয়-বাসনার বিপক্ষে সংস্কার জন্মাইয়া দেয়। হৃদয়ের উপর নূতন নূতন বিষয়ের বিস্তার এবং তাহা হইতে সংস্কার বা বন্ধনমাত্র লাভ—ইহাই সাধারণ জীব প্রত্যক্ষ করে। জন্ম জন্ম ধরিয়া ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়া, ইহার উপর বিষদৃষ্টি হয়। মাতৃকামনার মহাপ্রসার এইরূপে জীব-হৃদয়ে অলক্ষ্যে প্রসারিত হয় এবং ক্রমশঃ সেই মহাকামনা ক্ষুদ্র বিষয়কে দূর করিয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সাধারণ জীব কামনার এ পরিবর্দ্ধন ও পরিপোষণ লক্ষ্য করে না, তাহাদিগের সাধারণ লক্ষণ বিষয়-বিরক্তিরূপে

ফুটিয়া উঠে এবং এই বিষয়বিরতিই বিষয়-কামনাকে তখন মহাপাপ বলিয়া উদ্ঘোষিত করে। তাই অর্জ্জুন পূর্ব্বশ্লোকে সাধারণ জীবের মত বিষয়কামনাকৃত কর্ম্মকে পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভগবান্‌ও সেই জন্য বলিতেছেন,—"সেই পাপ কি? এইবার বলিতেছি, তোমরা শুন।"

অর্জ্জুনের "কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ" জিজ্ঞাসা করিবার আর একটি কারণ প্রদর্শন করিতেছি—বিষাদের সূচনায় অর্জ্জুন মৈত্রীভাবে সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই দর্শন উপলক্ষ্য করিয়া কেন বিষয় হনন করিব, এইরূপ প্রশ্নে অভিভূত হইয়াছিলেন। নাশ অর্থে অদৃশ্য হওয়া, ইহা অর্জ্জুন তখন বুঝিতেন না বা বুঝিলেও উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। বিষয়রূপ বা চিত্তবৃত্তিরূপ আত্মীয়-স্বজননাশে পাপ হইবে, ইহাই অর্জ্জুনের আশঙ্কা ছিল। আত্মীয় হইলেও ইহাদিগকে শত্রু বলিয়া বুঝিতেছিলেন, অথচ পাপভয়ে আশঙ্কিত হইতেছিলেন। ভগবান্ সেই জন্য বিষয়ের উপর অর্জ্জুনের শত্রু ও মিত্ররূপ উভয় বিরুদ্ধ ধারণার বিশ্লেষণ করিয়া, কিরূপে ধারণা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, প্রথমে তাহাই দেখাইতেছেন। একমাত্র কাম, উভয় মুখে উভয় প্রকারে জীবকে চালিত করে। যখন এই কাম বিষয় অভিমুখে ধাবিত করে, তখন ইহা সঙ্কল্পময় এবং তখন ইহা প্রতিঘাত প্রাপ্তে ক্রোধ উৎপন্ন করে; যখন ইহা মাতৃমুখে ধাবিত হয়, তখন ইহা মিত্র এবং মাতৃলাভে বিলম্ব প্রভৃতি কারণে উদ্বেলিত হইয়া অভিমানাদির সূচনা করে। বিষয়সকলের কোন দোষ নাই; বিষয়ে শত্রু বা মিত্রজ্ঞান, ইহা জীবেরই কামের বিষয়মুখা গতির রূপান্তর মাত্র। যখন বিষয়কে মিত্র বলিয়া বোধ হইবে, অথবা শত্রু বলিয়া বোধ হইবে, তখন এই কামই বস্তুতঃ শত্রু বা মিত্র বলিয়া বোধ করিবার যোগ্য। বিষয়-হননকে যদি তুমি পাপ বলিয়া বুঝ, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই কামকে তুমি মিত্রভাবে দর্শন করিতেছ। বিষয়-হননকে যদি তুমি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি এই কামকে বৈরী বলিয়া দর্শন করিতেছ। তোমার চিত্ত বিষয়-হনন করিতেই প্রধানতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিষয়ের উপর মৈত্রীভাব অপ্রধান অভিব্যক্তি। সেই প্রধান ধারণা বা শত্রুজ্ঞান কার্য্যতঃ কামেরই উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য আমি তোমাদের সেই বৈরি-ভাবাপন্ন কাম বিশ্লেষিত করিয়া এইবার বুঝাইব।

এ স্থলে ভগবানের প্রধান অভিপ্রায় এই যে—বিষয়াদিতে তোমার শত্রুজ্ঞান বা মিত্রজ্ঞান, কিছুই রাখিবার আবশ্যক নাই। কামের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি কর, এই কামের দ্বারা আমাকে লাভ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। বিষয়াদি নাশ অর্থাৎ বিষয়মায়া তিরোধান, ইহা আমিই করিয়া থাকি, সাধক আমায় জড়াইয়া ধরিলে আমিই করিয়া দিই। জগতে যাহা পাপ বলিয়া খ্যাত, তাহা এই বিষয়-বিজড়িত কামের দ্বারা সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্গ হইতে কাম জন্মায়, ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন। এখানে আর একটু বিশ্লেষিত করিয়া বলিলেন, রজোগুণ হইতে কাম উদ্ভূত হয়। মা যখন বিষয়রূপে আসিয়া সঙ্গ করেন, তখন বিষয়মুখে রাজসিক চঞ্চলতা সক্রিয় হয়, যখন মাতৃরূপে আসিয়া সঙ্গ করেন, তখন মাতৃমুখে ঐ রাজসিক চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয়। বিষয়কে খণ্ড বিষয়মাত্র দর্শন ও তদ্রূপ কার্য্যানুষ্ঠানই পাপ, বিষয়কে মাতৃপ্রেরিত ভোগ বলিয়া দর্শন বা মাতৃরূপে পরিচিন্তন—ইহাই পুণ্য। শাস্ত্রে যে সকল কার্য্যকে বিশিষ্ট-ভাবে পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা বিষয়কে খণ্ড বিষয়রূপে পরিদর্শনের ফল মাত্র। এবং যেগুলিকে শাস্ত্র পুণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বিষয়কে মাতৃত্বে পৌঁছাইয়া দিবারই সোপান মাত্র।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮

ধূমেন সহজেন (ধূমাৎ বহ্নিঃ ইতি বহ্নি-সহজাত-সংস্কার-ভাবেন মাতৃসত্ত্বগুণ-প্রকাশাত্মকেন সত্তাপ্রকাশকেন বা) যথা বহ্নিঃ আব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, যথা চ আদর্শো মলেন আগন্তুকেন (বাহ্যবিষয়াৎ নবসংস্কারোদ্ভাবনেন মাতৃরজোগুণাৎ জীবার্থে সক্রিয়-ভাবেন) আব্রিয়তে, যথা চ উল্বেন গর্ভবেষ্টেন বা গর্ভধারণচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্ব্বতোভাবেন (স্নেহৈশ্বর্য্যপ্রকাশাত্মকতমোগুণাৎ সংরক্ষকভাবেন) আব্রিয়তে, তথা এবংপ্রকারত্রয়েণ তেন কামেন ইদং ব্রহ্ম আবৃতম্ আচ্ছাদিতং প্রকাশিতং বা।

ব্যবহারিক অর্থ।—ধূমের দ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন মলের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, গর্ভ যেমন উল্বনের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্ম এই কামের দ্বারা আবৃত।

যৌগিক অর্থ।—কাম কি প্রকারে মাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ধূমের দ্বারা যেমন বহ্নি আবৃত থাকে, সেই ভাবে কামের দ্বারা মা আবৃতা। বিজ্ঞানময়ী মা আমার সর্ব্বব্যাপিনী হইয়াও কেন ও কিরূপে জীবের দ্বারা অপরিলক্ষিতা, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ভগবান্ ধূমাচ্ছন্ন অগ্নির কথা উল্লেখ করিলেন। জীবে জীবে সহজাত সংস্কাররূপে এই কাম অবস্থান করে এবং তাহার আবরণে থাকে বলিয়া জীব মাতৃসত্তা বুঝিতে পারে না, সুতরাং বহির্মুখী কর্ম্মে আসক্ত হয় এবং সে আসক্তির আতিশয্যে পাপাচরণে কুণ্ঠিত হয় না। জীবের সহিত কামের এই সাহজাত্য ভাব চিরবিদ্যমান।

কিন্তু এই ধূমাগ্নি-দৃষ্টান্তের আর একটি লক্ষ্য আছে। ধূম যেমন অগ্নির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, এই কাম তদ্রূপ মাতৃসত্তা জ্ঞাপিত করে। যেখানে ধূম দেখিতে পাওয়া যায়, সেইখানেই যেমন বহ্নি পরিদৃষ্ট না হইলেও বহ্নিসত্তা নিশ্চয়রূপে অনুমিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ যেখানে কাম পরিলক্ষিত, সেইখানেই মাতৃসত্তা প্রত্যক্ষ না হইলেও নিশ্চয়রূপে অনুমান করিতে পার।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সর্ব্বপ্রথম সত্য যখন লব্ধবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার মাতৃভাব উজ্জীবিত হয় এবং "আমি বহু হইব" এই ইচ্ছা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই বহু হইবার ইচ্ছা দ্বারা আপনি আপনার মহিমা কল্পনা করেন এবং সেই কল্পনা অনুযায়ী বিচিত্র জগৎ উদ্ভাসিত হয়। এ ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা। তোমার প্রাণে যখন কোন কল্পনা উদ্বোধিত হয়, যখন তুমি কোন বিষয় চিন্তা কর, তখন যেমন তুমিই সেই চিন্তনীয় পদার্থ হইয়া পড়, আপনিই দ্রষ্টা ও আপনিই দৃশ্য হও, তদ্রূপ মা আমার এই জগৎ কল্পনা করিয়াছেন, এবং আপনিই দ্রষ্টা ও দৃশ্য হইয়া পড়িতেছেন। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তবেই স্পষ্ট বুঝা গেল, বহু হইবার ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি জগদাদিরূপে বহু বিভক্ত হইয়া পড়িতেছেন, অথচ সেই সমস্ত বিষয়ই তাঁর স্বরূপ। আমরা জীব, আমরা তাঁহার কল্পিত বিষয় মাত্র; তাঁহারই কামনার উদ্বেলন মাত্র, অথচ তাঁহার স্বরূপ, ইহা যেমন সত্য, তেমনি আবার এ জীবত্বে তাঁহার স্বরূপের কোন প্রত্যবায় হয় না বলিয়া আমাদিগেরও কামনা-প্রবুদ্ধ বিষয়-সকল আমাদিগের স্বরূপ মাত্র। তাঁহারই প্রাণের কামনা বিষয় আকারে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারই স্বরূপ কামনা নামে অভিহিত হয়। কামনার দ্বারাই মা আমার বহু রূপে রূপময়ী। আমাদিগের কামনা দ্বারা যেমন আমাদিগের সত্তাকেই আমরা উপলব্ধি করি, তেমনি মা কামনার দ্বারাই আপনার সত্তাকে আপনি উপলব্ধি করিতে চান। আমার ইন্দ্রিয়াদি যাহা কিছু, তাহা যেমন আমারই কামনা, তেমনি আমি ও জগদাদি যাহা কিছু, ইহা মায়েরই কামনা এবং মা। আমার চিত্তের কল্পনাদি যাহা কিছু, তাহা যেমন আমারই চৈতন্যে উদ্ভাসিত হয় ও আমারই চৈতন্য দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তদ্রূপ বিষয়াদি যাহা কিছু মায়েরই চৈতন্যে উদ্ভাসিত এবং মায়েরই চৈতন্যে নির্ম্মিত। সুতরাং জগৎ বলিয়া যে মাতৃকামনা তোমরা পরিদর্শন কর, তাহা মায়েরই সত্তা মাত্র এবং মায়েরই সত্তা বুঝাইয়া দেয় মাত্র। চৈতন্যময় তুমি আছ বলিয়া যেমন তোমার কামনারাশি প্রাণে ফুটে এবং তাহা দ্বারা যেমন তোমার সত্তা সহজে অনুমান করা যায়, তদ্রূপ এই কল্পনাময় জগৎ দেখিয়া মায়েরই সত্তা নিরূপিত হয় মাত্র। এ জগৎ মাতৃআবরণ মাত্র নহে, মায়ের সত্তাপ্রকাশক। জগতের দ্বারা মা নিরূপিতা হন। অরূপা, অব্যক্তা, অচিন্তনীয়া, অবাঙ্‌মনসগোচরা মা আমার এই জগতের দ্বারা রূপময়ী, শব্দময়ী, স্পর্শময়ীরূপে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অচিন্ত্য জননী চিন্তার বিষয়ীভূতা হইয়া পড়িয়াছেন; অসেব্য মা আমার সেব্যসেবক ভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছেন। "কোথা তুমি কল্পনাতীতা" এ ভাব ছাড়িয়া "এই যে আমি-রূপে" জাজ্বল্যময়ী হইয়া তোমার প্রত্যক্ষীভূতা। তোমরা যাহা মায়া বল, তাহা মায়েরই জাজ্বল্যমান সত্তা। মায়ার প্রকৃষ্ট অর্থ তোমরা জান না। বেদান্ত-ভাষ্যকারগণ মায়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, মিথ্যার কজ্জলী মুখে মাখিয়াছে। সত্যবাদ প্রচার করিতে গিয়া মিথ্যাবাদী হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের মতে মায়া শব্দের নিরুক্তি এইরূপ—মা—নিষেধ

অর্থে এবং যা—প্রাপ্ত্যর্থে। যাহাকে পাইলে আর যাহা থাকে না—তাহাই মায়া। ব্রহ্মদর্শন হইলে আর জগদ্দর্শন হয় না; সেই জন্য এই জগদ্দর্শন মায়া নামে অভিহিত। কিন্তু ইহাতে মিথ্যার আভাস কোথায়? মায়াকে দেখিলে মায়াও ব্রহ্ম হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মই মায়ারূপে পরিদৃষ্ট হন। এবং সেটি ব্রহ্মেরই সঙ্কল্পজাত প্রকাশ, কাজেই মিথ্যা নহে। মাকে পাওয়াইবার জন্যই মায়ের আমার মায়াময়ী মূর্ত্তি; ঢাকা দিয়া রাখিবার জন্য নহে। অনির্দ্দেশ্য মা আমার নির্দ্দিষ্টা হইবার জন্য মায়ার সাজে সজ্জিতা। তোমরা মায়া শব্দের নিরুক্তি এইরূপ বুঝিবে,—"মাতৃত্বং যাতি প্রাপ্নোতি ইতি মায়া।" মাতৃভাবে প্রকটিত ব্রহ্মই মায়া। নির্গুণ যখন স্নেহগুণান্বিতা হইয়া, বিচিত্র কল্পনা-মালায় সজ্জিতা হইয়া অহং জ্ঞানে জগৎ সাজেন ও তাহা দর্শন করেন, ধারণ করেন, পালন করেন, আবার অদৃশ্য করেন, সেই সক্রিয় অবস্থার নাম মায়া বা মায়াময়ী। সন্তান গর্ভে ধারণ করিলে জীব যেমন মাতৃশব্দে অভিহিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম যখন স্বীয় গর্ভে জগদাত্মিকা কল্পনা দর্শন করেন, তখন তাঁহার নাম মায়া। সন্তান বলিলে যেমন মাতৃসত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ জগৎ বলিলে ব্রহ্মসত্তা স্বতঃ নিরূপিত হইয়া থাকে। সেই জন্য এখানে ধূমাগ্নি উপমা। মাতৃত্ব সন্তানের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত—সন্তানের দ্বারা মায়ের মাতৃত্ব নিরূপিত হয়। সন্তানের সন্তানত্ব মাতৃত্বের দ্বারাই গঠিত হয়। ধূম অগ্নির উত্তাপে উত্তাপময়, অগ্নির তেজে তেজোময়, অগ্নি-সত্তাই রসাদিকে ধূমত্বে পরিণমিত করে। অগ্নির মাতৃত্বে ধূমের সন্তানত্ব। পিতৃবীজ মায়ের দ্বারা যেমন পরিস্ফুটিত হয়—অগ্নির দ্বারা তদ্রূপ রসাদির ধূমাকার লাভ—এই কারণেই ধূমাগ্নি উপমা।

তোমরা জগৎকে মিথ্যা ভাবিতে শিখিয়াছ। বেদান্তের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, ভাষ্য ও তদ্ভাষ্য—এইরূপ ভাষ্যপ্রবাহে পতিত হইয়া, যথার্থ বস্তু হইতে বহু দূরে অপসৃত হইয়া একটা স্থূল মিথ্যা ধারণায় প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছ। মায়া অর্থে মিথ্যা বুঝিয়াছ। বাচনিক জ্ঞানে জগৎকে মিথ্যা বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছ, অথচ সত্যকে খুঁজিতে গিয়া একটা মিথ্যার আচ্ছাদনে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছ। এমন অপূর্ব্ব মাতৃত্বের বিকাশকে—এমন অপূর্ব্ব ব্রহ্মের মহত্ত্বকে তোমরা হৃদয়হীন প্রহেলিকা ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ। মা আমার মা সাজিয়া, হৃদয়ের অপূর্ব্ব অমিয়ময় স্নেহ-রাগে রঞ্জিতা হইয়া, তাঁর নির্গুণ চৈতন্যমাত্র অবস্থার বীজ গর্ভে ধারণ করিয়া, সেই বীজে আপনার মাতৃসত্তা অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া, এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া তুলিয়াছেন। জলবিন্দুতে যেমন শৈত্য, অগ্নি-কণায় যেমন উত্তাপ, এ জগতের প্রত্যেক পদার্থে তেমনি মাতৃত্ব। ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিকাশের দ্বারা বা তোমরা যাহাকে প্রপঞ্চ বল, সেই প্রপঞ্চের দ্বারা মা আচ্ছাদিতা নহে—প্রকাশিতা। ইহা আবরণ নহে—প্রকাশ। ধূম যেমন অগ্নির আবরণ মাত্র নহে—প্রকাশক, জগৎপ্রপঞ্চও তদ্রূপ। এই জন্য ভগবান্ ধূমাগ্নির উপমার কথা বলিয়াছেন। ইহা সত্ত্বগুণের উপমা।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—আদর্শ যেমন মলের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, এ জগৎ তদ্রূপ কামের দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহা রজোগুণের দৃষ্টান্ত। আগত মলে মুকুর আচ্ছাদিত হইলে মুকুরের প্রতিবিম্ব-গ্রাহিতা যেমন লুক্কায়িত হইয়া পড়ে, যেমন সে অংশে আর প্রতিবিম্ব পরিদৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ কামনা-চঞ্চল হৃদয়ে মাতৃসত্তা প্রকটিত হয় না। ইহাই এই উপমার সাধারণ মর্ম্ম। কিন্তু এ উপমার অন্য একটি প্রধান লক্ষ্য আছে। পূর্ব্বদৃষ্টান্তে জীবের সহজাত কামনার কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বাহ্য জগৎ হইতে আগন্তুক বিষয়-সকলের দ্বারা উদ্রিক্ত কামনার কথা বলা হইতেছে। বিষয়দর্শন মলস্বরূপ। এই মলে মাতৃত্ব বিম্বিত হইতে দেয় না, ইহা সত্য ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মায়ের এই বিষয়রূপগ্রাহিতাই আমাদিগকে রাজসিক ভাবে মাতৃমুখে চালিত করে। তোমরা বিষয় বিষয় করিয়া চীৎকার কর—বিষয়-মোহে মুগ্ধ হইলাম বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে থাক। হায়, যদি জানিতে—এই বিষয়রূপ স্তন্যের দ্বারা তোমরা পরিপুষ্ট, পরিপালিত ও মাতৃঅভিমুখে সঞ্চালিত হইতেছ। তুমি অহর্নিশ বাহ্য বিষয়ের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছ এবং এই আচ্ছাদন তোমাকে মাতৃদর্শনে বঞ্চিত করিতেছে ভাবিতেছ, কিন্তু তুমি জান না, অসীম অনন্ত জিনিষ অনুপলব্ধ, অচিন্তনীয়, অজ্ঞেয়। যদি একখানি দর্পণ অনন্ত ব্যাপকতা লাভ করে, তবে সে দর্পণের সত্তা একমাত্র মলের দ্বারাই সুপ্রকাশিত হইতে পারে। যেখানে দর্পণের প্রতিবিম্বগ্রাহিতা প্রকাশ হইয়া পড়ে—সেইখানেই দর্পণও প্রকাশিত হয়। অস্বচ্ছ পদার্থ না হইলে দর্পণ কিসের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইবে—চৈতন্যের প্রকাশক্রিয়া অন্য কি উপায়ে উদ্ভাসিত হইতে পারিবে। মাতৃত্বের অনুভাব্য স্নেহচাঞ্চল্য কেমন করিয়া চৈতন্য ভোগ করিবে—কেমন করিয়া খণ্ড চৈতন্য পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনে অভিভূত হইয়া স্নেহ-পীড়নের আদান প্রদান করিবে—কেমন করিয়া মা আপনাকে আপনি কত ভালবাসে—কত আকুল ভালবাসায় তাহার প্রত্যেক পরমাণু উচ্ছলিত, তাহা কেমন করিয়া জানিবে ? ভালবাসা কাহাকে বলে—উহা কিসের ধর্ম্ম ? ভালবাসা পরের জন্য কখন হইতে পারে না। তোমরা যখন বল, আমি ব্যক্তিবিশেষকে বা পদার্থবিশেষকে ভালবাসি, তখন তোমরা জান না যে, আপনি আপনার জন্য ভালবাসা সম্বন্ধে ঐরূপ বলিতেছ। সে ভালবাসা ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষকে নহে—তোমার প্রাণের সে ভালবাসা তোমাকেই ভালবাসিতেছে। পরকে কি কেহ ভালবাসিতে পারে ? পর জ্ঞান থাকিতে কি ভালবাসা প্রকাশ হয় ? যে পরিমাণে পরজ্ঞান থাকিবে, সেই পরিমাণে ভালবাসার ইতরতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। পরকে যে পরিমাণে আপনার করিয়া লইতে পার, তোমার ভালবাসা সেই পরিমাণে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ অন্য কিছু নহে, ভালবাসা পরের জন্য হয় না,—আপনার ভালবাসা আপনার জন্যই উদ্রিক্ত হয়। কোন জীব যখন অন্য কাহাকেও ভালবাসে, তখন বুঝিতে হইবে, সে তার নিজের প্রাণের যে প্রিয় ধর্ম্মগুলি উক্ত জীবে

উপলব্ধি করিয়াছে, সেইগুলিকেই ভালবাসিতেছে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ সে তাহার নিজের আত্ম-ছবি যে পরিমাণে উক্ত পুরুষে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইয়াছে, সেই পরিমাণে তাহাকে ভালবাসিতেছে। যে পরিমাণে সে ও তুমি উভয়ে আপনার বা এক বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছ, সেই পরিমাণে ভালবাসা সেখানে উদ্বেলিত। আরও বিশেষভাবে বুঝিলে আমরা দেখিতে পাই, যে পরিমাণে আত্মোপলব্ধি সংগঠিত হয়, সেই পরিমাণে ভালবাসানামীয় বৃত্তির সত্তা আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হই। আপনার ছবি, আপনার আদর্শ, অন্যে দেখিতে পাইলে তবেই সে অন্য আত্মীয় হইয়া পড়ে। এই দর্শন সম্যক্‌ হইলে ভালবাসা, আত্মীয়তাও সম্যক্‌ হয়। সাধারণতঃ জগতের কোন পদার্থের সহিত এই সম্যক্‌ ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কেন না, জগতে পূর্ণ আত্মোপলব্ধি বিরল। তাই শ্রুতি বলেন,—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।……ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।"

যাহা হউক, আমরা তীক্ষ্ণদর্শনে ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আত্মোপলব্ধিরই নামান্তর ভালবাসা এবং এই আত্মোপলব্ধির—এই ভালবাসার চরম নাম আত্ম-জ্ঞান বা আত্ম-দর্শন। জ্ঞান অর্থে বাচনিক জ্ঞান নহে, জ্ঞান অর্থে বেদন—আত্ম-জ্ঞান,—আত্মবেদন—বেদ একই কথা।

জগতে এই হিসাবে পূর্ণ ভালবাসা নাই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ কিছু নাই। আমরা সংস্কৃত ভাষা অনুসারে "প্রীতি" শব্দটিকে ভালবাসার প্রতিশব্দরূপে পাই। এই "প্রীতি" শব্দ যে আত্মবেদন-নির্ণয়মুখী, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ভালবাসা শব্দ যেন যাহাকে ভালবাস, তাহারই ভোগের জিনিষ নির্ণীত করে। "প্রীতি" শব্দ যে ভালবাসে, তাহারই ভোগ জ্ঞাপন করে। মোট কথা জানিয়া রাখ, ভালবাসা বা প্রীতি অর্থে আত্মজ্ঞান—আত্মবেদন।

এইবার মাকে দেখ—কেমন করিয়া মা আমার মাতৃত্ব লাভ করিয়াছে, কেমন করিয়া নির্গুণ ব্রহ্ম স্নেহময়ী মায়ের সাজে সজ্জিতা হইয়া, এই মহামহিম ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, এইবার বুঝ। মায়ার প্রকৃত অর্থ এইবার বুঝিতে চেষ্টা কর। আত্মবেদনে সম্বেদিতা হইয়া, মা আমার আত্মপ্রীতিবিহ্বলা হইয়া, আপনাকে আপনি ভালবাসিয়া, অনুরাগভরে দিগন্ত ব্যাপিয়া যে অপূর্ব্ব স্নেহের আনন্দ-বিলাস যুগ-যুগান্তর ধরিয়া প্রকাশ করিতেছেন—যে স্নেহের উত্তাল তরঙ্গে সাধকের প্রাণ নাচিতে নাচিতে গলিয়া গলিয়া অস্তিত্ব হারাইতেছে—সেই স্নেহের লীলাবিলাসকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া স্বপ্নেও ভাবিও না। মায়া শব্দের অর্থকে তোমরা মিথ্যাবাদে পরিণত করিয়া, জগতে মিথ্যাবাদী সাজিয়া মিথ্যার সাধনা করিও না। এ অপূর্ব্ব মাতৃত্বকে ক্ষুদ্র কুটিল জ্ঞানের চক্ষে ভাসাইয়া দিতে চেষ্টা করিও না। যে মাকে জন্মাবধি বা চৈতন্যের প্রথম উন্মেষণাবধি

দেখিয়া দেখিয়া, যে মায়ের হৃদয় অনাদি অনন্ত কাল হৃদয়ে চাপা দিয়া, যে মাকে বক্ষে বক্ষে, চক্ষে চক্ষে, মর্ম্মে মর্ম্মে চাপিয়া চাপিয়া সাধক তৃপ্তির সীমা খুঁজিয়া পায় না—যে মাও তদ্রূপ তোমাদিগকে বক্ষে বক্ষে, চক্ষে চক্ষে, মর্ম্মে মর্ম্মে চাপিয়া চাপিয়া তৃপ্তির সীমা খুঁজিয়া পান না—সেই মাকে যদি দর্শন করিয়া তোমার হৃদয়ের যাতনা দূর করিতে না পারিলে, তবে বৃথা তোমার শাস্ত্রাধ্যয়ন, বৃথা তোমার আত্মজ্ঞান, বৃথা তোমার সত্যজ্ঞান। যদি এ মাতৃলীলা না দেখিতে পাইলে, যদি তোমাদিগের এ চাক্ষুষ জগৎ অপেক্ষা সহস্র গুণে প্রত্যক্ষ উদ্ভাসিত ইহার মূল সত্তা মাতৃত্ব তোমাদের হৃদয়কে পরিপ্লাবিত না করিল, যদি মা বলিতে আকুল জলধারা হৃদয় ছাপিয়া চক্ষু দিয়া প্রবাহিত না হইল—যদি মা বলিতে তোমরা অনন্ত কোটি বিশ্বজীব এক অঙ্গীভূত না হইয়া গেলে, তবে করিলে কি ? তবে দেখিলে কি ? শুধু এই বুঝিলাম, তোমাদিগের দর্শন এখনও ক্ষুদ্র, এখনও মিথ্যার গণ্ডি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই।

এইবার দেখ, দর্পণে মলের আচ্ছাদন কি অভিনব অভিব্যক্তি, অজ্ঞান আবরণের খণ্ড জ্ঞান কি অপূর্ব্ব আত্মোন্মাদী স্নেহ-চঞ্চল লীলাতরঙ্গ। আমরা সহজাত কামনার দ্বারা যেমন আমাদিগের চৈতন্যের বা মাতৃসত্তার উপলব্ধি করি, আগন্তুক কামনা বা বাহ্য বিষয়ের ইন্দ্রিয়-পথে আগমনে আমরা সে মাতৃসত্তার চাঞ্চল্য তদ্রূপ উপলব্ধি করি। ধূমাগ্নি দৃষ্টান্তে মাতৃত্বের সত্তা লক্ষ্য করা হইয়াছে। মল ও আদর্শ দৃষ্টান্তে সে মাতৃসত্তার ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা হইয়াছে। বিষয় ইন্দ্রিয়গোচর হইবামাত্র তাহার গ্রহণে অথবা পরিত্যাগে যে চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাই মাতৃত্বের পরিচায়ক। একই বিষয় জন্ম জন্ম ধরিয়া নূতন নূতন রকমে যে ভোগ করিয়া থাকি, ইহাই—এই নূতনত্ব উপভোগই মাতৃত্বের লীলাবিলাস। কামনা বিষয়কে ভোগ করায় সত্য, কিন্তু যদি তাহার তলদেশ দিয়া মায়ের আমার প্রগাঢ় অনুরাগের উর্দ্ধমুখী আকর্ষণ না থাকিত, যদি মাত্র এই ভোগেই পর্য্যবসিত করা জগতের সাধারণ ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে একই বিষয় কথঞ্চিৎ ভোগের পর প্রাণে বিতৃষ্ণা জন্মাইতে সমর্থ হইত না। আজ যাহা অনুরাগভরে ভোগ করি ও ভোগের জন্য লালায়িত হই, কাল তাহাই আবার আমার রুচির দ্বারা পরিত্যক্ত হইত না। আজ যাহা পাইবার জন্য সমস্ত জগৎ ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হই, কাল তাহাই আবার অকিঞ্চিৎকর বোধে পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইতাম না। এই যে গ্রহণ ও পরিত্যাগ, এই যে অনুরাগ ও বীতরাগ ভাব, এইটুকু মাতৃত্বের প্রত্যক্ষ অনুরাগের লীলাচাঞ্চল্য। আগন্তুক কামনার দ্বারা এইটুকু আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত—“যথা উল্বেন গর্ভঃ আবৃতঃ”—গর্ভবেষ্টনি চর্ম্মের দ্বারা সন্তান যেমন সম্যক্‌ভাবে আচ্ছাদিত থাকে, আমরা কামনার দ্বারা তদ্রূপ সম্যক্ ভাবে আচ্ছাদিত। সাধারণ অর্থে ইহাতে এই বুঝা যায় যে, আমরা কামনার দ্বারা উক্তরূপে আচ্ছাদিত আছি বলিয়াই মাতৃদর্শন করিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের চৈতন্য সর্ব্বতো-

ভাবে কামনা-বেষ্টিত হওয়াতে আমরা আর চৈতন্যসত্তা উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু ইহাপেক্ষা আর একটি মুখ্য অর্থ আমরা এই দৃষ্টান্তে পাইয়া থাকি। মাতৃগর্ভে শিশু যে চর্ম্মবেষ্টনী দ্বারা আবৃত থাকে, সেই চর্ম্মবেষ্টনের দ্বারাই শিশু তাহার আহার সংগ্রহ করে। মাতৃশরীরস্থ রক্ত, রস, স্নেহ, সেই চর্ম্মস্থলীর সাহায্যে, সেই চর্ম্মস্থলীর আকর্ষণে, সেই চর্ম্মস্থলীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া শিশুকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করে। ভবিষ্যতে সেই শিশু যে পরিপূর্ণতা ও স্বাধীনতা লাভ করিবে, তাহার সূচনা এই চর্ম্মস্থলীর সাহায্যে হইয়া থাকে। তদ্রূপ আমরাও বিরাট্ ব্রহ্ম বলিবার কামনারূপ গর্ভাবরণে আবৃত থাকিয়া, তাহারই সাহায্যে, তাহারই স্নেহাকর্ষণে, তাহারই ভিতর দিয়া মায়ের আমার স্নেহ পান করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছি। এই কামনারূপ চর্ম্মাবরণের সাহায্যে আমরা ইন্দ্রিয়, মন, জ্ঞান, বুদ্ধি লাভ করিয়া ধীরে ধীরে অপূর্ব্ব মহান্ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। এমনি করিয়া গর্ভে ধরিয়া, এমনি করিয়া চর্ম্মাবরণে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত করিয়া, এমনি করিয়া স্নেহের ধারা অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, প্রাণে প্রাণে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া যে মা আমাদিগকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, যদি আমরা সেই চর্ম্মবেষ্টনের দ্বারায় সেই মায়ের মহান্ স্নেহের লীলা না বুঝিলাম, মা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া কিরূপ স্নেহবিমূঢ়া হইয়া, স্নেহের তমে সর্ব্বতোভাবে কিরূপ অভিভূতা হইয়া, কত যত্নে কত আদরে আমার পরিপোষণ করিতেছেন, ইহা যদি না বুঝিলাম, এ চর্ম্মাবরণের দ্বারা একমাত্র মাতৃত্বই যদি প্রকটিত না হইয়া পড়িল, তবে হে মনুষ্য-নামধারী জীব! আমরা কি মনুষ্যত্ব অদ্যাবধি অর্জ্জন করিয়াছি?

এই তৃতীয় দৃষ্টান্ত মায়ের তমোগুণের পরিচায়ক। প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা মাতৃসত্তা লক্ষ্য করা হইয়াছে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মায়ের স্নেহের লীলাচাঞ্চল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং এই তৃতীয় দৃষ্টান্তে মা যে, অনন্ত কোটি সন্তানের মা হইয়াও কি অপূর্ব্ব কৌশলে আমার একার মা সাজিয়া, একা আমাকে গর্ভে লইয়া দেশের পর দেশ, ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমায় স্বাধীন রাজ্যে প্রসব করিবার জন্য ছুটিয়াছেন, তাহাই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। সাধারণ অর্থে এই তিন প্রকার দৃষ্টান্তে কামনাকে মাতৃত্ব উপলব্ধির অন্তরায় বলিয়া লোকে বুঝিয়াছে, যৌগিক অর্থে এই তিন প্রকার দৃষ্টান্তের সাহায্যেই আমরা মায়ের সঙ্গে কিরূপ যুক্ত, তাহাই দেদীপ্যমান বলিয়া বুঝা গেল। যদি মায়ে যুক্ত হইতে চাহ অথবা মায়ে তুমি কিরূপে যুক্ত, তাহা তুমি বুঝিতে চাহ, তবে মাতৃস্নেহের সর্ব্বত্রসঞ্চারিণী মহাশক্তি এইরূপে বুঝ—তুমি মুক্ত হইবে।

অনেকে ভাবিতে পারে, আমরা যে ভাবে ভগবদ্বাক্যের অর্থ গ্রহণ করিতেছি, ইহা অশাস্ত্রীয়; শাস্ত্রে এরূপ ভাব বুঝি নাই। কিন্তু তাহা নহে; যেখানে সত্যসন্দর্শন হইয়াছে, সেইখানেই এই চক্ষে মহাজগৎ প্রতিভাত হইয়া পড়িয়াছে। উপনিষদে এ

ভাব প্রচুর। মহান্ সত্যের সন্ধান লাভ হইলে এই ভাবে ছাড়া অন্য ভাবে জগৎ পারদৃষ্ট হয় না। ইহা আমার ভাব নহে, ইহা সত্যদ্রষ্টা মাত্রেরই হৃদয়ের আলোক। যে মহাসত্য জননী আমার নিরুপাধিক ও সোপাধিক, এই দুই ভাবে চিরদিন প্রকটিতা, বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই দুই আলোকে নিত্য উদ্ভাসিতা—সত্য ও মিথ্যা, এই দুই রূপের লীলা-বিলাসে নিত্য আনন্দময়ী ; সেই মহাসত্য জননী উপলব্ধ হইলে আর মিথ্যা বলিয়া চক্ষে কিছু উদ্ভাসিত হয় না। যাহা সাধারণতঃ প্রপঞ্চ বা মিথ্যা বলিয়া বিচারজ্ঞানে প্রতীয়মান হয়, মহাসত্যের চরণচ্ছায়া লাভ করিলেই সেই মিথ্যাও যে সত্যেরই একটি নামান্তর মাত্র, ইহা সাধক বুঝিতে পারে। তাই আবার বলিতেছি, মায়া অর্থে মিথ্যা বুঝিও না, মায়া অর্থে নির্গুণের মাতৃত্বপ্রাপ্তি বুঝিও। "মাতৃত্বং যাতি ইতি মায়া"—যদি সাধক হইতে চাহ, তবে এ কথা মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইও না। মাতৃউপাসনা করিয়া, মাতৃক্রোড়ে উঠিয়া যদি আত্মসত্তাকে মহামাতৃসত্তার স্নেহদ্রবময় হৃদয়ে দ্রবীভূত করিয়া মিলাইয়া দিতে চাহ, তবে এ উভয়ের উভয়ত্ব—সত্য ও মিথ্যা উভয়ই একের স্বরূপ, বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই একের রূপলাবণ্য, এইরূপ বুঝিয়া সাধনায় অগ্রসর হও। এ উভয় স্বরূপই সমান—সত্য মহিমায় সমান, তুল্য—ইহাই সম্যক্‌দর্শন। বেদে ইহা বিশেষরূপে কথিত।

> অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
> ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
> বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ।
> অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

ইহার অর্থ—যাহারা অবিদ্যার অনুসরণ করে, তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে ; যাহারা কেবল বিদ্যায় অনুরক্ত, তাহারা তদপেক্ষা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা, উভয়কে একত্র জানেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া, বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন। এ প্রকার শ্রুতি বহু। সত্য-দর্শনে একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে—সত্যের অমর সিংহাসনের তলদেশে একবার গিয়া পৌঁছাইলে, এই সত্যই চারি দিকে দেদীপ্যমান হইয়া পড়ে। চারি ধারের এই প্রাণহীন জড়বৎ প্রতীয়মান ব্রহ্মাণ্ডরাজি প্রাণময় চেতনা-সমুদ্রের সজীব প্রতিষ্ঠা বলিয়া জ্ঞানচক্ষে স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়। অরূপা অনির্দ্দেশ্যা অচিন্তনীয়া মা—সরূপা সর্ব্বতোনির্দ্দিষ্টা চিন্তালিঙ্গনবেষ্টিতা হইয়া পড়ে। দ্বৈত ও অদ্বৈত, উভয় ভাব মথিত করিয়া, এক দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত অথচ দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ, হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। শুন—এ দ্বৈত অদ্বৈতময় অথচ তদতীত অপূর্ব্ব সত্যের সাধনায়, ঋষির প্রাণ কোন্ সত্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান, তাহার নিদর্শন বেদে দেখ,—

> পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ।

যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥

হে পোষণকারী সূর্য্য! হে একর্ষে! হে সকল প্রাণীর সংযমকর্ত্তা! তোমার রশ্মিজাল সংযত কর, তোমার তেজ সংযত কর; তোমার যে কল্যাণময় অতিশোভন রূপ, তাহা আমি তোমার প্রসাদে দেখি, তোমার অভ্যন্তরস্থ ঐ যে পুরুষ, উনিই যে আমি। ইহাই বেদ, ইহাই সত্য, আত্মপ্রাণ বলিয়া তাঁহাকে জানা ও সেই আত্মপ্রাণ যাবতীয় পদার্থে পরিদর্শন করা, যাবতীয় পদার্থকে সেই আত্মপ্রাণের স্বরূপ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা, ইহাই বেদ আকারে নিত্য শব্দিত। ইহাই সম্যক্জ্ঞানের সহজ সরল শৈশবীয় সাধনা, ইহাই জ্ঞানময়ীর সরল সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাতৃরূপে আবির্ভাব। ইহা জীবের ভোগ্য, নিত্য সেবনীয়, প্রাণ জুড়াইবার সনাতন শান্তিক্রোড়, অমর হইবার অমৃতনিস্রাবী মাতৃবক্ষ—জীবে ও ব্রহ্মে মাতাপুত্রভাবে চর্ম্মচক্ষের গোচরীভূত হইয়া—স্নেহ-বেষ্টনে আলিঙ্গিত হইয়া অবস্থান। তোমরা এ মাকে দেখ—তোমরা এ অমৃতের সন্ধান লাভ কর—তোমরাও অমর হও। মিথ্যা মিথ্যা করিয়া নিত্যভোগ্যা জননীকে, তোমার বুকের মাকে অতি দূরস্থ বলিয়া বুঝিও না—দূরে ঠেলিও না। কামনাকে মায়ের আচ্ছাদন ভাবিও না—মা আপনাকে কামনাদ্বারা লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, এ কথা প্রাণে স্থান দিও না—সত্যযুগের নিত্যভোগ্যা জননীকে তোমরা ত্রেতা দ্বাপরাদি কালপ্রবাহে একটু একটু করিয়া হারাইয়া ফেলিয়াছ। আজ আলোকময় গৃহে, চক্ষে মিথ্যা-জ্ঞানের চীরখণ্ড বাঁধিয়া অন্ধকারময় মাতৃবক্ষ পরিদর্শন করিতেছ,—মায়ের বক্ষে বসিয়াই, মাকে করের দ্বারা স্পৃষ্ট করিয়াই মাকে খুঁজিয়া পাইলাম না বলিয়া কাঁদিতেছ। এ কামনা আচ্ছাদন সত্য, কিন্তু ইহা স্নেহের আচ্ছাদন; মাতৃসত্তা জাগাইয়া দিবার আচ্ছাদন। এ কামনা আচ্ছাদন সত্য, কিন্তু ইহা বক্ষে সন্তানের মুখ টানিয়া লইয়া মা যেমন তাহার চক্ষুকে আচ্ছাদিত করে, এ আচ্ছাদন তদ্রূপ। এ কামনা আচ্ছাদন সত্য, কিন্তু ইহা শীতার্ত্ত সন্তানকে মা যেমন আপন বসনাঞ্চলে আচ্ছাদিত করিয়া ক্রোড়ে ধারণ করে, ইহা তদ্রূপ। কামনা মাকে লুক্কায়িত করে না; যদি সত্যের সন্ধান পাইয়া থাক, তবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, কামনাদ্বারা মা আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া দিগ্‌দিগন্তে উদ্ভাসিত।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

হে কৌন্তেয়, নিত্যবৈরিণা কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন এতেন জ্ঞানিনো জ্ঞানং আবৃতম্।

ব্যবহারিক অর্থ। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের চক্ষে শত্রুবৎ উদ্ভাসিত এই কামনারূপ দুষ্পূরণীয় অনলের দ্বারা জীবের জ্ঞান আচ্ছাদিত।

যৌগিক অর্থ। এ কামনা জ্ঞানীদিগের শত্রু, জ্ঞানীরা এ কামনাকে বৈরী বলিয়া অনুমান করেন। যত ক্ষণ না জীব মহাজ্ঞানে গিয়া উপস্থিত হয়, তত ক্ষণ এ কামনা শত্রুরূপে প্রতিফলিত।

কামনাতে অরিদর্শন জীবত্বের মধ্যাবস্থার নিদর্শন মাত্র। পশুরা কামনাকে অরিরূপে দর্শন করে না—ঋষিরা কামনাকে অরিরূপে দর্শন করেন না—জীবনের মধ্যাবস্থায়—যে অবস্থায় পশুত্ব ছাড়িয়া দেবত্বে গিয়া উপনীত হইবার জন্য প্রয়াস পায়, সেই অবস্থায় জীব কামনাকে শত্রুরূপে পরিদর্শন করে। সেই অবস্থায় জ্ঞানের তীব্র শাসনে—কামনার অসীম স্বাধীন ভ্রমণকে জীব অঙ্কুশিত করিবার জন্য শত্রুজ্ঞানে আপনাকে সজ্জিত করে ; এবং এই কামনার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া শেষ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হয় ও বিনা ভোগে সমস্ত বিষয়ের ভোগী হইয়া—বিনা কামনায় সমস্ত কামনায় পরিতৃপ্ত হইয়া শান্তির সমুদ্রে ভাসমান থাকে। সাধারণ জ্ঞানী অবস্থায় যদি কামনাকে এরূপ শত্রু জ্ঞানে পরিদর্শন করিতে জীব-স্বভাব ধাবিত না হইত, তাহা হইলে পশুত্ব হইতে দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারিত না এবং দেবত্বের দিকে অগ্রসর না হইলে মাতৃত্বের শীতল ছায়ার আশা করিতে সমর্থ হইত না। এই জন্য মধ্যাবস্থায় কামনার এ শত্রুভাব।

সাধারণ জীবের জ্ঞান এই কামনার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলেও এবং দেবত্বে পৌঁছিবার জন্য জীব এই কামনাকে সংযত করিতে সহস্র চেষ্টা করিলেও, এ কামনা অনলের মত জ্বলিতে থাকে। সর্ব্বভুক্ অগ্নিতে যতই ইন্ধন অর্পণ করা যায়, ততই যেমন অগ্নিশিখা প্রবলতর হইতে থাকে, তদ্রূপ এ কামনার যত ভোগ হয়, ততই ইহার শিখা উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর দেশে উঠিতে থাকে। সাধারণ জ্ঞানের সুতীব্র কশাঘাত সত্ত্বেও এ কামনা নির্ব্বাপিত হয় না। ইহার সর্ব্বগ্রাহিতা নানা অবনতি ও উন্নতির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে উর্দ্ধমুখে শিখা বিস্তার করে এবং মাতৃচরণের তলাভিমুখে লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করিতে থাকে। ইহার একমাত্র চরম উদ্দেশ্য মাতৃচরণ স্পর্শ করা, সেই উদ্দেশ্য যত দিন না সাধন করিতে সমর্থ হয়, তত দিন কামনা আমাদিগকে দুষ্পূরণীয় অনলের মত আচ্ছাদন করিয়া থাকিবে, এবং মাতৃমুখে স্বীয় শিখা বিস্তার করিবে। কামনা দমন করিতে পারিলাম না বলিয়া জীব কতই না আক্ষেপ প্রকাশ করে, দুরন্ত কামনার জন্য মাতৃসাধনা হইল না বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের কত ঝটিকা জগতে প্রবাহিত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ কামনার মুখ্য উদ্দেশ্য যে মাতৃলাভ—এ কামনার বুকের নিত্যাকাঙ্ক্ষা যে মাতৃবেষ্টন—এ কামনা, মাতৃলাভের জন্য জীবাত্মার যে মর্ম্মের ক্রন্দন—মাকে না পাইলে এ কামনা যে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে না, সাধারণ জীব ইহা বুঝে না। কামনার ক্রন্দন মায়ের জন্য, মাকে না পাইলে ইহা থামে না। 'কই মা'—কামনার ইহাই অর্থ। যে জ্ঞানের সাহায্যে আমরা কামনাকে সংযত করিতে প্রয়াস পাই, সে জ্ঞান এই

কামনারই সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধমুখে সমুত্থিত হইয়া, শেষ মাতৃজ্ঞানে পরিণত হইয়া পড়ে। তখন কামনা ও জ্ঞান একীভূত হইয়া বেদ বা বেদন নামে অভিহিত হয় এবং চিরদিনের জন্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

জ্বল কামনা, জ্বলিতে থাক। ধূ ধূ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর দেশে ছুটিতে থাক। ঊর্দ্ধের পর ঊর্দ্ধ, আকাশের পর আকাশ ভেদ করিয়া আমায় জ্ঞানজ্যোতি মাখাইতে মাখাইতে ঊর্দ্ধতম দেশে লইয়া চল—আমায় অঙ্কে লইয়া সহস্র ঝঞ্চাবাত—সহস্র অতৃপ্তির যন্ত্রণা—সহস্র আকাঙ্ক্ষার তীব্র অভাব ভেদ করিয়া মাতৃরূপিণী কামনা, তুমি আমাকে তোমার স্বরূপে লইয়া চল। আমি তোমায় চিনিয়াছি, তোমায় চিনিয়াছি। তুমি তৃষারূপে হে মা! আমার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছ—তুমিই তৃষারূপে হে মা, জ্বলিয়া উঠিয়া আমায় সুখ দুঃখ, গরল অমৃত, কতই কি খাওয়াইতেছ—তোমার এ অভিনব, সাধারণ চক্ষে শত্রুবৎ আচরণ দেখিয়া তোমাকে রাক্ষসী বলিয়া লোকে কতই নিন্দা করিতেছে, কিন্তু আমি চিনিয়াছি—তোমার অট্ট অট্ট ক্রূর হাসির তলদেশে স্নেহের কি প্রশান্ত নদী প্রবাহিত! তোমায় চিনিয়াছি; তুমিই এ তৃষারূপ পরিত্যাগ করিয়া জলরূপে আমার হৃদয়কে চির-বিগলিত করিয়া দিবে। যত দিন না তাহা কর, যত দিন তোমার স্নেহোন্মত্ত প্রাণ পুত্রত্বের বিষয়মদিরা পান করিয়া উন্মাদিনী সাজিয়া বিহার করিবার তৃষা না পূরে, তত দিন তুমি সেই জন্য দুষ্পূরণীয়—অসীম। তোমার কৃষ্ণান্ধকার-ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, যে তোমায় মা বলিতে না শিখিয়াছে, তাহার হৃদয়ে মৃত্যুরূপে কতই বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে; কিন্তু যে তোমার প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তোমায় মা বলিয়া ডাকিয়াছে, হৃদয়ের অন্তস্তলে পুরিয়া তাহাকে তুমি স্নেহের—কি শান্তিময় আলিঙ্গন দান করিয়াছ।

মূল শ্লোকে কামনাকে "জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা" বলা হইয়াছে। ইহা সাধারণ শাস্ত্রাভিজ্ঞ জ্ঞানীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ যে বলিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত। কেন না, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলে জীবের হৃদয়ে কামনা স্বতঃ উদ্ভাসিত হইতে আর অবসর পায় না এবং বৈরিরূপে প্রতিফলিতও হয় না। কামনা ব্রহ্মজ্ঞের অধীন, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞের বৈরী নহে। অনেক ভাষ্যকার এ স্থলে জ্ঞানী অর্থে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ, এরূপ অর্থ করিয়াছেন দেখিয়া এ কথা উল্লেখ করিলাম।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে। জ্ঞানং আবৃত্য এষ এতৈঃ দেহিনং বিমোহয়তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠানস্থান। জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া ইহাদিগেরই সাহায্যে কাম জীবগণকে বিমোহিত করে।

যৌগিক ব্যাখ্যা।—কামনার অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে। এই তিন স্থানে কামনা যে প্রকারে ক্রিয়াশীলা, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ ধূম অগ্নি আদি তিনটি উপমা দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের কামনার ক্রিয়া ধূমাগ্নিবৎ। মনে মল ও আদর্শ এবং বুদ্ধিতে গর্ভোল্বনবৎ। ধূম যেমন অগ্নির তেজ গর্ভে ধারণ করিয়াই ধূমত্ব প্রাপ্ত হয় ও সেই তেজে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, আমাদিগের ইন্দ্রিয়াদিও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতার তেজে বাহ্য বিষয়সকল স্পর্শ করিতে সক্ষম হয়। অগ্নিশিখার ক্ষুদ্র ধূমকণা বিশাল আকাশে উচ্চতর দেশে যেমন ধাবিত হইয়া থাকে—আমাদিগের ইন্দ্রিয়ও তদ্রূপ সূক্ষ্মতর বিষয়সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ। ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে মা আমার স্বীয় বিকাশ-শক্তি অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়া আমাদিগকে বিষয়বিকাশ-রূপ সাত্ত্বিক প্রকাশের অধিকার দান করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা প্রকাশ-বান্—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা এ ব্রহ্মাণ্ডসত্তা উপভোগ করি এবং ব্রহ্মাণ্ডের শব্দ স্পর্শ রূপ রস যে সকল মাত্রা আছে, তাহার আবিষ্কার, নির্ণয় ও ভোগ করিতে সমর্থ হই। ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠিত দেবতা একত্রে না থাকিলে, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় গ্রহগুলিও আমাদের প্রাণে তাহাদিগের সত্তা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মা যদি ইন্দ্রিয়রূপে ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতারূপে প্রকাশধর্ম্মী হইয়া, আমাদিগকে আবৃত করিয়া না থাকিতেন, তাহা হইলে জগতের এই বিচিত্র প্রপঞ্চতরঙ্গ আমরা ভোগ করিতে বা ইহার সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতাম না। এবং এই জগৎসত্তা এইরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে মাতৃসত্তাও নির্ণীত হইত না। মা আমার স্বীয় প্রকাশশক্তির দ্বারা এইরূপেই জীবের চক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছেন। মাতৃমহিমা এইরূপেই আমরা ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। ধূমে যেমন অগ্নিসত্তা দর্শন কর, ইন্দ্রিয়ে তোমরা তেমনি করিয়া মাতৃসত্তা দেখিতে অভ্যস্ত হও। ইন্দ্রিয় মনে পড়িলেই, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাকে যেন মনে পড়ে। বিকাশের কথা স্মরণে আসিলেই বিকাশময়ীকে তোমাদিগের ইন্দ্রিয়ে যেন প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাও। মায়ের ভোগী সন্তানগণ! রে অমৃতের বরপুত্রগণ! যদি কৃতজ্ঞতার একটা কণামাত্র প্রকাশ করিতে তোমাদিগের হৃদয় কাতর হইয়া থাকে, তবে মুহুর্মুহু স্মরণ কর, মা নিজেই চক্ষুরূপে অবস্থান করিয়া তোমায় বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্য্যের ভোগাধিকার দিতেছেন। জিহ্বাধিষ্ঠিত দেবতারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তোমার জন্য মধুরাদি রস সংগ্রহ ও আস্বাদন করাইতেছেন। স্ত্রীপুত্রাদি আলিঙ্গন করিয়া মিলনের যে আবেশ তোমাকে বিভোর করিয়া ফেলে, জানিও—তোমাদিগের সে আলিঙ্গনের মধ্যস্থলে স্পর্শেন্দ্রিয়রূপে অবস্থান করিয়া জননী সে সুখের সম্ভার ঢালিয়া দিতেছেন। এইরূপ বিষয় ও তুমি যেখানে যেখানে পরস্পর সংমিলিত হইতেছ, অমৃতময়ী মা আমার অন্নপূর্ণারূপে সেই মিলনের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অমৃতের ভোগ তোমাদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেছেন। এই ভোগই তোমাদিগকে অমরত্ব বুঝাইয়া দেয়। যদি এ ভোগ

না থাকিত, তবে বুঝিতে না,—তুমি আছ, কি নাই। তাই ভোগ অমৃত। যদি মা বলিয়া এ ভোগ ভোগ করিতে—যদি মায়ের হাত হইতে গ্রহণ করিয়া খাইতেছ ভাবিয়া ভোগী হইতে, তাহা হইলে ভোগে আর ভয় দেখিতে পাইতে না। আমাদিগের নারী-সমাজে প্রবাদ আছে, "মা যাহা হাতে তুলিয়া খাইতে দেয়, তাহা অমৃত—তাহাতে রোগভয় আসিতে পারে না।" মানবীরূপিণী জননীর পক্ষে এ কথা যত সত্য হউক বা না হউক, স্থিররূপে জানিও, জগজ্জননীর হাত হইতে এইরূপে ভোগ লইয়া খাইতে পারিলে তোমার অমৃত সেবন করা হইবে।

এইবার মনের কথা বলি। মলাদর্শ দৃষ্টান্তের দ্বারা মন ও কামনার সম্বন্ধ ভগবান্ বুঝিতে বলিয়াছেন। মলের দ্বারা দর্পণের স্বচ্ছত্ব যেমন খণ্ডিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-বাহিত বিষয়ের দ্বারা আমাদিগের মন অহর্নিশ খণ্ডিত হইতেছে। অর্থাৎ মন ইন্দ্রিয়-বাহিত বিষয়ের দ্বারা খণ্ডিত হইয়া, তদ্রূপ আকার গ্রহণ করিয়া, উপভোগের আয়োজন করিয়া দিতেছে ও উপভোগ করিতেছে। আদর্শ ও মল দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যার সময় আমরা এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছি। মন এইরূপে খণ্ডিত ও বিষয়াকার প্রাপ্ত না হইলে, ভোগ বলিয়া জিনিষ থাকিত না। ভোগ না থাকিলে মাতৃস্নেহ উপলব্ধির অবসর পাইতাম না, এবং মাতৃস্নেহের সন্ধান না পাইলে মা মা করিয়া আকুল হইয়া ছুটিতাম না। মায়ের ভালবাসার চাঞ্চল্যই তোমার মনের চাঞ্চল্য। তোমার মনকে যখন তুমি চঞ্চল বলিয়া ধারণা কর, তখনই বুঝিও, তোমাকে অমৃত সেবন করাইতে—তোমাকে অমৃতের আস্বাদনে বিভোর করিয়া স্বীয় অঙ্কে টানিয়া লইতে মা কত চঞ্চলা। এই চাঞ্চল্য—মায়ের এ রাজসিক ক্রিয়াশীলতা উপলব্ধি করিয়া তোমার স্নেহ-বিহ্বলা জননীকে চেন—তুমি মা বলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য তাহার অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়। তুমি যে পরিমাণে তাহার এই স্নেহ ধারণা করিতে সমর্থ হইবে, সেই পরিমাণেই তুমি মাতৃমুখী হইয়া পড়িবে এবং সেই পরিমাণেই মা বিহ্বলা হইয়া তোমাকে স্বীয় ব্রাহ্মী স্থিতিরূপ স্থৈর্য্যের দিকে টানিয়া লইতে থাকিবেন। ভোগ বিরক্তিকর বলিয়া যখন প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তখন বুঝিতে হয়, মাতৃসত্তা—মাতৃহৃদয়—মাতৃকর্তৃত্ব, এ সকলের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় নাই। তখন যে মা মা করি বা মায়ের জন্য বিষয় ছাড়িতে উদ্যত হই, তাহা শুধু যন্ত্রণার তাড়নায়, তখন পর্য্যন্ত বিশিষ্টভাবে সাধকের অবস্থায় প্রবেশ করিতে পারি নাই। যে কোন উপায়ে যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই জীব মা মা করে এবং কোন এক অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়, পরিত্রাণসমর্থ শক্তিমানের আশ্রয়ের জন্য জীব ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া ফেলে; আর সাধক হইলে যে বিষয়-বিরতির লক্ষণ জীবে প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহা বিরতি নহে, উদাসীনতা মাত্র। অগণিত মণিমাণিক্যের অধিপতি যেমন একটি তাম্রখণ্ডের উপর উদাসীন থাকে, তদ্রূপ মাতৃসত্তা উপলব্ধ পুরুষ বিষয়ভোগে উদাসীন হইয়া পড়ে। মহোচ্চ ভোগে প্রাণ ডুবিয়া থাকে বলিয়া, ক্ষুদ্র ভোগ স্বতঃ তুচ্ছ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, মনের উপর মা রাজসিক ভাবে এই প্রকারে কার্য্য করেন।

এইবার বুদ্ধির কথা বলি। গর্ভোল্বন দৃষ্টান্তে মা এই বুদ্ধিক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়াছেন। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি। কোন বিষয়ে আমাদিগের বুদ্ধি আছে বলিলে এই বুঝায় যে, সেই বিষয়ের ধারণা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। তাহাতে আর চিন্তা ও সংশয়ের স্থান নাই। আমার চিত্ত যেখানে নিশ্চিন্তভাবে শায়িত, সেইখানে আমি সংস্কারসম্পন্ন বা বুদ্ধিমান্। হইতে পারে ভুল—হইতে পারে সত্য, কিন্তু আমার চিত্ত তাহাই স্থির সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্তে অবস্থান করে। এই নিশ্চিন্তরূপে অবস্থিত বৃত্তির নামই বুদ্ধি। গর্ভস্থ শিশু উল্বন অভ্যন্তরে যেমন নিশ্চিন্তে অবস্থান করে, বুদ্ধিবৃত্তিতে আমিও তদ্রূপ নিশ্চিন্ত। ইহাই মায়ের তমোগুণের আশ্রয়স্থল।

তাহা হইলে মোটের উপর আমরা এই পাইলাম, মা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় সত্তা ফুটাইয়া দিতেছেন। তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া আমাদিগকে মাতৃসত্তায় জ্ঞানী করিতেছেন; মনে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে ভোগ করাইতেছেন, এবং ভোগের আস্বাদনে উন্মত্ত করাইয়া আমাদিগকে তাঁহাতে আসক্তিযুক্ত করিতেছেন বা ভক্তিমান্ করিতেছেন এবং বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিতা হইয়া আমাদিগকে সংশয় সন্দেহের পরপারে লইয়া গিয়া, স্থিরসঙ্কল্প করিয়া দিয়া কর্ম্মে ব্রতী করিতেছেন। বুদ্ধি হইতেই কর্ম্ম সূচিত হয়। কোন বিষয়ে যতক্ষণ না নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি লাভ করি, ততক্ষণ তদ্বিষয়ক কর্ম্মে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হই না।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১

হে ভরতর্ষভ! তস্মাৎ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং পাপ্মানং তথা জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ এনং পাপরূপং জ্ঞানং বা প্রজহি পরিত্যজ।

ব্যবহারিক অর্থ।—সেই জন্য তুমি পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়াদিকে নিয়মিত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞাননাশী পাপরূপ এই কামকে পরিত্যাগ কর।

যৌগিক অর্থ।—সাধারণ হিসাবে কামনার উপর যে প্রকার পাপ ধারণা আমাদিগের আছে, সেইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী যতক্ষণ জীব থাকে, ততক্ষণ বুঝিবার জন্য এই শ্লোকের পূর্ব্বোক্ত অর্থ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু মাতৃঅনুসন্ধানে অভিলাষী হইলে, এ শ্লোকের অর্থ অন্যরূপ বুঝিতে হইবে। সে অর্থ এইরূপ,—কামনা তিন প্রকারে তিন অধিষ্ঠানক্ষেত্রে কার্য্য করে এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাতৃসত্তা বুঝাইয়া দেয়, সেই জন্য আগে ইন্দ্রিয়সকল নিয়মিত অর্থাৎ মাতৃসত্তাগ্রহণোপযোগী করিয়া কামনার উপর তোমাদিগের যে পাপ ও জ্ঞানবিজ্ঞাননাশী বলিয়া ধারণা আছে, তাহা পরিত্যাগ কর। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যখনই বিষয় গ্রহণ করিবে, তখনই অন্তরাকাশরূপা মায়ের নিকট হইতে এ ভোগ লাভ করিলাম—মা নিজে ভোগ্যা হইয়া

আমার ইন্দ্রিয়-পথে উদিতা হইলেন, এইরূপ ধারণা করার নামই ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করা। এই ভাবে প্রাণকে যত পরিপূরিত করিয়া রাখিতে পারিবে, চিন্ময়ী মায়ের স্নেহের পরিচয় পাইয়া ততই তুমি কৃতার্থ হইবে। এবং ততই কামনার উপর তোমার যে অজ্ঞাবস্থার ধারণা ছিল—কামনাকে পাপ বলিয়া—কামনাকে জ্ঞানবিজ্ঞাননাশী বলিয়া, তোমার অজ্ঞ চিত্তে বিষয়ের যে বিষময়ী ছবি সতত হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিত, মাতৃসত্তার জ্ঞান লাভে সে অজ্ঞতা দূর হইয়া গিয়া, বিষের স্থলে অমৃতের আস্বাদ লাভ করিবে। পূর্ব্বে বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মাতৃসত্তা উপলব্ধি হয় এবং মাতৃঅস্তিত্বের বেদন বা জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। মনের বা হৃদয়ের সাহায্যে মাতৃস্নেহভোগ হয় এবং মাতৃভক্তি লাভ হয়। বুদ্ধির সাহায্যে জীব মায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মাতৃসংস্কারময় হইয়া, মাতৃসম্বন্ধে সমস্ত সংশয় সন্দেহের হাত এড়াইয়া নিশ্চিন্তে মাতৃসাধনায় বিভোর হয়। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, আগে ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত কর। সাধনার এমন প্রকৃষ্ট উপায় আর কোথাও ফুটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সাক্ষাৎভাবে মাতৃঅঙ্কে যুক্ত করিয়া দিবার ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় আর নাই। মাতৃসাধনায় বিভোর হইয়া থাকিতে—মাতৃকর্ম্মে অহর্নিশ নিযুক্ত হইতে—যোগযুক্ত অবস্থায় এই কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া কর্ম্মে কর্ম্মে অমৃত লাভ করিতে ইহাই অদ্বিতীয় উপায়।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২

ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ (সক্রিয়ত্বাৎ), মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকাত্বাৎ), যস্তু বুদ্ধেঃ পরঃ, স তু সর্ব্বান্তর্য্যামী।

ব্যবহারিক অর্থ।—ইন্দ্রিয়সকল এই ভাবে শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয় হইতে মন বা হৃদয় শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি—সংস্কারভূত জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ তিনি।

যৌগিক অর্থ।—ইন্দ্রিয়-সকল মাতৃসত্তা প্রকাশ করিয়া দেয় বলিয়া শ্রেষ্ঠ জানিবে। মন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত সেই সত্তায় আসক্তিযুক্ত হইয়া তন্মুখে ধাবিত হয় এবং মা মা বলিয়া কাঁদে বলিয়া ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি নিশ্চয়রূপে মায়ে যুক্ত হইয়া শায়িত হয় ও সকল কর্ম্মকেই গাতৃকর্ম্মরূপে প্রবর্ত্তিত করে বলিয়া, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। জীব! এই প্রকার বুদ্ধি লাভ কর; তোমার সাধনার অভ্যাস ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া, মনের ভিতর দিয়া বুদ্ধিতে গিয়া তোমাকে উপনীত করুক। তুমি মাতৃবুদ্ধিতে বুদ্ধিমান্ হও। তুমি নিশ্চিন্তে মায়ে অঙ্গ ঢাল। আর ঢুলিও না—সংশয় তর্কের আন্দোলনে আর অভিভূত হইও না, সত্বর এই মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয় সাহায্যে মাতৃ প্রকাশ লক্ষ্য কর—মাকে দেখ। মনের সাহায্যে মায়ের বিষয় ভোগ করিয়া ও মাকে চিনিয়া, কপটী মায়ের গুপ্ত যাতায়াত ধরিয়া ফেলিয়া, তাহার ভালবাসায় ডুবিয়া যাও, প্রবল ভক্তিতে তোমার প্রাণ পরিপূরিত হউক—সেই ভক্তির পরিপ্লাবনের মাঝে,

তোমার বুদ্ধি প্রলয়ার্ণবশায়ী নারায়ণের মত শায়িত হউক। নারায়ণ বটপত্রশায়ী। বট অর্থে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রে জীব! মাকে এইরূপে দর্শন করিতে করিতে তুমিও বটপত্রশায়ী হও। তুমি তোমার নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া থাক।

মন, প্রাণ ও জ্ঞানগ্রন্থি বা ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও রুদ্রগ্রন্থি, এই তিন গ্রন্থির কথাই পূর্ব্বোক্ত কয়টি শ্লোকে ভগবান্ বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। গ্রন্থিগুলি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩

হে মহাবাহো, এবম্ বুদ্ধেঃ পরং পরমাত্মানং বুদ্ধা, আত্মানং আত্মনা সংস্তভ্য কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে মহাবাহো! এই প্রকার বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ সেই পরমাত্মাকে জানিয়া, আপনি আপনার প্রাণকে স্থির করিয়া লইয়া, কামরূপ দুরাসদ শত্রুকে জয় কর।

যৌগিক অর্থ।—স্পর্শ-গুণের কর্ম্মেন্দ্রিয় বাহু। ভগবান্ তাঁহাকে স্পর্শ করিবার এই অপূর্ব্ব সাধনা-রহস্য বলিলেন বলিয়া, এ স্থলে অর্জ্জুনকে 'মহাবাহো' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। ইন্দ্রিয়দিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিয়মিত করিয়া—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত বিষয়-সাহায্যে মাতৃসত্তাকে প্রকাশিত দেখিয়া, মনের দ্বারা বিষয়ভোগ সাহায্যে মাতৃস্নেহের অমিয়রস উপভোগ করিয়া, বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাতে নিশ্চয়রূপে অবস্থিত হও—অহর্নিশ তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া রাখ। সেই অপূর্ব্ব নিশ্চিন্ত বুদ্ধিতে তাঁহাতে যুক্ত থাকিয়া, আপনি আপনাকে নিশ্চল করিয়া ধারণ কর। আপনার আলিঙ্গনে আপনার প্রাণকে জড়াইয়া ধর; মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইও না। তোমার আপনি বলিতে যাহা, তোমার তুমি বলিলে যাহাকে বুঝায়, তোমার প্রাণের প্রাণ—তোমার আত্মার আত্মা, প্রকাশময়ী—স্নেহময়ী এবং সর্ব্বাবস্থায় নিশ্চলা, সনাতনী সেই মাকে এইরূপ স্পর্শ করিয়া এ কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ কর। কামনার উপর তোমার যে শত্রু-জ্ঞান আছে, তাহা বিদূরিত হইবে। যে কামনাকে দুরাসদ বা দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া জানিতে, সেই কামনার যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইবে। তুমি এ জগৎ মাতৃময় দেখিবে।

ইহাই কর্ম্মযোগ। এইরূপে, এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা মাকে না জড়াইতে পারিলে সাধনায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না। মায়ে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি লাভ না হইলে, বুদ্ধিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং সে সত্যের দ্বারা প্রাণকে জড়াইয়া না ধরিলে, সত্য-প্রতিষ্ঠায় প্রাণরূপে অবস্থিতা সেই মাকে প্রতিষ্ঠিতা করিতে না পারিলে,

মাতৃলাভ ঘটিবে না। এরূপ বুদ্ধি পাইতে হইলে মনকে তাঁহার স্নেহ-রসে অভিষিক্ত করিয়া রাখিতে হইবে; বিষয়ভোগে মাতৃস্নেহ ভোগ করিতেছি বুঝিতে হইবে; এবং এই প্রকার মন পাইতে হইলে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত বিষয়-সকলকে মাতৃস্বরূপের প্রকাশক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

মূল শ্লোকে "সংস্তভ্যাত্মানং আত্মনা" আছে। আপনার দ্বারা আপনাকে স্তম্ভিত কর। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বুদ্ধির দ্বারা মাকে জ্ঞাত হইলে, বুদ্ধি-সাহায্যে নিশ্চলরূপে মায়ে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে সংস্তম্ভিত করা হয়। তুমি যাহাকে তোমার প্রাণ বলিয়া বুঝ, যিনি তোমার প্রকৃতিরূপে উদ্বেলিতা হইয়া, অঙ্কস্থ শিশুর মত উচ্চ হইতে উচ্চতর দেশে তোমাকে লইয়া চলিয়াছেন, যাহা তোমার তুমিত্ব—যাঁহার প্রভাবে তুমি আপনাকে তুমি বলিয়া পরিচিত হও—যাঁহার আমিত্ব লইয়া তুমি আপনাকে আমি বল, তোমার সেই আমি—সেই তোমার মা, সেই তোমার আত্মা, সেই তোমার স্নেহের জননী। তুমি আপনাকে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহার চক্ষুর তলে লইয়া যাও; মোহনকারী অথবা স্তম্ভনকারীর চক্ষুর তলে পড়িলে—তাহার দৃষ্টিতে একবার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলে, আর দৃষ্টি ফিরান যায় না। মোহন ও স্তম্ভনবিদ্যায় অধিকারীর চক্ষুর প্রভাব এমন যে, মনুষ্য দূরের কথা, ব্যাঘ্রাদি পশু অবধি সে পুরুষের দৃষ্টিমুখে পড়িলে স্তম্ভিত হইয়া যায়। তেমনি বিশ্ব-স্তম্ভিনী, বিশ্বমোহিনী জননী তোমার। তাঁহার মোহিনী শক্তির প্রভাবে কাল স্তম্ভিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াদি ক্রিয়ার আধার হইয়া অবস্থান করিতেছে। তোমারি মায়ের মহামায়ায় স্তম্ভিত হইয়া চন্দ্র সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছে। তোমারি মায়ের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু স্ব স্ব ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। আর সেই বিশ্বমোহিনী, বিশ্বস্তম্ভিনী মা-ই তোমার ভোগের জন্য—তোমার মা হইয়া তোমাকে আদর করিবার জন্য—তোমাকে মুগ্ধ করিবার জন্য—তোমার তুমি সাজিয়া তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা। ব্রহ্মাণ্ডের বরেণ্যা, ব্রহ্মাণ্ডের শরণ্যা, ব্রহ্মাণ্ডের পূজিতা হরিহরবিরিঞ্চিসেবিতা সেই জননী তোমাকে মুগ্ধ করিবার জন্য তোমার অন্তরের অন্তস্তলে, তোমার মর্ম্মের মর্ম্মে, তোমার তুমিত্বের অণুতে অণুতে ওই তিন গ্রন্থিরূপে বা মনাদি ইন্দ্রিয়রূপে, প্রাণ বা হৃদয়রূপে ও জ্ঞানরূপে প্রবিষ্ট হইয়া তোমায় ডাকিতেছেন,—"এই আমি রহিয়াছি—আমায় দেখ। আমি তোমাকে দেখিতেছি, আমার চক্ষে তোমার জন্য কত কত স্নেহ ঝরিতেছে, তুমি একবার আমার দিকে চাহিয়া তাহা প্রত্যক্ষ কর। আপনি আপনাকে দেখ।" মায়ের এ স্নেহের আহ্বানকে আর উপেক্ষা করিও না। গীতারূপে উন্মেষিত মাতৃবাণী, গীতারূপে স্পন্দিত মাতৃআহ্বান যখন তোমার শ্রবণে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর মাতৃহারা হইয়া থাকিও না—মায়ের কোলে বসিয়া মাকে হারাইয়াছ ইহা আর ভাবিও না; যাহা করিয়াছ করিয়াছ, আর নহে—তুমি মায়ের বিশ্বস্তম্ভিনী

নয়নের দিকে একবার চাহ, আর চক্ষু ফিরাইতে সমর্থ হইবে না—চক্ষে চক্ষে একবার শুভদৃষ্টি সম্পাত হইলে তুমি জন্মজন্মান্তরের জন্য মায়ে জড়াইয়া যাইবে। প্রাণহীন তুমি চিরদিনের জন্য প্রাণকে হৃদয়ে পাইয়া, জগৎময় সে মহাপ্রাণকে পরিদর্শন করিবে—তুমি স্তম্ভিত হইবে। তোমার নিজের প্রাণ নাই, তাই তুমি জগৎকে প্রাণহীন দেখ, তোমার নিজের চৈতন্য নাই, তাই তুমি জগৎকে অচৈতন্য পরিদর্শন কর। তুমি নিজের প্রাণের আদর কর না, তুমি যে প্রাণের সেবায় অহর্নিশ নিযুক্ত থাকিয়াও, শত সহস্র বিরক্তিতে তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছ, যে প্রাণের পরিসেবনের জন্য দিবানিশি দারুণ মোহে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ, সেই প্রাণেরই স্নেহের ধারা বুঝিতে পারিলে না, মহাপ্রাণের সন্ধান কেমন করিয়া পাইবে। মা এত ক্ষুদ্র হইয়া, তোমার এত আপনার হইয়া আসিয়াছেন। তোমার কৃতজ্ঞতা তবু তাঁর চরণে দান করিতে পারলে না, তোমার ভালবাসায় তবু তাঁহার চরণকে অভিষিক্ত করিতে পারিলে না, তোমার প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি তবু সে রক্ত চরণকে শোভিত করিল না, তুমি তাঁর গৌরবময় বিশ্বব্যাপী মহিমা কেমন করিয়া বুঝিবে।

শুন, এই প্রাণ। এই প্রাণকে জগদাত্মা বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। বিরাট্ বিশ্ব-প্রকাশকে এই প্রাণেরই বিভূতি বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই প্রাণকে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র গুরুর উপদেশ অনুসারে পরিদর্শন করিবে। চন্দ্রে সূর্য্যে আকাশে, গ্রহে উপগ্রহে বিগ্রহে, সর্ব্বত্র এই প্রাণেরই সত্তা বুঝিয়া, সমস্তকে এই প্রাণেরই প্রকাশ ভাবিয়া তোমার পূজার অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। ইহাই প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত সাধনা হয় না, এই প্রাণপ্রতিষ্ঠাশূন্য কর্ম্মযোগ অসম্ভব, এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত সমস্ত সাধনা প্রাণহীন, এই প্রাণের দিকে চাহিলে তবে তোমার ক্ষুদ্র তুমিত্ব স্তম্ভিত হইয়া, মায়ের মহান্ আমিত্বে মিশাইয়া যাইবে।

আর এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সত্যপ্রতিষ্ঠার একান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বুদ্ধি লাভ করিলে, মাতৃসত্তায় ও মাতৃস্নেহে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি লাভ করিলে, তবে সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ব্বে যে ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে বুদ্ধিলাভের কথা বলিয়াছি, সেই বুদ্ধিতে অবস্থান করাই সত্যপ্রতিষ্ঠা করা।

আবার বলি—সাধনার চরম প্রকাশ ভগবান্ এইখানে নিবেশিত করিয়াছেন বলিয়া, আবার আমি বিশেষ করিয়া বলিতেছি—তোমরা গীতা পাঠ করিতেছ, তোমরা মায়ের প্রিয়পুত্র, তোমরা মাতৃবরে পরিপুষ্ট মনুষ্য, বহু দূর হইতে বহু কাল ধরিয়া আসিয়া, বহু ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়া, বহু কষ্ট বুকে সহ্য করিয়া আজ মনুষ্যকুলে অধিকার লাভ করিয়াছ, কর্ম্মীর সাজে কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া নামিয়াছ। বহু আয়াসের পুরস্কারস্বরূপ তোমার এ কর্ম্মাধিকার। হে জীব! হে মনুষ্য! তোমরাই মা! তোমাদিগেরই এ অপূর্ব্ব সাধনা তোমরা সাদরে অবলম্বন কর। মাকে ভালবাস।

অপূর্ব্ব এ জ্ঞানবিস্তারে, গীতাধর্ম্মে তোমাদিগের অন্তর আলোকিত হইয়াছে। প্রাণস্বরূপা জননীকে আর উপেক্ষা না করিয়া, সারথিরূপিণী মাকে আর ক্ষুদ্রা না দেখিয়া, এস, কোটি মনুষ্য এককণ্ঠে মহাসমারোহে মাকে চিনিয়া মা বলিয়া একবার ডাকি। প্রাণ আবার প্রতিষ্ঠিত হউক, সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণ আবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। সত্য আবার প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমাদিগের সত্যদর্শনের ফলে সত্যযুগ আবার অবতীর্ণ হউক। সত্যের অনন্ত বিস্তারে মায়ার ধাঁধা মুছিয়া যাউক। তোমরা বুঝ—তোমরা দেখ—মায়া বলিয়া যাহা বলিতেছিলে, তাহা মা,—তাহা সত্য। মিথ্যাদর্শন তোমাদিগের চক্ষু হইতে অপসৃত হউক।

ইন্দ্রিয়সাহায্যে দেখ, হৃদয়ের সাহায্যে মাকে ভোগ কর এবং এই দর্শন ও ভোগের সাহায্যে মায়ে নিশ্চলা বুদ্ধি লাভ কর ; বুদ্ধির সাহায্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর ও এইরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হও।

কামনা কামনা করিয়া চীৎকার করিও না—ভোগ ভোগ করিয়া বিরক্তির জ্বালায় জ্বলিও না। যাহার জন্য কামনা, যাহার জন্য ভোগ—তাহা যত দিন না হয়, তত দিন তোমার সহস্র চীৎকার তোমাকে ভোগ ও কামনার সুখ হইতে ফিরাইতে পারিবে না। মায়ের জন্যই কামনা—মাকে চিনাইয়া দিবার জন্যই ভোগ। কামনারূপ তৃষ্ণার দ্বারা তোমার প্রাণে উদ্বেগ ফুটাইয়া, ভোগরূপ বারি দ্বারা তোমাকে নিত্য যে অভিষিক্ত করিতেছে, তাহাকে দেখিবার জন্য আকুল হও—প্রত্যেক ভোগ্য পদার্থে মায়ের দান দর্শন কর—প্রত্যেক ভোগ্য পদার্থকে মা বলিয়া বুকে ধর ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর,—"মা, তুমি তোমার সর্ব্বব্যাপিনী মূর্ত্তি আমারে দেখাও।" বুদ্ধির সাহায্যে এইরূপ করিতে করিতে তুমি সত্যপ্রতিষ্ঠ হইবে।

সত্য ও প্রাণ এবং জ্ঞান বা চেতনা—এই ত্রিমূর্ত্তিই—ইহাই সাধ্য—ইহাই সেব্য—ইহাই বরেণ্য—ইহাই মোক্ষ। এই সত্য, প্রাণ ও চেতনা সর্ব্বত্র সন্দর্শন কর। মরীচিকা দর্শন করিও না। মরীচিকা কোথাও নাই—ধান্ধা নাই—সত্য ও প্রাণের ছেদ কিম্বা আবরণ নাই। সত্যের সাধনা না করিয়া—প্রাণের পরিচর্য্যা না করিয়া তোমরা জগৎ মিথ্যা বলিতে শিখিয়াছ—মিথ্যাদর্শনে আপনাদিগকে ডুবাইয়া রাখিয়াছ। সাধনাহীন, উপলব্ধিহীন বাচনিক জ্ঞান কণ্ঠস্থ করিয়া জগতে মিথ্যার কোলাহল তুলিয়াছ এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে আপনাদিগকে দূরদর্শী ভাবিয়াছ। উহা তোমাদিগের জ্ঞানের দূরদর্শন নহে—চক্ষের দূরদর্শন মাত্র। মনুষ্য বয়স্থ হইলে, চক্ষের জ্যোতি মন্দীভূত হইলে, নিকটের বস্তু তেমন দেখিতে পায় না, দূরস্থ পদার্থ দেখিতে পায়। তোমরাও সেই হিসাবে দূরদর্শী। তোমরা মাকে বহু দূরে চক্ষের জ্যোতির অভাবে দেখিতেছ। বুদ্ধির সাহায্যে, বুদ্ধির অধিষ্ঠিত দেবতা অচ্যুতের কৃপায় তোমার মাকে চাক্ষুষভাবে সর্ব্বত্র দেখিতে অভ্যাস কর। যাহা মিথ্যা দেখিতেছ, তাহাই সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে, যাহা প্রাণহীন ভাবিতেছ,

তাহা প্রাণময় বলিয়া উপলব্ধি করিবে। সত্য, প্রাণ ও চেতনা বা জ্ঞান, এ ত্রিমূর্ত্তি আত্মারই। বাক্ প্রাণ মন নামে এ ত্রিমূর্ত্তির কথা উপনিষদে বর্ণিত। চাক্ষুষ জগৎ সত্য বলিয়া উপাসনা করিবার কথা উপনিষদেরই কথা।

প্রাণ সর্ব্বত্র, তোমরা সেই প্রাণকে উপেক্ষা করিয়া কাহার সাধনা করিতেছ? তোমরা ভগবান্‌কে 'আমার প্রাণ, আমার প্রাণ' বলিয়া মুখে কতই না ডাক, কতই না অশ্রুধারা তোমাদিগের বক্ষ প্লাবিত করে; যদি তাঁহাকে তোমরা প্রাণ বলিয়া জানিয়া থাক, তবে সেই প্রাণকে সত্যের জ্যোতির্ম্ময় সাজে না সাজাইয়া, মিথ্যার ছিন্ন বসন পরাইয়া রাখ কেন? পুণ্য নির্ম্মল বিশুদ্ধ জ্ঞানের চন্দনে তাঁহাকে চর্চ্চিত না করিয়া, পাপী তাপী কলঙ্কিত, দীন ক্ষুদ্র মলিন, তাপদগ্ধ ইত্যাকারধারণার কজ্জলী তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত করিয়া রাখ কেন? সেই প্রাণকে অবহেলা করিও না। বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহাকেই মহাপ্রাণ ভাবিয়া সর্ব্বত্র তাঁহারই উল্লাস দর্শন কর। উৎসব উপলক্ষে বিগ্রহকে যেমন নানা বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া শোভাযাত্রা কর, তেমনি ভাবে আপনার প্রাণকে গুরুর উপদেশানুসারে পদার্থে পদার্থে লইয়া গিয়া পরিদর্শন কর। সূর্য্যে চন্দ্রে আকাশে, সর্ব্বত্র আপনার প্রাণ বিকশিত দেখ। আর তাঁকে, সেই তোমার দেবতাকে—সেই তোমার মাকে সর্ব্বত্র দেখিয়া, মা মা করিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠ।

দেখা দূরের কথা, যাঁহার নাম একবার মাত্র স্মরণে সমস্ত পাপ—সমস্ত মলিনতা দূর হইয়া যায়, সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়া যায়, সেই দেবতার নাম অহর্নিশ স্মরণ করিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া, দিন দিন ডাকিয়াও তোমাদিগের মলিনতা ঘুচে না কেন? তোমরা আপনাদিগকে শুদ্ধ বুদ্ধ বলিয়া চিনিতে পার না কেন? মহারাজ দশরথ মুনিপুত্র সিন্ধুকে ভ্রমক্রমে বধ করিয়া ও তাহার পিতামাতা অন্ধ মুনিদম্পতীর মৃত্যুর কারণ হইয়া, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বীয় গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব গৃহে না থাকায় তদীয় পুত্র বামদেবের নিকট বিধান জানিতে ইচ্ছা করিলে, বামদেব দশরথকে বলিয়াছিলেন—মহারাজ, তুমি ব্রহ্ম ও স্ত্রীহত্যা করিয়াছ, তিনটি জীবের মৃত্যুর কারণ তুমি হইয়াছ, তিন বার মাত্র রামনাম কর, তাহা হইলে এই ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যার পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

পরে বশিষ্ঠদেব গৃহপ্রত্যাগত হইলে, বামদেব তাঁহাকে দশরথ-সংক্রান্ত এই ঘটনার কথা জানাইলেন এবং বলিলেন,—পিতঃ। আমি এ ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মহারাজ দশরথকে তিন বার মাত্র রামনাম উচ্চারণ করিবার বিধান দিয়াছি।"

মহামুনি বশিষ্ঠের পুণ্য হৃদয় বাত্যান্দোলিত সাগর-বক্ষের ন্যায় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে যে মহাজাগ্রত সত্য, পুত্রকে বলিয়াছিলেন, তাহা যত দিন মনুষ্যজগৎ স্মরণ করিতে থাকিবে, তত দিন মনুষ্য-হৃদয়মাত্র কম্পিত হইয়া উঠিবে। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আরে অযোগ্য পুত্র! তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হও,—তুমি একবার

মাত্র রামনাম করিতে বলিলে না কেন ? এত পাপ কল্পিত হইতে পারে না, যাহা সে নাম একবার মাত্র স্মরণ করিলে ভস্ম হইয়া না যায়। সামান্য তিনটি হত্যার জন্য তুমি সেই মহামূল্য নাম তিন বার গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছ ! আরে অযোগ্য পুত্র! তুমি নামের অবমাননা করিয়াছ ; নামের মহিমা খর্ব্বিত করিয়াছ ! একবার নাম উচ্চারণে সমগ্র নরককে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে।”

হায় ! আজ সেই নাম, সেই মর্ম্মস্পর্শী, সেই মর্ম্মের মর্ম্ম, ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ স্বরূপ সেই নাম গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে গীত, উচ্চারিত, তুমুল আন্দোলনে ধ্বনিত, গগনভেদী উচ্চৈঃস্বরে শব্দিত হইতে শুনিতে পাই, কিন্তু মলিনতার আবরণ বুঝি যেমন তেমনি থাকে !

কিসের জন্য—কেন এমন হয় ? শুধু প্রাণপ্রতিষ্ঠার অভাবে ! তোমরা সং কর, কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর না। তোমরা প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া দেহকে লইয়া থাক—তোমরা সত্যকে দূরে রাখিয়া, মিথ্যাজ্ঞানে আপনাদিগকে আবৃত করিয়া রাখ, তাই তোমাদিগের নামও মিথ্যা হয় ; তোমরা প্রাণকে উপেক্ষা কর বলিয়া তাই তোমাদের নাম প্রাণহীন হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর, তোমরা অমৃতের বরপুত্র—সত্যপ্রতিষ্ঠ হও ; তোমরা যে সম্প্রদায়ভুক্তই হও, যে জাতীয়ই হও, এ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মসাধনা করিতে হইলে সত্যপ্রতিষ্ঠা, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রচৈতন্য না হইলে কিছুই হইবে না।

শুন, অবহিত চিত্তে ধারণা কর, হে মনুষ্যসঙ্ঘ ! হে জীবশ্রেষ্ঠ ! হে ভগবৎহৃদয়ের কৌস্তুভমণি ! হে বিশ্বজননীর স্নেহাঙ্কস্থ পুণ্য শিশু ! যে রহস্যের কথা ভগবান্ বলিতেছেন, অতি সন্তর্পণে একান্ত বিশ্বাসের সহিত ইহা ধারণা কর। বিতণ্ডা করিও না, অন্ধ জ্ঞানের তর্কের ছটায় উড়াইয়া দিও না। ইহা অতীব গূঢ়—ইহা ধ্রুব—ইহা সত্য। তোমার প্রাণ বলিয়া যাহা বুঝ, যেটিকে তুমি লক্ষ্য করিয়া আপনাকে আমি বলিয়া পরিচয় দাও, তোমার মোটামুটি ধারণা যেটুকুকে তোমার তুমিত্ব বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করে, সেইটুকুকে—সেই তোমার সদাসর্ব্বদা উপলব্ধ তুমিটুকুকে তোমার মা বলিয়া—তোমার সারথি বলিয় বুঝিয়া বুদ্ধির দ্বারা তাহাতে যুক্ত থাক। এই জগৎকে মায়েরই অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝ। আমি পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, তোমরা অন্য কাহাকেও প্রাণ অপেক্ষা ভালবাস না। সেই প্রাণ—তোমাদিগের সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া চারি ধারে প্রস্থত। তোমরা “নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে নমঃ” মন্ত্রে তোমারই এ মহাপ্রাণের পূজা কর। ইহারই নাম আত্মাকে আত্মা দ্বারা সংস্তম্ভিত করা। আপনার প্রাণকে সর্ব্বত্র দেখ, তোমরা মাতৃকৃপায় সত্যযুক্ত হও—জয়যুক্ত হও—তোমাদিগের দীনতা ঘুচিয়া যাউক, তোমরা প্রাণময় হও।

ইতি কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

উপনিষদ্ রহস্য
বা
গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা
চতুর্থ অধ্যায়
ব্রহ্মখণ্ড
[জ্ঞানযোগ]

কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভগবান্ দেবতাদিগের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ-ঘনিষ্ঠতা বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দেবতাবৃন্দ অহর্নিশ মহাযজ্ঞে রত থাকিয়া জীব-জগৎকে বিকাশ ও কর্ম্মময় করিয়া রাখিয়াছেন। কর্ম্মের সূচনা ব্রহ্ম হইতে স্ফুরিত হইয়া, দেবক্ষেত্ররূপে সম্যক্ ব্যাপকতা লাভ করিয়া, মনুষ্যাদি মরলোকস্থ জীব-বৃন্দকে কিরূপে চৈতন্যময় করিয়া তুলিতেছে ও মরলোকস্থ জীববৃন্দের শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইতে সেই কর্ম্ম প্রতিদানস্বরূপ কিরূপে অন্তর্মুখে দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া মাতৃচরণে আসিয়া বিলীন হইতেছে, ভগবান্ বিশেষরূপে ইহাই উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। কর্ম্মের আবর্ত্তন ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়া আবার কিরূপে ব্রহ্মে গিয়া পৌঁছায়, সেইটুকু লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করিতে ভগবান্ শিক্ষা দিয়াছেন। দেবতারা আমাদিগের বিকাশের জন্য প্রযত্নশীল। আমরা যদি সেই দেবতাদিগকে পরিচিন্তন করি, এবং কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি তাঁহাদিগের চরণে অর্পণ করি, যদি আমরা এই সকলের মূল কেন্দ্র মাকে সর্ব্বকর্ম্মের বীজ বলিয়া জানিয়া, সর্ব্বক্ষেত্রে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া বুঝিয়া, তাঁহার এ সৃষ্টিরূপ কর্ম্মের মহোৎসবে যোগদান করি, আমার ক্ষুদ্র আমিত্বের কর্ম্ম নহে বুঝিয়া, মহান্ আমিত্বের মহাকর্ত্তৃত্ব আমাকে কর্ম্মোৎসবে নাচাইয়া লইয়া চলিতেছে বলিয়া, যদি আমি এ কর্ম্মোৎসবের আনন্দ-প্রাঙ্গণে আনন্দে বিচরণ করি, তাহা হইলে আমি কর্ম্মিপদবাচ্য হইব। কর্ম্মযোগ নামক অধ্যায়ের ইহাই মূল শিক্ষা। জ্ঞানযোগ নামক এই চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁহার ও দেবতাদিগের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ আরও ঘনীভূত করিয়া আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার স্নেহানন্দময় এ সৃষ্টিউল্লাসে তিনি আমাদিগকে মাত্র কতকগুলি কর্ত্তব্যের ভারে পীড়িত করিয়া ছাড়িয়া দেন নাই। মায়ের এ অপূর্ব্ব স্নেহের ক্রোড়ে, আমরা জ্ঞানের শক্তি বুকে লইয়া, কর্ত্তব্যের কঠোর-তম পর্ব্বত অতিক্রম করিবার জন্য মায়ের দ্বারা অভিনিযুক্ত নহি। দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত-

শিখরসকল অতিক্রম করিয়া অদম্য উৎসাহে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, ঘর্ম্মনিষিক্ত কলেবরে, অতি সন্তর্পণে, কর্ত্তব্যের উচ্চতম পর্ব্বতের সর্ব্বোর্দ্ধ শিখরে অবস্থিত মাতৃ-চরণে গিয়া পৌঁছাইতে হইবে, এরূপ আমাদিগের অবস্থা নহে। মুহূর্ত্তের জন্য পিচ্ছিল পর্ব্বতাঙ্গ হইতে চরণ স্খলিত হইলে, অনন্ত কালের জন্য অস্তিত্ব হারাইয়া বিচূর্ণিত হইয়া যাইব; হৃদয়ের বল মুহূর্ত্তের জন্য নষ্ট হইলে, কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া, ভগ্নপদ পশুর মত মরুপথে পড়িয়া রহিব, ইহা আমাদিগের অবস্থা নহে। পারি ত মহাসত্তায় গিয়া পৌঁছাইব, না পারি নিজসত্তা বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় হইবে, ইহা আমাদিগের অবস্থা নহে। কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যতমের জয়, ইহা মাতৃরাজ্যের ব্যবস্থা নহে।

কর্ত্তা একমাত্র মা—কর্ম্মভার তাঁহার হাতে। মা এই জ্ঞানযোগে বলিতেছেন, —অমি সমস্ত করিতেছি, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ, সে সমস্তই আমার দ্বারা কৃত —তোমাদিগের সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞ। দেবশক্তির দ্বারা চালিত হইয়া যাহা কিছু তোমরা করিতেছ, "কু" "সু" নির্ব্বিশেষে যাহা কিছু তোমাদিগের দ্বারা কৃত হইতেছে, সে সমস্তই ব্রহ্ম-যজ্ঞ। তোমার করিবার কিছু নাই, তোমার সমস্ত কর্ম্মই তোমাকে মহাজ্ঞানের, মহাবিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছে। তুমি এই জ্ঞান মাত্র হৃদয়ে ধারণ কর, তুমি তোমার হৃদয়ের সমস্ত সংশয় এই সম্যগ্দর্শনের মহাবিকাশে ডুবাইয়া দাও, তুমি অচিরে অন্তরাকাশে অন্তর্য্যামীকে লাভ করিবে। কর্ম্ম বলিয়া যাহা কিছু আছে, সে সমস্তের দ্বারাই তুমি যজ্ঞের অমৃত ভোগ করিতেছ মাত্র। তুমি এই জ্ঞানে অবিচল শ্রদ্ধা রাখ, সাহসের সহিত নিঃসঙ্কোচে স্বাধীন হৃদয়ে এই জ্ঞানকে হৃদয়ে ধারণ কর, তুমি পূর্ণতার অসীম ক্ষেত্রে গিয়া পৌঁছাইবে। তুমি সত্যসঙ্কল্প পুরুষ হইবে—তুমি আপ্তকাম হইবে,—তুমি মহাবল লাভ করিয়া ক্ষুদ্র ফলাসঙ্গের তৃষ্ণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

যে যেমন করিয়াই জগতে বিচরণ করুক, সে আমারই ভজনা করিতেছে—আমারই নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিতেছে—আমি সর্ব্বত্রই তাহাকে অনুগৃহীত করিতেছি—এই জ্ঞান মুহূর্ত্তের জন্য হারাইও না—এই জ্ঞান হৃদয়ে উদ্ভাসিত রাখিলে, কর্ম্মের ভিতর যথার্থ কর্ম্ম কোন্ অংশটুকু, তাহা বুঝিতে পারিবে। তোমায় কর্ম্মবন্ধনে আর আবদ্ধ হইতে হইবে না। সিদ্ধি অসিদ্ধির দিকে তোমার চক্ষু পড়িবে না। তুমি যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট গতসঙ্গ মুক্ত পুরুষ হইবে। জগন্ময় ক্রিয়া, ভাব, নাম, রূপ যাহা কিছু, সমস্তই তুমি ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-কার্য্য বলিয়া পরিদর্শন করিবে।

ইহাই জ্ঞানযোগ—ইহাকে কেহ কেহ জ্ঞান-কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগও বলিয়া থাকেন। জ্ঞানের দ্বারা যে উপায়ে কর্ম্ম, জ্ঞানে পরিণত হয়—যে উপায়ে কর্ম্ম জ্ঞানময় হইয়া পড়ে—যে উপায়ে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সাধারণ কর্ম্ম ব্রহ্ম-জ্ঞানে পরিণমিত হয় বা ব্রহ্ম লাভ করে, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, ইহাকে জ্ঞান-কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ অথবা জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় বলে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেবতাদিগের কর্ম্মের আদর্শ অঙ্কিত করিয়া, কর্ম্মবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া, অনন্তব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রের ছবি চক্ষুর সম্মুখে পরিদৃষ্ট করাইয়া, আমাদিগকে কর্ম্মময় হইতে বলিয়াছেন। যে জ্ঞানের দ্বারা সেই কর্ম্মকে অনুসরণ করিতে হইবে, এই অধ্যায়ে তাহারই বর্ণনা করিতেছেন। কর্ম্মবিচার মনে পড়িলেই, সাধারণতঃ উদ্বেগ, চাঞ্চল্যাদি রাজসিক উদ্বেলনের কথা মনে পড়ে। কর্ম্মমাত্রই চাঞ্চল্যময়, সাধারণতঃ আমরা এইরূপ বুঝি। এই অধ্যায়ে জ্ঞানের বিকিরণে কর্ম্মের সে রাজসিক চাঞ্চল্য তিরোহিত হইবার উপায় ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম করিয়াও যাহাতে আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব—কর্ম্মের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া যাহাতে আমরা নিশ্চলতা হারাইব না—তাহারই উপায় এই অধ্যায়ে বর্ণিত। যে জ্ঞানের সাহায্যে কর্ম্ম করিলে আমরা বুঝিব, কর্ম্ম করারূপ ক্রিয়াটুকুও আমাদিগকে করিতে হয় নাই–তিনিই করেন–কর্ম্ম করিয়া ও কর্ম্মের উপায় বলিয়া দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত নহেন—তিনিই কর্ম্ম করাইয়া লয়েন, সেই মহাজ্ঞান এই অধ্যায়ে বিবৃত।

আর বিশেষভাবে মহাসত্যজ্ঞান এই অধ্যায়ে মা ঘোষণা করিয়াছেন। সে সত্যজ্ঞান এই,—‘আমি ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই’ ; কার্য্য, কারণ, প্রপঞ্চ যাহা কিছু, এ সমস্তই আমি। ভ্রান্তি নাই—মরীচিকা নাই—প্রহেলিকা নাই—সমস্তই আমার অভিব্যক্তি—আমার স্বরূপ।

ইতি জ্ঞানযোগ।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১

ইমং অব্যয়ং যোগং অহং বিবস্বতে সূর্য্যায় প্রোক্তবান্। বিবস্বান্ ইমং যোগং মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।

ব্যবহারিক অর্থ।—ভগবান্ বলিতেছেন, এই অব্যয় ফলদায়ক যোগ আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য স্বায় পুত্র মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ আদিত্যকে সর্ব্বপ্রথম এই যোগাধিকার দিয়াছিলেন। আদিত্য এই যোগের প্রথম অধিকারী। এই যোগে আরূঢ় হইয়াই বিষ্ণুরূপী আদিত্য বিশ্ব পরিচালন করিতেছেন। অনন্ত প্রাণশক্তির আধার হইয়া—অনন্ত প্রাণের সাক্ষাৎ আশ্রয় হইয়া—সূর্য্য-নারায়ণ এই যোগেরই মহিমা বিকাশ করিতেছেন। মহান্ কর্ম্মযোগে ব্রতী হইয়া, প্রাণের প্রস্রবণ অনন্ত দিকে স্ফুরিত করিয়া—বুদ্ধিযোগের দ্বারা মাতৃঅঙ্কে যুক্ত থাকিয়া বিরাট্ ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে "অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যে মহাযজ্ঞের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই মহাযজ্ঞের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া ভগবান্ সূর্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত।

ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় পুত্র বৈবস্বত মনুকে এবং মনু স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই যোগোপদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে ক্ষত্রিয় নৃপতিবর্গ যোগাধিকার লাভ করিয়া, এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের মহিমায় অধিকার লাভ করিয়া, তাহার পালক ও রক্ষকস্বরূপ হইয়াছিলেন।

আর 'মনু' অর্থে মন্ত্র। ভগবান্ সূর্য্যরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, এই মহাযোগের মনন করিয়াছিলেন ; সে মননশক্তি মনু বা শ্রাদ্ধদেবতা নামে পরিচিত। সেই মননাধিষ্ঠিত চৈতন্যই শব্দাকারে চারি দিকে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। ইক্ষ্বাকু শব্দে ব্যাপকতা অর্থ বুঝায়। ইক্ষুং শব্দং অকতি ব্যাপ্নোতি ইতি ইক্ষ্বাকুঃ। মায়ের এ অপূর্ব্ব যোগতত্ত্ব জীবরূপী সমস্ত সন্তানকে স্বীয় অঙ্কে যুক্ত করিয়া রাখিবার মহান্ অভিলাষ, বিশ্বধারক অধিদৈব পুরুষ বিষ্ণু আদিত্য বা জীবাত্মা প্রথম উপলব্ধি করেন। জীবের অহংরূপে বিরাজিত জ্যোতির্ম্ময় অধিযজ্ঞ পুরুষ মায়ের এই ইচ্ছার ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া এই মহতী ইচ্ছার মনন করেন, এবং সেই মনন মন্ত্রাকারে শব্দময় হইয়া জগতে সাধকদিগের লভ্য হয়। ক্ষত্রিয় অর্থে কর্ম্মবীর সাধক। যখন পূর্ব্বোক্তরূপ বুদ্ধিযোগের ধারণা জীবহৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখনই সেই জীব সাধক-পদবাচ্য। এই শ্লোকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

মা যখন ইচ্ছা করেন, তখনই আমাদিগের আত্মা এ যোগের আভাস হৃদয়ে উপলব্ধি করেন এবং এই যোগ মনন করিতে থাকেন এবং এই মননই শব্দাকারে তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, সে সমস্তই শব্দাত্মক। শব্দহীন চিন্তা আমরা করিতে পারি না। বিষয়াদি যাহা কিছু আমরা মনন করি, সে সমস্তই শব্দাত্মক। শব্দ সাহায্যে আমরা চিন্তা করিতে সমর্থ হই। আমাদিগের অন্তর্জগৎ—আমাদিগের কল্পনার ব্রহ্মাণ্ড শব্দময় মনন মাত্র। যখন আমাদিগের আত্মা মায়ের এই যোগতত্ত্বের আভাস পান, তখন ইহার মনন করিতে করিতে আমরা আমাদিগের কল্পনার জগৎকে বা মনোময় ক্ষেত্রকে আমরা এই মননাত্মক শব্দে পরিণত করি। অর্থাৎ আমরা মনে মনে তখন যে কোন বিষয় উপলব্ধি করি, সমস্তই এই যোগ-বুদ্ধিময় হইতে থাকে। আমরা তখন কর্ম্মী বা ক্ষত্রিয় বা সাধক হই। বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু, এই তিন শব্দ দ্বারা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এই অবস্থাত্রয়ও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মাতৃপ্রেরিত ভগবদ্ভাব জ্ঞানে প্রথম প্রকাশ পায় এবং উহার আভাস অনুভূত হইতে থাকে—দীপ্তি পাইতে থাকে, ইহাই জ্ঞানাবস্থা ; সেই ভাবে যখন আমরা বিভোর হই ও যখন আমরা মনন করিতে থাকি, তখনই উহার অনুরক্তি বা ভক্তির অবস্থা, এবং যখন সেই মনন, জপ স্তোত্রাদি আকারে শব্দময় হয় ও অনুরক্তির আবেগে তৎচিন্তন ও সেবায় আমরা অবিরত ধাবিত হইতে থাকি, তখন উহা কর্ম্মের অবস্থা। বস্তুতঃ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এই তিনে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই, শুধু ব্যবহারিক পার্থক্য মাত্র।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং যোগং রাজর্ষয়ো বিদুঃ। হে পরন্তপ! ইহ লোকে মহতা কালেন স যোগো নষ্টঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিরা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। হে পরন্তপ! সুদীর্ঘ কালতরঙ্গে উহা এখন নষ্ট হইয়াছে।

যৌগিক অর্থ।—অধিকারিপরম্পরাক্রমে এই অব্যয় যোগশিক্ষা-প্রবাহ আসিতে আসিতে, কালতরঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইতে হইতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে মহাসত্যপ্রতিষ্ঠার কথা বলিতেছিলাম—সত্যযুগের যে সত্যদর্শনের কথা পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে—কালের বিক্ষোভনে উহা বিলুপ্তপ্রায়। কাল কি ? কলয়তি ইতি কালঃ। যাহা সমস্ত সৃষ্টি করে এবং গ্রাস করে, তাহাই কাল। আপনি আপনাকে মহান্ অসীমত্বে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়া, যাহা আবার আপনিই আপনার সেই ব্যাপ্তিকে বা আপনাকে গ্রাস করে, তাহাই কাল। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ" ইহাই কালের অভিব্যক্তি। মহাপ্রাণই কাল শব্দে অভিহিত হন। **প্রাণের ব্যাপ্তির নাম কাল।** ঘটনা বা

ক্রিয়াপরম্পরা দ্বারা এই কালসত্তা অভিব্যক্ত হয়। **মনের ব্যাপ্তির নাম দিক্** এবং উহা পদার্থ অবস্থিতির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। এই দুইটি তত্ত্ব অতীব প্রয়োজনীয়। প্রাণের ব্যাপ্তির নাম কাল ও মনের ব্যাপ্তির নাম দিক্, এই দুইটি কথা তোমরা ভুলিও না। আমরা এ স্থলে শুধু কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রাণের ব্যাপ্তির নাম কাল এবং ইহা ঘটনা বা ক্রিয়াপরম্পরা দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। প্রাণ অর্থে প্রকৃষ্টরূপে যাওয়া। প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন, এই জন্য মহাসত্য মায়ের একটি নাম মহাপ্রাণ। প্রত্যেক স্পন্দনে বিশিষ্টতা লাভ করেন—প্রত্যেক স্পন্দনে পূর্ব্বাপেক্ষা ভিন্নতা পরিগ্রহণ করেন—প্রত্যেক স্পন্দনে বিভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হন এবং পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ করেন, ইহারই নাম প্রকৃষ্টরূপে গমন। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে বৈচিত্র্য—ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থে পদার্থে যে স্বাতন্ত্র্য, প্রলয়াদি যে পরিবর্ত্তন, এ সকল এই প্রাণশক্তিরই বিশিষ্ট প্রকার গমন মাত্র—কালের বিভিন্ন স্পন্দন মাত্র। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে—স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সাজে সাজিতে সাজিতে, মা আমার উদ্বেলিতা হইতেছেন। এই উদ্বেলনের ফলস্বরূপ মা যত বহুত্ব লাভ করেন—যত বহির্মুখে বা স্থূলাভিমুখে গমন করিতে থাকেন, ততই মা যেন ইচ্ছা করিয়া স্বীয় মহত্ত্ব হারাইয়া সাধে ক্ষুদ্রত্বের বেশ পরিধান করেন। এই মহত্ত্ব হইতে ক্ষুদ্রত্ব বা নির্ব্বিশেষ অবস্থা হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈচিত্র্য পরিগ্রহণ যত হইতে থাকে, তত আমরা বাহ্যতঃ সত্যচ্যুত হই। কালাভিঘাতে এই সত্যবিচ্যুতি আমরা চারি স্তরে বিভাগ করিয়া লই। এই স্তরচতুষ্টয়ের নাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। মহতের অভ্যন্তরে মা যত ক্ষুদ্রত্ব ও বহুত্বের ভাব উদ্বোধিত করেন, ততই ব্রহ্মাণ্ড যেন সত্যবিচ্যুত হইতে থাকে। সত্য দ্বাপরাদি কালের স্তর-চতুষ্টয় এই সত্য-বিচ্যুতিবৎ ভাবের ক্রমবিকাশ মাত্র। সত্যযুগে সমস্তই ধর্ম্মময় ছিল। কার্য্যমাত্রই তখন ধর্ম্মময় ছিল—সকল কার্য্যই সত্যের দিকে চাহিয়া সম্পাদিত হইত। তখনকার ভোগ-সকলে এ বহুত্ব ছিল না; কিন্তু স্থায়িত্ব এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। প্রাণ বা কালের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রবাহে সেই সত্যের যত অন্তরায় ঘটিল, তত যাগ-যজ্ঞাদি বিশিষ্ট কর্ম্মসকল আবিষ্কৃত হইতে থাকিল। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়েরা প্রধানতঃ এই যজ্ঞময় ধর্ম্মের পরিপালক। সত্যের বা ধর্ম্মের অভাব-বোধরূপ তৃষা যেন সমাজ-শরীরের বক্ষঃস্থল অবধি শুকাইয়া তুলে, এবং ততই এই সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। কালপ্রবাহে সত্যের আরও অন্তর্ধান ঘটিলে সেই যাগযজ্ঞাদি ক্ষুদ্র ব্রত-পূজাদি আকারে খণ্ডিত হইয়া সমাজের চারি ধার ছাইয়া ফেলে। জলের অভাব শরীরে যত সঞ্জাত হয়, ততই যেমন তৃষ্ণা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ জিহ্বা, কণ্ঠ, বক্ষ অবধি শুকাইয়া যায় এবং ততই যেমন আমাদিগের জল জল আর্ত্তনাদ বাড়ে, তদ্রূপ সত্য হইতে বিচ্যুতি যত ঘটিতে থাকে—সত্যের যত অভাব বোধ হইতে থাকে, ততই সমাজে কর্ম্মবহুলতা পরিবর্দ্ধিত

হয়। উপস্থিত কলিতে সে কর্ম্মপ্রবাহ এত ক্ষুদ্রত্ব লাভ করিয়াছে যে, ভগবৎনাম স্মরণমাত্রও বিশিষ্ট ধর্ম্ম-কার্য্যরূপে পরিগণিত হইতেছে। সত্যের সকল কর্ম্ম ধর্ম্মময় ছিল; তার পর ক্ষত্রিয়পাল্য যাগযজ্ঞে সে ধর্ম্মের অধিষ্ঠান হইল, তার পর অর্থাৎ দ্বাপরে সাধারণ বৈশ্য-পাল্যোপযোগী ব্রতাদিরূপে পর্য্যবসিত হইল, তার পর কলিতে আচণ্ডালের পালনীয় নাম স্মরণ, নাম কীর্ত্তন প্রভৃতিরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। জল জল চীৎকার যেমন তৃষাতুরের বা জলাভাবগ্রস্তের লক্ষণ, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চীৎকার তদ্রূপ ধর্ম্মাভাবের লক্ষণ। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া আজ যে জগদ্ব্যাপী বাহ্যান্দোলন দেখিতে পাইতেছ, ইহা প্রকারান্তরে ধর্ম্মহীনতার লক্ষণ—সত্যবিচ্যুতির লক্ষণ। সত্যের অভাব এত হইয়াছে যে, আজ মনুষ্যনামধারী জীবমাত্রেই বা সমাজ-শরীরের পদ-নখরও যেন সে অভাব উপলব্ধি করিতেছে, এবং বাঙ্ময় ধর্ম্মান্দোলন ততই তুমুল ভাবে জগতে আন্দোলিত হইতেছে। প্রাণহীনতা—সত্যহীনতার ততই আমরা পরিচয় পাইতেছি। সত্যযুগে মহান্ সত্যের পরিপ্লাবনের মাঝে বিশিষ্টভাবে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া কিছু ছিল না।

যাহা হউক, প্রাণ কালরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকার জগৎ প্রকাশ ও গ্রাস করেন। চেষ্টা বলিয়া যাহা কিছু আমরা উপলব্ধি করি, সে সমস্ত প্রাণেরই ধর্ম্ম। এই জন্যই আমি প্রাণপ্রতিষ্ঠার কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। কালের প্রবাহে, মহাপ্রাণের ইচ্ছায় আজ আমরা প্রাণহীন হইয়াছি। যদি আবার এই প্রাণের উপাসনা করি, যদি এই মহাপ্রাণকে মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষের অন্তরাল না করিয়া এই প্রাণে যুক্ত হইতে প্রয়াস পাই, তবেই আমরা মহাসত্যলাভে কৃতার্থ হইব—তবেই মাতৃচরণ লাভের আশা করিতে সমর্থ হইব—তবেই অহর্নিশ মায়ের জ্যোতি আমাদিগের হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া রাখিবে।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে এখানে পরন্তপ বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন। এখানে পরন্তপের এইরূপ অর্থ হইবে,—"পরং শ্রেষ্ঠং তপতে উদ্‌ভাসতে যত্র স পরন্তপঃ।" মা অহর্নিশ যাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া থাকেন, তাহাকেই পরন্তপ বলে। বুদ্ধিযোগের ইহাই অপূর্ব্ব ফল, সেই কারণে ভগবান্ পরন্তপ বলিয়া অর্জ্জুনকে সম্ভাষণ করিলেন।

রাজর্ষিরা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, শ্লোকে এইরূপ আছে। সাধারণ অর্থে ক্ষত্রিয় নৃপতিবর্গ, যাঁহারা সত্যধারণায় সমর্থ হয়েন, তাঁহাদিগকে রাজর্ষি বলে। সাধনায় যাঁহারা গৃহী হইয়াও সত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভিতর শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকেই এ স্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। গৃহিশ্রেষ্ঠ অর্থে এখানে রাজশব্দ ব্যবহৃত।

প্রাণের এ সাধনার কথা আজ আমি নূতন বলিতেছি না। ইহাই আমাদিগের ঔপনিষদিক সাধনা। এই অপূর্ব্ব সাধনা হইতে বঞ্চিত হইয়াই আজ আমরা কাচখণ্ডকেও হীরকের মত আদর করি। সাধনার ঈষৎ আভাসযুক্ত পুরুষকেও আমরা অবতার করিয়া তুলি। বিড়ম্বনা!

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৩

ত্বং মে মম ভক্তঃ সখা চ অসি, ইতি হেতোঃ অয়ং স এব পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে তুভ্যং প্রোক্তঃ, হি যতঃ এতৎ উত্তমং, অতএব রহস্যং গোপনীয়ম্।

ব্যবহারিক অর্থ।—তুমি আমার ভক্ত ও সখা বলিয়া আজ আমি তোমাকে সেই পুরাতন যোগ বলিলাম। ইহা অতীব উত্তম রহস্য।

যৌগিক অর্থ।—ভক্ত ও সখা হইলে ভগবান্ এই অপূর্ব্ব রহস্যময় যোগ জীবকে শিক্ষা দেন। অন্য কোন উপায়ে এ যোগ-প্রতিভা জীব লাভ করিতে পারে না। অনুরাগহীন হৃদয়ে এ যোগের সত্যতা উপলব্ধি হয় না। এইটুকুই ইহার রহস্য। এ যোগোপদেশ সহস্র প্রকারে শিক্ষা দিলেও হৃদয়ে আসক্তি না থাকিলে, সে শিক্ষা ফলবতী হয় না। আমরা পূর্ব্বে যে বুদ্ধিযোগের কথা বলিয়াছি, সেই বুদ্ধিযোগসাধনা বিশ্লেষিত করিয়া দেখিলে দুইটি স্তর উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি অন্তরে তাঁহাকে সখা বা সারথিরূপে পরিদর্শন, এবং দ্বিতীয় বাহ্য জগৎ তাঁহারই মহিমা, তাঁহারই স্বরূপ বলিয়া বুঝিয়া অনুরক্তি প্রকাশ। এই অনুরক্তি প্রকাশ করিতে গেলে মনে যে পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, তাহাই তৃতীয় অধ্যায়ের সেই শ্লোকে ভগবান্ 'সংস্তভ্য আত্মানং আত্মনা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের কয়েকটি শ্লোকে কামনার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক ভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া ভগবান্ নিজে তিন ভাবে কি প্রকারে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত, তাহাই দেখাইয়াছেন এবং সেই তিন রূপ প্রকাশের স্থান ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বলিয়াছেন, সেই তিন স্থলের কার্য্য বুঝাইবার জন্য শেষের শ্লোকে তিনটী ক্রিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—বুদ্ধা, সংস্তভ্য এবং জহি। বুদ্ধিতে বোধ কর, আর সেই বোধস্বরূপ আত্মার দ্বারা মনকে সংস্তম্ভিত কর, এবং এইরূপে ইন্দ্রিয়ে ভগবল্লাভে জয়যুক্ত হও। ইহার মধ্যে বুদ্ধির সাহায্যে সেই বুদ্ধির অতীত মায়ে যে প্রকারে সংযুক্ত হইতে হয়, সত্য ও প্রাণ বলিয়া যে প্রকারে বুঝিতে হয়, তাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহাই ভগবানের সহিত সখ্যতা স্থাপন, এবং সেই সখ্যতা স্থাপিত হইলে মনে ও ইন্দ্রিয়ে যে প্রকারে তিনি প্রকাশিত হইয়া পড়েন, যে প্রকারে বিষয়মাত্র ভগবান্ বলিয়া মনে পর্য্যবসিত হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় স্পর্শ করিয়াও কার্য্যতঃ ভগবৎস্পর্শলাভে পবিত্র হয়, তাহাই বুদ্ধিযোগের কর্ম্মময় অবস্থা, এবং উহাই অনুরুক্তি বা ভক্তি নামে খ্যাত। এই কারণে ভগবান্ এখানে সখা ও ভক্ত, এই দুই নামে অর্জ্জুনকে বিশেষিত করিলেন।

ইহা বলিবার আর একটি রহস্য এই যে, শুধু যন্ত্রচালিতবৎ হইয়া বুদ্ধিযোগের চেষ্টা করিলে হইবে না, সত্যস্বরূপে প্রাণস্বরূপে তাঁহাকে ধরিতে হইবে। নিজের প্রাণকে মহাপ্রাণ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া একান্ত সরল ভাবে ভালবাসিতে হইবে। তবেই

তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপিত হইবে। ইহাই রহস্য। প্রাণ না দিলে প্রাণ পাইবে না। প্রাণ বলিয়া তাঁহাকে না ডাকিতে শিখিলে, সে মহাপ্রাণ প্রাণময় হইয়া তোমার জড়-ধারণা ঘুচাইবে না। ইহাই রহস্য, ইহাই লীলা।

এই যোগটী ভগবান্ পুরাতন বলিয়াছেন। ইহা বস্তুতই পুরাতন। শ্রুতিতে এই প্রাণের উপাসনা বিশেষভাবে বর্ণিত।

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪

অর্জ্জুনঃ উবাচ—ভবতঃ জন্ম অপরং, দৈবং, স্থূলং, অর্ব্বাচীনং ইতি বা, বিবস্বতঃ সূর্য্যস্য জন্ম পরং, শ্রেষ্ঠং, ব্রাহ্ম, পূর্ব্বকালীনং বা, অতঃ ত্বং আদৌ বিবস্বতে ইমং যোগং প্রোক্তবান্ ইতি, এতৎ অহং কথং বিজানীয়াম্ ?

ব্যবহারিক অর্থ।—অর্জ্জুন কহিলেন,—আপনার জন্ম অপর অর্থাৎ স্থূল, দৈবী এবং সূর্য্যের জন্ম পর, শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মী। আপনার জন্মের পূর্ব্বে সূর্য্যের জন্ম হইয়াছিল। তবে আমি কিরূপে জানিতে পারি, আপনি এই যোগ সূর্য্যকে বলিয়াছিলেন ?

যৌগিক অর্থ।—ভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপ পরিগ্রহণ করিয়া জগতে আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুন যে এই প্রশ্ন করিলেন, এমন নহে। এই প্রশ্নের অন্য উদ্দেশ্য আছে। ভগবান্ প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে প্রত্যেক চিদাকাশে তাঁহাকে যে সম্ভূত হইতে হয়, সাধনার শেষ সীমায় উপনীত হইলে প্রত্যেক জীবরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের বক্ষে যে তাঁহার চরণ সংস্থাপিত হয়—সেই ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারিরূপে সাধকবক্ষে আবির্ভাবও অর্জ্জুনের প্রশ্নের লক্ষীভূত বিষয়। বাহ্য জগতে বা বিরাটে যে মহাপুরুষ সূর্য্যরূপে বিরাজিত—কুরুক্ষেত্র-সমরসময়ে যিনি জগৎচক্রের কেন্দ্রস্বরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে অবশ্য আবির্ভূত রহিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার বংশধর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি বহু কাল পূর্ব্বে ইহজগৎ হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে সেই সূর্য্যদেবকে মনু ও ইক্ষ্বাকুর পূর্ব্বে যোগ শিক্ষা দিয়াছেন ? ইহা কি প্রকারে সম্ভব ? উপস্থিত সময়ে সূর্য্যকে শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে, কিন্তু তাহা ত নহে। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ভগবান্ সূর্য্যনারায়ণ, মনু ও ইক্ষ্বাকুকে উপদিষ্ট করিয়াছিলেন ; সুতরাং ইক্ষ্বাকু ও স্বায়ম্ভুব মনুর পূর্ব্বে যে সূর্য্য এ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন—ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইক্ষ্বাকু আদির বহু পরে কৃষ্ণ-মূর্ত্তির আবির্ভাব। সুতরাং ইহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব। ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্নের স্থূল তাৎপর্য্য।

ব্যষ্টিভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবে সাধক-প্রবর অর্জ্জুনের এ প্রশ্নের লক্ষ্য এই যে, জীবাত্মরূপী বিবস্বান্ সংস্কারবশে যখন যোনি হইতে যোন্যন্তর ভ্রমণ করিতে থাকে,

যখন জন্মের পর জন্ম আপন সংস্কাররূপ জগৎচক্রের কেন্দ্রস্বরূপ থাকিয়া, কোন বিরাট্ কেন্দ্রকে—কোন সত্যকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রাম্যমাণ সংস্কার-চক্র-বেষ্টিত হইয়া, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইতে হইতে ছুটিতে থাকে এবং যখন স্বীয় বিরাট্ জীবন-পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া, অতি কাতর ভাবে 'আর ছুটিতে পারি না; কোথায় তুমি—অগ্রসর হইয়া আসিয়া আমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লহ' বলিয়া কাঁদিয়া ফেলে, সুধু তখনই তুমি না তাহার হৃদয়ে গিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর; তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, তাহাকে আলিঙ্গন দাও। তোমার সংস্পর্শ লাভ করিয়া তবে তখন জীবরূপী সূর্য্য না ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করে। চিরতরে তাহার ছুটাছুটি ঘুচিয়া যায়—তাহার নিত্যবেষ্টনী সংস্কার-গ্রহমালা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। তুমি দেখা দিবার পর, তুমি উপদেশ দিবার পর, আর ত সাধকের সাধনাবিচ্যুতি ঘটে না। ইহা যদি সত্য হয়, তবে তুমি যে বলিলে—আমি পূর্ব্বে বিবস্বান্‌কে এ যোগ উপদেশ দিয়াছিলাম বা সাধককে পূর্ব্বেই উপদেশ দিই এবং তাহা কালে আবার নষ্ট হইয়া যায়—এ কথার তাৎপর্য্য কি জগন্ময়ি? আর এক কথা। সাধকের হৃদয়ে তোমার এ আবির্ভাব—ইহা অপর—অর্ব্বাচীন, আধুনিক বা সাধকের সংস্কার অনুযায়ী ইষ্ট-মূর্ত্তিতে, সুতরাং পরস্বরূপ হইতে নিকৃষ্ট। আর ব্রহ্মস্বরূপের "বহু স্যাম্" অর্থাৎ বহু হইব বলিয়া যে জীবভাবাবলম্বন, তাহা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মসঙ্কল্প, সুতরাং তাহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, জীব ব্রহ্ম-সঙ্কল্প এবং তুমি প্রাণ, ইষ্টদেবতারূপে যখন জীব-হৃদয়ে উদ্ভাসিত হও, তাহা আবার সেই জীবের সঙ্কল্প-প্রভব, সুতরাং জীব অপেক্ষা তাহা অবিশুদ্ধ। অপরা প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত পরা প্রকৃতিকে কিরূপে শিক্ষা দিবে? যদি বল, তাহা হইতে পারে। যেমন বৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজ শক্তিহীন হইলেও তাহা হইতে প্রসূত অঙ্কুর যেমন প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া পল্লবিত ও তাহার জনক সেই বীজটির মত সহস্র বীজ প্রসব করিতে সমর্থ, অথবা জ্যোতিহীন মেঘখণ্ড জগৎকে অন্ধকার করে, কিন্তু তৎপ্রসূত বিদ্যুৎ যেমন নয়ন ঝলসিয়া দিগন্ত আলোকিত করে—ইহাও তদ্রূপ। না হয় স্বীকার করিতাম; কিন্তু তুমি জীবের আকুলতা জন্মাইবার পূর্ব্বে যখন তাহার হৃদয়ে আবির্ভূতই হও না, তখন আবার কি প্রকারে শিক্ষা দিবে? ইহাই অর্জ্জুনের আশঙ্কা।

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫

শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জ্জুন! মে মম তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি অতিক্রান্তানি। হে পরন্তপ! অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ, ত্বং ন বেত্থ।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অতীত জন্ম বহু; সে সকল আমি জানি; কিন্তু হে পরন্তপ! তুমি তাহা জান না।

যৌগিক অর্থ।—আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জন্ম দুই প্রকারের—ভগবৎসম্বন্ধে জ্ঞানপরিশূন্য এবং ভগবদ্‌বুদ্ধিযুক্ত। যে সকল জন্মে জীব মাতৃসত্তার সন্ধান রাখে না, মাতৃঅস্তিত্ব যে সকল জন্মে উপলব্ধ হয় না, ভগবৎসম্বন্ধশূন্য সেই সকল জন্মকে ব্যতীত জন্ম বলে। (বি+অতি—ই+ক্ত) ই ধাতু অর্থে গমন, বিশেষভাবে যত দিন জীব বহির্মুখে গমন করিতে থাকে, মোট কথায় তত দিন জীবের সেই জন্মগুলিকে ব্যতীত জন্ম বলা যায়। এবং যখন জীব মাতৃমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে বা অন্তর্মুখী গতি লাভ করে, অর্থাৎ বহু পথ পর্য্যটন করিয়া, মাতৃসন্ধানে প্রাণ যখন আকুল হইয়া উঠে এবং 'ও মা ও মা' করিয়া জীব অন্তর্মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেই অবস্থার জন্মগুলিকে জীবের সমেত জন্ম বলা যায়। (সম্—আ—ই+ক্ত=সমেত) সম্যক্‌রূপে আগত, ইহাই সমেত শব্দের অর্থ, ইহা হইতেই একত্রিত, মিলিত প্রভৃতি অর্থ হইয়াছে। জীব যে মুহূর্ত্ত হইতে মাতৃলাভের জন্য আকুল হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতে বুঝিতে হইবে, মা তাহার হৃদয়ে আসিয়াছেন, ইহা আমি পূর্ব্বে বিশদভাবে বুঝাইয়াছি। সুতরাং মাতৃসন্ধানে উন্মুখী হওয়া হইতে জীবের সমেত জন্মের সূচনা ধরিয়া লইতে হইবে। মায়ের জন্য প্রাণ আকুল-হওয়া মাত্রই আর মা ত হৃদয়ে পূর্ণরূপে প্রকটিতা হন না। তবে তাহাকে কিরূপে সমেত জন্ম বলা যায়? এরূপ সংশয় কেহ মনে স্থান দিও না। মায়ের জন্য আকুলতা আসিলে অতি স্বল্প জন্মস্রোত জীবকে উত্তীর্ণ হইতে হয়; অনন্ত কোটি জন্মের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। যাহা হউক, জীবের যে এইরূপ ব্যতীত জন্ম বহু হইয়া থাকে, ইহা বুঝা গেল। এইবার ভগবানের ব্যতীত জন্ম কি, তাহা বুঝাইতেছি।

যে সকল জন্মে জীবের সহিত তিনি সাক্ষাৎভাবে ব্যবহার করেন না: অথচ হৃদয়ে থাকিয়া জীবের অজ্ঞাতসারে তাহাকে পরিচালিত করিতে থাকেন, সেই সকল জন্মকে তাঁহারও ব্যতীত জন্ম বলা যায়। জীব যত বার জন্মগ্রহণ করে, মাকে উপলব্ধি করুক বা না করুক, পরমাত্মরূপিণী মা আমার সাক্ষিস্বরূপা হইয়া তত বারই জীবক্ষেত্রে অবস্থান করেন বা জাত হয়েন। সেইগুলিই তাঁহার ব্যতীত জন্ম। তার পর জীব বহির্মুখে নামিতে নামিতে, দুষ্কৃতিপরিব্যাপ্ত হইয়া যখন মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠে, তখন তিনিও সাক্ষাৎভাবে তাহার হৃদয়ে উপলব্ধ হয়েন এবং তখন হইতেই তাঁহারও সমেত জন্মের সূচনা বলিতে হয়। যত দিন তিনি পরের মত, অস্তিত্বহীনের মত অবস্থান করেন, তত দিন তাঁহার ব্যতীত জন্ম এবং যখন তিনি মায়ের মত সাক্ষাৎভাবে ব্যবহার করেন, তখনকার জন্মগুলি সমেত জন্ম। জীবের ও পরমাত্মার অমিলন অবস্থার জন্মগুলি উভয়ের ব্যতীত জন্ম, এবং মিলনবোধ ও মিলন-সংযুক্ত জন্মগুলি উভয়েরই সমেত জন্ম। এই শ্লোকে ভগবান্ কেবল ব্যতীত জন্ম কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, ব্যতীত জন্ম প্রসঙ্গ দ্বারাই অর্জ্জুনের প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি পূর্ব্বে কোন ব্যতীত জন্মে, সূর্য্যকে এই অপূর্ব্ব বুদ্ধিযোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—সূর্য্যকে তিনি কি প্রকারে শিক্ষা দিলেন ? ভগবান্ তদুত্তরে এই শ্লোকের অবতারণা করায় বুঝা যাইতেছে যে, তিনি কোন পূর্ব্বজন্মে তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা বলাই তাঁহার অভিপ্রায়। ইহা হইতে আমরা এই বুঝিলাম যে, তিনি সূর্য্যরূপী জীবাত্মাকে, ব্যতীত জন্মে এই বুদ্ধিযোগের শিক্ষা দিয়া থাকেন। সে কি শিক্ষা—কি প্রকারে সে শিক্ষা দেন ? যখন জীব মা বলিতে শেখে না, তখন জীব মাতৃবেদনে সম্বেদিত না হইয়া যথেচ্ছাচারিরূপে নাস্তিক্যবুদ্ধি হৃদয়ে লইয়া আধ্যাত্মিক আলোকশূন্য ঘোর অন্ধকারময় জন্মতরঙ্গসকল উত্তীর্ণ হইতে থাকে, তখন জীবের সে দুরন্ত দুর্দ্দিনের ভিতর কখন্ তিনি আসিয়া তাহাকে বুদ্ধিযোগ শিক্ষা দেন ? তিনি যদি আসেন, তিনি যদি অমৃতময় শিক্ষা দিয়া জীবের হৃদয়ে আশার আলোক উদ্দীপিত করিয়া দিয়া যান, তবে জীব তাহা বুঝিতে পারে না কেন ? আমরা ত জগতে দেখিতে পাই, অনেক জীব ভগবদ্ভাবে সময়ে সময়ে বিভোর হইয়া পড়ে, অথচ ভগবৎসত্তার উপলব্ধি করিয়াছে, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারে না। আমরা দেখি, নাস্তিক্যবুদ্ধি হইতে জীব ধীরে ধীরে আস্তিক্যবুদ্ধিতে আসিয়া পৌঁছায়, অথচ ভগবদুপলব্ধি পাইয়াছে বলিয়া বোধ করে না। যদি তিনি আসেন, তবে তাহার উপলব্ধি থাকে না কেন ? ইহার উত্তর—জীব তাহা দেখে না ; সাধারণ জীব মাকে দেখিতে চাহে না, আত্মকর্ত্তৃত্বের অভিমানে পূর্ণ জীবপ্রাণ, কে আসিয়া তাহার কি করিতেছে, ইহা দেখিবার অবসর পায় না ; এমন কি, যখন মা আমার স্নেহের বিশিষ্ট উচ্ছ্বাস বুকে লইয়া আসিয়া ঈষৎ মাতৃমুখী সন্তানকে আদর করেন, যখন তাহাকে সাধুতার ঈষৎ স্বর্গীয় আলোকে মাতাইয়া দিয়া, জগৎচক্ষে সাধুতার যশে ভূষিত করিয়া দিয়া, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন, জগৎ মহাসাধু বলিয়া তাহার চরণে শির নমিত করে, তখনও সে মাকে না চাহিয়া, আত্মাভিমানে জগদ্গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইবার ঈপ্সার তাড়নায় জগদুদ্ধাররূপ ব্রত কিম্বা ব্রতের ভাণ গ্রহণ করে। তখনও সে অতি অল্প মুহূর্ত্ত মাত্র যথার্থ মাতৃমুখে ধাবিত হয় ; যথার্থরূপে প্রাণ ভরিয়া মাকে চায় নাই। যদ্যপি বা তাহার সে মহাব্রত অকৃত্রিম হয়, তত্রাচ তাহার কার্য্যকারিতা অতি সামান্য মাত্র হইয়া থাকে। হায় ! জীব শুধু নিজে মাতৃমুখী হইয়া জগতের যে কল্যাণ সাধন করিতে পারে, শুধু নিজে আদর্শ হইয়া জগৎকে আদর্শাভিমুখে যে পরিমাণে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়, আদর্শ হইবার উপদেশ সহস্র বৎসর ধরিয়া জগতে প্রচার করিলেও, তাহার সহস্রাংশ পরিমাণ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কিন্তু সে অন্য কথা।

কর্ত্তৃত্বাভিমানের কথা বলিতেছিলাম। কর্ত্তৃত্বাভিমান মায়ের সে আগমন দেখিতে দেয় না, মাকে খণ্ডিত করিয়া ফেলে। জীবকর্ত্তৃত্ববোধ খণ্ডদর্শন বা খণ্ডদর্শনের ফলমাত্র ;

এবং সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহাকে আত্মহত্যা বলা যায়। সেই খণ্ডদর্শন বা বিষয়-দর্শন যত দিন যে পরিমাণে প্রবল থাকে, তত দিন সেই পরিমাণে আমরা মাতৃদর্শনে বঞ্চিত থাকি। যে পরিমাণে জীব বিষয়কেও মা বলিয়াই চিনিতে পারে বা প্রাণ বলিয়া আদর করিতে সমর্থ হয়, সেই পরিমাণে জীব, মায়ের এই গুরুরূপে আগমন উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। বিষয়কে মাতৃরূপে দর্শনই মনে-প্রাণে মিশান। বিষয়—মনেরই অভিব্যক্তি-বৈচিত্র্য ; এবং প্রাণেরই উহা লীলাবিলাসময় স্বরূপ। বাহিরে যেমন, ভিতরেও ঠিক তেমনি। বাহ্য পদার্থকে মা বলিয়া বা প্রাণ বলিয়া উপলব্ধি করা—অন্তরে কল্পিত পদার্থে তদ্রূপভাবে প্রাণ বলিয়া আবাহন করা—এই উভয়ই মনে-প্রাণে মিশান। ইহারই আমরা নাম দিয়াছি—প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। অনেকে ধ্যানাদির সাহায্যে কোন ভগবৎরূপ বা ভাব হৃদয়ে কিছু কাল ধারণ করিতে সমর্থ হইলেও এই প্রাণ-মিশান বা প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অভাবে মাতৃলাভে সমর্থ হয় না বা মাতৃআগমন উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্য প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কথা আমি বিশেষভাবে বলিয়াছি এবং আরও বলিব।

অর্জ্জুন যে ভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবান্ যেন ঠিক সেই ভাবে উত্তর না দিয়া, তাঁহার অপূর্ব্ব জীবরক্ষকরূপে আবির্ভাবের কথা বলিয়া, তাঁহার প্রশ্ন অপেক্ষা অতি গভীর তত্ত্ব অর্জ্জুনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন ; এবং পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে ইহাই মনে হয় ; বস্তুতঃ তাহা নহে। অর্জ্জুনেত মত সাধক যে ভগবদুক্তিতে বালকোচিত সন্দেহ করিতে পারে, ইহা ধারণা করা ভ্রান্তিমাত্র। কথাটা এখানে একটু স্পষ্ট করা আবশ্যক। ভগবান্ বলিলেন,—"আমি এই অপূর্ব্ব যোগ প্রথমতঃ সূর্য্যকে শিক্ষা দিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ দিয়াছিলেন।" ভগবানের এই উক্তি দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণদেহধারী ভগবানের অনেক পূর্ব্বে এই যোগের অবতারণা হইয়াছিল। অর্জ্জুনের সমসাময়িক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহা সাধারণ মানুষ মাত্রেই বুঝিতে পারে, তাহাতে অর্জ্জুনের পক্ষে তাদৃশ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। তাই সাধক-প্রবর অর্জ্জুন, জন্মগত অপর ও পরবিষয়ক প্রস্তাবের অবতারণাপূর্ব্বক "কথমেতদ্বিজানীয়াম্" বলিয়া একেবারে জন্ম-রহস্য অবগতির জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন ; সুতরাং ভগবান্ও অর্জ্জুনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া "বহূনি মে" ইত্যাদি এবং "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং" পর্য্যন্ত পাঁচটী শ্লোকে অপূর্ব্ব জন্ম ও কর্ম্ম-রহস্য বিশ্লেষণপূর্ব্বক প্রিয়তম শিষ্যের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিলেন। অর্জ্জুন ও পরন্তপ শব্দের অর্থ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এ স্থলে উক্ত সম্বোধন-পদদ্বয় দ্বারা ভগবান্ ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন যে, শুদ্ধসত্ত্ব ও মাতৃনিষ্ঠ সাধক ব্যতীত এই জন্মতত্ত্ব অবধারণ করিতে সম্যক্ সমর্থ নহে। যাহা হউক, ভগবান্ এইরূপ ব্যতীত জন্মের উল্লেখপূর্ব্বক বলিলেন—"হে পরন্তপ! আমি সে সকল জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত আছি ; কিন্তু তুমি কিছুই জান না।"

হে শুদ্ধ, হে পবিত্র! তুমি আমার দ্বারা সর্ব্বদাই উদ্দীপিত, আমার আলোকে আলোকিত, আমার প্রাণে অনুপ্রাণিত, তুমি যত দিন ইহা না দেখ, তত দিন তুমি আমি অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন; তত দিন তোমার ও আমার ব্যতীত-জন্ম; তত দিন তোমার জন্য আমি যে সকল জন্মপরিগ্রহণ করি, সেগুলি বিরহপূর্ণ—ততদিন আশায় বুক বাঁধিয়া আমি তোমায় বুকে ধরিয়া রক্ষা করি, একবার মা বলিয়া সম্ভাষণ করিবে, এ সার্থকতাটুকুও তত দিন আমার থাকে না। রে আমার জীবন—রে আমার জীব! তত দিন আমার হৃদয়ের স্নেহ-প্রেমময় আদান প্রদান সবই ব্যতীত—বিশেষভাবে অতীত ঘটনার স্মৃতিমাত্র। জীব আমায় বুঝিতে পারিলে তাহাতে আমাতে কত প্রেমলীলা অনুষ্ঠিত হয়—তখন তাহাকে বুকে ধরিয়া আমি কত সুখ অনুভব করি, সে আমাকে বুকে ধরিয়া কত সুখ অনুভব করে; সেই পূর্ব্বস্মৃতিসমষ্টি মাত্র আমি হৃদয়ে লইয়া তোমার ভবিষ্যৎ উদ্বোধপূর্ণ জন্মের জন্য অপেক্ষা করি। আমার বুকে তুমি, তোমার বুকে আমি, আমার অন্তরে তুমি—তোমার অন্তরে আমি—আমার চক্ষে তুমি—তোমার চক্ষে আমি—তুমি আমার প্রাণ—আমি তোমার প্রাণ, ইহা যত দিন না হইবে,—তত দিন আমি তোমার কাছে অস্তিত্বহীন, সত্তাহীন, অথবা সম্বন্ধহীন ভাবে প্রতীয়মান। তত দিন তোমার ও আমার ব্যতীতজন্ম। তত দিন তোমরা তোমাদের সত্তাকে তোমাদেরই সত্তা বলিয়া বোধ কর—আমার সত্তায় সত্তাবান্ বলিয়া অনুভব কর না— বিষয়ের গুণ ও রূপকে বিষয়েরই রূপ-গুণ বলিয়া উপলব্ধি কর— আমার রূপ-গুণ বলিয়া ধারণা কর না। তোমরা বল—অগ্নির দাহিকা শক্তি, সূর্য্যের জ্যোতি, সলিলের শীতলতা, কুসুমের গন্ধ। কই, বল না ত—আমার দাহিকা শক্তি যে কেন্দ্রে বিকশিত, তাহার নাম অগ্নি; আমার শীতলতা যেখানে অনুভূত, তাহার নাম জল; আমার কোমল পরশ যেখানে সম্যক্‌রূপে জীবিত ও সুখ-কণ্টকিত করে, তাহার নাম—বায়ু; আমার পুণ্যসৌরভ যাহাতে সম্যক্ চর্চ্চিত, তাহার নাম—কুসুম। অথবা গন্ধসুখময়ী আমি যেথায় গন্ধরূপে ঘনীভূত হইয়া আত্মহারা হইয়াছি, তাহার নাম—ক্ষিতি। রসসুখময়ী আমি রসময়ী হইয়া যেথা আত্মহারা হইয়াছি, তাহার নাম অপ্, বিকাশ-সুখময়ী আমি বিকাশরূপ সুখে যেখানে আত্মহারা, তাহার নাম তেজঃ, স্পর্শ-সুখময়ী আমি স্পর্শসুখে যেখানে আত্মহারা, সেখানে তাহার নাম মরুৎ, শব্দ-সুখময়ী আমি শব্দসুখে যেখানে আত্মহারা, তাহার নাম ব্যোম। তোমরা প্রাণটুকু বাদ দিয়া আমাকে ভোগ কর। তাই তোমরা প্রাণহীন। তোমরা অন্ন গ্রহণ কর, উহা জড় অন্ন—তাই অন্নগ্রহণে তোমাদের জড় দেহই প্রধানরূপে পরিপুষ্ট হয়। আমি অন্নরূপে রসময়ী হইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত, এরূপ তোমরা ব্যতীত জন্মে দেখিতে পাও না। আমি তোমাদের মধুস্বরূপ, তোমরা আমার মধুস্বরূপ,—আমি তোমাদের আত্মা, তোমরা আমার আত্মা, এ অপূর্ব্ব দর্শন, এ অপূর্ব্ব ভোগ তোমরা পাও নাই। পরে পাইবে, পরে আমায় চিনিবে।

সত্যই তোমরা পাও নাই। যদি পাইতে, এ জগৎ প্রাণময় দেখিতে, সর্ব্বত্র মাকে দেখিতে, সর্ব্বত্র মাকে লাভ করিতে—সর্ব্বত্র মাকে ভোগ করিতে, মাকে ভোগ করিয়া জড়নামীয় খণ্ড বা স্বল্প ভোগ হইতে ওই স্বল্পভোগ করিতে করিতেই নিবৃত্ত হইতে। সর্ব্বত্র প্রাণ দেখিয়া প্রাণ লাভ করিতে। ঋষিদিগের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে,—"ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্ত সত্যস্থ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।" জগতে মোহের লীলা না দেখিয়া প্রেমের লীলা দেখিতে। জড়ের পরিবর্ত্তন ও পরিণাম না দেখিয়া মায়ের—চৈতন্যের অপরিণামী স্নেহচাঞ্চল্য পরিদর্শন করিতে। তোমরা ধন্য হইতে।

মায়ের আমার তিন প্রকারের জন্ম। জন্ম-তত্ত্ব সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রায় একই কথা। মা যখন বহু হইবার সঙ্কল্প করেন এবং সেই ইচ্ছাক্রমে প্রথমে আপনি আকাশাদি তত্ত্ব বিকাশ পায়, সেই তত্ত্ব হইতে তন্মাত্রাসকল, তন্মাত্রা হইতে ইন্দ্রিয়বর্গ—ইন্দ্রিয় হইতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ক্রমান্বয়ে ফুটিয়া উঠিয়া, আপনি এই সকল বিম্বিত আকারে জীব-মণ্ডলীস্বরূপ স্ফুরিত হইয়া পড়েন এবং হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মারূপে বা ঈশ্বরস্বরূপে আপনি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত থাকেন, সে এক প্রকারের জন্ম। সেই জন্ম আঁকিতে গিয়াই বেদান্তদর্শন লিপিবদ্ধ। এই যে মহিমময় সমষ্টি প্রকাশস্বরূপের আভাস, ইহাই পূর্ণ ঘনীভূত আকারে প্রতি জীব-চৈতন্যকে রঞ্জিত করিয়া রাখে, এবং সান্নিধ্যবশতঃ জীব-চৈতন্যে তাহা বিম্বিত হয় ও তাহা হইতে বিলোমক্রমে অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, তন্মাত্রা ও তত্ত্ব ফুটাইয়া জীব আপনাকে ভৌতিক করিয়া লয় বা ভূতময় হয়, ইহাও মায়েরই আর এক প্রকারের জন্ম। এই খণ্ড জন্মতত্ত্ব বর্ণনা করিতে গিয়াই সাংখ্য-দর্শন প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে বলিব। ইহা ব্যতীত মায়ের আর এক প্রকারের জন্ম-কাহিনী সাধকেরা জানেন। মা আমার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবভাব পরিগ্রহণ করিয়া, আবার ধীরে ধীরে মহান্ স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা ক্রমাভিব্যক্তির সাহায্যে কর্ম্মোপলক্ষ অবলম্বন করিয়া। কিন্তু তাঁহার সেই জীবোদ্ধারকল্পে আর একটি বিশেষ জন্মপরিগ্রহণ সংসাধিত হয়। সেটী মায়ের আমার বিশেষ জন্ম। পূর্ব্বোক্ত জন্মন্তরদ্বয় সৃষ্টির জন্য বা বহির্মুখী। এ বিশেষ জন্ম—সেই জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য, জীবকে পুনরায় স্বীয় অঙ্গে মিশাইয়া লইবার জন্য; জীবের সহিত স্নেহের আদান প্রদান করিয়া, জীবের সহিত সংসারী হইয়া, তাহাকে বিমল ব্রহ্মানন্দের সুখ অনুভব করাইয়া, তাহার বহু জীব-জন্মগত সুখ-দুঃখের চাঞ্চল্য বিদূরিত করিয়া দিয়া, নিত্য সুখের হৃদয়দ্রাবী আবেগে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য। জীব তাহার বহু জন্ম পরিগ্রহণের ভিতর দিয়া একটি জিনিষ গড়িয়া তুলে, সেটী ভালবাসা—মায়া। জীব ইন্দ্রিয় সাহায্যে অহর্নিশ বিষয় লাভ করে ও তাহার সংস্পর্শে থাকিয়া, তাহার নূতনত্বে মজিয়া, তাহাতে আপনাকে ঢালিয়া দিতে থাকে। ইহারই নাম ভালবাসা বা মায়া। এইরূপে জীবনের পর জীবন, কত যুগ ধরিয়া বিষয় বা পদার্থসকলে আত্মদান করিয়া, নানা

সংস্কার-সঞ্চয়ের মধ্য দিয়া জটিল কর্ম্মজালের মধ্যে জড়িত হইতে হইতে জীব একটি অমূল্য জিনিষ লাভ করে ভালবাসা—মায়া। যাহা পায়, যাহা ইন্দ্রিয়সাহায্যে গ্রহণ করিতে সক্ষম, চক্ষুর সম্মুখে যাহা কিছু আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই সেই মায়া জড়াইয়া দেয় ও পূর্ণ তৃপ্তির অভাবে আবার বিষয়ান্তরে তাহা বিজড়িত করে। এই ভাবে যুগযুগান্তর ধরিয়া জীব মায়ার সূত্র—মায়ার মালা রচনা করে, সুদৃঢ় করে, মায়াময় হয়। সে সূত্র যখন একান্ত সুদৃঢ় হয়, সে মালা যখন সুচারু গ্রথিত হয়, তখন মা আমার অতি সংগোপনে তাহার এক প্রান্ত ধরিয়া আপন গলে ধারণ করেন। তখন সে মালা ধীরে ধীরে জীবের অজ্ঞাতসারে বিষয়ত্ব হইতে একটু একটু করিয়া স্খলিত হইয়া মাতৃবক্ষে দুলিতে থাকে। তখন জীব সহসা দেখে—সে মাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, তাহার চারি দিকের বাঁধন শ্লথ হইয়া গিয়াছে—মায়াসূত্র মায়াময়ীর কণ্ঠে বিজড়িত হইয়াছে। সে মাকে ভালবাসিয়াছে। এই ঘটনাটী ঘটিতে গিয়া তাহার যে সকল লক্ষণ ফুটিয়া উঠে, সেইগুলিকে আমরা বৈরাগ্য, বিবেক, সত্য, সরলতা, সমদর্শিতা ইত্যাদি নামে অভিহিত করি। যাহা হউক, মাকে ভালবাসাও মায়ার বাঁধন—মায়ার খেলা। এত দিন সুধু মায়ের মায়ায়, মায়ের স্নেহের ভোক্তা ছিল, এখন সে মাকে মায়ের ভোক্তা করে—মায়ের মা হয়। আকুল আবেগে কুমারী কন্যাটীর মত তাহাকে কত মায়াশ্রু অভিষিক্ত করে—সময়মত হৃদয় খুলিয়া তাহার সহিত কত কথা কয়, স্বামীর মত বুকে লইয়া কত প্রেমাত্মহারা হয়—সে মাকে লইয়া ঘরকন্না করে। এই খেলাটুকু খেলিবার জন্য মা এত করিয়া জীবকে, জীবের মায়াকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন। এই সাধ—এই আত্মরতির বাসনা—বালকের ক্রীড়াবাসনার মত মাকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ মহাক্রীড়ায় নিযুক্ত করে। আর এই খেলা খেলিবার জন্য তিনি জীবের উক্ত মায়ামাল্য রচনায় জটিল সময়ে বিশেষ জন্মপরিগ্রহণ করিয়া তাহার জীবগতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাহার জীবন-রথের সারথি হইয়া, আকুল-নয়নে মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে তাহার ইন্দ্রিয়াশ্ব চালনা করেন। এমন প্রেমিক কোথাও দেখিয়াছ—এমন হৃদয় কোথাও অনুভব করিয়াছ রে? স্নেহের এমন তুফান কোথাও ভোগ করিয়াছ রে? রোগ-শয্যায় শায়িত হইয়া জ্ঞানহীন অবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া আছ—সহসা জ্ঞানলাভ করিয়া জাগ্রত হইয়া দেখিলে—নিশীথের গভীর অন্ধকারে দীপের ক্ষীণ আলোকে উজ্জ্বল, একখানি মলিন মুখের দুইটী বিমল আঁখি, তোমার মুখের উপর স্থির অপেক্ষায় নিশ্চল নির্নিমেষ ভাবে চাহিয়া; সে তোমার মা বা স্ত্রী বা কোন ভালবাসার পাত্র। বল দেখি, প্রাণটি তখন তোমার কি হয়? রে জীব, আজ তেমনি চক্ষু চাহিয়া একবার দেখ, দেখিবে—বিশ্বের সাম্রাজ্ঞী, বিশ্বের নিয়ন্তা, তোমার অজ্ঞানবিকার-প্রলাপময় জীবনের গভীর নিশায় কি স্নেহ-স্থির নির্নিমেষ নয়নে তোমার মুখ তাকাইয়া যুগযুগান্তর বসিয়া! তোমার জন্য বিশিষ্ট জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া, তোমার জন্য অমৃত-বারি করে লইয়া, তোমার

চমক ভাঙ্গার অপেক্ষা করিতেছে। এমন ছবি দেখিয়াছ রে! এস, আজ যদি চমক ভাঙ্গিয়াছে—যদি তাঁর মহাবাণী শুনিতেছ, তবে এস, আজ তাঁর পবিত্রতাময় বিশিষ্ট জন্ম-কাহিনী শুনিয়া অন্ততঃ বারেকের জন্য তাঁর চরণে লুটাইয়া পড়ি।

অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬

অব্যয়াত্মা অহং অজঃ জন্মরহিতঃ সন্ অপি, ভূতানাং ঈশ্বরঃ সন্ অপি, স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি।

ব্যবহারিক অর্থ।—আমি জন্ম-রহিত এবং অবিনশ্বর ও ভূতসকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়ার দ্বারা জন্ম পরিগ্রহণ করি।

যৌগিক অর্থ।—জীবের কর্ম্মাশয়ের তিনটি প্রধান সংস্কার বা বন্ধন আছে। জন্ম, মৃত্যু ও ক্ষুদ্রত্ব বা কর্ম্মাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য। এই তিনটি যত ক্ষণ থাকে, তত ক্ষণ আত্মা জীবপদবাচ্য। আমরা অনাদিকাল হইতে এ সংস্কারে আবদ্ধ আছি। সুতরাং ইহাদের কঠোরতা আমাদিগের অনুভবে বড় একটা আসে না। ইহাই আমাদিগের স্বভাবগত ধর্ম্ম। কিন্তু মায়ের পক্ষে এ বন্ধনের ভিতর আসিতে হইলে মাকে কতটা ত্যাগ স্বাকার করিতে হয়! জন্ম-রহিত হইয়াও আমাদিগের জন্য ভৌতিক বন্ধনের কঠোর শৃঙ্খল সর্ব্বাঙ্গে বিজড়িত করিয়া মাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়! অব্যয়াত্মা হইয়াও মৃত্যুর তদপেক্ষা কঠোর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা বহন করিতে হয়; কেন না, জন্ম থাকিলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও ভূতের দাসত্ব স্বীকার করিয়া, আপনাকে জীব-ধর্ম্মের ক্ষুদ্রত্বের স্বতন্ত্রতার মধ্যে আবদ্ধ করিতে হয়। অবশ্য তাঁহার তাহাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট নাই—তিনি স্বীয় অসঙ্গত্ব ভোলেন না। কিন্তু তবু আমাদিগের চক্ষে সে অসঙ্গত্ব বুঝিবার উপায় নাই। কাজেই আমরা দেখি তাঁহার বাহ্য ব্যবহারিক ভাবটি, দেখি আতুরা জননী। বিরাট্ সৃষ্টিচক্রের অধিপতি হইয়া, তাহারই গুটিকয়েক ধূলিকণা অঙ্গে মাখিয়া, আপনার শরীর বলিয়া বিরাটত্ব হইতে আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা—এ প্রীতির গভীরতা বুঝিবার শক্তি আমাদিগের নাই। মাকে এই তিনটি মর্ম্মচ্ছেদী বেদনা সহ্য করিতে হয়। আমাদিগের জন্য জন্মাইতে গিয়া এই তিন প্রকার কঠোর বেদনায় মাকে আমার জর্জ্জরীভূত হইতে হয়। যখন মলিনতার আবরণে আবৃত হইতে হয়, তখন তিনি অসঙ্গ হইলেও আমরা বলিব, তিনি আমাদিগের জন্য বেদনা সহ্য করেন। বেদনার এই প্রকারত্রয় বিশেষ করিয়া দেখাইবার জন্যই মা এখানে “অজ,” “অব্যয়াত্মা” ও “ভূতানামীশ্বরঃ” এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ঠিক এই তিনটি গুণের বিপর্য্যয় প্রধানভাবে ঘটে বলিয়াই জন্মতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া, মা এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা যেন মনে থাকে।

জন্মগ্রহণের গুরু অন্তরায়সকল নির্দ্দেশ করিয়া, পরে সে সকল অন্তরায়কে কেন

উপেক্ষা করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং কি প্রকারে করেন, তাহাই পরপাদে বর্ণনা করিয়াছেন। কেন এমন ক্লেশ স্বীকার করি—কেন ক্ষুদ্র জন্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হই—কিসের দ্বারায় নিয়ন্ত্রিত হই—আত্মমায়া। আত্মমায়ার দ্বারা চালিত হই, মায়ায়—স্নেহময়ী মাতৃভাবের প্ররোচনায়—আত্মরতির ইচ্ছায়। জীব যে আমিই— এই আত্ম-ভালবাসা স্ফুরিত হয়—আর থাকিতে পারি না। অমনি জীবের জন্য বুক খুলিয়া, সাম্রাজ্ঞীত্ব বিসর্জ্জন করিয়া, জীবোদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হই। পুত্র-মুখ চুমিতে প্রাণে আকুল মায়ার বন্যা উথলিয়া উঠে, তখন স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবহৃদয়ে অথবা জগতে জাত হই। ব্যষ্টিভাবে জীব রক্ষা করিতে জীবের হৃদয়ে ইষ্টদেবতারূপে, সমষ্টি-ভাবে জীব-জগৎ রক্ষা করিতে অবতাররূপে আবির্ভূত হই।

কেমন করিয়া সম্ভূত হই? স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায়। নিজ প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠান করিয়া—নিজ প্রকৃতি বশীভূত করিয়া। তাঁহার নিজ প্রকৃতি বলিয়া কোন্‌টী? সমস্তই ত মায়েরই প্রকৃতি, তবে আবার নিজ প্রকৃতি বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিলেন? পরা বিদ্যা, পরা প্রকৃতি— যে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম—সেই প্রকৃতি। যে প্রকৃতিতে, তিনি মা—মায়াময়ী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি আহঙ্কারিক জীবপ্রসবিনী, জীবভূতা জগদ্ধাত্রী প্রকৃতি—যাহার কথা সপ্তম অধ্যায়ে পরে বলিবেন, সেই প্রকৃতি; জীব-প্রকৃতি নহে। অপরা বিদ্যা বলিয়া যাহা বর্ণিত অর্থাৎ আহঙ্কারিক সৃষ্টি যদ্দ্বারা সম্পাদিত হয়—যাহা বর্ণনা করিতে গিয়া সাংখ্যদর্শন কথিত, সে প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া নহে। "নিজত্ব"রূপ চেতনা, যাহা তাঁহার স্বরূপমহিমা—সেই মহিমাকেই পরাশক্তি বা পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। স্বাং প্রকৃতিং বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য।

কেন তিনি সেই নিজ প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হয়েন, তাহার দুইটি কারণ। প্রথম, দৃশ্যমান জীবকর্ত্তৃত্ব রক্ষা করিবার জন্য—লোকতঃ জীবের যে স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্বাধীনতা ব্যবহারত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। আমরা সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহার দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছি—পুত্তলিকাবৎ তাঁহারই ইচ্ছানুসারে বিবর্ত্তিত হইতেছি—অথচ যেন মনে হয়, আমরাই সব করিতেছি—আমরাই কর্ত্তা; এই যে স্বাধীনতা, ইহা অটুট রাখিবার জন্য। আপনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও আমাদিগকে এই স্বাধীনতার হাওয়ায় ফুটাইয়া তুলিতে তিনি এমনই অলক্ষিত ভাবে লুকাইয়া অবস্থান করিতেছেন—যেন কেহ কোথাও নাই! যেন আমরাই সব! আ মরি—আ মরি, লীলার কি অভিনব কৌশল! যদি সে থাকিয়াও এরূপ না থাকার মত না থাকিত, যদি প্রতি পদে স্বীয় সত্তা প্রকট করিত—তবে ভগবৎপ্রেমহীন ক্ষুদ্র জীবত্বপ্রিয় সাধারণ জীবসঙ্ঘের কি অবস্থা হইত! কত ভয়ে ভয়ে, কত সতর্কিতে, কত সঙ্কোচচিত্তে এ জগতে পদ বিক্ষেপ করিতে হইত। শাস্ত্র বলিয়া যে সকল বিধি-

নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই কয়টা মানিতে গিয়া আমরা কত অপদস্থ হইয়া পড়ি—কত বুঝিয়া পা বাড়াইলে তবে শাস্ত্রগণ্ডী উল্লঙ্ঘন করা হয় না। আর সাক্ষাৎ তাঁর সম্মুখে তৎপ্রেমহীন জীব, সর্ব্বনাশ! দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার সহিত এক ঘরে বসবাস করিতে সাধারণ জীব কি পারে! “ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ”—ইহাঁর সহিত একসঙ্গে চোখোচোখি বাস—তা কি সাধারণ জীব পারে! আর পারিলেও ভয়ে ভয়ে কি প্রেমক্রীড়া হয়—ভয়ে ভয়ে কি ভালবাসার আদান প্রদান হয়! তাই মা আমার এত লুকাইয়া থাকেন—ব্যবহারেতে জীবকে স্বাধীনবৎ রাখিয়া, ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় চুরি করিয়া, তাহার সহিত স্নেহরঙ্গ করিবার জন্য ইহা মায়ের অপূর্ব্ব কৌশল। তাই মা আমার আপনার ঘরে আপনি চোর! সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত বা জগতে অবতীর্ণ হওয়া, মায়ের এই লুকাইয়া থাকা—মায়ের এই দুর্লভতা—মায়ের এই অবাঙ্‌মনসগোচর ভাবে যেন নাই ভাবে থাকা—অধিকতর স্নেহময় লীলা। তোমরা মাকে চেন, মাকে মা বল—বুঝিবে, এই দুর্লভতায় তাঁহার অধিক মহিমা প্রকাশিত। কঠোর সাধনা করিয়া তবে তাঁহাকে পাইতে হয়, এ নালিশ যাহারা তাঁহাকে ভালবাসে নাই, তাহাদের; হৃদয়ে যতক্ষণ না মায়ের প্রতি আসক্তি জন্মায়, ততক্ষণ; হৃদয়বান্ হইলে আর এ নালিশ থাকে না।

যাহা হউক, আমরা এই বুঝিলাম, জীব-স্বাধীনতা পাছে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এই জন্য স্বীয় পরা প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া মা আমার জীব-হৃদয়ে লুক্কায়িতা থাকেন। জীবপ্রকৃতি অবলম্বন করিলে আপনাকে স্বীয় মহিমা বিস্মৃত হইতে হয়, সুতরাং সে অবস্থায় জীবোদ্ধার সংসাধিত হয় না। জীবভাব লইয়া এই ত জগৎময় রহিয়াছেন; ইহাতে বিশেষভাবে জীবোদ্ধারের কিছু উপযুক্ততা দেখিতে পাওয়া যায় না। হৃদয়ে যদি আমার গুণে ও শক্তিতে গুণশক্তিময় হইয়া দেখা দিতেন, তাহা হইলে আমার উদ্ধারের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেন না। আমাকে উদ্ধার করিতে আমাপেক্ষা বলবান্ বা শক্তিমানের আবশ্যক। তাই সে লুক্কায়িতা মা আবশ্যক অনুসারে জীবোদ্ধারের জন্য জীবের হৃদয়ে প্রকটিতা হন। তিনি ধীরে ধীরে জ্ঞানের আকারে, জ্ঞানময় রূপ ধরিয়া সাধকের হৃদয়ে পা বাড়াইয়া দেন। হৃদয়ে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞানের আলোকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রভাত, তদ্রূপ। এ কথা পরে বলিতেছি।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭

হে ভারত! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ অধর্ম্মস্য চ অভ্যুত্থানং ভবতি, তদা অহং আত্মানং সৃজামি।

ব্যবহারিক অর্থ।—যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়া থাকে, তখনই আমি দেহ ধারণ করি।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে ভগবান্ জীবের প্রতি স্বীয় ভালবাসা, এবং সেই ভালবাসার জন্য কি প্রকারে জন্মপরিগ্রহণ করেন, তাহা বিশদরূপে বলিয়াছেন। এখন জন্মের উদ্দীপক কাল নির্দ্দেশ করিতেছেন। ধর্ম্ম যখন গ্লানিযুক্ত হয়, এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়া থাকে, তখনই তিনি মায়াবশে জন্মপরিগ্রহণ করেন। ধর্ম্ম গ্লানিযুক্ত হওয়া ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়া এক না হইলেও প্রায় একই কথা। যেমন আলোকের অভাবে অন্ধকার স্বতঃসিদ্ধ, তদ্রূপ ধর্ম্ম গ্লানিযুক্ত হইলে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। ভগবান্ বলিতেছেন—অধর্ম্মের সেই অভ্যুত্থানসময়ে তিনি আত্মাকে সৃজিত করেন। কিরূপ প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া তিনি জন্মপরিগ্রহণ করেন, তাহা পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

তিনি আসেন, দুঃখের দাবানলে জীবজগৎ যখন দগ্ধ হইতে থাকে, জীবের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে যখন দিগন্ত কাঁপিয়া ওঠে, অভাবের তীব্র দংশন যখন জীবহৃদয়কে জ্বালাময় করিয়া তুলে, তখন তিনি আসেন। কিসের দুঃখ? কিসের আর্ত্তনাদ? কিসের অভাব? সুখের অভাবের নাম দুঃখ। যেমন ধর্ম্মের অভাবের নাম অধর্ম্ম, তেমনি সুখের অভাবের নাম দুঃখ। তেমনি ভাবের অভাবের নাম অভাব। সুখ কি! শ্রুতি বলেন—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং।" যাহা ভূমা, মহৎ, নিরতিশয়, তাহাই সুখ। আর সুখ কি? যাহা পরিজ্ঞাত হইলে, অন্য জ্ঞাতব্য থাকে না, অন্য দ্রষ্টব্য থাকে না, অন্য শ্রোতব্য থাকে না, তাহাই ভূমা সুখ। "সু" অর্থাৎ সুলভ বা সুপ্রকাশ "খ" অর্থাৎ আকাশ, ইহাই সুখ। আর "দুঃ" অর্থাৎ দুর্লভ "খ" বা আকাশ, ইহাই দুঃখ। অন্তরাকাশের ভূমা প্রকাশই ব্রহ্ম।

সেই ভূমা সুখের অভাবই দুঃখ। সেই ভূমা সুখই—অমৃত বা মা। যাহা অল্প সুখ, তাহাই অসৎ নামে অভিহিত। কিসের আর্ত্তনাদ? এই সুখের অভাববোধে যে ভাবসকল উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, তাহাই আর্ত্তনাদ। অভাব কিসের? এই ভূমা সুখহীনতার বোধ—অভাব। যখন আমরা জগতের চারি ধারে সার্ব্বভৌমিক সুখময়ী মূর্ত্তি দেখিতে না পাই, যখন আমরা পদার্থসকলের স্ব স্ব খণ্ডত্ববোধে, খণ্ড সুখে রত থাকি, এবং তাহাতে ভূমা সুখ না পাইয়া, প্রাণ কিছুক্ষণ পরে অতৃপ্তিময় হইয়া উঠে তখন জগতের চারি ধারে ভূমা সুখময়ী মূর্ত্তি না দেখিয়া, দুঃখময়ী মূর্ত্তি বোধ করি, জগৎকে—এ আনন্দ-বিলাস সৃষ্টিকে, আমরা নিরানন্দময় বলিয়া পরিদর্শন করি। সেই অবস্থাতেই আমরা, ধর্ম্ম গ্লানিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ করি। বস্তুতঃ ধর্ম্মের কখনও গ্লানি হয় না। ধর্ম্মপালনরূপ কার্য্যের গ্লানি হইতে পারে। ভূমা সুখ দর্শনের অভাব হইতে পারে, ভূমা সুখের অভাব হয় না। এবং সেই দর্শনহীনতা যে একটা অন্ধকার

ফুটাইয়া তুলে, তাহারই নাম অধর্ম্ম। অর্থাৎ আমরা তিনটী অবস্থা দেখিতে পাই, একটী অন্তরের সার্ব্বভৌমিক সুখময় স্বরূপ, সেইটি যত ক্ষণ আমাদিগের লক্ষ্য থাকে, তত ক্ষণ আমরা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ করি। দ্বিতীয়টী যখন আমরা সার্ব্বভৌমিক মূর্ত্তিতে দেখি না, সার্ব্বভৌমিকত্ব যখন বিচ্যুত হইয়া যায়, সেই অবস্থায় যে বিচিত্র স্বল্প সুখ বা খণ্ড সুখ বা বিষয় অন্তরে ভোগ করি, তাহারই নাম অধর্ম্ম বা স্বল্প ধর্ম্ম। এবং ভূমা সুখকে খণ্ড জ্ঞানে যে খণ্ড নাম ও রূপ দিয়া দেখি, আর সেই বিষয় দর্শনে বা বিষয় ভোগে একান্ত লালায়িত হইয়া, ভূমা সুখের সত্তা সম্যক্‌রূপে বিস্মৃত হইয়া, মাত্র বিষয়-দর্শন ও তৎপশ্চাৎ মোহাক্রান্তচিত্তে অনুধাবন, ইহারই নাম—অধর্ম্মের অভ্যুত্থান। যখন আমরা সর্ব্বত্র অন্তর্বাহ্যে তাঁহারই রূপ দর্শন করি, তাঁহারই অরূপ রূপ যখন এ বিচিত্র জগতের বৈচিত্র্য ঘুচাইয়া দিয়া, আমাদিগের সত্তাকে আপন সত্তায় মাখিয়া লয়, তখন আমরা ধর্ম্মময়। যখন তৎসত্তায় বিশ্বাস থাকিলেও তাহার কার্য্যকারিতা স্বল্পতর অনুভূত হয়, আমরা জগতের বিষয়-সকলকে স্বতন্ত্রভাবে তাঁহা হইতে পরিদর্শন করি—ইহা যে তাঁহারই স্বরূপ, এ কথা ভুলিয়া গিয়া, মাত্র বিষয় বলিয়া দর্শন করি এবং তদ্‌ভোগে অনুরক্ত থাকি বা স্থূল কথায় তাঁহার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হারাইয়া ফেলি। বিষয়ের বিষয়ত্বই চিত্তের উপর যখন আধিপত্য করিতে থাকে, তখন ধর্ম্ম গ্লানিযুক্ত বুঝিতে হইবে ; এবং এই গ্লানিময় অবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিষয়ের বিষয়ত্বে সম্যক্ প্রকারে মোহাচ্ছন্ন হইয়া, ভগবৎসত্তা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যাই ; এমন কি, হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলি, তখনই সেই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অধর্ম্ম অভ্যুত্থানের সময়েতেই মা আমার আসেন। সত্যদর্শন যখন না থাকে, সত্যপ্রতিষ্ঠায় জীব যখন প্রতিষ্ঠাপন্ন না হয়, প্রাণে বা হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠাবান্ হইতে জীবশক্তি যত দিন অভ্যস্ত না হইতে পারে, তত দিন জীব ধর্ম্মকার্য্য করিয়াও, প্রধানতঃ অধর্ম্মে অবস্থান করিতেছে বুঝিতে হইবে। চক্ষু যত দিন না অরূপকে চারি ধারে রূপময় দর্শন করিবে, শ্রবণ যত দিন ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পদার্থকে অন্তরেরই জ্ঞানময় শব্দময় রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইবে, যত দিন এ স্থায়িরূপে দৃশ্যমান জগৎকে শক্তির একটি প্রবাহ—তরঙ্গ বলিয়া না বুঝিবে, এবং সে শক্তি মনোময়ী প্রাণময়ী অন্তর্যামিনী বলিয়া না চিনিবে, যত দিন আঁখি ফিরাইতে মা চক্ষে উদ্ভাসিত না হইবেন, তত দিন আমরা আপনাদিগকে সত্যে, ধর্ম্মে, মায়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিব না। দেখ, একপাত্র দুগ্ধে ঈষৎমাত্র জল মিশ্রিত করিলে আমরা তাহাকে দুগ্ধরূপেই পরিদর্শন করি। তাহার দুগ্ধত্বই চক্ষে প্রতিফলিত হয়। এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড তদ্রূপ সত্য-প্রতিষ্ঠ পুরুষের চক্ষে মা বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রুতিতে আছে,—ব্রহ্মের ত্রিপাদ নির্ম্মল নিষ্কল ; এক পাদে এ নাম-রূপাত্মক জগৎ অবস্থিত মাত্র। যদি সাধারণ হিসাবে এই নাম-রূপাত্মক জগৎকে মিথ্যাই বলিতে হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের মত

ইহার ব্রহ্মত্বই প্রধান ভাবে, প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদিগের জ্ঞান-চক্ষে নিত্য উদ্ভাসিত হওয়া উচিত। ত্রিপাদ দুগ্ধে একপাদ জল মিশ্রিত থাকিলে, উহা দুগ্ধরূপেই প্রত্যক্ষীভূত হয়। তদ্রূপ ত্রিপাদ সত্যে, নিষ্কল ব্রহ্মে যদি একপাদ মিথ্যাবৎ মায়া বলিয়া কিছু মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলেও ব্রহ্মত্বই প্রত্যক্ষীভূত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু আমরা জগৎকে মাত্র জগৎ বলিয়াই দর্শন করি। মাতৃত্ব সাধারণতঃ তোমরা দেখিতে পাও না। ইহার কারণ, তোমরাই সেই জল বলিয়া—তোমরাই সেই মিথ্যাত্মক জগৎরূপে সাজিয়াছ বলিয়া। মিথ্যাজ্ঞানে হৃদয়কে ডুবাইয়া মিথ্যাদর্শী হইয়া আছ, তাই দেখিতে পাও না। আপনারা আপনাদিগকে অভ্যস্ত করিয়াছ, জগৎকে মিথ্যা বলিবার সংস্কারে আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ—সেই জন্য। ইহা যত দিন থাকিবে, সত্য-দর্শনে যত দিন অভ্যস্ত না হইবে, যাহা কিছু আমাদিগের ইন্দ্রিয় বহন করিয়া আনে, সে সমস্তই সত্য, সত্যে উদ্ভাসিত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত—সত্যের আলোকে প্রকাশিত—সত্যের দ্বারা সংঘটিত—সত্য উপাদানে বিনির্ম্মিত—এরূপ দর্শন যত দিন না হইবে, মাত্র মাতৃ-সত্তা সর্ব্বতোভাবে তোমাকে সমাচ্ছন্ন না করিবে, যত দিন পদার্থ দর্শনমাত্রে “নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে” এই চৈতন্যউদ্বুদ্ধ প্রণব তোমার সংস্কারের শীর্ষস্থানীয় না হইবে ও তোমার লক্ষ্য অন্তর্যামিনীতে না ফিরাইবে, তত দিন তুমি ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত নহ।

ইহাই ধর্ম্মময় অবস্থা। এই বোধের অভাবই অধর্ম্ম বা গ্লানিময় ধর্ম্ম। ধর্ম্মের গ্লানিময় অবস্থা ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে জীব যখন অভিনিবিষ্ট থাকে, তখন মা আসেন। জগৎ যখন ভগবদ্দর্শনশূন্য হয়—নাস্তিক্য-বুদ্ধিতে মনুষ্যসমাজ বা মনুষ্য-হৃদয় যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে—জীবনের বিরাট্ গতি, কর্ম্মের সুশৃঙ্খলাময় আবর্ত্তন ও বিরাট্ জগৎচক্রের সহিত আপন আপন সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া মনুষ্য যখন ইহজীবনকে সার বলিয়া বুঝিতে থাকে ও ইহকালিক স্বার্থে একান্ত অন্ধ হইয়া, শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম-শৃঙ্খলা উপেক্ষা করিয়া জগতে ছুটাছুটী করে—তখন মা আসেন, তখন আর তিনি থাকিতে পারেন না। মনুষ্যকুল জন্ম-কর্ম্ম-রহস্য ভুলিয়া, আপনার বিরাট্ জীবনগতি ভুলিয়া, সেই বিরাট্ জীবনপ্রবাহে কর্ম্ম-শৃঙ্খলার দ্বারা ক্রমোন্নতি বিস্মৃত হইয়া, যখন পশুত্বের দিকে নামিয়া পড়িতে থাকে,—তখন মা আসেন। মনুষ্যকুল পশুত্বাভিমুখী বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যখন জগতে সম্বন্ধশূন্য হয়—আপন আপন ঐহিক সুখের বশবর্ত্তী হইয়া, জগতে আত্মীয়তা রাখিতে সমর্থ হয় না—জগন্মাতা ত দূরের কথা, ইহজীবনের মানবী প্রসূতিকেও স্বার্থের দ্বারে ভুলিয়া পশুত্বের চরম পরিণতি দেখাইতে থাকে,—তখন মা আসেন। মনুষ্য ধর্ম্মে যত প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, ততই সে সমস্ত জগৎকে এক সম্বন্ধে আবদ্ধ বোধ করিয়া ত্রিভুবনই আপনার স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান করে—ত্রিভুবনবাসীকে আপনার আত্মীয় বলিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আর তাহারা যত পশুত্বমুখী হইতে থাকে, ততই সম্বন্ধের গতি সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। এমন কি, আপনার পিতামাতার

সহিতও সম্বন্ধচ্যুতি দেখিতে পাওয়া যায়। পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে এই সম্বন্ধ-বিজ্ঞান একটি চমৎকার লক্ষণ। পশুজগৎ সম্বন্ধশূন্য, যথার্থ মনুষ্যের ত্রিভুবনই আত্মীয়। মানুষ যত পশু হয়, ততই সে আত্মীয়তা হারাইয়া ফেলে। আত্মীয়তার প্রসার ও আত্মার প্রসার একই কথা; এই আত্মীয়তা যখনই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তখনই মা আসেন। আপনার সন্ততিবৃন্দের মধ্যে আসিয়া আবার সন্তানদিগের ভিতর সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেন। এক মায়ের পুত্র, এক বিরাটের অংশ, এক মহাজ্ঞান-সমুদ্রের তরঙ্গ বলিয়া, এক অদ্বিতীয় সত্তার আভাস জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নবজীবন দিয়া, নূতন করিয়া ঘর পাতিয়া মা চলিয়া যান। তাঁর এ আগমন বা অবতীর্ণ হওয়াকে আমরা স্থূলরূপে ভোগ করিতে পাই। ইহাকেই আমরা অবতারের আবির্ভাব বলি। শক্তিধর মনুষ্য-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া, তিনি জগতে সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া অধর্ম্মের গ্লানি ও অভ্যুত্থান রোধ করেন।

আর আসেন মনুষ্যের হৃদয়ে—যখন জীববিশেষের হৃদয় সত্যধর্ম্মের আভাস না পাইয়া জাগতিক বিষয়কে বিষয়মাত্ররূপে ভোগ করিতে করিতে তাহাতে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ও তাহার ফলস্বরূপ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, ত্রিতাপে জর্জ্জরীভূত হইয়া জগৎকে অন্ধকার দর্শন করে; এমনি কি, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এক দিকে জগৎকে অসত্য বলিয়া ধারণা করিয়া সত্য হইতে বঞ্চিত হয়—অন্য দিকে সত্যের আভাস না পাইয়া, ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ উভয় দিকে বিনষ্ট হইতে থাকে। কর্ণধারহীন তরণীর মত এ বিরাট্ ভবার্ণবে, তরঙ্গে তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত ও নিমগ্নপ্রায় হয়। সংশয়ে সন্দেহে প্রাণে গরলের কুম্ভ বহন করিয়া নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেই সময়ে মা আসেন। এ আগমন তাঁর জ্ঞানরূপে—বিদ্যারূপে। একটি ক্ষুদ্র জ্ঞান অর্জ্জন করিতে আমাদিগকে যে আত্মত্যাগ করিতে হয়, তাহা ভাবিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, এই ক্ষুদ্র জ্ঞানটি অর্জ্জন করিতে, অহো জীব! তোমাকে কত জন্ম অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে হইয়াছে। এ বিষয়-বৈচিত্র্যপূর্ণ সংসার—ইহা অন্তর্যামিনী মায়েরই অঙ্গের তরঙ্গ-ভঙ্গ, এই মহাজ্ঞান লাভ করিতে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের তুলনায় কত অসংখ্য অসংখ্য জন্মপ্রবাহ তোমাকে বিষয়াগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া দগ্ধীভূত হইতে হইয়াছে ও হইতেছে। জ্ঞান অতীব দুর্ল্লভ—তাই মাকে আমরা দুর্ল্লভা বলি। বিষয়বিশেষের মোহে মুগ্ধ হইয়া যখন আমরা তৎপশ্চাৎ ধাবিত হই ও তাহার মায়ায় অভিভূত হইয়া তাহাতে জড়াইয়া পড়ি, তখন তাহার অসারতা বুঝাইবার জন্য রোগ, শোক, বিচ্ছেদ ইত্যাদি নানাপ্রকার শাসন প্রেরণ করিয়া, মা উহার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইয়া দেন। এইরূপ ভোগ করিতে করিতে আমরা জগৎকে অকিঞ্চিৎকর বলিতে শিখি ও ক্রমশঃ বহু জন্ম ধরিয়া এই অকিঞ্চিৎকর বিষয়-সমুদ্র হইতে মাতৃমুখে প্রাণকে প্রবাহিত করিবার ইচ্ছা সঞ্চয় করি। এইরূপে কত শত জন্ম অতিবাহিত

হইবার পর, তবে আমরা মায়ের সর্ব্বব্যাপকতার আভাস পাইতে থাকি ; অন্তর্যামিনী মা-ই যে অন্তর্বাহ্য, এই জ্ঞানের সন্ধান পাইতে থাকি ও অবশেষে মায়ে অনুরক্ত হইয়া বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও মাতৃবক্ষে বা অন্তরে ব্রহ্মাণ্ড ভোগ করি।

যাহা হউক, মা জ্ঞানরূপে আসেন,—জ্ঞানময়রূপে আসেন। মনুষ্য-হৃদয় যখন অবিদ্যায় সম্যক্‌রূপে আচ্ছন্ন হয়—অনাচারে ধর্ম্মহীনতায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কঠোর ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইতে থাকে—দুঃখে ক্লেশে, আধি ব্যাধিতে প্রপীড়িত হইয়া, যখন অনুতাপে দগ্ধীভূত হইতে থাকে, তখন মা আসেন—জ্ঞানরূপে। প্রত্যেক কার্য্যের ফলস্বরূপ আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, উহা মা—উহাই ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রকটিত হয়—উহাই ব্রহ্মময়ীরূপে আমাদিগকে তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপে যুক্ত করিয়া লয়। জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে—জ্ঞানকে মা বলিয়া উপাসনা করিবে—জ্ঞানকেই তোমার আরাধ্য দেবতা বলিয়া নিত্য তাঁর সেবা করিবে। বস্তুতঃ এ ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আমরা পদার্থ বলিয়া যাহা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করি—উহা তাঁহার জ্ঞান মাত্র বা তিনি ঐরূপ জ্ঞানময়। তাঁহার জ্ঞানই পদার্থরূপে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। তিনি চন্দ্র সূর্য্য জ্ঞান করিতেছেন ; সেই জ্ঞানই চন্দ্র সূর্য্য আকারে আমরা দেখিতে পাই। আমরা আকাশ বলিয়া যাহা দেখি, উহা তাঁহারই আকাশজ্ঞানের বিকাশ। আমরা বৃক্ষ বলিয়া যাহা বুঝি, উহা তাঁহারই বৃক্ষজ্ঞানের বিকাশমাত্র। তাঁহার জ্ঞানময় স্বরূপই জগৎরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে। তাঁহার অন্তরের জগদ্‌বেদনই এ বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাসৃষ্টিবিকাশ। তুমি আমি তাঁহার একটি জ্ঞানমাত্র। আমরা তাঁহার হৃদয়ের এক একটি উপলব্ধিমাত্র। তাঁহার বহুত্ব লাভের ইচ্ছায় এ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড। আর যে একত্বের উপর বহুত্ব উপলব্ধ হইয়াছে, উহাও তাঁহার জ্ঞান বা স্বরূপ। উভয়ই বিদ্যা বা বেদন। যে বেদনে একত্ব উদ্বোধিত হয়, এক বলিয়া তিনি আপনাকে বুঝেন, শ্রুতি তাহার নাম দিয়াছেন বিদ্যা, আর যে বেদনে তিনি আপনাকে খণ্ডিত, স্বল্প ও বহু বলিয়া অনুভব করেন ও আত্মবিস্মৃত হন, তাহার নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা অর্থে বিদ্যাহীনতা নহে, স্বল্পবিদ্যা বা স্বল্পতাজ্ঞান। বহু হইলে সসীম বা ক্ষুদ্রজ্ঞান আইসে। সেই সসীমতা ও স্বল্পতা তাঁহার যে বেদনে অনুভূত হয়, তাহার নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা, অসৎ প্রভৃতি শব্দ, বিদ্যার হীনতা বা সত্যের হীনতা বা মিথ্যা জ্ঞাপন করে না। ঐ স্বল্পতাজ্ঞাপক।

যে বেদনে সত্যই খণ্ড খণ্ডরূপে বা বিষয়রূপে প্রতিভাসিত হয় ও আত্মত্ব ভুলাইয়া দেয়, তাহার নাম অবিদ্যা। যে বেদনে সত্যই এক অখণ্ডরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই বিদ্যা। সত্যের অভাব বা সংকীর্ণতা কোথাও হইতে পারে না বা হয় না। নাম ও রূপ যাঁহারা মিথ্যা বলেন, তাঁহারা মিথ্যাদর্শী। বেদান্ত মিথ্যাদর্শন শিক্ষা দেয় না। সত্যদর্শন শিক্ষা দেওয়াই বেদান্তের উদ্দেশ্য। পরিণামিবৎ দৃষ্ট হয়েন, নিত্য দৃষ্ট হইয়া থাকেন, ইহা মিথ্যা নহে। মিথ্যাদর্শীরা বলেন, তিনি পরিণামিবৎ দৃষ্ট হয়েন,

—ইহা নিত্য এবং সত্য হইলেও বস্তুতঃ তিনি যখন পরিণত হয়েন না—তখন ওই দর্শনটি মাত্র ব্যবহারিক সত্য, পরমার্থতঃ সত্য নহে ;—সুতরাং শুক্তিতে রজতদর্শনের মত মিথ্যা বা ভ্রান্তি। ইহা একান্ত অযুক্তি। ইহা ভাষ্যকারদিগের কথা, বেদান্তের বা বেদান্তের আশ্রয়স্থল শ্রুতির কথা নহে। ভ্রান্তি কার? তাঁহার ভ্রান্তি সম্ভবে না। যাহা জ্ঞানকৃত, স্বেচ্ছাকৃত, লীলার্থে প্রকটিত, তাহা ভ্রান্তি হইতে পারে না। যদি বল, এ ভ্রান্তি জীবের—তাঁহার নহে ; তিনি স্বেচ্ছায় জগৎজ্ঞান নিত্য করিয়া থাকেন, সেই জন্যই যখন আমাদিগের জীবত্ব বা জগৎজ্ঞান আমরা ভোগ করি, তখন ইহা জীবের কৃত নহে, তাঁহার কৃত না বলিবার উপায় নাই। বলিলে জীবকেই জগতের রচয়িতা বলিতে হয়। মিথ্যাদর্শীরাও ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ বলেন ; সুতরাং ভ্রান্তি বলা অযুক্তি। দ্বিতীয়তঃ এক বস্তুতে অন্য বস্তু দর্শন বা আরোপের নাম ভ্রান্তি। সর্পজ্ঞান যাহার নাই, তাহার রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতে পারে না। রজতজ্ঞান যাহার নাই, তাহার শুক্তিতে রজতভ্রম হইতে পারে না। আবার সর্প বা রজত না থাকিলে সর্প বা রজতজ্ঞান থাকিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মে নিশ্চয়ই নিত্য এ জগৎজ্ঞান বর্ত্তমান এবং সেই জ্ঞানই জগৎরূপে তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত, তাই আমাদিগের হৃদয়েও প্রতিভাত। অথবা আমাদিগের জীবভাবই তাঁহার সেই জ্ঞান। সুতরাং ইহা ভ্রান্তি হইতে পারে না। লীলার্থে তিনি ইচ্ছা করিয়া থাকেন, ওইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমরাও সেই জন্য ওইরূপ ব্যবহার করি, আমরাও সেই জন্য জগৎ দর্শন করি ; ইহাতে ভ্রান্তি স্বীকারের অবকাশ কোথায়? যদি বল, পরিণাম বস্তুতঃ যখন কোথাও নাই, অথচ পরিণামবৎ আমরা দেখিতেছি ; সুতরাং ভ্রান্তি। তাহা ভ্রান্তিপদবাচ্য নহে। পরিণামিবৎ পরিদৃষ্ট হওয়াই ইচ্ছা ; ওইটুকুই শক্তিমহিমা—মায়া, তাঁহার একাংশে নিত্য ব্যবহার। তাঁহার সেই ইচ্ছা বা জ্ঞানই আমরা দর্শন করি বা জ্ঞান করি, অনুভব করি। ভ্রান্তি শব্দ টানিয়া আনিয়া, জীবজ্ঞানকে ধান্ধায় নিক্ষেপ করিয়া, ভাষ্যকারেরা আপনাদিগের ভ্রান্তিরই পরিচয় দিয়াছেন।

বলিতে পার, ব্যবহারতঃ জগৎ আছে—ইহা আমরা স্বীকার করি ; তবে সেই ব্যবহারমাত্রকে পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া জ্ঞান করা—এইটুকু আমরা ভ্রান্তি বলি। তাহাও বলিতে পার না। কারণ, সেই ব্যবহারও যে পারমার্থিক। যদি আমরা এ ব্যবহারের কর্ত্তা হইতাম, তবে ভ্রান্তি বলিতে পারিতে। ওইরূপ হওয়াই পরমার্থের ইচ্ছা, সে ইচ্ছা অভ্রান্ত ; সুতরাং ভ্রান্তি নহে ; তবে সত্যের অংশ-দর্শন মাত্র। এই অংশ-দর্শন আমরা স্বীকার করি। আমাদিগের দিক্ হইতে ভ্রান্তি বলিতে হয় বল, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মের দিক্ হইতে ভ্রান্তি বলিতে পার না।

আর এক কথা। তোমরা ব্যবহারিক জগৎ স্বীকার কর, অথচ তাহার কারণস্বরূপ ব্রহ্ম-ব্যবহারটিকে পারমার্থিক সত্য বল ; ইহা একান্ত অসিদ্ধ। কার্য্য দেখিয়া কারণ

বিচার। কার্য্য যদি ব্যবহারিক মাত্র হয়, এবং সেই ব্যবহারিক কার্য্যকে যদি মিথ্যা বা ভ্রান্তিতে পরিণত কর, তবে সেই ব্যবহারিক কারণকেও ভ্রান্তিতে পরিণত হইতে হয়। কার্য্যরূপ জগৎ যখন ব্যবহারিক, তখন ব্রহ্মের ঈশিত্বও ব্যবহারিক। ব্যবহারতঃ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বস্বরূপ স্রষ্টা, সেটাও তাঁহার ব্যবহার মাত্র—এ কথা তোমরা না বলিতে পার না। এখন তোমরা সেই জগদ্ব্যবহারকে যদি বিচার করিয়া মিথ্যা বা ভ্রান্তি বল, তবে ব্রহ্মের সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক মহিমাকেও ভ্রান্তিপ্রসূ বলিতে হইবে। ঈশ্বরত্ব একটা ভ্রান্তিবিলাস মাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। সত্যের একটা ভ্রান্তি এই মহাজগৎচক্রের কারণ, ভ্রান্তিতে আমরা নিমগ্ন, ভ্রান্তিতে দেবতাবৃন্দ শক্তিধর সাজিয়াছে, ভ্রান্তিতে মনুষ্য, পশু পক্ষী মর্ম্মস্পর্শী যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে, ভ্রান্তি বিস্তার করিয়া যা আমার ঈশ্বররূপে বিরাজ করিতেছেন, সমস্ত ভ্রান্তিতে সংগঠিত—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দর্শন আর কি হইতে পারে? ঈশ্বরত্ব ভ্রান্তির লীলা, জীবত্ব ভ্রান্তি, ভ্রান্তিতে মহা-বিকাশময় সত্য আচ্ছন্ন, সত্যের সত্যবিকাশ বিলুপ্ত, মিথ্যা বিকাশে সত্য আচ্ছাদিত, সত্যের ঈশ্বরব্যবহার একটা ভ্রান্তি! কি ভয়ানক অন্ধকার! বেদান্তদর্শন—সত্য-দর্শনের জন্য। সেই সত্য দর্শন করিতে গিয়া, তোমরা ভ্রান্তি শব্দ টানিয়া আনিয়া, কি ভয়ানক ভ্রান্তিদর্শন সৃজন করিয়াছ! সত্যবাদ প্রচার করিতে গিয়া মিথ্যাবাদী হইয়াছ। মায়ার খেলা দেখিতে গিয়া ভ্রান্তির প্রহেলিকা গড়িয়া তুলিয়াছ। তোমরা ভ্রান্তি কথাটা ছাড়। ওই কথাটী টানিয়া আনিয়া চিন্তাশীল জগৎকে কি অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছ, ভাবিয়া দেখ।

দেখ, সত্যদর্শনের ফল—সত্যের অভাববোধের নাশ। সত্যের অভাববোধ না থাকাই মোক্ষের লক্ষণ। তোমাদিগের বিচার-ক্রম যে ভাবে ভ্রান্তি শব্দের ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে সাধারণ লোক ভ্রান্তির প্রতিষ্ঠাই লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। সত্যদর্শন সংঘটন দূরে থাকুক, প্রত্যক্ষ সত্যকেও ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, সত্যদর্শন হইতে বহু দূরে পিছাইয়া পড়িতেছে। তাহার অনিবার্য্য বীভৎস ফল, সত্যের অভাব সৃজন ও ক্রমশঃ বিষয়মোহাচ্ছন্নতা। কেন, তা বলি।

দেখ, উৎকৃষ্ট পদার্থের আস্বাদন পাইলে, নিকৃষ্ট পদার্থ কেহ ভোগ করিতে চাহে না। উৎকৃষ্ট ভোগের স্মৃতি নিকৃষ্ট ভোগে বীতরাগ করিয়া তুলে। কিন্তু উৎকৃষ্ট ভোগে বঞ্চিত জীব, নিকৃষ্ট ভোগে স্বচ্ছন্দে নিযুক্ত থাকে; তাহাতে তাহার কোন চিত্তবিকার ঘটে না। সেইরূপ সত্যভোগে অভ্যস্ত পুরুষের সত্যভোগই প্রিয়তর হয়, এবং ক্রমশঃ ভূমা সত্যভোগের দিকে তাহার গতি ছুটিতে থাকে। চিত্তবৃত্তি বলবতী হয় এবং সার্ব্ব-ভৌমিক সত্যসম্ভোগে তাহার প্রাণ দ্রুততর বেগে দিন দিন ধাবিত হয়। কিন্তু মিথ্যা-ভোগী পুরুষ, যাহারা বিষয় ভোগ করে অথচ তাহা মিথ্যা নিকৃষ্ট বলিয়া ধারণা রাখে, তাহারা সাধারণতঃ চিত্তের বল হারাইয়া ফেলে। কেন না, তাহারা মনে জানে, মিথ্যা

ভোগ করিতেছি, গরল পান করিতেছি, বিষে জর্জ্জরিত হইতেছি। ধারণাই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র রহস্য। অমৃত ধারণা কর—অমৃত লাভ করিবে, বিষ ধারণা কর—বিষ-জর্জ্জরিত হইবে। ধারণার এই রহস্য শিখাইবার জন্যই গীতার বুদ্ধিযোগ। অবশ্য কদাচ দুই একজন একান্ত বীর্য্যবান্ পুরুষ, জগৎ মিথ্যা—সুতরাং বর্জ্জন করিয়া, এই ভাবে যথার্থ ত্যাগী হইয়া, জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিতে সক্ষম হয় সত্য; কিন্তু তাহা সাধারণ অবস্থা নহে। সাধারণ অবস্থা—বিষয়ে অবস্থান। সেই বিষয়কে বিষ বলিয়া তুমি তাহার হৃদয়ের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়াছ, অথচ তাহার সে গৃহ হইতে বহির্গমন করিবার বল তাহার নাই। বল নাই বলিয়া ক্রমশঃ দ্রুততর বেগে তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিতেছে। সত্যের ধর্ম্ম মিথ্যা প্রকাশ ? কি ভয়ানক কথাই তোমরা জগতে প্রতিষ্ঠা করিতেছ।

সত্যের ধর্ম্ম—সত্য। তোমাদিগের মত, এই সকল ধর্ম্মমত—ধর্ম্ম-গ্লানির লক্ষণ—ধর্ম্মের নহে। তোমাদিগের এ দর্শনও সত্য; কেন না, সত্য ব্যতীত কিছু নাই। কিন্তু ওই খণ্ড সত্য একদেশগত; অবিদ্যাগত—সুতরাং গ্লানিময়। সর্ব্বাত্মবাদ, আত্ম-ক্রীড়াময় জগৎ—এ দর্শন সম্যক্‌ভাবে যত ক্ষণ না আসিবে, তত ক্ষণ সর্ব্বপ্রকার দর্শনই গ্লানিময় বুঝিতে হইবে। আর এইরূপ দর্শনের ধূমাচ্ছন্ন নির্জীবতা, দিন দিন জগৎকে নির্জীব করিয়া তুলিতেছে ও তুলিবে। সরল সত্যকে জটিল করিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিবে। ধর্ম্ম গ্লানিময় করিয়াছে ও করিবে এবং মায়ের আসিবার প্রয়োজন বাড়াইয়া দিবে। হায় হায়! তোমাদিগকে বদ্ধকরে মিনতি করি, তোমরা ভ্রান্তি, মিথ্যা, এই কথাগুলি ছাড়। জীবের অমৃত জীবকে পান করিতে দাও। সত্যামৃতপানে জীবকে মগ্ন হইতে দাও।

দেখ,—নদী একটি জলপ্রবাহ। বস্তুতঃ নদীর যে জল-সম্ভার এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখে দেখিতে পাই, পরমুহূর্ত্তে আর সেখানে থাকে না, অন্য জলপ্রবাহ আসে; এই ভাবে দেখিলে বস্তুতঃ আমরা নদী বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু দেখিতে পাই না—জল ব্যতীত আর কিছু খুঁজিয়া পাই না—ইহা সত্য; কিন্তু একটু ব্যবহার পাই, একটা শক্তিময় প্রবাহব্যবহার পাই এবং তাহাই আমরা নদী বলি। এ ব্যবহার মিথ্যা নহে; যেমন একটী কাষ্ঠখণ্ডের এক প্রান্ত প্রজ্বলিত করিয়া লইয়া, তাহাকে দ্রুতভাবে সঞ্চালিত করিতে থাকিলে, মাত্র একটি অগ্নিরেখা দেখিতে পাওয়া যায়; সে অগ্নিরেখায় বস্তুতঃ অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছু পদার্থ না থাকিলেও একটা শক্তিময় প্রবাহরেখা বুঝিতে পারি, একটা রেখা-ব্যবহার পাই, এই নদীবৎ প্রবাহকে বা রেখাবৎ প্রবাহটিকে মিথ্যা বা ভ্রান্তি বলিতে পার না; পরিণামী বলিতে পার, কিন্তু ভ্রান্তি বলিতে পার না। অথবা তোমাদিগেরই দৃষ্টান্তানুসারে বলি, বস্ত্রখণ্ড যেমন তুল্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহার বস্ত্র-ব্যবহারকে যেমন ভ্রান্তি বলিতে পার না, তদ্রূপ

জগৎ বলিয়া ব্রহ্মাতীত কিছু না থাকিলেও তাঁহার ইচ্ছাপ্রবাহকে, তাঁহার জগদ্ব্যবহারকে ভ্রান্তি বলিতে পার না। ইহা তাঁহার শক্তি, ইহা সর্ব্বপ্রকার হইতে পারে। অপরিণামিরূপে প্রত্যক্ষীভূত হওয়াও যেমন তাঁহার শক্তি, পরিণামিরূপে ব্যবহার প্রকাশ করাও তদ্রূপ তাঁহার শক্তি। উভয়ই তাঁহার ধর্ম্ম এবং এ উভয় ব্যবহারেরই সারবত্তা সমান। দেখ, অপরিণামিত্বও একটি ভাববিশেষ, একটি ব্যবহারবিশেষ; সুতরাং উহাকেই তাঁহার একমাত্র লক্ষণ বা চিহ্ন বা লিঙ্গ বলিতে পার না। সর্ব্ববিশেষণময়তা, সর্ব্বব্যবহারময়তা, আবার সর্ব্ববিশেষণশূন্যতা, সর্ব্বব্যবহারশূন্যতা, এ সকলই তাঁহার স্বরূপ। পরিণাম ব্যবহারময় অবস্থা বা অবিদ্যাময় স্বরূপ, অপরিণাম ব্যবহারময় অবস্থা বা বিদ্যাময় স্বরূপ, সর্ব্বব্যবহারশূন্যতা বা মাত্র আত্মস্বরূপ—এ তিনই নিত্য, সত্য, পারমার্থিক। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পরিণামময় রূপ গ্রহণের কৌশল ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা মাত্র। ব্যক্ততা ও অব্যক্ততার পরিমাণের বিভিন্নতাই মাকে পরিণামময়ী করিয়া ফুটাইয়া তুলে। ইহা ভ্রান্তি নহে। দ্রষ্ট্রীর দৃষ্টিশক্তি অবিনাশী নিত্য। বিশ্ব তাহারই ব্যক্ততার নামান্তর—মিথ্যা নহে।

তবে কি এই জগদ্ভোগকেই লইয়া থাকিব? তাহা নহে, খণ্ড সত্য হইতে মহৎ সত্য লাভের জন্য ব্যস্ত হইবে। খণ্ড সত্য সাহায্যে মহৎ সত্যের আভাস হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সেই মহৎকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মহত্ত্বের জন্য জীবনের বিস্তারাভিমুখী গতিকে স্বভাবসিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। দাতার দান গ্রহণ করিয়া যেমন প্রাণ স্বতঃই দাতার উপর অনুরুক্ত হয়, তদ্রূপ হইতে হইবে। এইরূপে মহৎসত্তার সংস্কার দৃঢ়তররূপে হৃদয়ে চিহ্নিত হইলে, তখন ক্রমশঃ এ জগতের জগত্ত্ব আর চক্ষে ভাসিবে না। অন্নভোগীর লক্ষ্য ভোজনকালে যেমন আস্বাদনের তৃপ্তিতেই বদ্ধ থাকে, অন্নের রূপ ও নামে বড় থাকে না, তদ্রূপ জীব ব্রহ্মভোক্তা হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সে নাম ও রূপ যে উড়িয়া যায়, তাহা নহে।

এত কথা বলিবার এখানে আবশ্যকতা—শ্লোকস্থ "ধর্ম্মগ্লানি" শব্দটি বুঝান। গ্লানি অর্থে বিকাশের হানি, বিকাশের অবরোধ; বিকাশের একান্ত অভাব নহে। ভ্রান্তি, মিথ্যা আদি শব্দে বিকাশের সেই হানি সংঘটিত করে, ধর্ম্মগ্লানি সৃজন করে এবং তাহাই অধর্ম্মের অভ্যুত্থানরূপে প্রকাশ পায়। এই সামান্য মিথ্যার কাল্পনিক ছায়া ক্রমশঃ গভীর অন্ধকারে জগৎচিত্ত আচ্ছাদিত করিয়া অজ্ঞানতার ঘনঘটা বিস্তার করে। সর্ব্বরূপে প্রকাশশীল এবং সর্ব্বরূপে উপলব্ধ মাকে সুদূরে সংশয়-মেঘের পশ্চাতে অপসৃত করে, অমৃতময় মাতৃস্নেহকে বিষময় বিভীষিকার বিকট উল্লাসরূপে পারচালিত করে, মাকে রাক্ষসী করিয়া তুলে। উপনিষদ্ বা বেদান্ত ইহার আভাস মাত্রও দেয় না। ইহা দ্বারা উপনিষদের প্রচার হয় নাই—উপনিষদের উপর খড়্গাঘাত করা হইয়াছে। মাতৃস্নেহ ভোগ না করিলে মাতৃমোহে প্রাণ আচ্ছন্ন হইতে পারে না। মাকে স্নেহ-মহিমময়ী

বলিয়া না চিনিয়া তাঁহার মহত্ত্বে প্রাণ যে ডুবাইয়া দেওয়া যায় না। মাতৃলাভ প্রাণের ধর্ম্ম, সাধনা প্রাণের ধর্ম্ম, ব্রহ্ম হওয়া, ব্রহ্মত্ব লাভ করা, আত্মদর্শী হওয়া, এ সমস্ত প্রাণের ধর্ম্ম—মনের নহে। হে ভ্রান্তিবাদী বা মিথ্যাবাদী বৈদান্তিক! তোমাদিগের ব্রহ্ম যদি এমনই হয় যে, তাঁহার স্বভাব বিভীষিকা-উৎপাদক, তাঁহার বিকাশ মরীচিকা-তুল্য তৃষিতের প্রাণনাশী, তাঁহার ব্যবহার—ছলনা, ক্রূরতা, কুটিলতা, তাঁহার চরিত্র—প্রহেলিকাময়, তাঁহার শক্তি শুধু বঞ্চনাময় মর্ম্মস্পর্শী; যদি এ বিচিত্র জগদ্ব্যবহার, যাহাকে তোমরাও তাঁহার স্বভাব বা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য এবং করিয়া থাক, এ জগদ্ব্যবহার বা জগৎ যদি শুধু আর্ত্তনাদের লীলাভূমি হয়, যদি কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল হয়, তোমাদিগের উদ্ভট ক্রীড়া বা রঙ্গ-রসময় সে পুরুষকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করি। তিনি জগৎকারণ, জগতের উপাদান, এ কথা আমরাও মানি; তাঁহার নির্গুণ স্বরূপে আমরাও সংসার-মূল প্রতিষ্ঠা করি, তাঁহার বিচিত্র জগদ্ব্যবহারকে আমরাও তাঁহার স্বভাব বা শক্তি বলি। আবার দাহিকা-শক্তিশূন্য যেমন অগ্নি হয় না, তদ্রূপ এ জগদ্ব্যবহারশূন্য ব্রহ্ম হইতে পারে না, ইহা তোমরাও স্বীকার কর। তবে, এ ব্যবহারটী দর্শনে তোমরা তাহাতে মিথ্যার একটা মিথ্যা আবরণ আনিয়া চাপা দিয়া কেন দেখ? কেন অমৃতময়, সর্ব্বরূপসৌন্দর্য্যময়, সর্ব্বভাবময়, পূত সহৃদয়তাময়, দয়াময়, স্নেহময়, করুণাময়, পুণ্যময়, জ্ঞানময়, হৃদয়ের আনন্দপ্রদানময়, হাস্যময়, আলোকময় এ অপূর্ব্ব ভোগতৃপ্তির এ লীলাকে, এ লীলাময়ী মাকে,—মৃত্যুময়, অন্ধকারময়, কঠোরতা-ময়, বিভীষিকাময় করিয়া দেখ? পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার, এই ঊনবিংশ দ্বার দিয়া যিনি নিত্য প্রকাশিত, যাঁহার সত্য ও অমৃতালোক নিত্য হৃদয়কে আলোকিত করে, ভ্রান্তিশব্দরূপ সংকীর্ণ ভাব-অন্ধকারে এই ঊনবিংশ দ্বার আলোকশূন্য করিয়া কেন মিথ্যা ও মৃত্যুর অবসাদ জীবের বুকে জাগাইয়া দাও? যাহা নাশ করিতে তোমাদিগের মতপ্রতিষ্ঠা, অসাবধানতাবশতঃ তাহাই পরি-বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছ। ইহাতেই ধর্ম্মগ্লানি সৃজন করা হইতেছে; উপনিষদের সত্য-দর্শনকে আচ্ছাদন করা হইতেছে। চক্ষু বদলাও—মাকে দেখ। স্নেহের নির্ঝর, করুণার আধার, দয়ার প্রস্রবণ, প্রেমের সমুদ্র, সেই আনন্দময়ী মাকে দেখ। ভুলের খেলায় ক্রমোন্নতি থাকে না। ভুলের খেলায় শৃঙ্খলতা থাকে না, সত্যের খেলা ভ্রান্তিময় হয় না।

আবার বলি, মাকে দেখ। যে মা প্রাণের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, স্পন্দিত হইয়া কালরূপ ব্যাপকতা প্রকাশ করিয়াছেন, আবার ক্রীড়ার জন্য মনোরূপ ব্যাপ্তি বিস্তার করিয়া, তাহাতে প্রেমে বিগলিত ক্রীড়োন্মত্ত রহিয়াছেন, সে মাকে দেখিতে আয়াসের আবশ্যকতা নাই। সরল সত্য ধ্রুব বিশ্বাসে প্রাণকে পূর্ণ করিতে চেষ্টা কর। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, যখন এই জগদ্ব্যবহার পারমার্থিক, তখন ইহাতেই মগ্ন থাক। ইহা অসৎ অর্থাৎ স্বল্প সত্য, মিথ্যা নহে। স্বল্প সত্য অর্থে

সত্যের স্বল্পতারূপ মহিমময় বিকাশ। তোমরা সে স্বল্পতারূপ সত্য ভোগ করিয়া, মহত্ত্বরূপ মহাসত্যের জন্য লুব্ধ হও—ইহাই মায়ের উদ্দেশ্য, এবং ইহাই আমার বক্তব্য। মাকে দেখ। সর্ব্বত্র যাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সর্ব্বত্র তাঁহাকে দর্শন কর। মিথ্যা, ভ্রান্তি, কথাগুলি ছাড। বুদ্ধিযোগের সাহায্যে সত্যপ্রতিষ্ঠা কর। প্রাণহীন, চৈতন্যহীন বলিয়া যে জগৎকে নিত্য দর্শন করিয়া, আপনার প্রাণহীনতা ও চৈতন্যহীনতার পরিচয় দিতেছ, সেই জগৎকে প্রাণময়, জীবন্ত চৈতন্যময়, স্নেহ-লীলাময় বাঞ্ছাকল্পতরুরূপে দর্শন করিয়া আপনি প্রাণময়, চৈতন্যময়, সত্যময় হও। যে পরিমাণ সত্য দর্শন করিতে সমর্থ হইবে, সেই পরিমাণে আপনি সত্যময় হইবে, সেই পরিমাণেই সত্য লাভ করিবে। ওইরূপ সত্য দর্শন করা সত্যলাভের উপায় মাত্র নহে, ওইরূপ দর্শন করাই সত্যলাভ। এ সত্যপ্রতিষ্ঠা সামান্য মাত্র করিতে সমর্থ হইলেও মহামৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। ইহার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহা শ্রুতিবাক্য,—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥" গুরুমুখে এ সত্যপ্রতিষ্ঠা শিক্ষা কর। আমাদিগের আচমন হইতে এ সত্যপ্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। আচমন যাহা করি, তাহা এই সত্য-দর্শন, সত্য-প্রতিষ্ঠা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আচমনের অর্থানুধাবন করিলে ইহা বুঝিতে সমর্থ হইবে। আচমন হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু আমরা করি, সমস্তই এই সত্য-দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া।

মা বলিতে বিচার বিতর্ক, সন্দেহ সংশয়, স্থূল সূক্ষ্ম নিরাকরণ করিতে গিয়াই ধর্ম্মগ্লানি প্রকটিত হয়, এবং সেই গ্লানি হইতে আবার সত্যকে প্রকাশময় করিতে মাকে আমার রূপ ধরিয়া বিশিষ্টভাবে অবতীর্ণ হইতে হয়। সে অবতরণ সহজ নহে, সে অবতরণ অরিদলনমূর্ত্তিতে, দণ্ডদাতা রাজস্বরূপে। সে অবতরণের উদ্দেশ্য পরশ্লোকে ভগবান্ ব্যক্ত করিতেছেন।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮

সাধূনাং পরিত্রাণায়, দুষ্কৃতাং বিনাশায়, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ অহং যুগে যুগে সম্ভবামি।

ব্যবহারিক অর্থ।—সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিতে, দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করিতে এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে ভগবান্ বলিলেন, ধর্ম্ম যখন গ্লানিযুক্ত হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন আমি জন্মগ্রহণ করি। এ শ্লোকে বলিতেছেন, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করিবার জন্য এবং ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ইহা হইতে আমরা এই তাৎপর্য্য পাই যে, যখন ধর্ম্ম গ্লানিযুক্ত হয়

এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন সাধুরা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন, দুষ্কৃতদিগের প্রতাপ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাশূন্য হইয়া পড়ে। সাধুদিগের বিপদ্ কি ? সাধুতার বিকাশ হ্রাস হইয়া যায়। সাধুতার বিকাশ— ভগবৎমহিমাবিস্তার। ভগবৎমহিমা উপলব্ধিতে আসাই সাধুতার বিকাশ। দুষ্কৃতি পরিবর্দ্ধিত হইলে ভগবৎমহিমা উপলব্ধ হয় না। এ অনন্ত মহিমময় ব্রহ্মাণ্ডবিকাশ, অচিন্ত্য অপার শক্তির এ হৃদয়স্তম্ভী লীলা-ভঙ্গ, মাতৃ-ইচ্ছাশক্তির অপরিমেয় আবর্ত্তন, আনন্দময়ীর আনন্দবিলাস-মাখা স্নেহ-দ্রবময় হৃদয়ে জীবমণ্ডলীর জাগরণ, বিহার, নিদ্রা ও ক্রমশঃ বিজিতনিদ্র মুক্ত অবস্থা প্রাপ্তি, ভোগময়ী মহামায়ারূপে বিকশিত হইয়া নির্গুণের গুণময় ভাবময় চাঞ্চল্য, অরূপের রূপময়ী অপরূপ মূর্ত্তিপ্রকটন, অনন্ত স্নেহ, প্রেম, প্রীতির মোহমদিরাসক্ত চাঞ্চল্যময় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রসব করিয়াও তাহার মধ্যে আবার সরল উদাস শিশুবৎ সাক্ষিস্বরূপ নগ্ন প্রকাশমাত্ররূপে অবস্থান—এ সকল মাতৃমহিমা দুষ্কৃতির পরিবর্দ্ধনে আর অনুভূতিতে আসে না। এই সকল মহিমাদর্শন হ্রাস হওয়ার নামই—সাধুতার বিকাশহানি। মাতৃমহিমাভোগে অধিকারী হওয়ার নামই সাধুতা। সর্ব্বত্র স্বপ্রকাশ মাতৃদর্শনের নামই সাধুতা। এই জগৎকে মায়ের স্নেহানন্দময় ব্যবহার বা হৃদয়ের বেদন বলিয়া অনুভব করাই সাধুতার পরিচয়। সর্ব্বত্র আবরণহীন, সরল সত্য যখন জীবের হৃদয়ে থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন হইতে সেই জীব সাধুপদবাচ্য হয়। ধর্ম্ম যত ক্ষণ গ্লানিযুক্ত থাকে, তত ক্ষণ এ সত্যদর্শন সংঘটিত হয় না। জগৎকে ভ্রান্তি বলিয়া দর্শন অথবা মা হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া উপলব্ধি—এ সমস্তই ধর্ম্মগ্লানির লক্ষণ। এই সমস্ত গ্লানি অভ্যুত্থিত হইলে ক্রমশঃ মা দূর হইতে দূরান্তরে অন্তর্হিতা হয়েন। জগৎকে মিথ্যাজ্ঞানে দর্শন সূচনা করিয়া নানাপ্রকার বাদের ভিতর দিয়া জীব শেষে এমন অবস্থায় আসে, যখন মাকে জীব আর খুঁজিয়াই পায় না। চারি ধারে এ অপূর্ব্ব মাতৃবেদনে পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও জীব মাতৃসত্তায় সন্দিহান হয়। এ জগতের কোন যে চৈতন্যময় মূল কারণ আছে, তাহাই জীব ধারণায় আনিতে পারে না। চৈতন্য হইতে জগৎপ্রকাশের সুর-সকল হারাইয়া ফেলিয়া, জগৎকে যেন নিত্য মৃত একটি জড়সত্তা মাত্র বলিয়া অথবা মিথ্যামূলক বলিয়া বোধ করে। যে বেদনে নিজে জীবরূপে বাঁচিয়া থাকে, যে বেদনে জীবিত বলিয়া আপনাকে অনুভব করে, সেই বেদনই অনুভবে আনিতে পারে না। চারি দিকে মাত্র জড় দর্শন করিতে করিতে, আপনাদিগের হৃদয়কে সঙ্কুচিত, ক্ষুদ্র ও জড় করিয়া ফেলে। তীক্ষ্ণ মেধা ও কূট বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে যদিও কখন কখন জীব জড়ত্ব দূর করিতে প্রয়াস পায়, মিথ্যাজ্ঞানের ঘন সংস্কারে সে চেষ্টা বৃথা হয়। সত্যদর্শনে অভ্যস্ত না হইলে জীবের এ জড়ত্বপরিণাম ঘুচে না। সাধারণ জীব-সমষ্টির এইরূপ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় সাধুরা, সত্যদর্শী পুরুষেরা একান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া, তাঁহাদের সত্যদর্শনের অপূর্ব্ব মহিমাগাথা জগতের সাধারণ

জীব-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া, প্রায়শই জগতে লাঞ্ছিত হন। এবং নির্জীব, নিস্তেজবৎ অবস্থান করেন। জীবন্ত জগৎদর্শন না করিলে, আপনি জীবন্ত হওয়া যায় না। জগদাবর্ত্তনকে চৈতন্যময় লীলাবিলাস না দেখিলে চৈতন্য স্ফুরণ হয় না। সুতরাং ধর্ম্ম গ্লানিযুক্ত হইলে সত্যদর্শন বা সাধুতাও গ্লানিযুক্ত হয়। ধর্ম্মের গ্লানি ও সাধুতার গ্লানি একই কথা, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

এই সাধুতা বা সত্যদর্শন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মা আবির্ভূতা হয়েন। সত্যদর্শনরূপ জ্ঞানরূপে জীবমাত্রের হৃদয়ে, এবং সত্য-প্রদর্শক বিশ্বরূপপ্রকাশক অবতাররূপে জনসঙ্ঘের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, মা জীবোদ্ধার-লীলায় রত হয়েন। এই সত্যদর্শন হইলে জীব-হৃদয়ে দুষ্কৃতিসকল এবং জীবসঙ্ঘের দুষ্কৃত পুরুষসকলের বিনাশ সংসাধিত হয়। ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। একটি সজীব সত্তার অঙ্গচাঞ্চল্য বা ভাবতরঙ্গ বলিয়া জগৎকে সত্যদ্রষ্টার উপলব্ধি হয়। সত্যের আলোকে দিক্‌সকল পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ভ্রান্তি, জড়ত্ব, চৈতন্যহীনতা প্রভৃতি জ্ঞানাকাশের কুজ্ঝটিকাজাল অন্তর্হিত হইয়া আনন্দ-ঘন-চৈতন্যময় জগৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জগৎ মিথ্যা—এই জ্ঞান হইতে সূচনা করিয়া, নাস্তিকতা অবধি যে গ্লানি সাধারণ জীব-হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহা বিদূরিত হয়। দুষ্কৃতি তিরোহিত হওয়া, দুষ্কৃত পুরুষ অন্তর্হিত বা অদৃশ্য হওয়া—ইহাই "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" এই বাক্যের প্রকৃত ভাব।

পতিতোদ্ধারিণি মা! তোমার বাক্যের এই তাৎপর্য্যই সত্যদর্শনের চক্ষে দেখিতে পাই। নতুবা সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিবে, দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করিবে—এরূপ সাধারণ অর্থমাত্র গ্রহণ করিলে তোমার মহিমায় আঁচ লাগে। সাধুর পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য তোমার আসিবার তত আবশ্যকতা কি? সাধুরা আপনা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, দুষ্কৃত আপনা হইতেই বিনষ্ট হইতে পারে—তাহার জন্য তোমার বিশেষ ভাবে আবির্ভাবের আবশ্যকতা কি? উহা ত তোমার কর্ম্মবিজ্ঞানের চিরন্তন নিয়ম। অবশ্য বিশেষভাবে সেই সাধারণ নিয়মকে প্রকটিত করিতে আসিলেও আসিতে পার, তোমার আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে আমরা তোমার তত মহিমা দেখি না। তোমার আগমনে লোকতঃ ঐরূপ সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশ পরিদৃষ্ট হইলেও, উহা স্থূল, ক্ষুদ্র দর্শন—উহার অভ্যন্তরে তোমার অপূর্ব্ব মহিমময় ব্যবহার দেখিতে পাই এবং তাহাই তোমার আবির্ভূত হইবার প্রধান কারণ। সে কি? দুষ্কৃতের বিনাশ নহে—উদ্ধার। দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য তুমি আস নাই—দুষ্কৃতকে বিনাশ করিতে যদি তুমি আসিবে মা—তবে দুষ্কৃতসঙ্কুল জগতে পতিতোদ্ধারিণী নাম প্রচারিত হইল কেন? কোটি কোটি দুষ্কৃত সন্তান শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণা মা বলিয়া তোমায় আবহমান কাল ডাকিয়া আসিবে কেন মা? পতিতকে বিনাশ করিতে যদি তুমি আস, তবে তোমার নাম করিতে কোটি কোটি দুষ্কৃত সন্তানের নয়নে

অশ্রুপ্রবাহ কেন বহে মা? পাপ-সঙ্কটে আসিয়া, পাপপঙ্কিল পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া যদি তুমি স্নেহাঞ্চলে তাহার ম্লান মর্ম্ম মুছিয়া না দিতে, তবে দুষ্কৃতের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া মা নাম কি ফুটিত? মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, দুষ্কৃত আমরা যদি তোমার প্রাণস্পর্শী স্নেহের আস্বাদন না পাইতাম, তবে তোমায় মা বলিয়া কে ডাকিত? দুষ্কৃতের বিনাশক যদি তুমি, দুষ্কৃতের সমুদ্ধর্ত্তা তবে কে? হত্যাকারী যদি তুমি—তবে রক্ষাকারী কে? দণ্ডবিধায়িনী যদি তুমি, তবে দণ্ডাপহারিণী কে? শাসনময়ী যদি তুমি, স্নেহময়ী তবে কে? সাধকের জননী যদি তুমি, সাধনহীনের মা কে? রাজার মা যদি তুমি, ভিখারীর মা কে? দুষ্কৃতের উদ্ধারের জন্যই যুগে যুগে আস, দুষ্কৃতোদ্ধারের জন্যই মানবদেহ ধারণ কর, দুষ্কৃত উদ্ধারই তোমার ধর্ম্ম—উহাই তোমার মহিমা—উহাই সাধক-হৃদয়ের চিরন্তন আশ্বাস-বাণী—তবে আজ এ কি নূতন কথা শুনাইলে? "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" বলিয়া আজ কি কঠোর হতাশের অন্ধকার ঢালিয়া দিলে? সন্তানের কর্ম্ম বিচার করিয়া দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করা, ইহাই যদি তোমার একমাত্র ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে স্নেহদয়া-করুণামণ্ডিতা মাতৃরূপে তোমায় হৃদয়ে কেহ স্থান দিত না। তোমার নামে জীব শঙ্কিত, ভীত, সন্ত্রস্ত হইত। আবেগে, উচ্ছ্বাসে, আশ্বাসে জীব-প্রাণ পরিপূরিত হইত না। তোমার নামে জীব-হৃদয় ভীতিপ্রকম্পিত হইত, তোমার শরণে জীব উচ্ছ্বাসহীন হইত। আনন্দের অশ্রুজল এ মর জগতে খুঁজিয়া পাইতাম না। দুষ্কৃতকে বিনাশ করিবে, সাধুকে পরিত্রাণ করিবে—তোমার এ মহিমা স্থিত-প্রজ্ঞ, সত্যপ্রতিষ্ঠ পুরুষের নিকট আনন্দদায়ক হইতে পারে; কিন্তু দুর্ব্বল পাপপীড়িত স্বল্পবয়স্ক শিশু জীব আমরা—আমাদিগের কণ্ঠ এখন মাতৃনাম উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করে নাই, আমরা তোমার সে মহিমা বুঝিতে পারি না। যে যাহা বলে বলুক, সত্যদর্শনের সাহায্যে যত আমরা দেখি, ততই আমরা তোমার স্নেহার্দ্রা অভয়া মুর্ত্তিই দেখিতে পাই। অংশদর্শী দর্শনের চক্ষে তুমি যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারিত হও, তোমার সত্তাকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভিতর যতই কঠোর দৃঢ় করিয়া বাঁধুক, সে সমস্তকে নিমজ্জিত করিয়া এক অনাবিল স্বাধীন স্নেহময় উচ্ছ্বাসে তোমায় পরিপূর্ণ দেখিতে আমরা সত্য-দর্শনের ফলস্বরূপ পাই। সে স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করিতে দিতে আমরা তোমায় প্রায়শঃই দেখিতে পাই। তোমার সে স্বাধীন স্নেহোদরতার প্রকাশের স্তরগুলিকে খণ্ড খণ্ড পৃথক্ দর্শন করিতে গিয়াই দার্শনিকেরা তোমায় খুঁজিয়া না পাইয়া, কঠোর নিয়মরাশিমাত্র আবিষ্কার করে; তোমার সত্য-স্বরূপকে প্রাণময় বাঞ্ছাকল্পতরুমুর্ত্তিতে না দেখিয়া, স্বাধীন উচ্ছ্বাসময় না দেখিয়া, কঠোরতাময় পরিদর্শন করে। আমরা জানি, যে তোমার স্বাধীন ব্যবহার, স্বাধীন বেদন, সর্ব্বভাবে সর্ব্বব্যাপী স্বাধীন সত্তার যে মাত্রায় ভোগী হয়, সে সেই মাত্রায় তোমায় স্নেহাবেশময়ী বলিয়া উপলব্ধি করে এবং সেই জন্য তোমায় "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" অর্থের মধ্যেও সেই স্নেহের প্রকটন দেখিতে পাই। বিনাশ অর্থে অদৃশ্য করা। কোরক ফুটিয়া যেমন কুসুম

হয়, জীবের হৃদয়ের দুষ্কৃতকারী বৃত্তিসকলই তদ্রূপ জ্ঞানময় হইয়া সুকৃতকারী বৃত্তিতে পরিণত হয়। লোকসমাজে দুষ্কৃত মনুষ্য তদ্রূপই সুকৃত মনুষ্যে পরিণত হয়—ওই কোরক হইতে কুসুম বিকাশের মত। কোরক বিনষ্ট হয় না—অদৃশ্য হয়। দুষ্কৃত বিনষ্ট হয় না, অগোচরীভূত হয়। এবং দুষ্কৃতকারী বৃত্তির ভিতর বা দুষ্কৃত জীবের ভিতর যে সুবৃত্তি বা সাধুতা প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহার উক্ত প্রকার পরিস্ফোটনের নামই সাধুর পরিত্রাণ। এবং সেই সাধুতার বা সাধুর পূর্ণ বিকাশই সত্যদর্শন, সব সত্য বলিয়া হৃদয়ে ধ্রুব প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম্মসংস্থাপন। উপনিষৎ তাই সানন্দে বলিয়াছেন,—"স এব সর্ব্বং যৎ ভূতং যচ্চ ভাব্যং সনাতনং। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥"

তবে জগতে যে শাসন দেখিতে পাই, দুষ্কৃতের দণ্ডবিধান, সাধুর পুরস্কার যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মাতৃতাড়নার মত লালনেরই প্রকারান্তর—ভালবাসারই প্রকারবিশেষ ; এবং তাহাও শুধু সাধারণ মাতৃচিন্তাশূন্য জীবক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য-প্রতিষ্ঠা হইলে, সেখানে সে তাড়নরূপ লালনও পরিদৃষ্ট হয় না।

শ্লোকের যুগে যুগে শব্দের মর্ম্ম সর্ব্বকালে। মাত্র সত্যপ্রধান যুগে যে তিনি আসেন, এমন নহে। যুগ শব্দের সাধারণ অর্থ যুগ্ম, যুগল। শব্দটি কালবিভাগ লক্ষ্য করিয়াই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। কালপ্রবাহের বিভাগ পরিকল্পিত করিয়া, সেই বিভাগগুলিকে যুগ আখ্যা দিবার কারণ—পরমাত্মা যখন বহু রূপ ধারণের সংকল্প করেন, প্রাণের লীলা করিবার জন্য যখন তিনি প্রাণ বা কালরূপে প্রকটিত হইয়া বিচিত্র ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে থাকেন, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ মহান্ মহিমা যখন তাঁহার অঙ্গে তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেই বিচিত্র লীলা প্রকাশের জন্য সর্ব্বত্র প্রকৃতি ও পুরুষ—আধার ও আধেয়—মন ও প্রাণ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা—জড় ও চৈতন্য, এইরূপ দুই দুই বিভাগে বিভক্ত হইয়া তিনি যুগ্মে যুগ্মে অবস্থিত, ক্রিয়াশীল ও প্রবাহিত হয়েন। প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক কার্য্য বিভাগ করিয়া দেখিলে, তাহার ভিতর এইরূপ দুই প্রকারের তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আপনি ভোগ্য সাজিয়া তাহাতে ভোগিরূপে অন্তর্নিবিষ্ট হয়েন, দৃশ্য সাজিয়া দ্রষ্টা হয়েন, জ্ঞেয় সাজিয়া জ্ঞাতা হয়েন, মনোরূপ ব্যাপ্তি সাজিয়া প্রাণরূপ ব্যাপক হয়েন। এই যুগ্মে যুগ্মে অবস্থান করিয়া ক্রীড়াস্রোত নিত্য একরূপে প্রবাহিত হয় না। সৃষ্টির দিক্ হইতে লয়ের দিকে এ ক্রীড়া যত অগ্রসর হয়, তত ঐ যুগ্মের মধ্যে প্রাণের প্রাধান্য স্বল্পতর, মনের প্রাধান্য প্রবলতর হইতে থাকে। সৃষ্টি-লীলা প্রকাশের সূচনায় প্রাণ অংশ বা ভোক্তা বা আধেয় অংশ প্রধান এবং মন বা আধার বা ভোগ্য অপ্রধানরূপে অবস্থান করে। ক্রমশঃ উভয়ের এই প্রাধান্যের ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে। সেই যুগ্মতার তারতম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এবং সেই তারতম্য লক্ষ্য করিয়াই কালের বিভাগগুলিকে সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ ও কলিযুগ, এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া সাধুগণ দর্শন করিয়াছেন। সত্য যুগে বা সত্যনামীয় কালবিভাগে প্রাণের

প্রাধান্য থাকে। অর্থাৎ প্রাণের প্রাধান্য দর্শন করিয়াই উহার সত্য যুগ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ত্রেতা দ্বাপরাদি পরবর্ত্তী যুগত্রয়ে প্রাণ বা চৈতন্য ক্রমশঃ অপ্রধান এবং মন বা জড় প্রধানতর হইতে থাকে। কলিতে জড় একান্ত প্রবলতর, প্রাণ বা চৈতন্য একান্ত হীন, অবসন্ন। সত্যযুগ চৈতন্য-প্রধান যুগ। কাল যুগ জড়প্রধান যুগ। যাহা হউক, যুগ্মতার এই তারতম্য লক্ষ্য করানই সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ইত্যাদি নামগুলির সার্থকতা। আজিকার ঘোর জড়বাদ, আত্মদর্শনের অভাব, জড় অন্নগত প্রাণ, জড়-বিষয়-লালসা, স্ত্রী আধিপত্য, এ সকল প্রকৃতির প্রাধান্য সুন্দর ভাবে জ্ঞাপন করে।

আর এক কথা। ধর্ম্ম-সংস্থাপন, দুষ্কৃতের বিনাশ ও সাধুর পরিত্রাণ, এই যে তিনটী কার্য্যের কথা ভগবান্ বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে ধর্ম্ম-সংস্থাপনরূপ কার্য্যটিই মুখ্য। অপর দুইটি তাহারই অবান্তর ফলস্বরূপ। ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই বাহ্যতঃ ওই দুই আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ৯

হে অর্জ্জুন! যঃ মে মম এবং দিব্যং জন্ম কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ বেত্তি, স দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি, মামেব এতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন! আমার এইরূপ জন্ম ও কর্ম্মরহস্য যে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে, দেহত্যাগের পর তাহাকে আর পুনরায় জন্ম পরিগ্রহণ করিতে হয় না; মৃত্যুর পর সে আমাকে পাইয়া থাকে।

যৌগিক অর্থ।—ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মরহস্য যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত হইয়াছে, তত্ত্বতঃ যদি কেহ তাহা জ্ঞাত হয়, অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে যদি কেহ উহা উপলব্ধি করে, তাহা হইলে তাহাকে মৃত্যুর পর সংসারে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। এখানে এইরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে, ভগবানের জন্ম-কর্ম্ম অর্থাৎ তিনি অনেক বার জীবহিতার্থে জন্মপরিগ্রহণ করেন, যখনই ধর্ম্ম-গ্লানি উপস্থিত হয়, এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েন—এই জ্ঞানটুকুমাত্র থাকিলেই তাহা হইতে জীবের মোক্ষ লাভ কেমন করিয়া হইতে পারে? বস্তুতঃ যদি পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক কয়টির সাধারণ স্থূল অর্থ মাত্র দেখা যায়, তাহা হইলে এইরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হইত। তিনি জীবহিতার্থে জন্মগ্রহণ করেন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন করেন, মাত্র এই জ্ঞানটুকু মুক্তিদায়ক কি প্রকারে হইতে পারে?—তাই ভগবান্ বলিতেছেন,—তত্ত্বতঃ জানিতে হইবে। তত্ত্বতঃ অর্থাৎ যে প্রকারে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলির অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি, সেই প্রকারে অনুভব করিতে হইবে। জন্ম ও কর্ম্মরহস্যের তত্ত্ব আমরা কি পাইয়াছি? ভগবান্ বলিয়াছেন,—তিনি চিরদিন আমাদিগের সহিত জন্ম পরিগ্রহণ করেন, আমাদিগের ভোগে ভোগিবৎ ব্যবহার করেন,

আমাদিগের সঙ্গে নিত্য সহচররূপে সর্ব্বক্ষেত্রে বিচরণ করেন, যত বার আমরা জন্ম পরিগ্রহণ করি, তত বার আমাদিগের সুখ-দুঃখের অংশিরূপে তিনিও সহচর হইয়া আসেন, ইহাই প্রথম ও প্রধান তত্ত্ব। আমরা যত দিন তাহা বুঝিতে না পারি, তত দিন আমাদিগের জন্মগুলিকে ব্যতীত জন্ম বলে, এবং যখন আমরা এই তত্ত্ব জ্ঞাত হই, তখন হইতে আমাদিগের জন্মগুলিকে সমেত জন্ম বলা যায়। তিনি যে আমাদিগের সহিত জন্ম পরিগ্রহণ করেন এবং আমাদিগের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখিবৎ ব্যবহার করেন—এ কথাটি অনেকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া ধারণা করিতে পারেন। পরমাত্মা—তিনি আবার সুখ দুঃখের ভোক্তা হইবেন কেন—এ আশঙ্কা অনেকের প্রাণে আসিতে পারে। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ সত্য, ইহা শ্রুতিতে স্পষ্ট করিয়া কথিত হইয়াছে,—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।" কঠ-শ্রুতিতে ইহা কথিত হইয়াছে। যাহা হউক, উহাই প্রধান তত্ত্ব। দ্বিতীয় তত্ত্ব—তিনি জীবের উপর একান্ত অনুরাগ-সম্পন্ন, জীবপ্রেমে বিভোর এবং তিনি সেই প্রেমের মোহে মুগ্ধ হইয়া মাত্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আমাদিগের সহিত ভোগাংশিরূপে থাকিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। পরন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি জ্ঞানরূপে জীবহৃদয়ে এবং অবতাররূপে জীবসঙ্ঘের মাঝে আবির্ভূত হইয়া জীবের প্রত্যক্ষীভূত হয়েন—ইহাই দ্বিতীয় তত্ত্ব। জীবের জন্য নিজের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, ক্ষুদ্র জ্ঞানরূপে, ক্ষুদ্র মনুষ্যরূপে স্নেহের বশে তিনি আসেন। তার পর তৃতীয় তত্ত্ব এই যে—তিনি যে কদাচিৎ এরূপ ভাবে আসেন, তাহা নহে; যখনই ধর্ম্ম গ্লানিযুক্ত হয় ও অধর্ম্মের সঞ্চার হয়, তখনই তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না আসিয়া থাকিতে পারেন না। আর চতুর্থ তত্ত্ব—সে আগমনের ফলস্বরূপ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ, জীব নির্ণয় করিয়া লইতে সমর্থ হয়, জীবের ব্যতীত জন্ম সমেত জন্মে পরিণত হয়, অসাধু অদৃশ্য হয়, সাধু পরিত্রাণ পায়।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০

মাম্ উপাশ্রিতাঃ জ্ঞানতপসা পূতাঃ বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ সন্তঃ বহবো জীবা মদ্ভাবম্ আগতাঃ প্রাপ্তাঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—আমাকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞান-তপস্যার সাহায্যে পূত, রাগ-ভয়-ক্রোধ-বিমুক্ত ও মন্ময় হইয়া বহু জীব মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

যৌগিক ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—ভগবানের জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলেও মুক্তি লাভ হয়। তত্ত্বতঃ জানা অর্থে তাঁহার ভালবাসাময় লীলানুগ্রহে সন্দীপিত হওয়া। মা আমার সর্ব্বজীবের হৃদয়গ্রন্থির মধ্যে অবস্থান করিয়া, তাহাদিগের সহিত জাত, মৃত ও সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইয়া বা তদ্বৎ ব্যবহার করিয়া, জীবের উদ্ধারের জন্য তাহার নিত্য-সহচররূপে যে অবস্থান করেন, এবং সঙ্কটে সঙ্কটে বিশেষভাবে

অভ্যুত্থিত হইয়া সাধুতার স্ফুরণ ও অসাধুতার বিলোপ সংসাধন করেন, এই তত্ত্বে মুগ্ধ হওয়ার নামই তত্ত্বতঃ জানা। অর্থাৎ তাঁহার মাত্র সাক্ষিস্বরূপ অচিন্ত্য অব্যক্ত নিরাভাস নির্গুণ নিষ্ক্রিয় স্বরূপমাত্রের জ্ঞানোদয়ে বা বেদনেই যে মুক্তি হয়, তাহা নহে। তাঁহার মায়াময়, কর্ম্মময়, বিদ্যা ও অবিদ্যা উপাধিসমন্বিত ঐশ্বরীয় লীলা-রহস্যে হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রেমাপ্লুত হইলেও তদ্‌ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, ইহাই এই স্থলে বক্তব্য বিষয়।

সাধারণতঃ নিরুপাধি, নির্ব্বিশেষ চৈতন্য-সত্তার ধারণা করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হইতে পারে, অন্যথা হয় না—কর্ম্মময় জগৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, বাহ্যতঃ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন, ত্যাগ ও নিরুপাধিক আত্ম-চিন্তনের সাহায্যে আত্ম-দর্শন সংঘটিত হইতে পারে, অন্যথা হয় না,—এইরূপ একটী সংস্কার বহু কাল হইতে জীব-হৃদয়ে কুটিলতা বিস্তার করিয়া আসিতেছে। সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত মুক্তির আর দ্বিতীয় স্থল নাই এবং সেই জন্য একমাত্র সন্ন্যাসই গ্রহণীয়—এইরূপ ভ্রমসংকুল ধারণা নিবারণ করিবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে জন্ম-কর্ম্মরহস্য বর্ণনচ্ছলে মুক্তির অন্যতর ও সহজতম উপায় ব্যক্ত করিলেন। সন্ন্যাসাশ্রমোচিত ব্যবহারে এবং নির্ব্বিশেষ আত্মোপাসনায় মুক্তি হইতে পারে; কিন্তু উহা অতীব কষ্টসাধ্য এবং সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম নহে,—ইহা ভগবান্ দ্বাদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কর্ম্মময় থাকিয়া তাঁহার কর্ম্মময় স্বরূপের উপলব্ধি করা এবং তাঁহার বিচিত্র স্নেহলীলায় বিভোর হইয়া চারি ধারে তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে অন্তরে তন্ময় হইয়া পড়িয়া, তৎপ্রসাদে নৈষ্কর্ম্ম্য ও তাঁহার নিষ্ক্রিয় স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই গীতার সার শিক্ষা। ইহাই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। মুক্তি-সাধনার ইহাই যে শ্রেষ্ঠ উপায়—সেইটুকু শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান্ তাঁহার এই অপূর্ব্ব জন্ম-কর্ম্মরহস্য বর্ণনা করিলেন।

তাঁহার কর্ম্ম—জীবের সহিত তাঁহার স্নেহ-লীলা। সর্ব্বত্র প্রতি অণুপরমাণুতে মধুস্বরূপে অবস্থান করিয়া, ক্রমশঃ জ্ঞান উন্মেষিত করিয়া, উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্ষেত্রে বুকে করিয়া বহন করা—ইহাই তাঁহার কর্ম্ম। তাঁহার এই কর্ম্ম দর্শনে হৃদয়ের জাড্য বিদূরিত করিয়া, অকৃতজ্ঞতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, প্রাণদাতার চরণে প্রাণসমর্পণ—ইহাই জীবের শিক্ষণীয়। জ্ঞানের সাহায্যে, বুদ্ধিযোগের সাহায্যে, সত্য-দর্শনের সাহায্যে পবিত্রীকৃত হইয়া—ক্ষুদ্রত্বে অনুরাগ, মৃত্যু বা পরিণামের ভয় ও প্রতিহত কামনার জন্য ক্রোধ—অজ্ঞানতার এই তিনটি বিষম গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া, তাঁহার মাতৃত্বে বা ব্রহ্মত্বে আসক্ত হইয়া বহুসংখ্যক জীব মুক্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে সন্ন্যাসের সাহায্যে অতি অল্পসংখ্যক জীবই উদ্ধার লাভে সমর্থ হয়। শ্লোকে 'বহু' শব্দ ব্যবহারের ইহাই তাৎপর্য্য। সত্যদর্শন ও বুদ্ধিযোগ-সংযুক্ত জ্ঞান-তপস্যার সাহায্যে মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবের মাতৃলাভ সংঘটিত হয়। ত্যাগ ও গ্রহণাদি ধর্ম্মলক্ষণার সাহায্যের আর তত

মুখাপেক্ষী থাকিতে হয় না—ইহাও এ স্থলে দ্রষ্টব্য। মাতৃশরণাগত হইলে বিষয়ানুরাগ বিদূরিত হইয়া, বিষয়-স্বরূপিণীকে লাভ হয়। মৃত্যুভয় নিবারিত হইয়া অভয়ার ক্রোড়ে জীব স্থান পায়। প্রতিহত কামনার ক্রোধরূপ উদ্বেলন তিরোহিত হইয়া, পূর্ণকামিতার পূর্ণত্বে হৃদয় পরিপূরিত হয়।

মূলে "মন্ময়াঃ" ও "মদ্ভাবমাগতাঃ" এই দুইটি শব্দ আছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা পুনরুক্তি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বুদ্ধিযোগে ও সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে সাময়িক তন্ময়তা লাভকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ময় শব্দটির ব্যবহার হইয়াছে ও হইয়া থাকে। আর যখন সেই তন্ময়তা প্রকৃতিগত হয়, অর্থাৎ ভগবদ্যুক্ত থাকাই স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন জীবকে ভগবদ্ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সেই আনন্দময়ী মায়ের কোলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থান করিয়া সরল নগ্ন শিশুটির মত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে আনন্দ উপলব্ধি করা যখন জীবের স্বভাবে পরিণত হয়, তখনই জীব "মদ্ভাবমাগতাঃ" হইয়া থাকে। এইরূপ জন্মকর্ম্মাদি লীলাময় আত্মস্বরূপের জ্ঞানই মুক্তির প্রশস্ত মুক্তার্গল প্রবেশদ্বার। এইরূপে মুক্তিদ্বারে উপনীত হইতে হইলে চারিটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। সর্ব্বপ্রথমে "মামুপাশ্রিতাঃ" অর্থাৎ অনন্যভাবে একান্তমনে মায়ের শরণাগত হইতে হয়। তৎপর "জ্ঞানতপসা বীতরাগভয়ক্রোধাঃ পূতাঃ" অর্থাৎ আমার বিশেষ কৃপাপ্রভাবে সত্যজ্ঞান ও বুদ্ধিযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা রাগ, ভয়, ক্রোধাদি হইতে পরিত্রাণ এবং তজ্জনিত আন্তরিক নির্ম্মলতা লাভ। তৃতীয় "মন্ময়ত্ব" অর্থাৎ সত্য ধারণা দ্বারা ভগবদ্যুক্ত হইয়া সাময়িক অবস্থান। এবং সর্ব্বশেষে তাহার পরিণামরূপে চতুর্থ অবস্থা—"মদ্ভাবমাগতাঃ" অর্থাৎ আমিই সকল এবং আমাতেই সকল, এইরূপ জ্ঞানে সাধনান্তরনিরপেক্ষ প্রকৃতিগত মাতৃভাবে অবস্থান। এই চারিটি স্তরের মধ্য দিয়া জীবকে মাতৃক্রোড়রূপ মুক্তি-মন্দিরে উপনীত হইতে হয়। তাই মা আমার স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিতেছেন,—মুক্তি-মন্দিরের অর্গল উদ্ঘাটিত করিয়াছি, তুমি একমাত্র আমার শরণাগত হও, আর তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না, আমিই তোমাকে সত্যজ্ঞানাদি দ্বারা বীতরাগভয়ক্রোধ করিয়া পূত করিয়া লইব। তৎপর তুমি সেই জ্ঞানের দ্বারাই আমাতে তন্ময়তা লাভ করিবে, এইরূপ করিতে করিতেই মদ্ভাবে উপনীত হইবে। আর তোমাকে জন্ম-মৃত্যুর তীব্র কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হইবে না। চির-শান্তিময় আমার ক্রোড়ে অবস্থান বা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। একমাত্র শরণাগত হইলেই মায়ের আমার জন্মকর্ম্মরহস্যময় লীলা অবধারণ করিতে পারা যায়। এবং তাহারই অমৃতময় ফলস্বরূপ মুক্তি করতলগত হয়, আর কিছুই তাহাকে করিতে হয় না। এই শ্লোকের এই চারিটি স্তর দেখাইয়া দিয়া, ভগবান্ চাতুর্ব্বর্ণ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য যে তাঁহারই সৃষ্ট, পরে সেই কথা বলিবেন বলিয়া এই শ্লোক হইতেই তাহার আভাস প্রকাশ করিলেন। জীবের শূদ্রাবস্থা লক্ষ্য করিয়া

"মামুপাশ্রিতাঃ," বৈশ্যাবস্থা লক্ষ্য করিয়া "জ্ঞানতপসা পূতাঃ," ক্ষত্রিয়াবস্থা লক্ষ্য করিয়া "মন্ময়াঃ" এবং ব্রাহ্মণাবস্থা লক্ষ্য করিয়া "মদ্ভাবমাগতাঃ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ চতুর্ব্বর্ণ জীবের ক্রমোন্নতির চারিটি স্তর মাত্র। পরে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা যাইবে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১

মাং যে যথা প্রপদ্যন্তে, তান্ অহং তথৈব ভজামি। হে পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে পার্থ! যে, যে অবস্থাতে, যে প্রকারেই আমার ভজনা করে, তাহাকে সেই অবস্থাতে, সেই প্রকারেই আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি; কারণ, সকল মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমারই নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুবর্ত্তন করে।

যৌগিক অর্থ।—সূর্য্যকে যোগ শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সে প্রশ্নটি অতি সংক্ষেপ হইলেও তাহার মধ্যে ভগবানের সমস্ত জন্মকর্ম্মরহস্য প্রচ্ছন্নভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। নতুবা ভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মপরিগ্রহণ করিয়া সেই সময়ে সূর্য্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এরূপ সন্দেহ করিয়া অর্জ্জুনের মত সাধক উক্তরূপ প্রশ্ন করেন নাই। ভগবান্‌ও সেই জন্য স্বীয় জন্ম-কর্ম্ম বিশদভাবে বুঝাইবার ছলে, আপনার দুই প্রকারের জন্ম, সেই জন্মের কাল ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়া, তিনিই যে সর্ব্বজীবের একমাত্র কর্ম্ম-নিয়ন্তা, তাঁহারই ইচ্ছাকে যে জীববৃন্দ সর্ব্বতোভাবে অনুবর্ত্তন করে, জীবের উপর তাঁহার যে অযাচিত ভালবাসা সর্ব্বদা বর্ষিত হয়, সেই তত্ত্ব এই শ্লোকে বর্ণনা করিলেন।

ভগবান্ কহিলেন—বৎস! যে আমাকে যে প্রকারেই ভজনা করুক, যে অবস্থাতে থাকিয়াই—যে অবস্থার ভিতর দিয়াই জীব আমার অনুগ্রহপ্রার্থী হউক, আমি সেই অবস্থাতেই—সেই অবস্থার ভিতর দিয়াই তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। অর্থাৎ জীব ইন্দ্রিয়ধর্ম্মী থাকিয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা বা বিষয়-ভোগরূপ বেদনে যখন উদ্বেলিত হয়, তখন প্রত্যক্ষভাবে সে আমায় তজ্জন্য সকল সময় প্রার্থনা না করিলেও পরোক্ষভাবে তাহার তদ্বিষয় লাভের জন্য আমারই ভজনা করা হয় এবং আমিও পরোক্ষভাবে তাহার সেই বিষয়সাধনার চরিতার্থতা দিয়া থাকি। অথবা জীব আমাকে লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে আমিও তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ করি। কেন না, আমারই নির্দ্দিষ্ট পথ জীবসমূহ অনুবর্ত্তন করে। আমি যে দিক্ দিয়া লইয়া যাই, জীব মচ্চালিত হইয়া সেই দিক্ দিয়াই আমাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয়। বিষয়-ভোগের ঝঞ্ঝাবাতে, ইন্দ্রিয়ের খরপ্রবাহে জীব-হৃদয় যখন উদ্বেলিত হইতে থাকে, মোহের তরঙ্গাভিঘাত যখন হৃদয়ের তটে তটে বিঘূর্ণিত হইয়া, কুলসকল ভগ্ন করিতে থাকে, তখনও সে আমারই অভিমুখে

অগ্রসর হইতেছে বুঝিও। শুধু উন্নত অবস্থায় নহে; সর্ব্বাবস্থাতেই একমাত্র আমিই জীবের পরিচালক এবং আমিই একমাত্র জীবের পরিচালক বলিয়াই, যে ভাবে যে কৃপাপ্রার্থী হয়, সেই ভাবেই আমি তাহাকে কৃপা করি, অথচ আমার কর্ম্ম-রহস্যের এমনি মহিমা যে, তাহাদিগের সে প্রার্থনা কখনও তাহাদিগকে অমঙ্গলের দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যায় না। আপাতদৃষ্টিতে প্রার্থনা বা উদ্যম অমঙ্গলজনকরূপে প্রতীত হইলেও, অন্তর্নিহিতভাবে আমার মঙ্গল ইচ্ছা তাহার তলদেশে থাকিয়া, মঙ্গল-পথেই তাহাকে লইয়া যায়। জীব যে অবস্থায় যেরূপ কর্ম্মই করুক না কেন বা যেরূপ সিদ্ধির জন্যই আকৃষ্ট হউক না কেন, তদ্রূপ কর্ম্ম করান বা তদ্রূপ সিদ্ধি প্রদান করা, তাহার সে অবস্থার পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়াই আমি এরূপে জীবকে তত্তৎকর্ম্মে নিযুক্ত বা সিদ্ধি অর্পণ করিয়া থাকি। আমিই জীবকে কর্ম্মাধিকার দিই, তবে জীব কর্ম্ম করে। আমিই জীবকে সিদ্ধিলাভের আশায় পরিচালিত করি, তবে জীব বিষয়-সিদ্ধি বা ভগবৎসিদ্ধি লাভের জন্য চঞ্চল হয়।

সাধারণ জীববর্গের গতিপ্রণালী বুঝিতে হইলে, পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এইবার সাধক সম্বন্ধে বলি। যে সাধক যে প্রকারেই মায়ের ভজনা করে, মা তাহাকে সেই প্রকারেই কৃপা করিয়া থাকেন। যে কেহ যে অবস্থাতে থাকিয়া মায়ের ভজনা করুক না কেন, তাহাকে সেই অবস্থার ভিতরেই মা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। গৃহে কি বিপিনে, গৃহ-ধর্ম্মে কি সন্ন্যাসাশ্রমে, নীচ কুলে কি উচ্চ বংশে, ভক্তিমার্গে কি জ্ঞানে অথবা কর্ম্মে, যে অবস্থার ভিতরে থাকিয়া হউক, মাকে ডাকিলেই মা আসেন—ইহাই মায়ের আমার চিরন্তন নিয়ম। সে ডাকা কি রকম? কত? সে আহ্বানে ও মাতৃ-আগমনে পরিমাণের সম্বন্ধ আছে কি না? অনেকে বলেন—আছে। তাই অনেকে এ শ্লোকের এরূপ অর্থ করেন যে, স্বীয় কর্ম্মাধিকারে থাকিয়া যে, যে পরিমাণে মাতৃমুখী হয়, সে সেই পরিমাণে মায়ের কৃপা লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। অনুরাগের পরিমাণ বুঝিয়া মাতৃকৃপা বর্দ্ধিত হয়। সাধারণতঃ ইহা সত্য। কিন্তু সে অনুরাগও তাঁহারই কৃপায় তাঁহারই ইচ্ছানুসারে উদ্বুদ্ধ হয়। তাঁহারই স্নেহের অপরিমেয় উদ্বেলন সে অনুরাগ উদ্বুদ্ধ করিবার মূল কারণ; সুতরাং কর্ম্ম অনুপাতে ফল নহে। যে কর্ম্ম যখন করাইবার ও যে ফল যখন দিবার ইচ্ছা মায়ের প্রাণে উদ্দীপিত হয়, তদুপযোগিভাবে কর্ম্মসমূহ জীব দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ জীব বহু চেষ্টায় যাহা লাভ করে, সাধকেরা ইচ্ছামাত্রে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। একান্ত অধ্যবসায় প্রয়োগে সাধারণ জীব যে কর্ম্মানুষ্ঠানে বা যে ফললাভে কৃতকার্য্য হয়, সাধু পুরুষ বিনায়াসে সঙ্কল্পমাত্রে তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারেন। সাধুদিগের ক্ষেত্রে কর্ম্মানুপাতে ফল মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য জীব সাধু একেবারেই হয় না। বহু আয়াসে বহু দিন ধরিয়া মাতৃভাবে যুক্ত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে জীব সাধু হয়। মাতৃ-

ভাবযুক্ত অবস্থা লাভ করিতে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তবে জীব সমর্থ হয়। সেই সকল বহু আয়াস-সাধ্য কর্ম্ম সঞ্চিতরূপে থাকে বলিয়াই, সাধু পুরুষগণ ইচ্ছামাত্রেই সিদ্ধকাম হন, এইরূপ আশঙ্কা কেহ কেহ করিতে পারেন ; কিন্তু এরূপ আশঙ্কারও কোন কারণ নাই। কেন না, মাতৃলাভেচ্ছারূপ কর্ম্মদ্বারাই জীব সাধুতা লাভ করে, সে কর্ম্মের সহিত অন্য ফলের বিশেষ সাপেক্ষতা নাই। শুধু মাতৃপ্রসন্নতার বিশেষত্ব নিবন্ধনই সাধুরা আপ্তকাম হন। তাই বলিতেছিলাম—ফলানুপাতে কর্ম্ম হয়, কর্ম্মানুপাতে ফল নহে। উচ্চতম ক্ষেত্রে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সাধারণ মনুষ্যক্ষেত্রকে কর্ম্মময় করিয়া রাখিবার জন্যই "কর্ম্মানুযায়ী ফললাভ" এই ভাবে কর্ম্ম ও ফলের সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। মা ব্যবসাদারের মত তুলাদণ্ডে মাপিয়া কর্ম্মমূল্যে ফল বিক্রয় করেন না। যতটা ফল দিবার যখন আবশ্যক বিবেচনা করেন, তখন সেই ফল ধারণোপযোগী সামর্থ্য দিবার জন্য, সেই ফল ভোগ করিবার উপযুক্ত ভাবে যে কায়িক, মানসিক, বাচনিক বা পাঞ্চকৌষিক অঙ্গ সঞ্চালন করান, তাহারই নাম কর্ম্ম।

কেহ কেহ বলেন—ভগবৎকৃপা পাত্রাপাত্র-নিরপেক্ষে সূর্য্যকিরণের ন্যায় সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষিত হয়। তবে সর্ব্বত্র সে কৃপার বিকাশ সমানভাবে উপলব্ধি না হইবার কারণ—অধিকারের বিভিন্নতা, গুণের তারতম্য। একই মেঘের বারিধারা যেমন কণ্টকবৃক্ষের কণ্টকবৃদ্ধির কারণ, সেইরূপ পুষ্পবৃক্ষেরও সুগন্ধি কুসুম বিকাশের হেতু। ইহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে—মাতৃকৃপা যদি মাত্র সকল ক্ষেত্রে সমভাবে, কেবল তত্তৎক্ষেত্রোচিত গুণেরই পরিপোষক হইত, তাহা হইলে বুঝি, আমাদের মত জীবের আর উদ্ধারের উপায় ছিল না। চিরদিনই তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে হইত। সত্যের অমৃতময় স্নিগ্ধ জ্যোতি দর্শনে অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবকে চিরদিনই বঞ্চিত থাকিতে হইত। মা আমার তেমন নহেন। তিনি যে সকলকেই নিজের আনন্দময় মুক্তি-মন্দিরের দিকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছেন—তিনি যে প্রত্যেক ক্ষুদ্র পরমাণুটিকেও নিজে বুকে করিয়া প্রয়োজনানুরূপ ক্ষেত্র ও কর্ম্মাদির ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে লইয়া যাইতেছেন ; যত দিন না তিনি উহাকে তাঁহার নিত্যভোগ্য মুক্ত আমিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, তত দিন বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া উন্মাদিনীর মত মা আমার সেই পরমাণুটী লইয়া ছুটিতে থাকেন। তাই ত দেখিতে পাই—আজ যে জীব ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন, দুই দিন পরে সেই আবার শুদ্ধ সত্ত্বেরও পরপারে চলিয়া গিয়াছে। মায়ের নিরপেক্ষতা সূর্য্য-কিরণবৎ হইলে, কণ্টকবৃক্ষ নিত্যই কণ্টকময় থাকিত, পাপী নিত্যই পাপী থাকিত। উন্নতির অবসর কাহারও আসিত না। মাতৃহৃদয়ে জীবোদ্ধারের ইচ্ছা সর্ব্বকর্ম্মশৃঙ্খলার মূলে আছে বলিয়াই, সাধারণতঃ জীব স্বীয় প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিলেও কার্য্যতঃ সে ক্রমশঃ কর্ম্ম হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকে। সুতরাং

বুঝিতে হইবে, নির্গুণ দ্রষ্টামাত্ররূপে অবস্থান করিয়া জীব-প্রকৃতিকে স্ব স্ব গুণে আবর্ত্তিত হইতে দিলেও মাতৃইচ্ছার আকর্ষণে আমরা সর্ব্বকর্ম্মের মধ্য দিয়া তাঁহারই দিকে ছুটিয়াছি অর্থাৎ তাঁহারই মঙ্গলময়ী ইচ্ছার দ্বারা প্রধানতঃ চালিত হইতেছি। স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী বা কর্ম্মানুযায়ী যে আবর্ত্তন, তাহা উপলক্ষ্য। যেমন তীর্থগামী রথ তীর্থমুখেই অগ্রসর হয়, তবে তাহার চক্র-মণ্ডলসকল নিত্যই স্ব স্ব নাভির উপর আবর্ত্তিত হইতে হইতে চলে—তদ্রূপ মায়ের মঙ্গল ইচ্ছায় তাঁহারই অভিমুখে জীবসকল ধাবিত। কেবল স্ব স্ব প্রকৃতিরূপ কর্ম্ম-নাভির উপর তাহার কর্ম্মচক্র স্বীয় গঠনানুযায়ী বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। মা আমার স্বাধীন ইচ্ছাময়ী। জীবের প্রতি মঙ্গল ইচ্ছাই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ববিকাশ বা মাতৃত্বের ধর্ম্ম। উহাই তাঁহার ব্রহ্মত্ব—মাতৃত্ব। মঙ্গল বরাভয় বিকীর্ণ করাই ইচ্ছাময়ীর নিত্যধর্ম্ম। সূর্য্যের ধর্ম্ম যেমন জ্যোতি বিকিরণ, মায়ের বা ব্রহ্মের ধর্ম্ম তদ্রূপ স্নেহ-করুণাময় মঙ্গল বিকিরণ। জ্যোতিই সূর্য্যের সূর্য্যত্ব—মাধ্যাকর্ষণই সূর্য্যের গ্রহপতিত্ব। স্নেহেচ্ছাই মায়ের মাতৃত্ব—স্নেহাকর্ষণই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব। তোমরা সেই মাকে একবার দেখিবে না ? যিনি "ক্ষেত্রজ্ঞ" সাজিয়া, জগতের প্রতি অণু পরমাণুর হৃদয়রূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া, এ কর্ম্ম-যজ্ঞময় ব্রহ্মাণ্ড-চক্র চালিত করিতেছেন, যজ্ঞক্ষেত্রের সর্ব্বত্র সর্ব্বকর্ম্ম-চাঞ্চল্যের মধ্যে নিত্য স্থির ধ্রুবাবস্থান করিয়া জ্ঞানাকারে ভাসিয়া উঠিতেছেন ও ক্রমশঃ স্থৈর্য্যাভিমুখে চালিত করিতেছেন ; জ্ঞানময় গুরুরূপে যিনি পথপ্রদর্শক হইয়া কৃমিত্ব হইতে নরত্বে, দেবত্বে, ব্রহ্মত্বে জীবকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকে একবার দেখিবে না ? তাঁহাকে কত কাল অবজ্ঞা করিবে ? যে চৈতন্য-সত্তা সর্ব্বকর্ম্মের ভিত্তি—তাঁহাকে কত কাল "চেতনামাত্র" বলিয়া বুঝিয়া, যে "আমিত্ব" সর্ব্বকর্ম্মের উপাদান, তোমাদিগের সেই আমিত্ব একটা চিত্তবৃত্তিমাত্র ভাবিয়া, কত কাল মাকে উপেক্ষা করিবে ? মা বল না। অন্তরের মধুকে মধু বল না—প্রাধান্যটা জীব-ভাবীয় তোমার না দেখিয়া, মাতৃভাবীয় তোমার ভাব না। যত দিন মাকে না জানিয়াছিলে—মাতৃসত্তা স্বপ্নেও ধারণা না করিয়াছিলে, তত দিন দার্শনিক হইতে গিয়া অবশ্য কর্ম্ম-প্রাধান্যই দর্শন করিয়াছিলে—কর্ম্মকেই সর্ব্বাবর্ত্তনের মূল বলিয়া বুঝিয়াছিলে। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল বলিয়াছিলে। আজ তাই বলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহারই শ্রীমুখের অভয়-বাণী শুনিতে শুনিতে আর জীবের কর্ম্ম-প্রাধান্য দর্শন কারও না। তিনি নিজে বলিতেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"—যে, যেমন করিয়া আমার ভজনা করুক না কেন—যেমন কর্ম্মই জীব করুক না কেন—তাহার কর্ম্মচক্র যে ভাবেরই হউক না কেন—"তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"—আমি সেই প্রকার ভজনার ভিতরই—সেই কর্ম্মের মধ্যেই—জীবক্ষেত্রে তাহার সেই অবস্থার মধ্যেই অর্থাৎ সর্ব্ব সাধনায়, সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্বপ্রকারে আমিই তাহাকে অনুগৃহীত করিতেছি। সর্ব্ব কর্ম্মে মদনুগ্রহ মৎকর্ত্তৃত্বই প্রধান। "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"—আমারই পন্থা, আমারই ইচ্ছা জীবসকল অনুবর্ত্তন

করিতেছে। মা এমন করিয়া তোমার সম্মুখে স্বীয় অনুগ্রহবাণী বর্ষণ করিলেন, আর তাহার মর্ম্মগ্রহণের সময় তুমি বলিয়া বসিলে—যে, যে পরিমাণে যে প্রকার কার্য্য করে, তাহাকে সেই পরিমাণে সেই প্রকার মা ফল দেন। অর্থাৎ জীব-কর্তৃত্বই প্রধান!

মাতৃভাব যদিও প্রাণের চর-ভূমিকে ডুবাইতে না পারিয়া থাকে, সরলভাবে শ্লোকটীর দুই চরণের সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থ করিতে গেলেও এরূপ বিকৃত অর্থ কল্পনা করা যায় না। তার পর দেখিতে হইবে, এ অধ্যায়ের এ স্থলে মা আমার স্বীয় জন্ম ও কর্ম্ম-বিবরণই বলিতেছেন; স্বীয় কর্ম্মমহিমা বর্ণন ও বিশ্লেষণ করাই এ স্থলে ভগবদুদ্দেশ্য। তবু কেন বৃথা জীব-কর্ম্ম-প্রাধান্য দর্শন কর। বুঝিয়াছি, তোমরা নির্গুণের সাধক। নির্গুণ নিরঞ্জন স্বরূপই তোমাদিগের সাধ্য এবং তাঁহার সেই স্বরূপসাধনাই একমাত্র মুক্তির উপায়, তোমাদিগের এইরূপ মত প্রতিষ্ঠা করিতে জীবের স্কন্ধে সব চাপাইতে চাহ এবং গীতাকেও সেই ছাঁচে মণ্ডিত করিয়া, জগতে স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়গত মতপোষক স্মৃতির ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া লইতে চাহ। সূর্য্যবৎ নিরক্ষেপভাবে ভগবৎসত্তার ধারণায়, তোমরা সন্ন্যাসবাদ-পোষক—তোমরা পটু হইতে পার, কিন্তু তাই বলিয়া গীতাকে সে ছাঁচে গড়িতে চেষ্টা কেন? পূর্ব্বে বলিয়াছি—গীতা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। সর্ব্বসাধারণের উদ্ধারের জন্যই গীতা—সন্ন্যাসবাদ, মিথ্যাবাদ খণ্ডনেই গীতার বিকাশ। লৌকিক সন্ন্যাস গ্রহণ ও নির্গুণ সত্তার ধারণা যাঁহারা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম করিতে চাহেন অর্থাৎ যাঁহারা প্রচলিত গ্রাম্য কথায় "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে চাহেন," যাঁহারা সংসারাশ্রমের অযথা অবনমন ও সন্ন্যাসাশ্রমের অযথা উন্নমন প্রচার করিতে গিয়া মায়াবাদকে মিথ্যাবাদে পরিণমিত করিয়াছেন, তাঁহারা গীতাকে স্বদলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন মাত্র। গীতার শিক্ষাই তাঁহাদিগের বিপরীত। সর্ব্বকর্তৃত্বময় মায়ের ঐশ্বরিক সত্তার শরণাগত হইতে, স্বীয় আমিত্বকে বিরাট্ আমিত্বে মিশাইতেই মা আমার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়াছেন; অতি আদরে—অতি স্নেহে স্ব স্ব অবস্থায় স্ব স্ব অধিকারের ভিতর থাকিয়াই তাঁহাকে বুকে ধরিতে বলিয়াছেন; কত আশা—কত অভয়, কত সান্নিধ্য—কত ব্যাপকতা তিনি গীতার ছলে বুঝাইয়াছেন। আর সেই গীতায়—সেই মহাকর্তৃত্বময় স্বরূপবর্ণনের সন্ধিস্থলেই ভগবৎপ্রাধান্য না দেখিয়া, কর্ম্ম-প্রাধান্য দেখিয়া, জানিয়া হউক বা না জানিয়াই হউক, বড়ই সংকীর্ণ মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে।

শুন মনুষ্য! আরও বলি। ভক্ত নাম গ্রহণের গর্ব্ব করি নাই, ভক্তি নাই। প্রাণ দিয়া ও প্রাণরূপে অবস্থান করিয়াও হৃদয় হইতে ভক্তির উচ্ছ্বাস দূরে থাক, কৃতজ্ঞতার এক বিন্দু অশ্রুজল পাইবার প্রত্যাশা তাঁহার নাই; তবু তাঁহার আদরের ভক্তের সহিত স্নেহ-ব্যবহার স্মরণে হৃদয় কণ্টকিত হয়, তাঁহার ক্ষুদ্রবৎ ব্যবহার দেখিয়া বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠে। তাই ভক্তের হৃদয়ের সুরে সুর মিলাইয়া আমি ভক্তের মত শ্লোকের

সর্ব্বপ্রধান বা মুখ্য ভাব বর্ণনা করিব। সেই ভাবটী পূর্ব্বোক্ত ভাব-সকলের ঊর্দ্ধে অথচ উহাদের প্রসবিতা—বিরুদ্ধ ভাব নহে। এবং সেই জন্য শ্লোকের উহাই যথার্থ তাৎপর্য্য। তবে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি না বুঝিলে সে অর্থের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় না, সেই জন্য পূর্ব্বে এত বলিলাম। শ্লোকে আছে,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" শ্লোকস্থ ভজামি শব্দের অর্থ আর "অনুগ্রহ" না বুঝিয়া ভজনা অর্থেই গ্রহণ কর। মা বলিতেছেন, যে কেহ যে প্রকারে আমার ভজনা করিতেছে—বুঝিও, আমিই তাহাকে ওই প্রকারে ভজনা করিতেছি মাত্র। যে, যে প্রকারে কর্ম্ম করিতেছে—বুঝিও, আমিই তাহার জন্য ওই প্রকার কর্ম্ম করিতেছি। হে পার্থ! যখন তুমি দেখিবে, স্তিমিত-নয়নে একাগ্রচিত্তে আমার জন্য ব্যাকুল হইয়া কেহ আমায় স্মরণ করিতেছে—বুঝিও, আমিই তখন কাতর প্রাণে তাহার জন্য পথ পানে চাহিয়া আছি; আমার সেইরূপ আকুলতার আভাসেই রঞ্জিত হইয়া সে ওই প্রকারে আমায় ডাকিতেছে। যখন দেখিবে, কেহ ঘোরতর পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া খরতর গতিতে নরকাভিমুখে নামিয়া চলিতেছে, বুঝিও—আমিই তাহার জন্য ওইরূপ দুষ্কৃত সাজিয়াছি—তাহাকে বুকে পাইবার জন্য আমিই তত তমসাচ্ছন্ন ক্ষেত্রে অবনমিত হইতেছি। জীব আমার প্রিয়—জীব আমার ভজনা করে সত্য, কিন্তু সে ভজনা আমারই ভজনার ছায়া! আমি যে প্রকারে জীবের জন্য ব্যাকুল হই—আমি যে প্রকারে জীবকে আকর্ষণ করি, তদনুকরণেই জীব আমার ভজনা করে। জীবের ভগবৎসাধনা আমার জীবসাধনার অনুকরণ মাত্র। আমিই জীবের সাধক—জীব আমার প্রাণ—জীব আমার অন্তর। আমিই জীব সাজিয়া এ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছি—আমিই জীবের প্রাণ পাইবার জন্য তাহার সাধনায় বিভোর। তাহার মন যোগাইবার জন্য আমিই বিচিত্র ভোগ্যসম্ভার; জীব-সেবার জন্য আমি অপূর্ব্ব অন্ন—জীব-তৃপ্তির জন্য অপূর্ব্ব রস, জীবের আরতির জন্য অপূর্ব্ব অগ্নি—জ্যোতি—বিদ্যুৎ। জীব আলিঙ্গনের জন্যই আমি বায়ুমূর্ত্তি ধরিয়া ঘুরিতেছি। জীবকে স্নেহ সম্ভাষণ করিবার জন্য, প্রাণের আদান-প্রদান করিবার জন্য, জীব দেখিয়া আমার আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ জন্যই ভাষা। জীবের গমনাগমনের জন্যই, জীবের অধিষ্ঠানের জন্যই চন্দ্র সূর্য্য। জীবের মন ভুলাইবার জন্যই আমি কুহকিনী সাজিয়াছি। ওরে, তুই আমার আমি রে! ওরে, আমি যখন যাহাকে বরণ করি, সে তখনই কেবল আমাকে পায় রে! সে তখনই সাধক হয় রে! আমিই শ্রীমতীর জন্য বাঁশরী বাজাইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরি। আমিই আমার তৃপ্তির জন্য শ্রীমতীকে ব্যাকুলা করিয়া, উন্মাদিনী সাজাইয়া পুলিনে পুলিনে পরিভ্রমণ করাই। আমিই জীবকে আমার তৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়াভিঘাতে উত্তেজিত রাখিয়া রাখিয়া তাহার উদ্বোধন করি। আমিই জীব-চৈতন্যের প্রতিপদাদি কল্প আরম্ভ করিয়া, প্রতি পদে পদে অর্চ্চনা করিয়া, বোধন করিয়া, তাহার মনশ্চন্দ্রের ছয় কলা পূর্ণ হইলেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মাহেশ্বরীস্বরূপে তাহাকে

পূজা করি। জীব আমার আত্ম-বিভূতি। আমিই জীবের সাধক। জীব আমার। জীব যাহা কিছু করে, সে সকল আমারই কর্ম্মের অনুবর্ত্তন মাত্র। মা যেমন খাদ্য-সামগ্রী হাতে লইয়া পুত্রকে খাওয়াইবার জন্য ভজনা করে এবং যত ক্ষণ না খাওয়াইতে পারে, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হয় না, আমিও তদ্রূপ আমার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিশাল স্নেহবক্ষ বিস্তারিত করিয়া পুত্রমুখ চাহিয়া অনিমেষ নয়নে স্নেহধারা ঢালিতেছি। আমার সেই চাহনিই চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ; অন্তরে মন, প্রাণ, জ্ঞান,—একই জিনিষ। এবং আমার সেই চাহনিই যে দেখে—দেখিতে পায়—সেই ঋষি হয় ; সেই চিরদিনের জন্য আমাতে মুগ্ধ হইয়া, আমার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে—আর আমায় ছাড়িতে চাহে না। আমার এই চাহনি দেখিবার জন্য বেদে আচমন-প্রণালী ব্যবস্থিত। শুন আমার সর্ব্বহৃদয়ের আস্পদ জীব—আমি এলায়িত-কুন্তলা, লুণ্ঠিতাঞ্চলা, স্নেহোদ্বেলিত-হৃদয়া, ক্ষীরপূর্ণস্তনী তোমার মা—জগৎ সাজিয়া তোমার ভজনা করিতেছি! শুনিতে পাইয়াছ? তোমাকে শিবত্বে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তোমার সেবায় বিভোরা! তাই তুমিও নিত্য আমারই সেবায় রত। তুমি জান বা না জান, তুমিও নিত্য আমারই তৃপ্তি-বিধানে যত্নবান্। তুমিও আমারই জন্য পাগল। আমিও তোমার জন্য পাগলিনী। ওরে, তুমি পুত্রের প্রীতির জন্য তোমার পুত্রকে ভালবাস না, আমারই প্রীতির জন্য, আত্মারূপিণী আমারই তৃপ্তির জন্য তুমি পুত্রকে ভালবাস। ওরে, তুমি পত্নীর প্রীতির জন্য পত্নীকে ভালবাস না, আত্মারূপিণী আমার প্রীতির জন্য তুমি পত্নীকে ভালবাস ; ওরে, তুমি অন্য কাহারও প্রীতির জন্য অন্য কাহাকেও ভালবাস না—আমারই প্রীতির জন্য তুমি যাহা কিছু ভালবাস। আমার জন্যই তুমি জগৎমোহে আচ্ছন্ন। যে যা বলে বলুক, উহা তোমার জগৎমোহ নহে—আত্মমোহ—আমারই মোহ এবং আমিই ইহার কর্ত্রী। আমাদিগের মাতা পুত্রের এ ক্রীড়া দর্শন কর—তুমি শিবত্ব লাভ করিবে।

ধন্য আমরা। ধন্য আমাদিগের জীবত্ব। তুমি কি অন্ধকারের ভিতর কি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া দিলে! কি মৃত্যুর তমসাচ্ছন্নতায় সৌরকরজ্বালা ছড়াইয়া দিলে! কি মরুভূমের মাঝে কি অমৃত উৎস আবিষ্কার করিয়া দিলে! তুমি আমাদিগের ভজনা কর মা? তুমি নীরব মূর্ত্তিমতী ভালবাসা, তুমি সাধিকা। তুমি এমন মা, তুমি এমন? জানিতাম জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র, কিন্তু মনুষ্যের কর্ম্মের জন্য, এই ধারণা ছিল। এ কি দেখাইলে এ কি শুনাইলে! তুমি কর্ম্মী—তোমার কর্ম্মক্ষেত্র! আমাদের যত ক্ষণ বুদ্বুদবৎ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে, তত ক্ষণ সুধু সে ক্ষেত্রে তোমার কর্ম্ম-তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া আনন্দ করিয়া বেড়াইব! আমরা যাহা করিতেছি, তাহাতে তিলমাত্র তোমার পথ হইতে বিচ্যুত হই নাই। আমরা জগতের কালিমা মাখিয়াছি বলিয়া যে, আঁধারের কল্পনা-জাল বিস্তার করিয়া আপনাদিগের মুখকে কজ্জলবৎ কালিমামণ্ডিত করিয়া রাখি, তাহা কালিমা নহে—তোমার স্নেহ-বিলেপ! ধন্য আমরা জীব। স্খলিত হইয়াও অস্খলিত—বিচ্যুত

হইয়াও অচ্যুত—ক্ষুদ্র হইয়াও মহৎ—অজ্ঞানী হইয়াও জ্ঞানী—অসক্ত হইয়াও পরম ভক্ত—ধন্য আমরা। রাজরাজেশ্বরী মা আমাদের ভালবাসার কাঙ্গাল—আমাদের সাধক—ধন্য আমরা। আর তাই আমরাও যাহা কিছু করি, তাঁহারই অনুবর্ত্তন—তাঁহারই ভজনা। তাই ঋষি অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বলিয়াছেন—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি...ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি...ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" এস মনুষ্যবৃন্দ—এস মায়ের সাধনার ধন—এস, এ অপূর্ব্ব মহিমাময় জ্ঞানসৌরদীপ্তিতে হৃদয়াকাশের দিক্‌প্রান্ত উজ্জ্বলিত করিয়া, মা বলিয়া, যিনি সর্ব্বহৃদয়ের হৃদয়—তাঁহার চরণ জড়াইয়া, মর্ম্মের শেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলি। ভয় নাই—আমরা ঠিক আছি। আমরা পথভ্রষ্ট নহি, মাতৃমন্দিরের মধ্যে; আমরা জটিল প্রহেলিকাময় জগৎধান্ধায় নহি, স্নেহময়ী মায়ের স্নেহপূর্ণ বক্ষে—আমরা পরিত্যক্ত পরিভ্রষ্ট পাপক্লিষ্ট নহি—আমরা স্নেহ-রক্ষিত শুদ্ধ বুদ্ধ পুণ্যময়;—আমরা মায়ের অঞ্চলের নিধি। শুধু দেখ, দেখিলেই দেখিতে পাইবে, মা আমার সাধনায় রতা—আমার জন্য জটাজূট-সমাযুক্তা—আমার জন্য দশভুজা—সহস্রভুজা—আমার জন্য ত্রিনয়না—সহস্র-নয়না, আমার জন্য একানন, চতুরানন পঞ্চানন, আমার জন্য সহস্রশীর্ষ—আমার জন্য সর্ব্বতঃ পাণি-পাদময়, সর্ব্বতঃ অক্ষি-শিরোমুখময়, সর্ব্বতঃ শ্রুতিময়;—আমার জন্য সসীম রূপ-সৌন্দর্য্যময়—আমার জন্য অরূপ রূপগাম্ভীর্য্যময়—আমার ভার বহিতে ভূভারহারী বিষ্ণু—আমায় বুকে ধরিতে নগ্না নিরুপমা সর্ব্বধান্ধা-বিনাশিনী শ্যামা। আমার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া, রথ-বল্গা ধরিয়া, অতি আদরে মুখের পানে চাহিয়া বলিতেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২

কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ ইহ মানুষে লোকে দেবতাঃ যজন্তে। মানুষে লোকে হি ক্ষিপ্রং কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ভবতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—কর্ম্ম-সকলের সিদ্ধি-প্রার্থীরা এই ক্ষেত্রে দেবতাসকলের ভজনা করে। এবং তদ্ধেতু কর্ম্মজা সিদ্ধি অতি শীঘ্রই মনুষ্যলোকে সঞ্জাত হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে মা আমার তাঁহার জন্মকর্ম্ম-রহস্যের সার মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে. অথচ সরল সজীবভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম-পরিগ্রহণ ও আমাদিগের জন্য ক্ষুদ্র বেশ ধারণ, বিপদে বিপদে আসিয়া সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের উদ্ধার, এ সকলের সার মর্ম্ম কি? তাঁহার ঐকান্তিক জীবপ্রিয়তা। জীব-প্রিয়তাই তাঁহাকে ঐ সকল কার্য্যে আহ্বান করে। জীব-প্রিয়তাই তাঁহাকে জীবের জন্য সাধক

করিয়া তুলে—কাঙ্গাল সাজায়, মা সাজায়, পথ-প্রদর্শক গুরু সাজায়। আর শুধু তাহা নহে ; শুধু এইরূপে বিশেষভাবে জন্ম-পরিগ্রহণাদি করিয়াই যে তিনি তাঁহার বাৎসল্য প্রকাশ করেন, শুধু বিশেষ বিশেষ সময়ে জীব-হৃদয়ে বা জীবলোকে আসিয়াই যে তিনি জীবের জন্য অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাহা নহে। সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ব-সময়ে তিনি ওইরূপ করিয়া থাকেন। মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত, তাঁহার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত—তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথেরই পথিক। শুধু বিশেষ বিশেষ জন্মেই বা অবতীর্ণ অবস্থাতেই যে তিনি আমাদিগের প্রেমে বিভোর, তাহা নহে ; সর্ব্বদাই তিনি জীবের ভজনাকারী। সর্ব্বদাই তিনি অনুগ্রহাশীর্ব্বাদ-বিধায়িনী পুত্র-স্নেহবিহ্বলা মঙ্গল-বরদা মা ; সন্তান পরিচালনে নিত্যই বিভোরা। ইহাই পূর্ব্বশ্লোকের মূল তাৎপর্য্য। এই স্নেহ-প্রণোদনে বিশেষ বিশেষ জন্মে কি প্রকারে কার্য্য করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। এইবার তাঁহার নিত্য কর্ত্তৃত্বের ও সর্ব্বকালীন অনুগ্রহ-পরায়ণতার পরিচয় দিতেছেন। এই শ্লোকটি তাঁহার পুত্রমঙ্গলান্বেষণের নিত্যত্বের দৃষ্টান্ত—প্রমাণ।

অঙ্গে বায়ুপ্রবাহের অনুভূতিতে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতায়াতে যেমন বায়ুর সত্তা প্রমাণিত হয়—প্রতীত হয়, তাঁহার কর্ম্ম-প্রবাহ অনুভূতি হইলে তবে তাঁহার, সত্তা তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতা—সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব তদ্রূপ প্রতীত হইতে পারে। মাতৃ-কর্ত্তৃত্বের স্নেহময় বিস্তার কিরূপ ওতঃপ্রোতভাবে লোকমণ্ডলকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, স্নেহের স্তন্যদানের জন্য তিনি কি প্রকার ব্যবস্থায় আপনাকে ব্যবস্থিত করিয়াছেন—তাহা বুঝাইবার জন্য এই শ্লোকটি। তাঁহার স্নেহের উপলব্ধি হইলে তবে না সকল যষ্টি ছাড়িয়া একমাত্র যষ্টিস্বরূপ তাঁহার করাঙ্গুলি ধরিব—তবে না মা নামের সার্থকতা ভোগ করিব ? তাই তিনি স্বীয় স্নেহগাথা গাহিতেছেন। এ স্নেহের বেদন জীববৃন্দের মধ্যে মনুষ্যহৃদয়েই উদ্ভাসিত হইতে পারে, সেই জন্য মনুষ্যক্ষেত্রের কথাই বলিতেছেন।

এই মনুষ্যক্ষেত্রে সকলকে কর্ম্মসিদ্ধি-প্রার্থিরূপে দেখিতে পাওয়া যায় ; কর্ম্মের সিদ্ধি অন্বেষণ করে না—এরূপ পুরুষ অতি বিরল। এ ক্ষেত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্মই কর্ম্ম-সিদ্ধির অভিলাষ। সিদ্ধির বা ফলের অভিলাষই আমাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে ; সিদ্ধির অভিলাষই আমাদিগের স্বাভাবিকতা। লোকসকল সাধারণতঃ দেখিতে দুই প্রকারের—ভোগপ্রধান এবং কর্ম্মপ্রধান। মনুষ্যেতর প্রাণিলোক এবং দেবলোক, এ উভয়ই ভোগপ্রধান। মনুষ্যলোক কর্ম্মপ্রধান। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভোগপ্রধান অর্থে সেখানকার কর্ম্মসকল প্রধানতঃ মাত্র তৎসাময়িক তৃপ্তিবিশেষপ্রদ। মাত্র ভোগেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া মনুষ্যেতর পশু কার্য্য করে ; আবার প্রধানতঃ ইচ্ছামাত্রে ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতাই দেবলোকের ধর্ম্ম। সে সকল ক্ষেত্রের কর্ম্ম বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যগর্ভ নহে। মনুষ্যালোকের কর্ম্মসকল দুই প্রকার—আপাত ভোগময় ও উদ্দেশ্যময়। কিন্তু সাধারণভাবে দেখিলে মনুষ্যের সর্ব্ব কর্ম্মই প্রধানতঃ উদ্দেশ্যময়। এমন কি, আমাদিগের

আহার-বিহারাদি ভোগপ্রধান কর্ম্মসকলও উদ্দেশ্যের দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া কৃত হয়। সেই লক্ষ্য যাহার যত থাকে, সেই তত মনুষ্যপদবাচ্য। হিন্দু-সমাজ মনুষ্যলোকের অগ্রণী হইবার ইহা অন্যতম কারণ। আমরা যখন আহার করি, রসনার পরিতৃপ্তি বা ক্ষুধার শমীকরণ মাত্রই তখন আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে সে আহার দেহ, মন ও প্রাণের পক্ষে পোষক হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ বিচার করিয়া তবে আমাদিগের আহার্য্য-সম্ভার বাছিয়া লই। এইরূপ বিহারাদি অন্যান্য ভোগপ্রধান কার্য্যের ভিতরও মুখ্যভাবে উদ্দেশ্যকে রক্ষা করি। পরন্তু আমাদিগের ভোগপ্রধান কর্ম্ম অতি অল্প। এ ক্ষেত্রে যত কর্ম্ম আমরা করিয়া থাকি, তাহার শতাংশও ভোগপ্রধান নহে, উদ্দেশ্যপ্রধান। এই উদ্দেশ্যতাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ; মনুষ্যলোকের একমাত্র পরিচয়। উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই আমরা সর্ব্ব কর্ম্ম অভিলাষ করিয়া থাকি বা মনুষ্য হইয়া থাকিতে হইলে করা কর্ত্তব্য। পরার্থে কর্ম্ম, হিতাহিত বিচার, ভবিষ্যৎ ফল চিন্তা, এই সকল মনুষ্যের কর্ম্মের মধ্যে নিহিত থাকে। তাই বলিতেছি—উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিলাষই আমাদিগের স্বাভাবিকতা, আমাদিগের গুণ—ধর্ম্ম। "কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং" বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য।

তার পর ভগবান্ বলিলেন,—ওইরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা দেবতাদিগের যজনা করি। বিশেষ বিশেষ কোন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যখন আমরা ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা বা পূজা করি, তখন না হয় দেবতা অর্চ্চনা করিতেছি বলা যায়। কিন্তু সেরূপ পূজা, যজ্ঞ ও আরাধনাদি কর্ম্ম আমরা খুব অল্পই সম্পাদিত করি। দেবতার প্রীতির মুখ চাহিয়া, দেবতার নিকট বরাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, তবে কর্ম্মসিদ্ধি লাভ করিব—এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা কয়টি কার্য্য করিয়া থাকি ? তবে "যজন্ত ইহ দেবতাঃ" কেন বলিলেন,—এরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে। সেই জন্য এটী বিশদভাবে বলিতেছি।

দেবতা শব্দ দিব্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। দিব্ ধাতু প্রকাশার্থক। বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি-প্রকাশাত্মক চৈতন্যই দেবতা শব্দের লক্ষ্য। মায়ের আমার বিশেষ বিশেষ শক্তি সঞ্চালনে, বিশেষ বিশেষ মহিমা প্রকটনে, বিশেষ বিশেষ লীলা-চাঞ্চল্যে যে অভিনিবিষ্ট চৈতন্য, বিশেষ বিশেষ কার্য্যপ্রকাশেচ্ছাময় যে চেতনা, তাহারাই মাতৃঅঙ্গস্বরূপ দেবতাপদবাচ্য। সমষ্টি সৃষ্টিচক্রের কর্ম্মজালের কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে চৈতন্য উদ্বোধিত রহিয়াছে, অর্থাৎ যে ইচ্ছাময় বিশেষ বিশেষ মাতৃচৈতন্য আধিপত্য করিতেছে, তাহারাই দেবতা। বিশেষ বিশেষ শক্তিবিকাশের বিশেষত্ব বিধায় দেবতারূপে মা বহু হইয়া রহিয়াছেন। তন্মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ কর্ম্মেচ্ছাময় দেবতাত্রয়ই প্রধান। তাঁহাদিগের সেই সকল কর্ম্মাধিকারের অন্তর্গত চৈতন্যক্ষেত্রকেই ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। সেই সকল কর্ম্মাধিকারের আবার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মবিভাগ আছে, এবং সেই সকল বিভাগানুযায়ী শক্তি-প্রকাশক চৈতন্যকে

অন্যান্য দেবতা বলিয়া সম্ভাষণ করা হয়। ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ এই শ্রেণীর দেবতা। যেখানে জীব, সেইখানেই ইতর-বিশেষভাবে এই সকল দেবতার বা চৈতন্যের আধিপত্য আছে ; তবে প্রধান ভাবে যেখানে যে ইচ্ছা ক্রিয়া করে, তাহাকে সেই লোকাখ্যা দেওয়া হয়। যেমন মনুষ্যলোক বলিতে মনুষ্যধর্ম্মীয় চৈতন্যক্ষেত্র বুঝায় ; মানব-সমষ্টির ভিতর যে মনুষ্যধর্ম্মীয় চৈতন্য বা মনুর শাসনাধিকার, তাহাকেই মনুষ্যলোক বলে ; এইরূপ সমস্ত লোক সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। লোক অর্থে বিস্তৃত চৈতন্যক্ষেত্র। পুরুষবিশেষ মাতৃইচ্ছায়, কর্ম্মবলে যখন এইরূপ কোন প্রকার বিশেষ চৈতন্যস্ফুরণময় বা চৈতন্যশক্তির দ্বারা অধিরূঢ় হয়, সরল কথায় যখন বিশেষ কোন চৈতন্যে বা জ্ঞানে বা শক্তিতে চৈতন্যবান্, জ্ঞানবান্, শক্তিমান্ হয়, তখনই সে পুরুষ ওইরূপ ক্ষেত্রের জীব হয় বা পূর্ণতায় সেই লোকাধীশ্বর দেবতা হয়। ইহারাই ব্যক্তিগতভাবে তত্তৎশক্তির পরিচালক—রক্ষক। মনুষ্য-লোকে রাজশক্তি যেমন একপ্রকার জ্ঞান বা চৈতন্যসমষ্টি—ব্যক্তি-বিশেষকে যেমন সেই চৈতন্য বা জ্ঞানসমষ্টির পরিচালক বা রাজা বলি ও তাহার কালপূর্ণে অন্য ব্যক্তি যেমন সে আসন পরিগ্রহণ করে,—দেবলোক-সকলও ঠিক সেই প্রকারের চৈতন্য বা জ্ঞানসমষ্টি ; এবং তাহার পালক পুরুষবিশেষই ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি। রাজা যেমন ব্যক্তি-বিশেষের নাম নহে, একটি পদের নাম, ইন্দ্রাদিও তদ্রূপ।

এইবার তোমাদিগের নিজের ভিতর ঠিক এই ভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর। মনে কর—তুমি। তোমার দর্শন, শ্রবণ, মনন বা গ্রহণ, ত্যাগ, গমনাদি কার্য্যাত্মক যে চৈতন্য, সেই বিশেষ কার্য্য-জ্ঞানাত্মক চেতনাগুলিকে দেবতা বলা হয়। সাধারণতঃ ইহাদিগকেই ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা বলা যায়। তোমার বাহিরে বা ভিতরে সর্ব্বত্রই এইরূপ অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি জ্ঞানাত্মক চৈতন্যকে তত্ত্বাভিমানী দেবতা বলা যায়। অগ্নিদেব বলিতে, সর্ব্বত্র মায়ের যে অগ্নিবৎ জ্ঞানাত্মক চৈতন্য, অর্থাৎ মায়ের যে অগ্নি বলিয়া চেতনা অগ্নিরূপে প্রকটিত রহিয়াছে, তাহাকেই অগ্নিতত্ত্বাভিমানী দেবতা বা অগ্নিদেব বলিয়া থাকি। এইরূপ সমস্ত তত্ত্বের সম্বন্ধে, সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। মায়ের যে দর্শনেচ্ছাপ্রকাশী চৈতন্য বা দর্শনেচ্ছা, তাহাই বাহিরে সূর্য্য, চন্দ্র ; তোমাতে তাহাই চক্ষু অভিমানী, মন অভিমানী দেবতা বা সূর্য্য, চন্দ্র ; এইরূপ সকলগুলি সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব। এখন সঙ্ক্ষেপে বলি। মনে কর, তুমি চন্দ্র দেখিবে বলিয়া ইচ্ছা করিলে। এ ইচ্ছা কোথা হইতে হইল ? দর্শনকার্য্যাত্মক চেতনা তোমাতে আছে বলিয়াই হইল। দর্শনরূপ কার্য্যাত্মক চেতনা বা আমি দেখি, এইরূপ তোমার যে চেতনা, তাহাই দৃগভিমানী দেবতা ; তোমাতে তিনি আছেন বলিয়াই ওইরূপ ইচ্ছা হইল। আর সেই যে ইচ্ছা করা, উহাই অজ্ঞাতভাবে সেই দৃগভিমানী দেবতার পূজা, যজন। তোমার যজনে তিনি আকৃষ্ট বা উদ্বোধিত হইলেন ; তাঁহার প্রসন্নতায় তৎকার্য্যের সহায়ক অন্যান্য দেবতাবৃন্দও

প্রয়োজনানুযায়ী নমিত হইলেন, তোমার গ্রীবা বক্র হইল, মুখ উর্দ্ধাকাশের দিকে ফিরিল; তুমি চন্দ্র দর্শন করিলে। চন্দ্রদর্শনরূপ উদ্দেশ্য বুকে লইয়া তুমি চক্ষুদেবতার যজন করিলে, এবং তাহাতে তিনি তোমাকে চন্দ্রদর্শনজনিত জ্ঞান বা অন্যান্য কর্ম্মজ সিদ্ধি তোমায় দান করিলেন। মনে কর, তুমি গীতবিদ্যা অভ্যাসে কৃতসঙ্কল্প। তুমি নিত্য আগ্রহ সহকারে গায়কের গীত-পারিপাট্য লক্ষ্য করিতে লাগিলে, এবং ক্রমশঃ শুনিতে শুনিতে গীতাভ্যাস করিতে করিতে তুমি গায়ক হইয়া উঠিলে। বুঝিও, ইহাও তুমি কর্ণাভিমানী, গীতবিদ্যাভিমানী প্রভৃতি দেবতার যজন করিয়াই লাভ করিলে। এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে, সর্ব্ব উদ্দেশ্যময় কর্ম্মে বুঝিতে হইবে।

কর্ম্মজ সিদ্ধির জন্য এই যে দেবতা সাধনার কথা বলিলাম, ইহা দুই প্রকারে হয়—জ্ঞাত ও অজ্ঞাত। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে অজ্ঞাতসারে দেবতা আরাধনার কথা বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, কোন বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, বিশেষ কোন দেবতার শরণাগত হইয়া, তাঁহাকে সাধনার দ্বারা তৃপ্ত করিয়াও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। উহাই জ্ঞাতসারে সিদ্ধিলাভ। উহাই সাধারণতঃ দেবতা-সাধনা বলিয়া কথিত হয়। যজ্ঞ তপস্যাদি কার্য্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই দুই প্রকারের আরাধনার মধ্যে জ্ঞাতসারে আরাধনাই অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেবতার শরণ লওয়াই প্রশস্ত ও সত্বর কার্য্যকারী। যদিও এ আরাধনা হইতে আমরা দিন দিন স্খলিত হইতেছি, দেবতা উদ্বোধন ও সিদ্ধিলাভ এ দেশে পূর্ব্বে অতিশয় প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও যদিও এখন উহা হারাইতে বসিয়াছি, তত্রাচ ইহার শক্তি চিরদিনই অব্যর্থ এবং ক্ষিপ্র সিদ্ধিপ্রদ। দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধিবিভ্রমই এ সাধনা লুপ্তপ্রায় হইবার মুখ্য কারণ। দেবতা কি এবং কে? তাহা না চিনিলে জ্ঞাতসারে দেবতা-সাধনা বৈধভাবে হয় না, এবং না বুঝিয়া যজ্ঞ-পূজাদি করিয়াও কোন ক্রমে ঐকান্তিকতার সাহায্যে কথঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ করিলেও তাহা তত ক্ষিপ্র সংঘটিত হয় না। দেবতার সহিত সম্বন্ধচ্যুতবৎ হইয়া থাকাই আমাদিগের উপস্থিত অনর্থের মূল। ব্রহ্মবিদ্যা শাব্দিক জ্ঞানমাত্ররূপে লাভ করিয়া, দেবতা নাই—একমাত্র ব্রহ্ম আছেন, লোক-সমাজে কাহাকেও এইরূপ বলিতে শুনা যায়; তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ ভাবিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না, এবং সেই ধারণার বশে অপক্ক অবস্থাতেই পক্ক হইয়া থাকেন। এমন কি, কদাচিৎ অহঙ্কার-কীট-দুষ্ট, অনাচারী, স্বার্থপর, মনুষ্য নামের অযোগ্য জীবে কেহ কেহ পরিণত হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের বুঝা উচিত, ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পূর্ব্বে দেবতাতত্ত্ব স্বতই হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। দেবতা বুঝা আর মায়ের বিশেষ বিশেষ কর্ম্মময় আধিপত্য হৃদয়ঙ্গম করা একই কথা। মাকে বুঝিতে গেলে দেবতা আপনি বোধগম্য হয়। যেমন সাধারণ জ্ঞানে সমস্ত ব্রহ্ম বলিয়া সাময়িক ধারণা করিলেও আমরা জগতের যাবতীয় পদার্থের বিভিন্নতা না দেখিয়া থাকিতে পারি না—মনুষ্য, গো প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ

ভাবেই আমাদিগের সংস্কারানুযায়ী দর্শন করি, তদ্রূপ দেবতাসকল মা হইতে ভিন্ন না হইলেও, মাতৃ-সাযুজ্য লাভের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ সত্তাই ফুটিয়া থাকে। মূল বক্তব্য হইতে দূরে আসিয়াছি।

জ্ঞাতসারে সাধনার কথা বলিতেছিলাম। জ্ঞাতসারে সাধনা দুই প্রকার,—দেবতাকে স্বতন্ত্রভাবে জানা, এবং মাকেই সেই দেবতা বলিয়া জানা। কোন বিশেষ শক্তিধর দেবতাকে তৎশক্তি লাভের আশায় অর্চ্চনা করা বা মাকেই সেই শক্তিধর দেবতা জ্ঞানে মায়ের সেই শক্তিধরস্বরূপের উপাসনা করা। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় প্রকার সাধনাই প্রকৃষ্ট এবং এইরূপ সাধনা প্রথম প্রকারের সাধনা অপেক্ষা সত্বর ফলপ্রসূ এবং সঙ্গে সঙ্গে অপ্রধান ভাবে মুক্তিমুখী।

যাহা হউক, আমরা বুঝিলাম যে, আমরা সর্ব্বতঃ দেবতার সাধনা করি। আর বুঝিলাম যে, সে সকল সাধনা প্রায় অজ্ঞাতসারেই করিয়া থাকি। তাই আমরা সাধনা করিয়াও সাধক নহি, যোগ করিয়াও যোগী নহি, জ্ঞানী হইয়াও জ্ঞানী নহি, কর্ম্মী হইয়াও কর্ম্মী নহি। অথবা সাধনা না করিয়াও সাধক, যোগ না করিয়াও যোগী, কর্ম্ম না করিয়াও কর্ম্মী। মাতৃস্নেহ সর্ব্বানুসারিণী বলিয়াই আমরা অজ্ঞাতভাবে সাধনা করিয়াও ফললাভ করি। আমরা এমনি অকৃতজ্ঞ যে, যাঁহার দ্বারা এইরূপে অলক্ষ্যে প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছি, তাঁহার সন্ধান রাখি না। তাঁহারই আরাধনা করিয়া তবে ফললাভ করিতেছি, অথচ তাঁহাকে মানি না, জানি না ;—জানিতে চাহি না যে, সর্ব্বতঃ আমরা তাঁর চরণরেণুর মুখাপেক্ষী।

সাধনা যেরূপ দুই প্রকার, সিদ্ধিও তদ্রূপ—কর্ম্মজা সিদ্ধি ও ইচ্ছাসিদ্ধি। মানসিক সঙ্কল্পকে কর্ম্মাকারে বাহিরে প্রকাশ করিয়া, সেই কর্ম্মের সাহায্যে যে সকল সিদ্ধি লাভ করিতে হয়, তাহাদিগকে কর্ম্মজা সিদ্ধি বলে। আর সঙ্কল্পমাত্রে যাহা মাতৃকৃপায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়, সেইগুলিকে সাধারণতঃ ইচ্ছসিদ্ধি বলা যাইতে পারে। ইচ্ছাসিদ্ধি কর্ম্মময় মনুষ্যক্ষেত্রে বিরল। ভোগপ্রধান দেবক্ষেত্রে উহা সুলভ। মনুষ্যলোক কর্ম্মময় এবং সে কর্ম্মসকল উদ্দেশ্যময়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই উদ্দেশ্যময় কর্ম্ম-সকলের ফলস্বরূপ যাহা লাভ করি, সেইগুলিই কর্ম্মজা সিদ্ধি। মূল শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন,—এই কর্ম্মজা সিদ্ধি মনুষ্যলোকে ক্ষিপ্র লাভ হয়। ক্ষিপ্র কেন লাভ হয়, পূর্ব্বোক্ত দেবতাতত্ত্ব একটু বিশেষভাবে ধারণা করিলে ইহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ভোগপ্রধান দেবলোক ও পশুলোক, এই উভয় ক্ষেত্রে ভোগপ্রাধান্যবশতঃ বিশেষ প্রকারের উদ্দেশ্যময় কর্ম্ম করিবার অবসর পাওয়া সুকঠিন। শুধু তত্তৎ-ক্ষেত্রোচিত সিদ্ধিসকল বা উদ্দেশ্য-সকলই সফল হয়। জীবহৃদয়ে উদ্দেশ্যতা পূর্ণরূপে প্রকটিত হইলে, তাহাকে মনুষ্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতে হয়। বহুমুখ কর্ম্মের বহু উদ্দেশ্য থাকায়, পাছে কর্ম্মসকলের ফল লাভের বিশৃঙ্খলতা ঘটে, সেই জন্য ভগবান্ মনুষ্যক্ষেত্রকে

সংযমাত্মক নিয়মরাশির দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্য-সকলকে যত সাবধানে সন্তর্পণে পদ চারণ করিতে হয়, এত অন্য কোন ক্ষেত্রের জীবকে করিতে হয় না। বিভিন্ন প্রকারের উদ্দেশ্য সংসাধিত করিয়া, পশুত্বের বিমোচন ও দেবত্বের বিকাশ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, মনুষ্য-জীবনে দুরন্ত সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এবং সেই জন্য স্বল্প সময়ের মধ্যে বহু উদ্দেশ্য, বহু সিদ্ধি পরিপূরিত করিয়া লওয়াই এ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। তাই কর্ম্ম-তরঙ্গাভিঘাত-সকলকে সুনিয়ন্তৃত ও সম্যক্ পরিচালিত করিবার জন্য মা মনুষ্যক্ষেত্রকে বহু নিয়মে শৃঙ্খলিত করিয়া থাকেন। ইহারই বাহ্য বিকাশ-স্বরূপে আমরা বাহ্য জগতে মনুষ্যক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় হিন্দুসমাজে জাতিবিচার দেখিতে পাই। বহু উদ্দেশ্য পরিপূরিত করিয়া লইতে হইবে, এবং পরে সে বহু উদ্দেশ্যকে একটিমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত করিতে হইবে, ইহাই মনুষ্যক্ষেত্রের ধর্ম্ম। উদ্দেশ্যময়তা লাভ করিয়া সাধারণ পশুভাবের বিমোচন, দয়া, স্নেহ, প্রীতি, সমদর্শিতা, জ্ঞানবুদ্ধির উৎকর্ষসাধন, হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সম্যক্ অবধারণ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গীয় উদ্দেশ্য-সকলের পরিপূর্ণতা এবং সমস্ত উদ্দেশ্যকে এক মাতৃলাভরূপ মহান্ উদ্দেশ্যে পরিণত করিয়া লইয়া ব্রহ্মত্বলাভ, এইগুলিই মনুষ্যক্ষেত্রের বিজয়-বৈজয়ন্তী। বহু গুণে সংমিশ্রণ-সঞ্জাত কর্ম্মসকলের বহুত্ব বিধায় মনুষ্যক্ষেত্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোর। পাছে এ কর্ম্ম-যজ্ঞাগারের কর্ম্মসকল পরস্পর সংমিশ্রিত হইয়া, স্ব স্ব বল হারাইয়া, কর্ম্মজা সিদ্ধি-সকলের সঙ্করতা উৎপাদন করে বা সম্যক্ পরিপূরণের অভাবে ব্যর্থসিদ্ধি হয়, সেই জন্য মায়ের এ যজ্ঞাগারে নিয়মের কঠোরতা। এই নিয়ম-শৃঙ্খলাই সিদ্ধি-সকলকে ক্ষিপ্র লাভ করিবার একমাত্র উপায়। ইন্দ্রিয়ধর্ম্মী, দৃষ্টিহীন, তমসাচ্ছন্ন পশু-হৃদয়কে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিয়া, সেই আলোক-সম্পাতের মধ্যে, কোটিসূর্য্য-প্রভালাঞ্ছিত অপরূপ রূপময়ী মা আমার আসিয়া দাঁড়াইয়া, তাহাকে কৃতার্থ করিবার জন্য একান্ত উদ্‌বিগ্না। তাই বহু কার্য্য একত্রে ক্ষিপ্র সমাধা করিয়া লইয়া, ব্যস্তভাবে পশুবৎ জীবকে মনুষ্যত্ব দিয়া, তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে আবির্ভূত হইয়া, তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পশুত্বের ধীরে ধীরে যত বিমোচন হইতে থাকে, তত জীব-হৃদয়ে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, হিত অহিত প্রভৃতির ধারণা জাগিয়া উঠে। সেই সকলের আবার যত সম্যক্ পরিচালনা হয়, ততই তাহার নৈতিক উন্নতি ধর্ম্মোন্নতিতে পরিণত হইতে থাকে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য-সিদ্ধি লাভ করিতে করিতে সিদ্ধিদাতারূপ মূল অজ্ঞেয়া শক্তির দিকে তাহার চক্ষু পড়ে এবং দেবতা-সকল সম্বর্দ্ধিত হন। এইরূপে জীবের অজ্ঞাতে স্নেহময়ী মা আমার জীবের বক্ষে পদার্পণ করেন। এইরূপে আমরা "খাল কাটিয়া ঘরে কুমীর" আনি। আমরা মনে করি,আমরা বহুমুখী উদ্দেশ্য-সকল পরিপূর্ণ করিতেছি। জ্ঞান, বুদ্ধি, নীতি, সংযম অথবা সম্পদ্, আত্মীয়তা, যশঃ, সম্মান-সম্ভ্রম প্রভৃতি যাহা কিছু জগতে লাভ করি, জানি—মাত্র তত্তৎসিদ্ধির জন্যই আমরা ঐরূপ ব্যগ্র হইয়াছি, তত্তৎসিদ্ধি সঞ্চয়ের জন্যই আমরা কার্য্য করিতেছি। জানি না—বুঝি না

—সর্ব্বগ্রাসিনী মা আমার অজ্ঞাতসারে সেই সিদ্ধিপ্রবাহের ভিতর দিয়া আসিয়া হৃদয়ে আশ্রয় লইতেছে, স্বীয় আবাস-গহ্বর নির্ম্মাণ করিতেছে ; একদিন আমার সমস্তটুকু স্বীয় করাল বদন বিস্তার করিয়া গ্রাস করিবে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩

ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টম্। তস্য কর্ত্তারমপি মাম্ অকর্ত্তারং অব্যয়ং বিদ্ধি।

ব্যবহারিক অর্থ।— গুণকর্ম্ম-বিভাগময় চাতুর্ব্বর্ণ্য আমারই দ্বারা সৃষ্ট, এবং তাহার কর্ত্তা হইলেও আমায় অকর্ত্তা অব্যয় বলিয়াই জানিবে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধি মনুষ্যক্ষেত্রেই ক্ষিপ্র লাভ হইয়া থাকে, এই কথা ভগবান্ বলিয়াছেন। সেই কর্ম্মজা সিদ্ধি-সকল লাভের জন্য যে বিশেষ নিয়ম-শৃঙ্খলা মনুষ্য-সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং থাকা কর্ত্তব্য, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভগবান্ এই শ্লোকে শৃঙ্খলার সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব জাতিবিচারটির কথাই প্রথমে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, গুণকর্ম্ম বিভাগানুসারে আমিই জাতি-বিচার বা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট করিয়াছি। কর্ম্মজা সিদ্ধি ক্ষিপ্র লাভই উহার প্রধান উদ্দেশ্য। এ চাতুর্ব্বর্ণ্য মনুষ্যকৃত নহে ; ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন ব্যাপারে যেমন চরমোন্নতি সুসাধ্য করিবার জন্য স্তরশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্যক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া, এই ক্ষেত্রে আবার তেমনি বিশেষভাবে গুণকর্ম্ম-বিভাগানুশাসিত চাতুর্ব্বণ্য ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সত্ত্ব, রজ, তমোগুণাত্মক মনুষ্য উক্ত গুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারে কর্ম্মসকল করিয়া থাকে বা করিতে সক্ষম হয়। সত্ত্বগুণপ্রধান বা রজ উপসর্জ্জিত সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব উপসর্জ্জিত রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তম উপসর্জ্জিত রজঃপ্রধান বৈশ্য, এবং রজ উপসর্জ্জিত তমঃপ্রধান শূদ্র। কর্ম্মসকল গুণের বিকাশ মাত্র। সুতরাং যে মনুষ্য যেরূপ গুণযুক্ত, স্বভাবতঃ তাহার কর্ম্মপ্রকাশ সেইরূপই হইয়া থাকে। তম আদি নিম্ন গুণ হইতে উচ্চতর গুণ সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ ক্রমশঃ শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, গুণ ত্যাগ ও গুণ গ্রহণে বিচার আবশ্যক হয়। উপসর্জ্জিত গুণ নিম্নবর্ণীয় হইলে তাহা ত্যাগ এবং উচ্চবর্ণীয় হইলে তাহা গ্রহণ, ইহাই কর্ম্মবিচারের এবং তদ্দ্বারা উচ্চ বর্ণ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। উহা লক্ষ্য করিয়াই জাতিগত কর্ম্মবিচার এ দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ণসঙ্করতার এ ভীষণ যুগে সে বিচার বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তবু ইহার চরণে নিত্য সংলগ্ন থাকিতে ভুলিব না। আমরা জাতি-বিচারের তত্ত্ব এ স্থলে আলোচনা করিব না ; উহার সম্যক্ আলোচনা সুদীর্ঘকলেবর। এই জাতি-বিচার সভ্য নামধেয় সমাজে নাকি বড়ই সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে। হউক, জন্মান্তরে অবিশ্বাসী মনুষ্য-রূপী জীব উহা করিতেই পারে। আমরা জানি, আমরা নিত্য। আমরা জানি, যত দিন

না মুক্তি লাভ করি, তত দিন আমরা বার বার কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম পরিগ্রহণ করিব। আমরা জানি, ব্রাহ্মণের কুলে অনেক শূদ্রাপেক্ষা অধম জ্ঞান-সম্পৎহীন তামসিক আচার-নিরত জীব ব্রাহ্মণত্বের সামাজিক উচ্চ মান উপভোগ করে, আবার অনেক বিপ্রাচারী শুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তিসম্পন্ন পুরুষ, মাত্র জন্মগত শূদ্র বলিয়া সমাজে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান পান না। কিন্তু ইহাও জানি, পরবর্ত্তী জন্মে হীনাচারী হীন কুলে, এবং শুদ্ধাচারী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম পরিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে, এবং স্ব স্ব কর্ম্মোচিত সামাজিক প্রতিষ্ঠা ভোগ করিবে। শুধু ইহ জন্মের দিন কয়েকের বাহ্যত পরিদৃশ্যমান অবস্থা-বিপর্য্যয় সমীকৃত করিবার ইচ্ছায় জাতিগত শূদ্রকে ব্রহ্মণের পদে এবং জাতিগত ব্রাহ্মণকে ইতর পদে পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়াসকল্পনা সমাজে অধিকতর বিপ্লব-সৃজনকারী। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণেতর মনুষ্য, কখনই সামাজিক এ দৃশ্যমান মরীচিকাবৎ মান্যটুকুর প্রলোভনে আত্ম-গরিমার মোহে আক্রান্ত হইয়া স্বীয় নিম্নত্বকে পরিবর্দ্ধন করেন না। তিনি যে সম্মান ব্রাহ্মণকে করিয়া থাকেন, তাহা প্রধানতঃ ব্রহ্মণ্যদেবের ; এবং দেবতাকে ধারণ করে বলিয়া আমরা যেমন দেবতার সিংহাসনের মর্য্যাদা রাখি, ব্যক্তিগত ভাবে জাতিগত ব্রাহ্মণের সম্মান তদ্রূপ রক্ষণীয়। আর বেদবিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণও জানেন, সম্মানের অর্থ কি ? ইহা ব্রাহ্মণের হৃদয়কে ভগবৎমুখেই প্রেরণ করে, তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ-স্বভাব-সুলভ আত্ম-গরিমায় মগ্ন করে না। শিবমন্দির জীর্ণ হইলে কে তাহা পদদলিত করে? শিবানুস্মরণে মস্তক নমিত করাইতে সে মন্দির কি অক্ষম হয় ? সুতরাং ব্রাহ্মণেতর সৎ জাতির চক্ষে ইহাতে কোন বৈলক্ষণ্য প্রতিভাত হয় না। বরং তাহাদিগের সম্মান কতকাংশে পতিত ব্রাহ্মণের চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ। যে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণের এ সম্মানে ক্ষুব্ধ, তাহাদের হৃদয় এখনও শূদ্রোচিতও হয় নাই ; সুতরাং তাহাদিগের সে হৃদয়ানুতাপ অগ্রাহ্য। কল্য যাহা নিশ্চিত লাভ হইবে, অদ্য তাহা পাইবার জন্য দুরন্ত সমাজবিপ্লব সৃজন করা অর্ব্বাচীন অদূরদর্শীরই শোভা পায়। প্রায়শঃই এরূপ মূঢ় ব্যক্তি সমাজের বক্ষে ধর্ম্মের আবরণে অযথা অত্যাচার করিতেছে, ধর্ম্মসাধনার কর্ম্মমন্দিরের সুবিশাল সনাতন স্তম্ভের বালুকাকার্য্য ভূমিসাৎ করিতেছে, দম্ভে জাতি সৃজনের ভার স্বয়ং লইয়া ভগবৎকর্ত্তৃত্বের অবমাননা করিতেছে, আর মূর্খস্বভাব-সুলভ আত্ম-গরিমা-মোহাচ্ছন্ন গড্ডালিকাসংঘ ঋষিযুগের পূত দৃশ্যের নাট্যলীলা করিতে গিয়া বিষম এবং সময়ে সময়ে অসহ্য কোলাহল তুলিয়া বিভ্রাট ঘটাইতেছে। কত নূতন নূতন বাদ বাহির করিয়া বিসম্বাদ বাধাইতেছে। আপাতদৃষ্টে মনোহর দুই কথা বলিতে বা লিখিতে পারিলেই একজন ধর্ম্মধ্বজী হওয়া যায়। আত্ম-মোহ পুষ্ট করা যায়—ভাবনা কি ! তখনকার ঋষিরা সনাতন শৃঙ্খলার নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার মাত্র করিয়া সমাজ সুদৃঢ় করিতেন, আজিকালিকার দূরদর্শী মহর্ষিরা সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্য-মণ্ডিত সমাজ-প্রাসাদের গলিত পলিত মসলা ঝাঁট দিয়া অভিনব সম্প্রদায়-দুর্গ রচনা করিতে সর্ব্বদাই

ব্যস্ত। অকুলান পড়িলে সে সনাতন ধর্ম্ম-প্রাসাদের অঙ্গ হইতে কুঠারাঘাতে নোনামাটি ছাড়াইয়া লইতেও বিশেষ পারদর্শী! রাবিশে কি অট্টালিকা হয় বাপ-সকল?

লেখা বা উপদেশ দেওয়া, বিশেষতঃ কোন ব্যক্তিসংঘের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যে কি দায়িত্বপূর্ণ, সে জ্ঞান থাকিলে অনেকেই উহাতে পশ্চাৎপদ হইতেন। লেখা বা উপদেশ দেওয়া চিন্তাপ্রসূত। চিন্তাশক্তি সর্ব্ববৈচিত্র্য-প্রসবিনী। যে কোন চিন্তা বিচিত্র বিচিত্র ক্ষেত্রে বিচিত্র বিচিত্র ভাব বিকাশ করাইয়া দেয়। এবং উহার অসংযত ব্যবহার স্বর্গকে নরকে পরিণত করিতে সক্ষম।

যাহা হউক, জাতি-বিচাররূপ মহাশৃঙ্খলা গঠন যে ভগবৎকৃত, এবং ক্ষিপ্র কর্ম্মসিদ্ধি লাভের উপায়স্বরূপ, এইটুকু আমরা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিব। ভগবান্ জীবের প্রতি স্বীয় স্নেহের পরিচয় দিতে গিয়া, আপনার মায়াময় স্বরূপে অধিষ্ঠান, অবতাররূপে অবতীর্ণ, সাধুসংরক্ষণ, দুষ্কৃতির বিনাশ প্রভৃতি মুখ্য লীলাবিলাসের কথা বলিলেন। তার পর গৌণভাবে অলক্ষ্যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুর কর্ম্মাবর্ত্তনের কর্ত্তারূপে অবস্থান করিয়া, সর্ব্বতোভাবে জীবের পথপ্রদর্শক ও নেতা হইয়া কার্য্যতঃ জীবের ভজনকারিরূপে অপূর্ব্ব মর্ম্মপ্লাবী যে স্নেহের পবিত্র লীলা নিত্য করেন, তাহা বলিলেন। সে সমস্তের ভিতর দিয়া যে উর্দ্ধতম সত্যক্ষেত্র লাভের জন্য জীবকে লইয়া চলিয়াছেন, এবং সেই জন্যই যে মনুষ্যসমাজরূপ উদ্দেশ্যময় কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন, এবং এই মনুষ্যক্ষেত্রেই যে সর্ব্ব উদ্দেশ্য এক উদ্দেশ্যে পরিণত হয়, সে কথার আভাস দিয়া আপনার কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বের সুবিমল মঙ্গল ছবি দেখাইলেন। এ অবধি বেশ সরলভাবে বুঝা যায়। কিন্তু এ মঙ্গল ছবি অঙ্কিত করিতে গিয়া তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রসঙ্গ কেন করিলেন, এরূপ আশঙ্কা কেহ কেহ করিতে পারেন। সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব একমাত্র যে তাঁহারই, এ কথা বলাই ত যথেষ্ট হইত, জাতি-বিচারের কথা বিশেষভাবে বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি আমি করিয়াছি, এ কথা বিশেষ করিয়া বলিবার অভিপ্রায় কি? এ কথা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু স্বীয় কর্ম্ম-শৃঙ্খলা যে ভাবে তিনি নিজমুখে বর্ণনা করিলেন, তাহাতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, মহামুক্তি লক্ষ্যে সার্ব্বজনীন গতি নিয়ন্তৃত করিতে হইলে যে সোপানাবলী রচনা করিতে হয়, জাতি-বিচারই তাহার শেষ সোপান, এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করাই তাঁহার অভিপ্রায়। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকত্রয়ের ভিতর দিয়া তিনি ইহার ইঙ্গিত দিয়া আসিতেছেন। অতি সহজার্থ গ্রহণ করিলেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জন্মকর্ম্ম তত্ত্বত জানিলে, তাহা দ্বারাই মুক্তিলাভ হইতে পারে, এই কথা বলিয়া, পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে সেই কর্ম্মের প্রকার ও শৃঙ্খলা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, অর্থাৎ ভগবৎমুখে সমাজগতি স্থির করিয়া, কর্ম্মাবর্ত্তনের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইলে, সার্ব্বজনীন মুক্তি-ধর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই 'বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধ' ইত্যাদি

শ্লোকের তাৎপর্য্য। তার পর, মনুষ্য-সকলকে সেইরূপ নিজকৃত স্নেহ-কল্যাণের পথে নিজেই চালাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, মনুষ্য সর্ব্বভাবে আমারই অনুসরণ করিতেছে, আমারই সেই কর্ম্মময় পথে বিচরণ করিতেছে ইত্যাদি বলিয়া, তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে সার্ব্বজনীন মুক্তি-ধর্ম্মের এই কর্ম্মময় পথেরই স্বীয় কর্ত্তৃত্ব বিধায় শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিলেন। তার পর মনুষ্য-সকল যে প্রকারে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহার দেবতাস্বরূপের সাধনা করে এবং সেই জন্য ক্ষিপ্র কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভ করে, সেই কথা বলায় বুঝিতে হইবে, কর্ম্মজা সিদ্ধি দ্রুত লাভ করানই তাঁহার অভিপ্রায়, এবং কর্ম্ম-শৃঙ্খলতা, উদ্দেশ্যশৃঙ্খলতা মনুষ্যকুলের সাধারণ ধর্ম্ম। তার পরই "গুণ-কর্ম্ম-বিচারময় চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ত্তা আমাকেই জানিবে" বলায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ম্মশৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য, কর্ম্মফল সুলভ করিবার জন্য, মহা উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি এ জাতিবিচার প্রাতষ্ঠা করিয়াছেন। এবং কর্ম্ম-শৃঙ্খলা বর্ণনা করিতে যাইলে ইহার প্রসঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। এ স্থলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা তুলিবার ইহাই কারণ। শ্লোকের প্রথম চরণ বুঝা গেল। সকল মনুষ্য একরূপ, আকৃতিগত তারতম্য নাই, সুতরাং সকলেই সমান, এই যে সামান্য জ্ঞান, ইহা হইতে সহজেই মনে আশঙ্কা আসিতে পারে, জাতিবিচার বুঝি স্বার্থপর মনুষ্যের একটী কল্পনা মাত্র। ভগবানের কথায় সে আশঙ্কাও তিরোহিত করিয়া দিল।

তার পর তিনি এই শ্লোকের শেষ পাদে বলিতেছেন, এরূপ বর্ণবিভাগকার্য্যের কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগরূপ কর্ম্ম করিতে গেলে যেন অকর্ত্তৃত্ব অব্যয়ত্ব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, যেন অপরিচ্ছিন্নতায় ব্যাঘাত পড়ে, কর্ম্মফলানুলিপ্ততা, সুতরাং কর্ত্তৃত্ব, যেন উক্ত কার্য্যে স্বতঃ উদ্বুদ্ধ হয়, এইরূপ আশঙ্কাটুকু যেন সঙ্গত এবং সেই আশঙ্কা লক্ষ্য করিয়া যেন "অপি" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এত কার্য্যশৃঙ্খলার কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার যদি ওরূপ কর্ম্মানুলিপ্ততার আশঙ্কা না থাকে, তবে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগরূপ কার্য্যে ওইরূপ আশঙ্কা কেন করিতে হইবে? যদি অন্য কার্য্যে না বাধে, তবে এ কার্য্যের এমন কি বিশিষ্টতা আছে, যদ্দ্বারা উক্ত আশঙ্কা বিসদৃশ হয় না? বস্তুতঃ সেরূপ আশঙ্কার বিশেষ কারণ না থাকিলেও আছে। এরূপ বিশিষ্ট বিচার, সৃষ্টির অন্য কোন ক্ষেত্রে নাই, একমাত্র মনুষ্যক্ষেত্রেই জাতি-বিচার প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং ইহা যে মনুষ্যকৃত নহে, তাঁহারই কৃত, এ কথার উল্লেখ করিয়া, তার পর এই বিশিষ্টরূপ অসাধারণ বর্ণবিভাগরূপ কার্য্য করিতে যে বিশিষ্টরূপ কর্ত্তৃত্ব আবশ্যক হইয়াছে, যে বিশিষ্ট অনুলিপ্ততা স্থূলদৃষ্টিতে চক্ষে পতিত হয়, পাছে তাহাতে তাঁহার অকর্ত্ত্বে অব্যয়ত্বে হানি সাধিত হইয়াছে, এইরূপ অর্জ্জুন মনে করেন, সেই আশঙ্কা নিরাকরণ "অপি" শব্দ ব্যবহারের প্রধান কারণ। পাছে কেহ মনে করেন, তিনি মনুষ্যকুলকে শ্রেষ্ঠ করিতে গিয়া ভক্তস্নেহে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, আসক্ত হইয়াছেন,

জীবের মুখে প্রথম মাতৃ-সম্ভাষণ মনুষ্যলোকেই হইয়া থাকে, সেই প্রথম মা বুলি শুনিয়া বুঝি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন, বুঝি ভক্তের নবীন নয়নোন্মেষে বিমূঢ়া হইয়া, মা আমার ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া, নবীন আনন্দে বিভোরা হইয়া, মনুষ্যলোকের বিরাট্ সংসারটি সাজাইয়া গুছাইয়া দিতে মত্তা হইয়া, স্বীয় অকর্তৃত্ব অব্যয়ত্ব বিস্মৃতা হইয়াছেন ; সেই জন্য এই অব্যয় মায়ের এই অব্যয় শব্দ প্রয়োগ। সমগ্র গীতায় যে ভাবে তিনি মনুষ্যকে আদর করিয়াছেন, যেরূপ স্নেহ-মহিমার কথা পূর্ব্বশ্লোক কয়টীতে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে স্নেহের ফাঁস পড়িবার আশঙ্কা যে নাই, তাহা নহে ; সেই জন্য এই "অপি" শব্দ। তিনি তাই বলিতেছেন—"আমি এমন করিয়া তোমাদের ভালবাসি, আমি এমন করিয়া তোমাদিগের ক্ষেত্রের খুঁটিনাটি সংশোধন ও শৃঙ্খলিত করি, তোমাদিগের প্রতি আমার এতই দৃষ্টি, এতই মায়া, তোমরা জীব, তোমরা আমার এতই প্রাণের ধন, আমার এমনই প্রাণের প্রাণ, চক্ষের চক্ষু, মরমের মরম, আমি এতই তোমাদিগের জন্য আবদ্ধাবৎ ব্যবহার করি! যে ব্যবহারের তিলমাত্র অনুকরণ করিতে গিয়া তোমরা আত্মহারা হও, অনন্ত সংসার জুড়িয়া আমি যথার্থভাবে সেই স্নেহের, সেই হৃদয়ের ব্যবহার প্রতিনিয়ত তোমাদিগের সহিত করিতেছি, তত্রাচ আমি অকর্ত্তা অব্যয়, আমার স্বাধীনতা অটুট।"

প্রাসঙ্গিক ভাবে যখন চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা তুলিতে হইয়াছে, আর যখন তাহাতে ওইরূপ অকর্তৃত্ব-বিচ্যুতির অভাব পাওয়া যাইতে পারে, তখন সেই প্রসঙ্গকে প্রধান করিয়াই, সে আশঙ্কার নিরাকরণ করা যুক্তিসিদ্ধ। তাই মা বলিলেন,—চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ত্তা হইলেও আমায় অকর্ত্তা বলিয়াই জানিবে।

"মাং বিদ্ধি"—আমাকে জান। কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, এমন যে আমি, সেই আমাকে জান। আমাকে জানিবার জন্যই এত শৃঙ্খলা, এত বিচার রচনা করিয়াছি, সেই শৃঙ্খলা অনুসারে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্ব লাভ কর—আমাকে জান। এই কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা বলিয়া জানাটুকুই মায়ের বক্তব্যের প্রধান অংশ। কর্ম্ম করিলেই যে বন্ধনযুক্ত হইবে, কর্ম্মত্যাগ-প্রধান সন্ন্যাসই যে মোক্ষের প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা নহে। ভগবদ্‌ভাব-প্রবণতাই বা ভাবপ্রধান কর্ম্ম কর্ম্মময় গার্হস্থ্যে ত্যাগময় কর্ম্ম, উহাই যে মোক্ষের চিরন্তন উপায়, ইহা বলাই মায়ের অভিপ্রায়। এবং সে মাতৃভাবপ্রবণতা লাভ করিতে হইলে, মা অকর্ত্তা হইয়াও কর্তৃবৎ সাজিয়া কি অভিনব কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন, কর্ম্মের ভিতর দিয়া অকর্ত্তা থাকিয়া কি প্রকারে স্নেহের হৃদয়খানি আমাদিগের জন্য বিছাইয়া দিয়াছেন, নির্গুণা হইয়াও অনির্ব্বচনীয় ভালবাসায় উদ্দীপিতা হইয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া সগুণা হৃদয়ময়ী মা সাজিয়া, রূপময়ী হইয়া, কর্ম্মরূপে স্নেহামৃত দিয়া, আমাদিগকে চৈতন্যময় করিতেছেন—ইহা সর্ব্বদা দেখিতে হইবে। মাকে চক্ষে চক্ষে দেখিতে হইবে, চক্ষে চক্ষে রাখিতে হইবে, চক্ষে চক্ষে ফিরিতে হইবে। সর্ব্বত্র সত্যদর্শন করিতে হইবে। মিথ্যা, ভ্রান্তি, প্রহেলিকা, মরীচিকা বলিতে যে নশ্বর মৌহূর্ত্তিক পরিণতির ভাব আসিয়া হৃদয়কে

মরুময় করিয়া ফেলে, তাহাও সত্যের লীলাবিলাস বলিয়া, প্রত্যক্ষ সত্যের আভাসে মুহুর্ম্মুহুঃ জীবনময় হইতে হইবে। ইহাই সত্য-প্রতিষ্ঠা। ইহাই মায়ের আসন। ত্যাগময় কর্ম্ম। সত্যদর্শনের সাহায্যে সমস্ত নগ্না অনাবৃতা জাজ্বল্যমানা, অনন্তশক্তি-মণ্ডিতা অথচ শান্তা, সর্ব্বত্র সুপ্রতিভাতা মা বলিয়া দর্শন করিতে হইবে।

ইহা কঠিন নহে। একমাত্র সরল সত্য অনায়াসগম্য প্রশস্ত পথ। ইহাতে বাধা-বিঘ্ন নাই, পথ পর্য্যটনের অবসাদ নাই, কঠোর চিন্তারৌদ্রের প্রখর দাহন নাই, পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই, পথবিভ্রান্তির বিভীষিকা নাই। শুধু মা বল। শুধু যখনই অবসর পাইবে, তখনই সম্মুখে যাহা কিছু তোমার চিত্তে বিম্বিত হইবে, সেই পদার্থকেই মা বলিয়া সম্ভাষণ কর। ক্ষুদ্র বিষয়ে না পার, ক্ষুদ্র ভাবে, ক্ষুদ্র ভাবময় জীবে না পার, বিরাট্ দর্শন কর। বিরাট্ প্রকৃতিরূপিণী মাকে নিত্য মা বলিতে থাক, মা বলিয়া দেখ। এ বিরাট্ যে তোমারই প্রাণ, তোমারই প্রাণ যে তোমার উপযোগী মূর্ত্তিতে তোমারই চক্ষে ভাসমান হইতেছে, ইহা গুরুমন্ত্রবৎ গ্রহণ কর। তাহা হইলেই তুমি ঋষির আবিষ্কৃত সত্যকালের সুগম পন্থার অনুসরণ করিতেছ বুঝিবে। তোমার সকল ধান্ধা বিদূরিত হইবে, সকল অবসাদ অপগত হইবে, সকল জ্বালার অবসান হইবে। তাই বলি, আর জ্ঞানের অপেক্ষায়, বিচারের অপেক্ষায় কপালে কর সংন্যস্ত করিয়া জড়ের মত বসিয়া থাকিও না।

দেখ, দুইটির একটি নিশ্চিত—তুমি মাকে জগৎময় দেখিতে পাইতেছ, কিম্বা পাইতেছ না। যদি দেখিতে পাও, তবে তাঁকে লাভ করিতে কতক্ষণ? আর যদি না দেখিতে পাও, তবে দুইটির একটি নিশ্চিত—তোমার দেখিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে, অথবা জন্মায় নাই। যদি ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে, তবে দেখিতে কতক্ষণ? যদি ইচ্ছা না থাকে, তবে দুইটির একটি নিশ্চিত—তুমি হৃদয়ে তাঁর স্নেহ উপলব্ধি করিয়াছ, কিম্বা কর নাই। যদি স্নেহোপলব্ধি হইয়া থাকে, তবে ইচ্ছা হইতে কতক্ষণ? যদি না হইয়া থাকে, তবে দুইটির একটি নিশ্চিত—তোমার ভগবদ্‌জ্ঞান আছে, অথবা নাই। যদি ভগবৎজ্ঞান থাকে, তবে স্নেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে কতক্ষণ? আর যদি ভগবৎজ্ঞান না হইয়া থাকে, তবে দুইটির একটি নিশ্চিত—তুমি গুরু বলিয়া তাঁহার চরণ আশ্রয় করিয়াছ, কিম্বা কর নাই। যদি করিয়া থাক, তবে জ্ঞান হইতে কতক্ষণ? যদি না করিয়া থাক, তবে দুইটির একটি নিশ্চিত—তোমার কর্ত্তব্য বোধ আছে, কিম্বা নাই। যদি থাকে, তবে গুরু বলিতে কতক্ষণ? আর যদি না থাকে, তবে দুইটির একটি নিশ্চিত—তুমি আপনাকে মনুষ্য বল, অথবা বল না। যদি আপনাকে মনুষ্য বল, তবে কর্ত্তব্য বোধ হইতে কতক্ষণ? যদি মনুষ্য না বল, তবে তুমি মিথ্যা বলিতেছ—কেন না, তুমি মনুষ্য। সুতরাং তুমি মাকে না দেখিয়া থাকিতে পার না।

মা এই যে এত করিয়া স্বীয় কর্ম্মের কথা বিবৃত করিলেন, ইহার উদ্দেশ্য—কর্ম্ম-

মহিমার ঘোষণা। কর্ম্মের সাহায্যেই বা কর্ম্মরূপেই তিনি যে আমাদিগের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত, নিত্য প্রত্যক্ষীভূত হইয়া রহিয়াছেন, এইটুকু বুঝাইবার জন্য; কর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া যাহারা উন্মার্গগামী হইয়া, ভগবদ্‌ভাবের ঈষৎ উদ্দীপনাতেই কর্ম্ম-স্পন্দিত ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য থাকিতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করে বা তাহাতে প্রশ্রয় দেয়, তাহাদিগের সে কার্য্যের যে কিছুমাত্র গৌরব নাই—তাহাই অবান্তরভাবে বুঝাইতে। কর্ম্মক্ষেত্রের দুরন্ত সংগ্রাম দেখিয়া ভীত হইও না—অবসন্ন হইও না, কর্ম্মে বীতরাগ হইও না, কর্ম্ম ও জ্ঞানের সংমিশ্রণ কর, ভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত হইবে, তাহাতে ত্রিমার্গ এক মার্গে পরিণত হইবে; কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এক হইবে; মন্ত্র, গুরু ও দেবতা এক হইবে; ক্ষর, অক্ষর, পুরুষোত্তম এক হইবে; কায়া, মন, প্রাণ এক হইবে; তবে তোমার যথার্থ অব্যয় ভাবের আলোক ছুটিয়া হৃদয় উদ্ভাসিত করিবে, নতুবা নহে। তোমার জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয় সাধনা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনে সিদ্ধ কর।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪

কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি, যতঃ কর্ম্মফলে মে মম স্পৃহা ন অস্তি। ইতি এবং মাং যঃ অভিজানাতি, স কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—কর্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, যে হেতু কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই—এইরূপ ভাবে আমাকে যে জানে, সে আর কর্ম্মে আবদ্ধ হয় না।

যৌগিক ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বশ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, আমি চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়াও কি প্রকারে তিনি অকর্ত্তারূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন, তাহাই এই শ্লোকের প্রথম পাদে বলিতেছেন। আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই—সেই জন্যই কর্ম্মসকল আমায় লিপ্ত করে না, এবং আমি কার্য্যতঃ অকর্ত্তাই থাকি। ইহাই ভগবৎকর্ম্ম-তত্ত্ব-রহস্য। কর্ম্মফলে স্পৃহা না থাকিলে তাহা বন্ধন হয় না। ফলস্পৃহাই বন্ধনের কারণ, কর্ত্তৃত্ব বোধের কারণ। কর্ত্তৃত্ববোধই জীবত্বের শরীর, ফলস্পৃহা তাহার প্রাণ। স্পৃহা না থাকিলে কর্ত্তৃত্ববোধ বিলীন হয়, সুতরাং বন্ধনও থাকে না। দৃষ্টান্ত ভগবান্ স্বয়ং। তাঁহার ফলস্পৃহা নাই বলিয়া কর্ম্মসকল তাঁহাকে অনুলিপ্ত করে না এবং তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তারূপে থাকিতে সমর্থ হয়েন।

শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে ভগবান্ দুইটি অর্থের সমাবেশ করিয়াছেন। প্রথম অর্থ—ভগবান্‌কে ফলস্পৃহাশূন্য, এবং তজ্জন্য কর্ম্মের দ্বারা অননুলিপ্ত, এইরূপে যে জানে, তাহাকেও কর্ম্ম বন্ধন করে না। যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি, জানা অর্থে এখানেও মাত্র বাক্যগত জানা নহে, ওইরূপ জ্ঞানে সম্বেদিত হওয়া। আর দ্বিতীয় অর্থ, জীব স্ব স্ব

আমিত্বকে, অর্থাৎ আপনাকে ওইরূপ জানিলে, অর্থাৎ আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই, কর্ম্ম আমায় বন্ধন করিতে পারে না—এইরূপ জ্ঞানে সম্বেদিত হইলেও তাহাকেও কর্ম্মে আবদ্ধ হইতে হয় না। জীব যদি ওইরূপ জ্ঞান লইয়া জগতের কর্ত্তব্য-সকল করিতে থাকে, তাহা হইলে ধীরে ধীরে তাহার বিষয়-স্পৃহা স্বতঃ শ্লথ হইয়া পড়ে, এবং স্বাধীনতার আভাস পাইয়া কৃতার্থ হয়।

ভগবান্ চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে যাহা কিছু বলিয়াছেন, এই শ্লোক তাহারই মর্ম্ম। এই তত্ত্বটুকু বুঝাইবার জন্যই তিনি স্বীয় কর্ম্ম-কাহিনী উল্লেখ করিয়া, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ এ স্থলে এই শ্লোক-প্রতিপাদ্য জ্ঞানটি। সুতরাং ওই তত্ত্বটি সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক।

এই শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের অর্থ আমরা দুই প্রকারে গ্রহণ করিতে পারি সত্য, কিন্তু উহাতে প্রকৃত এক কথাই বলা হয়। একই কথা দুই ভাবে বর্ণনা ছাড়া, উহাতে বাস্তবিক দুই বিভিন্ন প্রকারের অর্থ নাই। কেন না, জীবের জীবত্বটুকু উপেক্ষা করিয়া, তাহাকে 'আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই, সেই জন্য আমায় কর্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না' এই কথা বলিতে শুনিলেই বুঝিব, সে ঈশ্বরত্বকেই লক্ষ্য করিতেছে। সন্ন্যাসবাদ জীবকে স্বীয় আত্মার উপর ওই ভাবের আরোপ করিতে বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত করে; কিন্তু ব্যবহারতঃ ঈশ্বরপ্রণিধান তাহাদিগের নিকট উপেক্ষিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যবহারতঃ ওইরূপ হইলেও কার্য্যতঃ তাহাদিগের ঈশ্বরপ্রণিধানই করা হয়, কিন্তু অজ্ঞাতসারে। যেমন অজ্ঞাতসারে জীব দেবতাবিশেষের সাধনা করিয়াও মায়েরই সাধনা করে, তেমনই অজ্ঞাতসারে, সন্ন্যাসবাদীরাও নির্গুণ আত্মতত্ত্ব ধারণা করিতে গিয়া ঈশ্বর সাধনাই করিয়া থাকে। অর্থাৎ 'আমি কর্ম্মফলে আবদ্ধ নহি, আমার কর্ম্মে স্পৃহা নাই'—এই প্রকারের ধারণায় আপনাকে অভিষিক্ত করিলেই কর্ম্মময়ী মায়েরই ধারণা করা হয়, নৈষ্কর্ম্ম্যের ধারণা হয় না। সন্ন্যাসবাদ কিন্তু আপনাদিগের পন্থাকে ভগবদ্‌বাক্যের সহিত সমীকরণ করিতে, এই দ্বিতীয় অর্থটাই বিশেষভাবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ শ্লোকস্থ "মাং" অর্থে "আপনাকে" করিয়া লইয়াই নিশ্চিন্ত হয়। আমরা কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। এ স্থলে ভগবান্ স্বীয় কর্ম্ম বর্ণনার সমাপ্তি করিতে এই শ্লোকটি বলিয়াছেন, সুতরাং আমাদিগের পূর্ব্ব অর্থ, অর্থাৎ "মাং" অর্থে "ভগবান্‌কে" এইরূপ ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং উহাই এ স্থলে প্রকৃষ্ট অর্থ।

যদি "মাং" অর্থে ভগবান্ করিয়া না লই, "আমি" এইরূপ গ্রহণ করি, তাহা হইলে অন্ততঃ এই কর্ম্ম বর্ণনার মূল হইতে অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে সমস্ত ভগবদুক্তিকে আমারই উক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আমি নিত্য সনাতন অজ, আমি ভূত-সকলের ঈশ্বর, আত্মামায়ায় আমি স্বীয় প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া জন্ম পরিগ্রহণ করি, ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান নাশ করিবার জন্য, সাধুর পরিত্রাণ, অসাধুর

অপলাপ ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আমি স্বপ্রকৃতির সহিত যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, জীবসকল আমারই পন্থা অবলম্বন করিয়া চলে, আমিই জগতের একমাত্র কর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে একমাত্র নিয়ন্তা, অথচ কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই বলিয়া আমি অকর্ত্তা অব্যয়। এইরূপ দর্শন, এইরূপ আমিত্বের বিস্তার দেখিলেও তাহাও সন্ন্যাসবাদের সমর্থক হয় না, কর্ম্মবাদেরই পরিপোষণ করে। গীতার উদ্দেশ্য ঐরূপ আমিত্বে ক্ষুদ্র আমিত্বকে লীন করা হইলেও, একেবারে তাহার প্রয়াস না করিয়া, ঈশ্বরপ্রণিধান-সাহায্যে করিতে হইবে, আপনি নুতন উদ্ভট ঈশ্বররূপে বা নিগুর্ণরূপে কল্পনার সাহায্যে আপনাকে গঠিত না করিয়া, ঈশ্বর সাধনার সাহায্যে ঈশ্বরে লীন হইয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে হইবে। এবং সে সাধনাবিশেষ কর্ম্মাত্মক হউক বা না হউক, সমস্ত কর্ম্মের দ্বারাই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সর্ব্বত্র সমস্ত কর্ম্মের কর্তৃপদে মায়ের প্রতিষ্ঠা দেখিতে হইবে। মায়ের বাঞ্ছাপূর্ণকারিণী দৃষ্টিশক্তির প্রশান্ত আভাসে উদ্ভাসিত হইতে হইবে। প্রতি কর্ম্মে কর্ম্মময়ী মা, এবং তাহার কেন্দ্রে কর্ম্মময়ী হইয়াও অকর্ত্তা অব্যয়-স্বরূপিণী, এইরূপে উপলব্ধি করিয়া, সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা আত্মিক উন্নতির পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া, নাস্তিকতার কবলে পড়িবে।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ১৫

পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি এবং জ্ঞাত্বা কর্ম্ম কৃতম্। তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্ববর্ত্তিভিঃ কৃতং পূর্ব্বতরং কর্ম্ম এব কুরু।

ব্যবহারিক অর্থ।—পূর্ব্ববর্ত্তী মুক্তিকামী জনগণ এইরূপ জানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। অতএব তুমিও সেইরূপ পূর্ব্বমুমুক্ষুগণানুষ্ঠিত অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর।

যৌগিক অর্থ।—আমাতে কর্ম্মসকল অনুলিপ্ত হয় না; আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই, এই প্রকারে আপনাকে অথবা ভগবান্‌কে (অথবা আপনাকে ও ভগবান্‌কে) জানিলে কর্ম্ম-সকলে জীব আবদ্ধ হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুমুক্ষুরা এই ভাবেই কর্ম্ম করিতেন। সুতরাং পূর্ব্বগত মুক্তিকামী পুরুষদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তুমিও উক্ত জ্ঞানাবলম্বনে কর্ম্মই কর। ইহাই ভগবানের উক্তি। পূর্ব্বশ্লোকের তাৎপর্য্য হইতে পাছে কেহ মনে মনে ধারণা করে যে, কর্ম্মসকল স্পৃহাশূন্য হইয়া করিলেই যখন আর বন্ধনের কারণ হইতে পারে না, তখন কর্ম্ম বিচারের আবশ্যকতা নাই—যে কর্ম্মই হউক না কেন, স্পৃহা না থাকিলেই হইল; শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ আর মানিবার প্রয়োজন নাই; সেই আশঙ্কা নিরাকরণ এই শ্লোকের উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ স্পৃহাত্যাগের ভাণে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, নামমাত্র সন্ন্যাসী হইয়া অথবা অনাচারী গৃহী হইয়া, শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া পাছে উন্মার্গগামী হই, ভগবান্ সেই জন্য বিশেষ করিয়া এই শ্লোকটি বলিলেন। হায়! বুঝি

মায়ের ত্রিকালদর্শী চক্ষে আজিকার দিনের বাহ্যাড়ম্বরী গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীর পাল প্রতিফলিত হইয়াছিল ; বুঝি আজ যে উন্মার্গগতিপুষ্ট সংসারধ্বংসী ধর্ম্মের ভাণে, প্রকৃত অধর্ম্মাচারী ধর্ম্মবীরদিগকে পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্বোধন করিতে ও সংসারকে মিথ্যা বলিয়া সংসারে বিষচিন্তা বিস্তার করিতে এবং গৃহীদিগকে সেই হলাহলে জর্জ্জরিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, মা কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে যুগসন্ধির মধ্য হইতে তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ দর্শনচ্ছলে দেখিয়াছিলেন, সেই জন্য অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের জন্য এ সতর্ক-বাণী। সাবধান জীব, স্পৃহা না থাকিলে কর্ম্ম আর বন্ধন হয় না, সুতরাং এইরূপ ধারণা বুকের ভিতর রাখিয়া যথেচ্ছ কর্ম্ম করি, এরূপ ভ্রান্ত যুক্তির বশবর্ত্তী হইও না। স্পৃহা নাই বলিলেই স্পৃহা যায় না অথবা কর্ম্মত্যাগ হয় না ; তুমি সাজিয়া ত্যাগী হইও না ; সাজিয়া ভক্ত হও, সাজিয়া কর্ম্মী হও, কিন্তু সাজিয়া ত্যাগী হইও না। তোমার স্পৃহা নাই, সুতরাং শাস্ত্রবিহিত বিধি-নিষেধ মানিবার আবশ্যক নাই ; অথবা শাস্ত্রবিহিত ভগবৎপূজা উপাসনাদির প্রয়োজন নাই, অথবা সংসারে থাকিবার সফলতা নাই, এরূপ ভাবিও না। স্পৃহা যথার্থই তোমার যায় নাই ; কেন না, তুমি দেহী। যদিই গিয়া থাকে, তবু তুমি মহাপুরুষদিগেরই অনুসরণ কর। এবং তাঁহাদিগেরই বিহিত কর্ম্মসকল কর। তাঁহারা ভগবানের আরাধনা ও তাঁহারই কর্ম্মে নির্লিপ্ততা ধারণা করিয়া যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিতে করিতে স্পৃহাশূন্য হইতেন, অথবা তৎফলে স্পৃহাশূন্যতা লাভ করিয়াও তাহার সংরক্ষণের জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং তুমিও সেইরূপ আচরণই কর। সঙ্গে সঙ্গে ধারণা করিতে পার যে, তুমি নিজেও নির্লিপ্ত, স্পৃহাশূন্য; তাহাতে তোমার স্পৃহা আরও দ্রুত ছুটিতে পারে, কিন্তু মাত্র আপনাকে ওইরূপ ধারণা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া স্বাধীনতার ছল গ্রহণ করিও না। কর্ম্মই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য ; এবং সে কর্ম্ম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নহে, ভগবৎজ্ঞানময় পুরুষেরা যেরূপ জ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া যে ভাবে কর্ম্ম করিতেন, এবং শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই ভাবে কর্ম্ম কর। কর্ম্মত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হওয়া যায় না—অন্ততঃ তত্তৎক্ষেত্রগত কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত ভাবে করিতে করিতে নিস্পৃহ হওয়া যায়। নিস্পৃহ হইতে হইলে শাস্ত্রবিহিত বা মহাপুরুষদিগের আচরণ অনুযায়ী কর্ম্ম করিতেই হইবে।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬

কিং কর্ম্ম, কিং অকর্ম্ম, ইত্যত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ। তৎ কর্ম্ম তে তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে।

ব্যবহারিক অর্থ।—কর্ম্ম কি এবং অকর্ম্মই বা কি, এ বিষয়ে বিবেচকগণও মোহিত হন। অতএব যাহা জানিলে তুমি অশুভ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার, আমি তোমাকে সেই কর্ম্মরহস্য বলিতেছি।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ নিস্পৃহতার উপায়স্বরূপ পূর্ব্বশ্লোকে বিবেকিগণবিহিত কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্রবিহিত বিধি নিষেধ বা মুক্তিকামী পুরুষদিগের আচরণ মানিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে সত্য, কিন্তু কেবল তাহা হইলেই নিস্পৃহ হইবে না, উহা কর্ম্মের স্থূল অংশ মাত্র, কর্ম্মের প্রাণ দর্শন করিতে হইবে। এবং সেই কর্ম্মের প্রাণাংশের রহস্য বুঝাইবার জন্যই ভগবান্ এই শ্লোকটীর অবতারণা করিলেন। শাস্ত্র ও মহাপুরুষদিগের অনুকরণ করিলে ক্ষেত্ররক্ষা হয়, অর্থাৎ স্বীয় আত্মিক অবস্থানুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সহসা বিচ্যুত হইতে হয় না এবং তদূর্দ্ধ ক্ষেত্রে উন্নীত হইবার কথঞ্চিৎ উপযুক্তও হওয়া যায় সত্য; কিন্তু কর্ম্মের প্রাণরহস্য না জানিলে উর্দ্ধগতি লাভ দুষ্কর হইয়া উঠে। কর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রবিহিত ও মহাপুরুষাচরিত কর্ম্মই বুঝিতে হইবে। কিন্তু মাত্র শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের স্থূলাংশ অনুষ্ঠান করিলেই উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট হয় না। কর্ম্মের প্রাণ বা শক্তি বুঝা আবশ্যক। অনেক নিষ্ঠাবান্ আচারপূত কর্ম্মীকে ভগবদ্‌জ্ঞানশূন্য ভাবে সমাজে বিচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়; নিত্যক্রিয়াশীল শাস্ত্রবিধি-প্রতিপালনপটু জীব, সমস্ত জীবনকে কর্ম্মসংগ্রামে বিপর্য্যস্ত করিয়াও মাতৃচরণ লাভের অধিকারী হয় না; চরণ লাভ দূরের কথা, তাহাদিগেরও চিত্তের সংকীর্ণতা দেখিলে, অধম জীব বলিয়া প্রতীতি হয়। যাঁহার স্মরণমাত্রে তৎসাযুজ্য লাভ হইবার কথা, যাঁহার শরণাগত হইলে জীবনের সমস্ত অবসাদ দূরীভূত হইবার কথা, সারা জীবন তাঁহার কর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও কিছু যে হয় না, ইহা নিত্যই চক্ষে প্রতিভাত হয়। সুতরাং নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, এমন একটু কিছু রহস্য আছে, এমন একটু কিছু শক্তি আছে, যাহার অভাবে কর্ম্ম পণ্ডশ্রমবৎ হইয়া পড়ে। সেই শক্তিটুকু, সেই প্রাণটুকু বুঝাইতেই মা, কর্ম্ম কি এবং অকর্ম্ম কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইলেন। কি করিলে সাধারণ কর্ম্মসকলও কর্ম্মপদবাচ্য হয়, তাহা বলিতেছেন।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ১৭

কর্ম্মণঃ অপি হি বোদ্ধব্যং অস্তি, বিকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং অস্তি, অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং অস্তি, যতঃ কর্ম্মণঃ গতিঃ গহনা।

ব্যবহারিক অর্থ।—শাস্ত্রবিহিত ভগবদুদ্দেশ্যকৃত কর্ম্মফলের মধ্যেও জানিবার একটি বিষয় আছে, বিকর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মসকলের মধ্যেও জ্ঞাতব্য আছে। এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ্যহীন কর্ম্মের মধ্যেও তদ্রূপ বোদ্ধব্য বিষয় আছে। অতএব কর্ম্মের প্রাণের গতি গহন বা অন্তঃপ্রবাহশালী।

যৌগিক অর্থ।—ভগবৎলাভ উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে যে বিশেষ কর্ম্মসকল উক্ত আছে, সাধারণতঃ লোকে সেই সন্ধ্যাদি নিত্যকৃত্যগুলিকেই কর্ম্ম বলিয়া জানে। এবং শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলির নাম বিকর্ম্ম। আর নির্ব্বি-

শেষে সাধারণ কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলা হয়। কর্ম্ম এই তিন প্রকারের। ভগবান্ কর্ম্মরহস্য বলিতে গিয়া উপদেশ দিতেছেন—কর্ম্ম করিবার সময় এই তিনটি অবস্থা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য বা বোধ করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখিবে, যাহা করিতেছ, তাহা ভগবৎলাভ উদ্দেশ্যে করা হইতেছে কি না? দ্বিতীয়তঃ দেখিবে, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম কি না? এবং তৃতীয়তঃ দেখিবে, তাহা আন্তরিকতার অভাবে ভগবদুদ্দেশ্যে ক্রিয়মান হইলেও সাধারণ কর্ম্মের মত অর্থাৎ অকর্ম্মের মত হইয়া পড়িতেছে কি না? ভগবদুদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া করিতেছ, অথচ যদি তোমার সে সময়ে আন্তরিকতার অভাবে হৃদয় ভগবদ্‌যুক্ত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তুমি কর্ম্ম করিয়াও অকর্ম্মী হইলে; অর্থাৎ সাধকোচিত ফল লাভ না করিয়া, মায়ের সাধারণ কর্ম্মপ্রবাহ অনুবর্ত্তনকারীর ন্যায় ঈষৎ উন্নতি লাভ করিলে। তার পর মনে কর, তুমি ভগবৎলাভ উদ্দেশ্যে করিতেছ ভাবিয়া কোন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছ; দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, তুমি অবশ্য-প্রতিপাল্য পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়া, ভগবৎলাভ করিবার জন্য যাইতেছি ভাবিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে অথবা ঈষৎ সুরাপান করিলে চিত্ত সংযত করিতে পারিবে এবং তৎসাহায্যে চিন্তা ভগবৎমুখী হইবে, এইরূপ ভাবিয়া সুরাপান করিলে অথবা জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সুতরাং শাস্ত্রের খুটিনাটী মানিবার আর আবশ্যক নাই ভাবিয়া, তুমি সংসারে যথেচ্ছাচারী হইলে; ইহাতে তুমি বিকর্ম্মী হইলে বুঝিতে হইবে। বিকর্ম্ম অর্থে ভগবৎবিযুক্ত কর্ম্ম। বলিতে পার, আমি ভগবৎলাভ উদ্দেশে ভগবদ্‌ভাবে যুক্ত হইয়াই করিতেছি, বিযুক্ত কি প্রকারে হইলাম? ইহা তোমার ভ্রান্ত সমন্বয়। শাস্ত্র মাত্র যে প্রকারে যে সকল কর্ম্ম করিলে চিত্ত তিলমাত্র ভগবৎমুখে স্ফুরিত হয়, সেইগুলিকেই কর্ম্ম, এবং যে সকল কর্ম্ম করিলে, চিত্ত সংকুচিত হইয়া বহির্ম্মুখে আসিয়া পড়ে, সেইগুলিকে বিকর্ম্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়াছেন। হইতে পারে, তুমি উপস্থিত ভগবদ্‌ভাবযুক্ত হইয়া বা ভগবৎলাভ উদ্দেশ্যে ঐরূপ কর্ম্ম করিলে, কিন্তু তোমার চিত্ত এখনও সাধুর মত গত-সঙ্গদোষ হয় নাই। কর্ম্মের সঙ্গ চিত্তের উপর এখনও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং ঐ কর্ম্মে স্থিতি লাভ করিলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তোমার ভগবদ্‌ভাব তিরোহিত হইবে। অথবা ভগবদ্‌ভাবজনক গুণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে অথবা জ্ঞানের উজ্জ্বলতা অচিরে মলিন হইয়া যাইবে। সুতরাং ওরূপ কর্ম্ম বিকর্ম্ম বলিয়া বোধ করিবে। তার পর অকর্ম্ম অর্থাৎ সাধারণভাবে কৃত কর্ম্মের কথা বলিতেছি। মনে কর, তুমি আহার করিতেছ। মাত্র রসনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি লাভের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যদি তুমি ভগবদ্‌ভাবে যুক্ত হইয়া আহার কর অর্থাৎ মাতৃপ্রসাদ গ্রহণ করিতেছি, ইহাদ্বারা আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে, আমি সেই চিত্তের সাহায্যে মাতৃচরণ লাভ করিব, অথবা সেই আহার্য্যকে আত্মসম্মিত করিয়া যদি গ্রহণ কর, কিম্বা তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতেছি ভাবিয়া যদি কর, তাহা হইলে, ইহা অকর্ম্ম না হইয়া কর্ম্মই করা হইল বুঝিতে হইবে।

এই প্রকার জ্ঞানই কর্ম্মের প্রাণ, কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ জ্ঞান লইয়া বিচরণ না করিলে কর্ম্মারণ্যের গহন প্রদেশে বহু দিনের জন্য আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে। মাকে পাইবার জন্য কর্ম্ম, কর্ম্ম পাইবার জন্য কর্ম্ম নহে; তুমি কর্ম্মই পাইবে, মাকে পাইবে না। তাই ভগবান্ বলিলেন—কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম করা হয় না, কর্ম্মের গতি গহন।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম, যঃ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম পশ্যেৎ, স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্, স যুক্তঃ, সঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।

ব্যবহারিক অর্থ।—যে ব্যক্তি কর্ম্মের ভিতর প্রাণপ্রতিষ্ঠাশূন্যতা হেতু অকর্ম্ম দর্শন করে, এবং অকর্ম্মের মধ্যেও প্রাণপ্রতিষ্ঠাযুক্ততাহেতু কর্ম্ম দর্শন করে, এই মনুষ্যলোকে একমাত্র সেই বুদ্ধিমান্, সেই যুক্ত এবং সেই সর্ব্বদা ভগবৎকর্ম্মকারী অথবা আপনার কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদকারী।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মের ভিতরও যিনি অকর্ম্ম লক্ষ্য করেন এবং সাধারণ কর্ম্মসকলের ভিতরও ভগবদ্‌ভাব সংগ্রহ করিয়া লয়েন, তিনিই মনুষ্যলোকে বুদ্ধিমান্, তিনিই যুক্ত পুরুষ, তিনিই যথার্থ কর্ম্মী, তিনিই স্বীয় কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদকারী। বিকর্ম্মের কথা ভগবান্ আর এ শ্লোকে বলিলেন না। কেন না, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বিকর্ম্ম সকল অবস্থাতেই একান্ত পরিত্যাজ্য। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, এই দুই কথা মাত্র বলিলেন। যখন মাকে ভাবিতে বসিবে, তখন দেখিবে, যথার্থই তোমার প্রাণ মাতৃবেদনে সম্বেদিত হইতেছে কি না? যখন সাধারণ কর্ম্ম করিবে, তখন দেখিবে, তুমি তাহার মধ্যে ভগবদ্‌যুক্ত হইয়া অকর্ম্মকে কর্ম্মে পরিণত করিতে পারিতেছ কি না? মাকে পাওয়াই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য, মাতৃমুখে ধাবিত হওয়াই তোমার সকল কর্ম্মের গতি, মাতৃঅঙ্কে যুক্ত থাকাই তোমার বুদ্ধির একমাত্র ধর্ম্ম। কর্ম্মে কর্ম্মে যদি মাকে না চাহিবে, মাকে না পাইবে, মাকে না স্পর্শ করিবে, তবে কিসের জন্য সংগ্রামক্ষেত্রে রক্তপাত করিতেছ, কর্ম্মী হইয়াই যদি কর্ম্মের রক্ষক না হও ও কর্ম্মের রক্ষক হইয়াই যদি কর্ম্মের উচ্ছেদকর্ত্তা না হইবে, তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁহাতে একীকৃত, তাঁহাকে কেমন করিয়া পাইবে? তাঁহাকে পাওয়া অর্থে তদ্ধর্ম্মী হওয়া। জগতে যখন যাহা কিছু পাই বলিয়া মনে করি, তখন আমরা তদ্ধর্ম্মী হইয়াছি বলিয়া বুঝিতে হয়। যদি মাকে চাও, তবে মাতৃধর্ম্মী হও। কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ত্রী, পাত্রী ও প্রহর্ত্রী মায়ের সন্তান যদি হইতে চাহ, কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব যাঁহার সমান হাস্যোল্লাস, তাঁহার অঙ্কে যদি অনন্ত বিরাম লাভ করিতে চাহ, তবে এই প্রকারে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হইয়া কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হও। কৃ ধাতু হইতে শ্লোকস্থ কৃৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বুঝিলে কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ অর্থে সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা বুঝায়। আবার কৃৎ ধাতু গ্রহণ করিলে কর্ত্তন বা

হনন করা বুঝায়। সুতরাং এই শ্লোকে মা যেন কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ শব্দটি প্রয়োগ করিয়া, কর্ম্ম করিয়াই কর্ম্ম লয় বা কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদকর্ত্তা হইতে বলিতেছেন।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯

সর্ব্বে সমারম্ভাঃ যস্য কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ, বুধাঃ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তং পণ্ডিতং আহুঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম কামনা এবং সঙ্কল্পশূন্য, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা পুরুষকে পণ্ডিত বলেন।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মের ভিতর অকর্ম্ম দর্শন এবং অকর্ম্মের ভিতর কর্ম্ম দর্শন যিনি করেন, তিনি মনুষ্যকুলে বুদ্ধিমান্, ভগবৎযুক্ত এবং সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়াও কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদকারী হয়েন; ইহা ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বুঝাইয়াছেন। কি প্রকারে তিনি তদ্রূপ হয়েন, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। বুদ্ধির সাহায্যে কর্ম্মের ভিতর অকর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদ্ভাবশূন্যতা লক্ষ্য করিয়া, এবং অকর্ম্মের ভিতর কর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদ্‌যুক্ততা ফুটাইয়া তুলিয়া, জীব যখন জগতে ভগবৎলাভের জন্য কাতর হইয়া পড়ে, তখন তাহার সে কর্ম্ম-প্রবাহের গতি বিষয়-কামনাসঙ্কল্প-বর্জ্জিত হইয়া থাকে। কেন না, বিষয়ের ভিতর সে মাকে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া ক্ষুদ্র কামনার সহবাসশূন্য হয়। বুদ্ধির সাহায্যে ভগবদ্দর্শনরূপ বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইলে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং তাহাতে কর্ম্মবীজসকল দগ্ধ হয়। যখন কোন জীব বুদ্ধিযোগের সাহায্যে ভগবানে যুক্ত হয়, তখন কার্য্যতঃ বুদ্ধির সাহায্যে সে ভগবানের বুদ্ধিতেই সংযুক্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকিলেই পরমপ্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হয় এবং বিষয়জ্ঞান নিস্তেজ ও ম্লান হইয়া পড়ে। জ্ঞানই সকল কর্ম্মের মূল। জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম হয় না; বুদ্ধিহীন কর্ম্ম হয় না। সর্ব্বাগ্রে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বা বুদ্ধি, তাহার আশ্রয়ে জ্ঞান, এবং স্ফুটতর বিকাশ কর্ম্ম। সুতরাং বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মও পরিবর্ত্তিত হয়। কর্ম্মাশয়ের কর্ম্মবীজসকল প্রজ্ঞার তাপ সহ্য করিতে পারে না। বাহ্য জগতে যেমন সৌরজ্যোতিঃ, অন্তর্জগতে তদ্রূপ বুদ্ধি বা জ্ঞান। বস্তুতঃ ইহা এক। আত্মিক আলোকের নাম অন্তর্জ্যোতি এবং স্থূল আলোকের নাম বাহ্যজ্যোতি। সূর্য্য এই উভয় জ্যোতির কেন্দ্র। সেই জন্য ব্রাহ্মণাদিরা গায়ত্রীর ছলে সূর্য্যের নিকট এই উভয় জ্যোতির প্রার্থনা করেন। এ কথা পরে বলিব।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ সন্ কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি ন কিঞ্চিৎ এব করোতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—কর্ম্মফলাসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, আপনার নিত্যভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া, কোন জাগতিক আসক্তির আশ্রয়রূপে না থাকিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যতঃ কিছুই করা হয় না। অর্থাৎ কর্ম্মজনিত বন্ধন সে কর্ম্মীকে আবদ্ধ করে না।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে কাম-সঙ্কল্প-বর্জ্জিত ও জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মা পুরুষদিগকে পণ্ডিত বলা হইয়াছে। কেমন করিয়া কাম-সঙ্কল্প-বর্জ্জিত কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মবীজ ধ্বংস করিতে সক্ষম হওয়া যায়, এই শ্লোকটি অবান্তরভাবে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। প্রথম কর্ম্মফলাসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মফলাসঙ্গ জাগতিক সকল কর্ম্মের মূল উপাদান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলাসঙ্গ থাকিলে, লক্ষ্য ফলের দিকেই থাকে, এবং ফলের দিকে লক্ষ্য থাকে বলিয়াই কামসঙ্কল্পসংযুক্ত হইয়া জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এবং এইরূপে জীব আপনার ঔপচারিক ধর্ম্মে আবদ্ধ হইতে থাকে। ফলাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে এই ঔপচারিক ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং তাহা আবদ্ধ করে না। ঔপচারিক অর্থ কি? যাহা যাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহার সেই ধর্ম্মের ইতরবিশিষ্টতা সংঘটিত হইলে, যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাকে ঔপচারিক ধর্ম্ম বলিতেছি। মনে কর—জল বা অপ্ একটি তত্ত্ব; রসত্ব বা শৈত্য ইহার ধর্ম্ম। এই অপ্‌তত্ত্ব হইতে জলের ও তুষারের উৎপত্তি হয়। অপ্‌তন্মাত্রার, জলত্ব বা তুষারত্ব ঔপচারিক ধর্ম্ম। মনে কর, অপ্‌তন্মাত্রা চৈতন্যময়—সেই অপ্‌তন্মাত্রা যদি জলত্বে লক্ষ্য না করিয়া, আপনার তত্ত্বগত অবস্থা দেখিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সমগ্র জলসম্ভারে সে মাত্র অপ্‌তত্ত্ব দেখিতে পায়, জলত্ব দেখিতে পায় না। আবার যেমন তুষার বা বরফখণ্ডে আবদ্ধ জলকণাসকল যদি আপনার তত্ত্বগত স্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করে, তবে সে সমগ্র বরফে যেমন জলকণা ছাড়া আর কিছু উপলব্ধি করে না, অর্থাৎ জলকণা মাত্র দেখে, তদ্রূপ জীব আপনার ঔপচারিক ধর্ম্ম বা কর্ম্ম ও ফল লক্ষ্য না করিয়া যদি আপনার তত্ত্বগত স্বরূপ দর্শন করে, তাহা হইলে সে তাহার সমস্ত কর্ম্মব্যাপ্তিতে চৈতন্যসত্তা মাত্র দর্শন করিতে সক্ষম হয়। কর্ম্মাসঙ্গ এবং ফলাসঙ্গ, এই উভয় পরিত্যাগ করিতে হইলে, নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় হইতে হয়। আপনার নিত্যতায় যে পরিতৃপ্তি, তাহা লাভ করিলে জীব নিত্যতৃপ্ত হয়, এবং আপনাকে বা মাকে আশ্রয়বৎ অবলম্বন করিলে জীব নিরাশ্রয় হয়। কর্ম্মাসঙ্গ ও ফলাসঙ্গ বা কর্ম্মফলাসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইলে, এই তৃপ্তি ও এই মাতৃআশ্রয়লাভের প্রয়োজন।

জগতের দ্বারে দ্বারে তৃপ্তি ও আশ্রয়ের জন্য ভিখারীর মত না ফিরিয়া, যদি মাকেই আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করে, যদি সেই মাতৃআশ্রয়েই তৃপ্তির সকল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য লালায়িত হয়, তবেই জীব আপনার নিত্যতা উপলব্ধি করিয়া মাতৃক্রোড়রূপ নিত্যাশ্রয়ে নিত্যসুখে বিরাজ করে। মাকে যে আশ্রয় করে নাই, মাতৃলাভই পরম পরিতৃপ্তি বলিয়া যাহার হৃদয় এখনও সম্বেদিত হয় নাই, তাহার পক্ষে

কর্ম্ম ও ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ অসম্ভব। এ কর্ম্মময় জগতের একমাত্র আশ্রয় মা, এবং এ পূত মাতৃস্নেহের চাঞ্চল্যরূপ কর্ম্মসকল অনিত্য প্রহেলিকামাত্র নহে, নিত্য মাতৃসম্ভোগ, নিত্য মাতাপুত্রের আত্মরতি। এই জ্ঞান বদ্ধমূল না হইলে নিত্যতৃপ্ত, নিরাশ্রয় বা কর্ম্মফলাসঙ্গত্যাগী হওয়া যায় না। পরবর্ত্তী "ব্রহ্মার্পণম্‌" আদি শ্লোকটির দ্বারায় কর্ম্মাদি সমস্তই যে ব্রহ্ম, ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোক হইতেই ব্রহ্মাশ্রয়ের আভাস সূচিত হইয়াছে।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্‌॥ ২১

সন্ন্যাসী ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ সন্‌ কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্‌ অপি নিরাশীঃ যতচিত্তাত্মা ভূত্বা কিল্বিষং ন আপ্নোতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—সন্ন্যাসিগণ সর্ব্ববিধ পরিগ্রহ পরিহারপূর্ব্বক কেবল দেহরক্ষণোপযোগী কর্ম্ম করিলেও, নিষ্কাম এবং আত্মায় সমাহিতচিত্ত হইলেই কর্ম্মবন্ধনরূপ কিল্বিষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, অন্যথা নহে।

যৌগিক অর্থ।—ফলাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কর্ম্ম করিয়াও কার্য্যতঃ নৈষ্কর্ম্ম্যে থাকা যায়, পূর্ব্বশ্লোকে এই প্রকার বলিয়া, এইবার মা সন্ন্যাসী ও গৃহী, উভয়ে যে নৈষ্কর্ম্ম্যে থাকিতে সমর্থ হয়, তাহাই বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন। উপস্থিত শ্লোকটি সন্ন্যাসীদিগের নৈষ্কর্ম্ম্য লক্ষ্য করিয়া। সন্ন্যাস আশ্রমের লক্ষণ—কামনাশূন্যতা, আত্মায় সংলগ্ন-চিত্ততা এবং সর্ব্বপরিগ্রহের পরিত্যাগ। সন্ন্যাসীদিগের শারীর কর্ম্ম ছাড়া অন্য কোনও বিশেষ কর্ম্ম নাই ; সেই জন্য ভগবান্‌ বলিলেন,—সন্ন্যাসীদিগকে যদিও কেবলমাত্র শরীরসম্বন্ধীয় কর্ম্ম করিতে হয়, তবু তাঁহারা আত্মায় সংযতচিত্ত থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সে কর্ম্মজনিত বন্ধন ভোগ করিতে হয় না। অর্থাৎ সন্ন্যাসীরাও যদি নিরাশী অর্থাৎ নিষ্কাম ও আত্মায় সংযতচিত্ত না হইতে পারেন, তাহা হইলে মাত্র শরীর সম্বন্ধীয় কর্ম্ম করিয়াও তাঁহাদিগের বন্ধনের আশঙ্কা আছে। শুধু সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেই যে— কর্ম্মবন্ধনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ইহা অসঙ্গত। তেমনি আবার গৃহীর পক্ষে। তাই পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

যঃ গৃহস্থঃ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বাতীতঃ, বিমৎসরঃ, সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ, সঃ কর্ম্ম কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যে গৃহস্থ যদৃচ্ছালাভে অর্থাৎ মায়ের ইচ্ছায় যাহা উপস্থিত হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট, সকলই মায়ের দান ভাবিয়া শীত উষ্ণাদি সহনশীল, বৈরবুদ্ধিহীন, এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন, সেই ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হয় না।

যৌগিক অর্থ।—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া তৎফলস্বরূপ যাহাই লাভ হউক না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট, সুতরাং দ্বন্দ্বাতীত, অর্থাৎ ফললাভের তারতম্যে অবিষণ্ণচিত্ত ও বিমৎসর, নির্ব্বৈরবুদ্ধি ; এইরূপ হইলেই তাহাকে সিদ্ধ্যসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি পুরুষ বলা যায়। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হইলে, যে কোন কর্ম্ম করিয়াও আর তাহাতে বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয় না।

এই দুইটি শ্লোক হইতে এই বুঝা গেল যে,—সন্ন্যাস অথবা গার্হস্থ্য, যে কোনও আশ্রমেই হউক, ফলাসঙ্গ-শূন্যতাই বন্ধন মোচনের কারণ ; ভগবান্‌মাত্র আশ্রয়, ভগবানে যুক্তভাবে অবস্থানেই নিত্যতৃপ্ত—এইরূপ হইলে কর্ম্মফলে স্পৃহাশূন্যতা লাভ হয়। এবং এইরূপ ভাবে চিত্তকে সমাহিত রাখিতে পারিলেই, সর্ব্বত্র সকল ক্ষেত্রে বন্ধনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আমি বলিয়াছি,—"নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা" ইত্যাদি শ্লোকটী সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া এবং "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট" ইত্যাদি শ্লোকটি গার্হস্থ্য আশ্রমকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহী কি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমানবুদ্ধি হইতে পারে ? মাতৃসঙ্গ গৃহীই পারে। কর্ম্মহীন সন্ন্যাসীর তাহা পারিবার সুযোগ ঘটে না। উত্তাল তরঙ্গমালার সহিত সংগ্রাম—সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী পুরুষেরই সম্ভব হয়। রোগ, শোক, দারিদ্র্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, এ সমস্তের আক্রমণ গৃহীর উপরই আছে ; সুতরাং পৌরুষ গৃহীরই, সন্ন্যাসীর নহে। সংসারের এক একটি তরঙ্গ অবিচলিতভাবে অতিক্রম করিয়া, ধীর মাতৃসঙ্গী গৃহী যে আনন্দ অনুভব করে, কর্ম্মহীন সন্ন্যাসক্ষেত্রে সে আনন্দের সুযোগ নাই। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমতা, গার্হস্থ্যে সমধিক সুপ্রকাশ হয় বলিয়াই এই শ্লোকটি সংসারাশ্রমকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—বলিলাম। কিন্তু সাধারণ কর্ম্মের সময় না হয়, সংসারী সিদ্ধ্যসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হইয়া রহিল, সুখ-দুঃখের মোহাভিঘাতে না হয় বিচলিত হইল না ; কিন্তু তোমার সাধনার বেলাতেও কি তবে সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান থাকিবে ? তোমাকে প্রাপ্ত হউক বা না হউক, তোমার দিকে অগ্রসর হউক বা নাই হউক, সমান ভাবে ফলাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে ? তোমার সাধনা যে করে, তাহার সে সাধনার ফলরূপে সে তোমাকেই দেখে। তুমিই সাধকের সাধনার ফল। সাধক কি সে ফল সম্বন্ধেও উদাসীন থাকিবে ? শুধু ডাকিতে হয়—ডাকিবে, শুধু মা বলিতে হয়—তাই বলিবে ? তাহা হইলেই কি সে বন্ধনমুক্ত হইবে ? যাহার প্রাণে তোমার জন্য তীব্র জ্বালা ধরিয়াছে, যাহার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি তোমার জন্য থাকিয়া থাকিয়া "হায় হায়" করিয়া উঠিতেছে, জগতের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া, তোমার দিকে অনিমেষ লোচনে যে চাহিয়া আছে, সে কি স্থির থাকিতে পারে ? তাহা হয় না। শুধু বৈষয়িক কর্ম্ম সম্বন্ধে এ উপদেশ, এইরূপ অনেকে মনে করিতে পারেন ; কিন্তু তাহাও কি সম্ভব ? যত ক্ষণ জীবের আত্মিক তৃষ্ণা না মিটে,

তত ক্ষণ সাধারণ সম্বন্ধেও যেরূপ, সাধকের সম্বন্ধেও সেইরূপ—কেহ স্থির থাকিতে পারে না। উপেক্ষা করিতে পারে, জগতের সুখ দুঃখ গ্রাহে না লইতে পারে, কিন্তু সন্তোষের বিন্দুমাত্রও বিচ্ছেদতৃষ্ণাবিশুষ্ক হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। শুধু সেই-ই পারে, যে তোমাকে না পাইয়াও তোমাকে চক্ষে চক্ষে পাইয়াছে, যে তোমাকে হৃদয়ে না ধরিয়াও তোমার সুকোমল পরশ অনুভব করিয়াছে, যে তোমাকেই জগৎরূপে সাজিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে,—অথবা যে তোমাকে আপনার প্রাণ বলিয়া চিনিয়াছে—যে জগৎকে আপনার প্রাণেরই বিকাশ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে তোমাকে সর্ব্বত্র দর্শন না করিলে, কি জাগতিক কর্ম্মে, কি সাধনায়, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমানভাবে অবস্থান করা যায় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় হইলে কর্ম্মফলাসঙ্গ ত্যাগ হয়। সেই তাৎপর্য্য অনুসারে এই শ্লোক হইতে আমরা এই মর্ম্ম গ্রহণ করিলাম যে, সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে তোমাকে সর্ব্বদা দর্শন করিলে, তবে নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় হওয়া যায় এবং তৎফলস্বরূপ কর্ম্মফলাসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হওয়া যায়; অন্যথা নহে। এইরূপে গতকর্ম্মফলসঙ্গ হইয়া, তোমার জ্ঞানময় মূর্ত্তিতে অবস্থিতচিত্ত হইয়া, জগতের সমস্ত কর্ম্মকে তোমারই মহাযজ্ঞ ভাবিয়া, তোমারই প্রাণের লীলাবিলাস বুঝিয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমদৃষ্টি হয় ও কর্ম্ম করিয়াও বন্ধনযুক্ত হয় না।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

গতসঙ্গস্য স্বতন্ত্রজগদ্বোধশূন্যস্য, বিষয়রাগাৎ মুক্তস্য, জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ বিজ্ঞানাবস্থিতচিত্তস্য, যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ সমগ্রং প্রবিলীয়তে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যিনি স্বতন্ত্র জগদ্বোধশূন্য, রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত, এবং বিজ্ঞানাবস্থিতচিত্ত, তাঁহার কর্ম্মসমূহ কেবল যজ্ঞ বা মাতৃপূজার জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া, ফলের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ কর্ম্ম ও ফলরূপে প্রতীয়মান পৃথক্ সত্তাদ্বয় একমাত্র মহতী সত্তায় বিলীন হয়।

যৌগিক অর্থ।—জীব যখন সত্য-প্রতিষ্ঠার সাহায্যে গতসঙ্গ হয়, যখন বুদ্ধিযোগের মহিমায় তোমার মুক্ত, নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানময় বিশ্বমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তোমাতে তন্ময় হইয়া পড়ে, যখন জীব—জগতের কর্ম্মরাশিতে জীবকর্ত্তৃত্ব না দেখিয়া অসঙ্গ ও অকর্ত্তা তোমারই কর্ত্তৃত্ব দর্শন করে, অর্থাৎ জগৎকে তোমারই আত্মরতি বলিয়া দর্শন করে, তখন তাহার সমস্ত কর্ম্ম যজ্ঞে পরিণত হইয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যায়।

এই শ্লোকে গতসঙ্গ, মুক্ত ও জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত, এই শব্দ কয়টি ব্যবহৃত হইয়াছে। গতসঙ্গ অর্থে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞানশূন্যতা ও মুক্ত শব্দে বিষয়রাগ হইতে মুক্ত। বিষয়ের স্বতন্ত্র সত্তাবোধ দূর হইলে, বিষয়রাগাদি হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। বিষয়ানুরাগ হইতে

বিমুক্ত হইলে, তবে তোমার জ্ঞানময় রূপে অবস্থিত-চিত্ত হওয়া যায় ; তোমার জ্ঞানময় গুরুমূর্ত্তি উপলব্ধি করিতে পারিলে, তবে কর্ম্মময় এ জগৎ তোমারই যজ্ঞাগার বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় ; এবং তখনই কর্ম্মসকল বিলীন হয়। এই কয়টি অবস্থা সকল সময়েই অর্থাৎ কি জাগতিক কার্য্যে, কি ভগবৎসাধনার সময়ে, মনে রাখিতে হইবে। সাধারণ কর্ম্মাদি করিবার সময়ের মত, ভগবান্‌কে ডাকবার সময়েও চিত্তের এই কয়টি অবস্থা ফুটাইয়া তুলিয়া লইতে হইবে। ভগবান্‌কে যখনই ডাকিবে, তখনই সর্ব্বপ্রথম গতসঙ্গ হইবে, অর্থাৎ আর স্বতন্ত্র বিষয় সন্দর্শন করিবে না। যাহা দেখিবে, তাহাই মা বলিয়া ধারণা করিবে। মাকে ডাকিতে উদ্যত হইলে এককালীন মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে, মায়ের সান্নিধ্য লাভ করিতে হইবে ; জলে, স্থলে, আকাশে, শিলায় বা প্রতিমায়, মনে বা প্রাণে বা আত্মায়, যেখানে তুমি মা বলিতে উদ্যত হইবে, যেখানে তুমি মাতৃত্ব আরোপ করিবে, সেইখানেই তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া মা বলিবে। এই শিলায় মা আছেন—কিন্তু এ শিলা মা নহে ; এই প্রতিমায় মা আবির্ভূতা হইয়াছেন, কিন্তু এ প্রতিমা মা নহে, এই জগতে সর্ব্বতোভাবে মা রহিয়াছেন, কিন্তু এ জগৎ মা নহেন, এরূপ ভাবিও না। মা-ই শিলা হইয়াছেন, মা-ই প্রতিমামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, মাই জগৎরূপে জগজ্জননী সাজিয়া আপনার অসীম স্নেহ-পারাবারকে সসীম ভোগের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন, এইরূপ ভাবিবে ; তবেই গতসঙ্গ হইবে। নতুবা শুক্তিকায় রজতভ্রমের মত ধারণা করিও না—ইহা জগৎ নহে—মা ; এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইও না, তাহা হইলে গতসঙ্গ হওয়া হইবে না। আপনাকে ভ্রান্ত জীব ভাবিয়া, মায়ের এ কর্ম্মাগারকে ভ্রান্তিময় ভাবিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইও না। বল, মাই জগৎরূপে সাজিয়াছেন, বল—মাই জগৎরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, বল—সাক্ষাৎ মাই সাকার হইয়া রহিয়াছেন ; নিরাকারত্ব অবিকৃত রাখিয়া, সাকার সসীম হইয়া, সসীম জ্ঞানের সসীম ভোগে জীবকে—আপনাকে—আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, তবেই মুক্ত হইবে—তবেই গতসঙ্গ হইবে।

কর্ম্ম—চৈতন্যের প্রবাহ মাত্র। তুমি সে শক্তিপ্রবাহে থাক, তাহার সঙ্গ কর, কিন্তু তাহার ফলের সঙ্গ করিও না। চৈতন্যের এক প্রকারের প্রবাহ ব্যতীত জগৎ অন্য কিছু নহে ; সেই প্রবাহ-জনিত যে নাম-রূপাদি অনুভূতিতে পাই অর্থাৎ সে প্রবাহ যেরূপে আমাদিগের গ্রাহ্যে আসে, যে আকারাদি তাহাতে প্রকটিত হয়, তাহাকেই জগৎ বলে। চৈতন্যপ্রবাহ যেন কর্ম্ম, আর এই জগৎপ্রকটন যেন তাহার ফল। মা আমার বলেন—এই ফলের স্বাধীন সত্তার সঙ্গ ত্যাগ কর, কর্ম্মের নহে। মনে কর—একখণ্ড বরফ। বরফের বরফত্ব মাত্র দর্শন করিও না, জলাত্মক বরফ দেখ। আবার জলে জলত্বমাত্র দর্শন করিও না, অপ্‌তত্ত্বময় জল দেখ। অপ্‌তত্ত্বের সঙ্গ কর ; জলত্ব ও বরফত্বরূপ শক্তিপ্রবাহের একমাত্র আশ্রয় যে অপ্‌তত্ত্ব, তাহাই দর্শন কর, তদাত্মক জল ও বরফ দর্শন কর। এইরূপে দেখিতে দেখিতে জল ও বরফ আর দেখিতে পাইবে না—অপ্‌তত্ত্বমাত্র

উদ্ভাসিত হইবে। বরফ বা বরফত্ব যে নাই বা অধ্যাস বা ভ্রান্তি, এমন মনে করিও না, তুমি অপ্‌তত্ত্বেরই জলমূর্ত্তি বলিয়াই দেখিবে। মায়ে জগত্ব যে নাই বা অধ্যাস বা ভ্রান্তি, তাহা নহে; তুমি সচেতন জগন্মূর্ত্তি দর্শন কর। বরফের জলকণাসকল চৈতন্যবান্ হইলে যেমন তাহারা আপনাদের জলকণাত্বই ভোগ করিত, বরফ সমস্তকে জলকণাময় বলিয়াই ভাবিত, আবার জলকণাসকলের অভ্যন্তরস্থ যে অপ্‌তত্ত্ব বা রসকণা, তাহারা যেমন সে বরফকে রসময় বলিয়াই বুঝিত, জলত্ব বা বরফত্ব বুঝিতে সক্ষম হইত না, তদ্রূপ আমরাও আমাদিগের দর্শন অনুযায়ী মাত্র চৈতন্যময় বা মাত্র শক্তিময় বা মাত্র জড় বলিয়া এ ব্রহ্মাণ্ডকে দর্শন করিতে পারি। আবার সমস্তকে এক করিয়া চিন্ময় জগৎ দেখিতে পারি। বরফত্ব যেমন ক্ষিতিধর্ম্মীয় বিস্তার, অথচ তাহার অন্তর্গত জলকণাসমষ্টির জলত্ব যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে, আবার জলকণাসমষ্টিতে যেমন অপ্‌ বা রসকণা অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্রূপ জগৎরূপে প্রকটিত হইয়াও ইহাতে শক্তি ও শক্তিতে চৈতন্য, সুতরাং জগৎ সাজিয়া মা নিত্য অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। চক্ষু উন্মেষিত করিয়া বা মুদ্রিত করিয়া মা ছাড়া আর কি দেখিবে রে?

বিকার কোথায়? পরিণাম কোথায়? ভ্রান্তি কোথায়? যে মাকে অন্বেষণ করে, সে কি আর কিছু দেখিতে পায়? মায়ের জন্য যার প্রাণ অধীর হইয়াছে, তাহার চক্ষের অন্তরালে মা কি লুক্কায়িত থাকিতে পারে? মা দেখিতে চাহ—মা দেখিবে; জগৎ দেখিতে চাহ—জগৎ দেখিবে; চিন্মাত্র দেখিতে চাহ, চিন্মাত্র দেখিবে। মা দুর্জ্ঞেয়া নহে, দুর্জ্ঞেয় তুমি।

চারি ধারে যে দিকে চক্ষু ফিরাও, সর্ব্বত্রই ত অপরিণামিতার দৃষ্টান্ত উদ্‌ভাসিত রহিয়াছে। জলে, স্থলে, অনলে, বায়ুতে, আকাশে, কোথায় কি বিকৃত হইয়াছে? কি পরিণমিত হইয়াছে? কোথায় তত্ত্ব তত্ত্বত্ব ছাড়িয়াছে? তবে যাহা সাধারণতঃ জগৎ বলিয়া দেখি, তাহা কি? নাম রূপ আদি কি? দেখ, যেমন জল রসতত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছু নহে। উহার ধর্ম্ম—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। রস বা অপ্‌তত্ত্ব অন্যান্য তত্ত্বের সহিত কোন এক বিশেষ পরিমাণে মিলিত হইলে জলত্ব প্রাপ্ত হয় এবং রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে বা অনুভূতিতে আসে; কিন্তু যদি উহার মাত্রার হ্রাস হয়, অর্থাৎ যদি জলকণাসকল বাষ্পাকার গ্রহণ করে, তাহা হইলে যেমন উহা জল না থাকিয়া, বাষ্পরূপে বায়ুতে থাকে এবং রসনেন্দ্রিয়ের অনুভূতির বহির্ভূত হইয়া যায়—আবার আরও যদি মাত্রার বা পরিমাণের হ্রাস হয়, তাহা হইলে রূপতত্ত্বও ছাড়ে ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বহির্ভূত হয়, এবং মাত্র শৈত্য-বশতঃ স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে প্রকটিত থাকে, আবার তাহা হইতে সূক্ষ্মত্ব লাভ করিলে মাত্র শব্দাত্মক থাকে, আর অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে আসে না, তদ্রূপ সমস্ত বুঝিবে। শুধু মাত্রার তারতম্য। শব্দধর্ম্মী আকাশতত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মতর মনাদিতে পদার্থ বিলয়ের কথা পরে বলিব। এখন শুধু ধারণা কর, আমরা যাহাকে বিষয়বিলীন বলি,

তাহা এই প্রকার। শুধু পরিমাণের মাত্রার পার্থক্য। যত ক্ষণ জড় পঞ্চভূতাত্মক, তত ক্ষণ আণবিক মাত্রার তারতম্য ; আর যখন মনাদি অন্তস্তত্ত্ব, তখন ইচ্ছার তারতম্য। জগৎ এই প্রকার, প্রধানতঃ শুধু চৈতন্যময়ীর ইচ্ছার বৈচিত্র্য মাত্র।

এইরূপ দেখার নাম—গতসঙ্গ হওয়া। ফল বা ভূততত্ত্বাদিময় জগৎ চৈতন্যময় দেখিলেই মা চৈতন্যে প্রকটিতা হয়েন। তখন মাতৃসঙ্গ হয়, কর্ম্মময়ী হইয়াও যে মা নিষ্কর্ম্মা, সেই মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। গতফলসঙ্গ হইয়া জীব মুক্ত হয়। মুক্ত হওয়া অর্থে এখানে বিষয়ানুরাগ হইতে বিমুক্ত হওয়া। পূর্ব্বোক্তরূপে জীব গতসঙ্গ হইলে অর্থাৎ এক কথায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জগৎকে বিষয়মাত্র না দেখিয়া, মায়ের একপ্রকার ব্যবহার বলিয়া বোধ করিলে, জীবের প্রাণ আর বিষয়ত্বে যুক্ত থাকে না, মাতৃত্বেই সংযুক্ত হয়। জগৎ তুচ্ছ হয়, কিন্তু জগন্ময়ী তুচ্ছ হন না। মৃত ব্যক্তির স্থূলদেহ যেমন তুচ্ছবোধে নিক্ষিপ্ত হইলেও এবং আত্মীয়াদির অনুরাগ, গত আত্মারই অনুসরণ করিলেও, জীবিতাবস্থায় যেমন জীবদেহ আত্মার সহিতই অনুরাগাদি দ্বারা সেবিত হয় এবং ব্যবহারত কেহ যেমন দেহ বাদ দিয়া মাত্র আত্মার সহিত ব্যবহার করিতে প্রয়াস পায় না, তদ্রূপ গতসঙ্গ হইবার পূর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানে যখন জগৎ ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র উদ্ভাসিত থাকে, তত ক্ষণ মাতৃঅন্বেষীর চক্ষে জগৎ তুচ্ছ বলিয়া প্রতিফলিত হয়, কিন্তু মায়েরই ব্যবহার বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইলে, জগৎ মাতৃপূজার সঙ্গেই পূজিত হইয়া পড়ে। কুরূপ পুত্রের কুরূপত্বে মা যেমন সৌন্দর্য্য-বিকাশই দেখিতে পায়, গতসঙ্গের চক্ষে জগৎ তদ্রূপ মাতৃসৌন্দর্য্য বলিয়াই প্রতীত হয়। মা বলিতে যেমন কেহ মায়ের দেহ-সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করে না, স্নেহ-সৌন্দর্য্যই সন্তানের চক্ষে উদ্ভাসিত হয়, এবং মায়ের সর্বাঙ্গই যেমন স্নেহ-সৌন্দর্য্যের বিমল শোভায় মণ্ডিত দেখা যায়, তদ্রূপ জগদ্ব্যবহারের স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য না দেখিয়া, চৈতন্যের সৌন্দর্য্যেই জগৎ বিমণ্ডিত হইয়া গতসঙ্গের চক্ষে ভাসে। জগতের শোভা স্বতন্ত্র হিসাবে, শুধু জগৎ হিসাবে তুচ্ছ, হেয়, ত্যাজ্য ; কিন্তু মাতৃঅঙ্গ বলিয়া বুঝিলে শুধু স্নেহেরেই সৌন্দর্য্য বলিয়া বোধ হয় ; এবং পরে ব্যবহার লক্ষ্যবহির্ভূত হইয়া, ব্যবহারক আত্মাকে মিলাইয়া দেয়।

দেখ, আত্মদর্শন কি জান,—আপনাকে আত্মায় হারাইয়া ফেলা। মা যখন পুত্রকে দেখে—তখন মা আপনাকে পুত্রে হারাইয়া ফেলে ; পুত্র যখন মাকে দেখে তখন পুত্র মায়ে আত্মহারা হয়। সুতরাং আত্মাতে আত্মা হারাণই বা আত্মদর্শনই শেষ ও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু স্নেহ-ব্যবহারই যেমন জীবকে জীবের দিকে আকর্ষণ করে—পুত্র যেমন স্তনাদি ব্যবহারেই মায়ে মুগ্ধ হয়, মা যেমন গর্ভকাল হইতে নিত্যাশ্রিতভাবে পুত্রের অবস্থানরূপ ব্যবহারের দ্বারাই স্বীয় মাতৃত্ব তাহার উপর ঢালিয়া দেয়, তদ্রূপ জগদ্ব্যবহার মায়ের ব্যবহার বলিয়া চিনিলে আত্মদর্শনের দিকেই অগ্রসর করে। যাঁহারা জগৎকে ব্যবহারিক বলেন, তাঁহারা যদি ইহা আত্মারই ব্যবহার বলিতেন, তবে আর অধ্যাসাদির অবতরণিকা

করিয়া জগৎকে অভিনব ভ্রান্তির অধ্যাসে আবৃত করিতে হইত না। আবার যাঁহারা মুক্তাবস্থায় জীবের জীবত্বকেই রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা আত্মদর্শনের আত্মহারা মিলনের মধ্যস্থলে বিচ্ছেদের কণ্টক প্রোথিত করিয়া, আত্মমিলনকে দেহীর মিলনমাত্রে পর্য্যবসিত করিতেন না।

যাহা হউক, গতসঙ্গ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাতৃ-ব্যবহার বুঝিয়া জীব বিষয় ভোলে—বিষয়ানুরাগমুক্ত হয়; এবং জগৎকে অখণ্ড জ্ঞানের ব্যাপ্তি বুঝিয়া, সে জ্ঞানে অবস্থান করিতে ক্রমশঃ সক্ষম হয়। তখন জগতের সমস্ত কর্ম্ম মাতৃযজ্ঞ বলিয়াই উপলব্ধিতে আসে। সেই জন্য তাহারা মাতৃঅঙ্গে বিলীন হইয়া যায়। কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর শারীর কর্ম্ম এবং গৃহীর শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য, সমস্তই গতসঙ্গ হইলে তবে চক্ষে বিলীন হয়, নতুবা নহে; ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। শুধু সন্ন্যাসী হইয়া কর্ম্মত্যাগী হইলে বা শুধু গৃহী হইয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিলে কর্ম্ম বিলুপ্ত হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—কর্ম্মফলাসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইলে, নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় হইতে হয়, এবং নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় হইতে হইলে সন্ন্যাসাশ্রমী বা গৃহী যেই হউক, তাহাকে গতসঙ্গ, মুক্ত ও জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত হইতে হয়। জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত অর্থে সত্যপ্রতিষ্ঠ। সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে জগতের সমস্ত কর্ম্ম মাতৃযজ্ঞ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, এবং সাধারণ কর্ম্ম করিয়াও আপনাকে যজ্ঞকর্ত্তা বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ তাহার সমগ্র জীবন মহাকর্ম্মপ্রবাহ—একটি মহামাতৃযজ্ঞ সম্পাদন বলিয়া উপলব্ধি করে। এবং তখনই তাহার কর্ম্মসকল ফল সহ ব্রহ্মে বিলীন হইতে থাকে। তাহা ভগবান্ বলিতেছেন।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ২৪

অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মণা ব্রহ্মাগ্নৌ হুতং ব্রহ্ম। তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্।

ব্যবহারিক অর্থ।—ব্রহ্মই অর্পণ অর্থাৎ ক্রিয়াসাধক করণসমূহ, ব্রহ্মই হবিঃ অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্ম্ম, ব্রহ্মই অগ্নি অর্থাৎ ক্রিয়ার আধার, ব্রহ্মই কর্ত্তা, ক্রিয়া এবং কালাদিরূপে দৃশ্য হন; এবং এইরূপ ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি পুরুষই ব্রহ্মরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—এই শ্লোকের প্রথম পাদে কর্ম্মবিলয় ও দ্বিতীয় পাদে ফলবিলয় লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাধকের বা পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের চক্ষে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ, সমস্তই ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। অর্পণরূপ ক্রিয়া—ব্রহ্ম, হবিরূপ অর্পিত পদার্থ—ব্রহ্ম, যাহাকে অর্পণ করা যায়, অগ্নিরূপী সে পদার্থ ব্রহ্ম—অর্পণকর্ত্তাও ব্রহ্ম। ব্রহ্মকর্ম্মসমাহিত পুরুষদিগের পক্ষে এইরূপে সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মাভিমুখী হয়। সমস্ত কর্ম্মের সাহায্যে তাহারা ব্রহ্মমুখেই অগ্রসর হয়। অর্পণাদি ব্যবহার, হবিরাদি নামরূপ, অগ্ন্যাদি শক্তিপ্রবাহ, হবনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব—এ সমস্ত

শুক্তিকা আদিতে রজত-ভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তি নহে, পরন্তু মাতৃমুখী সন্তানের মাতৃত্ব লাভের জন্য মায়েরই বিচিত্র ব্যবহার বা সাক্ষাৎ মা। যাহা দেখিতেছি, তাহা মা—যাহা করিতেছি, তাহা মা—যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সমস্তই মা। ব্রহ্মকর্ম্মসমাহিত পুরুষ, এইরূপে কর্ম্মাত্মক জগৎকে মা বলিয়াই পরিদর্শন করে। সুতরাং ফলবিলয়ও হয়। জগতের সমস্ত কর্ম্ম এক মহান্ যজ্ঞ বলিয়া তাহাদিগের চক্ষে বিম্বিত হয়। তাহারা দেখে প্রাণময়ী মা আমার প্রাণরূপ হবি বা স্বীয় মাতৃত্ব জ্ঞানাগ্নিরূপ ব্রহ্মে অহর্নিশ ঢালিয়া দিতেছেন। তাই জীবব্রহ্মও স্বীয় জ্ঞানাগ্নিব্রহ্মে কর্ম্মব্রহ্ম অর্পণ করিতেছে; এবং এই সমস্ত ঘটনাটি এক সঙ্গে দেখিলে, যে মহা অর্পণরূপ একটি কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ব্রহ্ম। সুতরাং তখন জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়, ফলান্তর থাকে না।

কর্ত্তা ত ব্রহ্মই; কিন্তু মাত্র তাহা নহে, আহুতি দেওয়ারূপ কার্য্যটিও ব্রহ্ম। যাঁহারা কার্য্য মিথ্যা, কারণ সত্য, এরূপ একটি যুক্তি পোষণ করেন, তাহারা বলেন যে, "এ অধ্যায়ে ভগবান্ জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন, সুতরাং এ শ্লোকের অর্থ ওরূপ করিলে চলিবে না; প্রতিমাদিতে দেবতাবুদ্ধি আরোপের মত কার্য্যে ব্রহ্মারোপ ভগবানের অভিপ্রেত নহে।" কিন্তু সে যুক্তি ভিত্তিহীন। ভগবান্ যে জ্ঞান, যে বুদ্ধিযোগ দিবার জন্য এ মহাগীতি গাহিয়াছেন, সে বুদ্ধিযোগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অর্থ আবিষ্কার করা সাম্প্রদায়িকতা মাত্র। কর্ম্মকে উড়াইবার জন্য গীতা নহে—কর্ম্মকে জ্ঞানময়, মাতৃময়, ব্রহ্মময় করিবার জন্য গীতা। ইহা গীতার ছত্রে ছত্রে সুপ্রকাশ। বস্তুতঃ শুধু এই শ্লোকটিতে তাহার পূর্ণ আভাস প্রকটন করিয়াছেন, এবং ওই আভাস দিবার জন্যই "ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নতুবা তিনি "ব্রহ্মসমাধিনা" বলিতেন। 'ব্রহ্মৈব কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম, তস্মিন্ সমাধির্যস্য স ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিঃ, তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।' ব্রহ্মই কর্ম্ম, অধ্যাস বা অন্য কিছু কর্ম্ম নহে; এইরূপ কর্ম্মময় ঈশ্বরভাবেই মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে মা আদেশ করিয়াছেন। এবং এইরূপ জ্ঞানাবস্থিত ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি পুরুষদিগের কথাই ভগবান্ এ স্থলে বর্ণনা করিতেছেন। সুতরাং অধ্যাসবাদ আনিয়া শুধু পাণ্ডিত্যের অপচয় করা হইয়াছে মাত্র। যাহারা জ্ঞানপ্রকরণ বলিয়া এ স্থলে কর্ম্মপ্রসঙ্গ বলা অসঙ্গত বিবেচনা করে, তাহারা পরবর্ত্তী কর্ম্মবর্ণনাত্মক শ্লোকগুলির বেলায় কি প্রকারে ভগবদুক্তির সমর্থন করিবে ? জ্ঞানযোগের ভিতর কর্ম্ম বিচার করিয়া এবং কর্ম্মযোগের ভিতর জ্ঞানের বিচার করিয়া, ভগবান্ অলৌকিকত্বই দেখাইয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানবিচার প্রধান, আর চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ, কিন্তু উহা কর্ম্মবিচার-প্রধান। জ্ঞানের ভিতর কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ভিতর জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করাইবার জন্যই ভগবানের এই গীতা প্রচার। ইহাই গীতার গৌরব, ইহা যেন মনে থাকে।

আচ্ছা—বলি। তোমরা সর্ব্বত্র মাকে আমার অবিকৃত থাকিয়া কর্ম্মময়ীরূপে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখিতে কি পাও না? বিশ্বাস কি এতই তোমাদের অল্প?

থাক, অথচ কেমন করিয়া তাহার এ অপূর্ব্ব স্নেহমহিমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া মায়ের ক্রোড়ে উঠিতে চাহ ? যে মাকে ভালবাসে সে কি মাতৃব্যবহারে দোষ দেখিতে পায় ? দেখ, কাহাকেও যদি শত্রু বলিয়া ধারণা থাকে, তবে তাহার প্রত্যেক ব্যবহারই যেমন শত্রুতারই পরিচায়ক হয়, সে সদ্ব্যবহার করিলেও যেমন তাহার ভিতর আমরা অসৎ উদ্দেশ্যই খুঁজিয়া বাহির করিয়া লই, তোমাদিগের বিচার কি ঠিক তদ্রূপ নহে ? হাতের রত্ন দূরে নিক্ষেপ করিয়া, রত্নের জন্য দেশ-দেশান্তরে ধাবিত হইতেছ। আত্মীয়তার পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিয়াই ত লোকে আত্মহারা হয়। আত্মদর্শন ত জীবভাবীয় আত্ম হারাইয়া ফেলা, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে জীবাত্মক ভাব হারাইয়া ফেলিতে বা আত্মহারা হইতে তোমরা আত্মীয়তাকে বর্জ্জন করিতে চাহ কেন ? যাঁহার মুখের বাক্য এই গীতা, তাহাকে কি তোমরা ঈশ্বর বলিয়া মান না ? যদি মান, তবে তাহার ঈশ্বর ভাবটিকে সাময়িক অধ্যাস বা ভ্রান্তিমাত্র বলিয়া বুঝিয়া, কেমন করিয়া তাহারই বাক্য লইয়া আপনাদিগের সাম্প্রদায়িক মত পোষণ করিবার প্রয়াস পাও ? তাঁহার ঐশ্বরিক ব্যবহার মিথ্যা বা ভ্রান্তি না বলিয়া, অমৃতময় স্নেহময় সত্য বলিতে কি সাধও যায় না? সাম্প্রদায়িক আত্মগরিমা কি ভগবৎপ্রেমও ডুবাইয়া দেয় ? এই প্রেম বুকে লইয়া তোমরা সন্ন্যাসী হইতে চাহ ?

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫

অপরে যোগিনঃ দৈবং এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে। অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এব যজ্ঞং উপজুহ্বতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—দর্শনের তারতম্যে কর্ম্মসকল দৈব যজ্ঞ অথবা ব্রহ্মযজ্ঞ হয় অর্থাৎ বন্ধন অথবা মুক্তিপ্রদ হয়। ব্রহ্মদর্শনশূন্য কর্ম্মীর কর্ম্মসকল দৈব যজ্ঞমাত্র হয় এবং ব্রহ্মদর্শনযুক্ত পুরুষ কর্ম্মের সাহায্যেই ব্রহ্মযজ্ঞ করে অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে গতসঙ্গ, মুক্ত ও জ্ঞানাবস্থিত অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। সেই অবস্থায় কর্ম্মাত্মক জগৎ যে ভাবে প্রতিফলিত হয়, ব্রহ্মার্পণমাদি শ্লোকে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত জ্ঞান, গতসঙ্গ না হইলে হয় না। তাই গার্হস্থ্য কিম্বা সন্ন্যাস আশ্রমের পার্থক্যে ফলের পার্থক্য হয় না। জ্ঞানের পার্থক্যানুসারেই ফলের পার্থক্য হইয়া থাকে, এইটুকু বিশেষ করিয়া বলিবার জন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন। যোগিনঃ অর্থে যোগেচ্ছু পুরুষ বুঝিতে হইবে। গৃহী কর্ম্মযোগী বা সন্ন্যাসযোগীকে লক্ষ্য করিয়া এ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। ভগবান্ বলিতেছেন, যাহারা পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞানসম্পন্ন নহে অর্থাৎ যাহারা গতসঙ্গ হয় নাই বা গতসঙ্গতার উপর লক্ষ্য রাখে নাই, এক কথায় যাহারা সর্ব্বত্র মাতৃপরিদর্শন করে নাই, তাহারা সন্ন্যাসীই হউক বা গৃহীই হউক, দৈব যজ্ঞই করিয়া থাকে। তাহাদিগের কার্য্য-সকল বিশেষ বিশেষ দেবতার সাধনামাত্র হয়। আর যাহারা

উক্ত জ্ঞানসম্পন্ন হয়, যাহারা এ কর্ম্মময় জগৎকে মায়ের যজ্ঞাগার বলিয়া দর্শন করে ও মাতৃবেদনে সংবেদিত হয়, তাহাদিগের যজ্ঞরূপ কর্ম্মের সাহায্যে নির্গুণ ব্রহ্মে আহুতি অর্পিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াই ব্রহ্ম লাভ করে। তাহা সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কর্ম্মই হউক বা গার্হস্থ্যোচিত কর্ম্মই হউক। দৈব যজ্ঞ কাহাকে বলে? যে কর্ম্মের দ্বারা বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট চৈতন্য বা দেবতার আরাধনা করা হয়, তাহাকে দৈব যজ্ঞ বলে। শুধু দেবতার আরাধনাদি করিলেই যে দৈব যজ্ঞ হয়, তাহা নহে। সাধারণ কর্ম্ম করিলেও যে অজ্ঞাত ভাবে দেবতারই সাধনা করা হয়, তাহাও এ স্থলে দৈব যজ্ঞ বলা হইয়াছে। দেবতার কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট মাতৃচৈতন্যের নাম দেবতা। কেমন করিয়া মাতৃদর্শনহীন কর্ম্মসকল দৈব যজ্ঞ হয়, মাতৃযজ্ঞ হয় না এবং মাতৃদর্শনযুক্ত কর্ম্মসকল কেমন করিয়া মাতৃযজ্ঞ হয়, দৈব যজ্ঞ হয় না, তাহা ভগবান্ পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬

অন্যে সন্ন্যাসিনঃ শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি। অন্যে গৃহস্থাঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—সন্ন্যাসীরা যে ইন্দ্রিয়াদি নিরোধরূপ কর্ম্ম করে, তাহা সত্যদর্শন না থাকিলে মাত্র সংযমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়; এবং সেইরূপ গৃহীরাও সত্যদর্শন শূন্য হইলে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে বিষয়াহুতি দেয় মাত্র অর্থাৎ তাহাদিগের কর্ম্মসকল বন্ধনমাত্র হয়, ব্রহ্মদর্শন না থাকায় মুক্তিপ্রদ হয় না।

যৌগিক অর্থ—এই শ্লোকটির প্রথম পাদটি সন্ন্যাসাশ্রমীদিগকে লক্ষ্য করিয়া এবং দ্বিতীয় পাদটী গার্হস্থ্যাশ্রমীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। ভগবান্ বলিতেছেন, মনে কর—তুমি সন্ন্যাসী, কিন্তু তুমি বুদ্ধিযোগের সাহায্যে মায়ের সহিত সংযুক্ত নহ। তুমি সন্ন্যাসোচিত বাহ্য লক্ষণ-সকলকে আপনার উপর ফুটাইয়া তুলিতেছ। ত্যাগ সন্ন্যাসের বাহ্য লক্ষণ। তুমি জগন্ময় মাকে না দেখিয়া, এ জগৎকে মায়েরই স্বেচ্ছাকৃত ক্ষুদ্র জগদ্‌বেশ বলিয়া না বুঝিয়া, ইহাকে মা হইতে স্বতন্ত্র বা মাতৃ-প্রকাশের উপরিস্থ কোনও মিথ্যা মোহ বলিয়া বুঝিয়া, তুমি ইহার পরিত্যাগেই যত্নবান্ আছ। এইরূপ অবস্থা যদি তোমার হয়, তাহা হইলে বুঝিও, কার্য্যতঃ তুমি সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়াদিকে আহুতি দিতেছ মাত্র, ব্রহ্মাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া তোমার আত্মাহুতি সম্পন্ন করা হইতেছে না অর্থাৎ তোমার ব্রহ্মযজ্ঞ হয় নাই—সংযমযজ্ঞই হইতেছে; তোমার মাতৃদর্শন হয় নাই—ত্যাগই দর্শন হইতেছে; তুমি মায়ের অনুসরণ কর নাই, ত্যাগের অনুসরণ করিতেছ।

অথবা মনে কর—তুমি গৃহী। তুমি সমস্ত কর্ম্ম সংসাধিত করিতেছ অথচ বুদ্ধিযোগের সাহায্যে তুমি মাতৃযুক্ত হও নাই। তুমি কর্ম্ম করিতেছ, কিন্তু জগৎকে মা

বলিয়া না দেখিয়া, জগৎমাত্রই দর্শন করিতেছ। তুমি বহু যজ্ঞাদিতে বা জপ, তপ, উপাসনা প্রভৃতি কার্য্যে নিত্য রত আছ অথচ সেই কার্য্য-সকলকে কার্য্যমাত্র বলিয়াই জান, মাতৃইচ্ছার স্ফুরণ বলিয়া ধারণা কর নাই বা মা বলিয়া দেখ নাই। কার্য্যতঃ তুমি নিত্য জপ-যজ্ঞশীল হইয়াও বা বিষয়রূপে মাতৃভোগী হইয়াও ইন্দ্রিয়াগ্নিতে বিষয়রূপ আহুতি প্রদান করিতেছ মাত্র।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

অপরে সত্যদর্শনশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি, তথাভূতাশ্চ গৃহস্থাঃ জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ প্রাণকর্ম্মাণি জুহ্বতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—সর্ব্বত্র সত্যদর্শী সন্ন্যাসিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম্মসমূহ এবং তথাভূত গৃহস্থগণ বহির্জগতে হৃদয়ে আদানপ্রদানরূপ প্রাণকর্ম্মসমূহ আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে অর্থাৎ আত্মাতেই আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে মাতৃবেদনহীন যজ্ঞের কথা বলিয়া, ভগবান্ এইবার মাতৃবেদন-সংযুক্ত যজ্ঞের কথা এই শ্লোকে বলিতেছেন। কার্য্যাত্মক জগৎকেও মাতৃময় না দেখিলে, নাম ও রূপকে মায়েরই নাম ও রূপ বলিয়া না বুঝিলে, ব্যবহারিক জগৎকে মায়েরই স্নেহব্যবহার বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না করিলে, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, কাহারও কর্ম্ম কখনও সাক্ষাৎভাবে বন্ধনশূন্য হয় না, ইহাই পূর্ব্বশ্লোকটীর তাৎপর্য্য। আবার মাতৃবেদন-সংযুক্ত হইলেই, নামরূপাত্মক ব্যবহারিক জগৎকে মায়েরই নামরূপ বলিয়া বুঝিলে, যে কর্ম্মই হউক, তাহা মুক্তিপ্রদ হয়, এই শ্লোকে ইহা বলাই ভগবানের উদ্দেশ্য। বুদ্ধিযোগে মাতৃসংযুক্ত হইলে, সন্ন্যাসীর কার্য্য বস্তুতঃ যাহা হয়, 'সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি' শব্দের দ্বারা তাহাই লক্ষিত হইয়াছে; 'প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে' এইটুকু গৃহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। মাতৃজ্ঞানদীপিত সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়কর্ম্মসকল এবং মাতৃজ্ঞানদীপিত গৃহীর প্রাণকর্ম্মসকল কার্য্যতঃ পরমাত্মাতে সংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি অর্পণ করা হয় মাত্র। হে সন্ন্যাসী, যদি তুমি মাতৃলাভ করিব বলিয়া ইন্দ্রিয়-সকলকে সংযম করিতে অভ্যাস করিয়া থাক, যদি তুমি অন্তরস্থ মাকে দেখিবে বলিয়া আপনার শ্রোত্র চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে আপনার অন্তরাভিমুখে লইয়া গিয়া মায়ে সংন্যস্ত কর, তবেই তোমার সে সংযমের সার্থকতা আছে, নতুবা তোমার সংযম মাতৃত্যাগমাত্র—মাতৃলাভ নহে। আর হে গৃহী, তুমি প্রাণের আবেগে বহির্জগতে আপনার প্রাণকে যে ছুটাইয়া দাও, যদি আপনার সে প্রবাহিত প্রাণের সাহায্যে অন্তর্বাহ্যব্যাপিনী মাকে অন্তর্বাহ্যে পরিদর্শন করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে তুমি যাগ যজ্ঞ, ধ্যান পূজাদি যাহাই কর না কেন, উহা তোমার মাতৃত্যাগ মাত্র। আর যদি জগৎকে মা বলিয়া বুঝিয়া—জগদ্ব্যবহার মাতৃব্যবহার বলিয়া ধারণা

করিয়া, জগৎকে মূর্ত্তিমান্ সত্য দর্শন করিয়া, তাহাতে প্রাণ সমর্পণ কর, তাহা হইলে তুমি বাহ্য জগতে কর্ম্মী হইয়াও পরমাত্মাতে আপনাকে সংযত করিতেছ মাত্র। আত্মসংযম শব্দের অর্থ এই শ্লোকে পরমাত্মাতে সংযম, মায়ে সংযত হওয়া। ইন্দ্রিয়কর্ম্ম অর্থে শারীরিক কর্ম্ম। প্রাণকর্ম্ম অর্থে হৃদয়ের আদানপ্রদানযুক্ত কর্ম্ম।

সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং গৃহীদের পক্ষে প্রাণকর্ম্ম কথিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়সকলকে আত্মাভিমুখে সংযত করিতেই বিশেষ যত্নশীল হইয়া থাকে এবং গৃহীরা ইন্দ্রিয়নিরোধাদিতে তত পারগ হইতে পারে না; কিন্তু বাহ্য বিষয়ে সর্ব্বদা প্রাণারোপে অভ্যস্ত বলিয়া, তাহারা ভগবন্মুখী হইলে বিশ্বরূপাত্মক মূর্ত্তিতে মাকে সম্ভোগ করিতে সহজে সক্ষম হইয়া থাকে এবং উহাই তাহাদিগের প্রকৃত্যনুযায়ী হয়। যদি এরূপ সন্ন্যাসী ও গৃহী সম্প্রদায়গত বিভাগ না করিয়া, সমগ্র শ্লোকটি সর্ব্বসাধারণ পক্ষে উক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ক্ষতি হয় না। জ্ঞানদীপিত না হইলে সংযম অগ্নিতে এবং ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় এবং জ্ঞানদীপিত হইলে, ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম বা মন ও প্রাণ, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, কর্ম্ম ও সন্ন্যাস, সমস্তই পরমাত্মায় সংযমরূপ যোগাগ্নিতে অর্পিত হয়।

এই পর্য্যন্ত আমরা বুঝিলাম, যে আশ্রমেই থাক না কেন, জ্ঞানদীপিত হইলেই, মাতৃদর্শনযুক্ত হইলেই তবে আশ্রমোচিত চেষ্টাসকল কার্য্যকরী হইবে, আর জ্ঞানদীপিত না হইলে, মাতৃদর্শনযুক্ত না হইলে, সন্ন্যাস কি গার্হস্থ্য, আশ্রমমাত্রই বন্ধনমাত্র হইবে। তাই বলিতেছিলাম—সন্ন্যাসী যদি, তবে তুমি অন্তরে মাকে দর্শন কর; অন্তর্জগৎকে মা বলিয়া ধারণা কর। আর যদি গৃহী, যদি অন্তরে বিচরণ করিতে এখনও সক্ষম না হইয়া থাক, তবে শুধু বহির্জগৎকে মা বলিয়া ধারণা কর। তোমাদের উভয়েরই অন্তর বাহ্য এক হইয়া যাইবে, তোমরা উভয়েই অন্তরে এবং বাহিরে মাকে দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে। মায়ের সর্ব্বব্যাপিনী সত্তায় বিশ্বাস করিলে এবং মাকে দেখিবার সাধ প্রাণে উদ্বোধিত হইলে তবে জ্ঞানদীপিত হওয়া যায়।

সন্ন্যাসী বা গৃহী, যেই হও না কেন, আমি তোমাদের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—বল দেখি, বস্তুতঃ তোমাদিগের মাতৃদর্শনের সাধ প্রাণে জাগিয়াছে কি? যাহার মাতৃদর্শনের সাধ প্রাণে জাগিয়াছে, সেই অনায়াসে মাতৃসান্নিধ্যে বসবাস করে। তোমরা মাতৃসত্তায় বিশ্বাসবান্ হইয়াছ কি? সর্ব্বতঃ জীবন্ত মাতৃসত্তা সপ্রকাশ। সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশ করিয়া যে মা প্রতি পরমাণুতে আপনার চৈতন্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন, সে মাকে দেখিতে তোমরা এত মাথা ঘামাও কেন? যদি মাতৃসত্তায় বিশ্বাসবান্ হইয়া থাক, তাহা হইলে প্রতি পরমাণুর অন্তরাল দিয়া মাতৃচক্ষু দেখিতে পাইবে। যদি বিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে তোমাদিগের জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির আড়ম্বর আবর্জ্জনার মত তোমার হৃদয়ের আবরণ পরিবর্দ্ধিত করিবে মাত্র। মাতৃসত্তায়

বিশ্বাসবান্ হওয়া আর মাতৃসম্মুখে উপনীত হওয়া, ইহা একই কথা। মাতৃসত্তায় বিশ্বাসবান্ হইয়া কর্ম্ম করা আর মাতৃসত্তায় বিশ্বাসবান্ হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করা, ইহা একই কথা। জ্ঞানের চরম সীমা বিশ্বাস। জ্ঞান ঘনীভূত হইলেই বাক্যগত না থাকিয়া, মর্ম্মগত হইয়া নিত্য সত্য আত্মসত্তার প্রতিভাস পাইয়া বিশ্বাসে পরিণত হয়। হৃদয় জ্ঞানদীপিত হইলে বিশ্বাসের অচল-প্রতিষ্ঠ সিংহাসন মায়ের জন্য রচিত হয়। যদি তোমার হৃদয়ে সর্ব্বব্যাপিনী জননী সর্ব্বত্র দর্শন করিতে এখনও শক্তি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিও, তোমার জ্ঞান জন্মাইতে এখনও বিলম্ব আছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, বিশ্বাস অন্ধ। অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া সাধন-জগতে একটি শব্দ প্রচলিত আছে। অন্ধ বিশ্বাস বলা আর আলোকহীন সূর্য্য বলা একই কথা। বিশ্বাস করিবামাত্র, বিশ্বাস জন্মিবামাত্র, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র বিশ্বাসীয় পদার্থ সুপ্রকাশ হইয়া পড়ে, লব্ধ হয়। বিশ্বাস হৃদয়ে আসিলে পর্ব্বত পথ ছাড়িয়া দেয়, বিদ্যুৎ দাসত্ব করে, আকাশ আপনার বক্ষ চিরিয়া বিশ্বাসময়ী মাকে আমার দেখাইয়া দেয়। বিশ্বাস ধূলিকে মুহূর্ত্তে সুবর্ণ করে—অগ্নিকে মুহূর্ত্তে শীতল করে—অন্ধকারকে মুহূর্ত্তে আলোকময় করে, নির্গুণা হৃদয়হীনা মাকে আমার সগুণা, স্নেহময়ী, হৃদয়ময়ী করিয়া চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। মাতৃসত্তায় বিশ্বাসবান্ পুত্র মা বলিয়া ডাকিলে, কোথায় কি তুচ্ছ অজ্ঞানতা থাকিতে পারে, যাহা সে আকুল আর্ত্তনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাকে লুক্কায়িত রাখিতে সমর্থ হয়? এমন যে বিশ্বাস, যাহার ফল এমনই অচিরলভ্য, তাহাকে কেমন করিয়া লোকে অন্ধ বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। যাহাকে তোমরা অন্ধ বিশ্বাস বল, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, কেমন করিয়া তাহা লব্ধ হয়? বহু জন্ম ধরিয়া জ্ঞান পুঞ্জীভূত হইয়া বিশ্বাস আকারে পরিণত হয়। বহু জন্ম ধরিয়া বহু বহু সংশয়কে ছিন্ন করিতে করিতে, বহু জন্ম ধরিয়া—নাস্তিক ভাবের ভিতর হইতে হৃদয়ের রক্তপাত করিয়া আস্তিকতা বাহির করিলে তবে অন্ধ বিশ্বাস হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। তোমরা কি জান, তোমরা কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব হইয়া, তবে আজ জ্ঞানের বিচার করিতেছ? তোমরা কি দেখিতে পাও নাই—যখন একটি ক্ষুদ্র চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়হীন ক্রিমিকে পিপীলিকারাশি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে, তখন তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্বীয় পরিত্রাণের পথ আবিষ্কারের জন্য মর্ম্মন্তুদ ব্রহ্মাণ্ডকম্পী আর্ত্তনাদ উছলিয়া উছলিয়া কোন্ এক দয়াময়ী মায়ের দিকে ধাবিত হয়? তোমরা কি দেখিতে পাও না, সেই আর্ত্তনাদের ফলস্বরূপ, স্নেহময়ী মায়ের স্নেহের নির্ম্মল ধারা আসিয়া সে জীবকে পরজন্মে চক্ষুষ্মান্ করে? এমনই জগতের প্রতি স্তরে স্তরে প্রতি পরমাণুর ইতিহাস দর্শন কর; দেখিতে পাইবে, অন্তর্য্যামিনীর অন্তরের দান—জ্ঞানের ক্ষুদ্র রশ্মি ধরিয়া আসে নাই,—কেবল বিশ্বাস ও প্রার্থনার আকুল আহ্বান ধরিয়া আসিয়াছে। এবং সে প্রার্থনা কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য আশ্রয়দায়িনী করুণাময়ীর সত্তায় আত্মিক বিশ্বাস হইতে

সমুদ্ভূত। বিশ্বাস এক হিসাবে অন্ধ। বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা বিশ্বাস্য বিষয়ের প্রতিকূলে আর কিছু দেখিতে পায় না এবং উহাই বিশ্বাসের শক্তি। বিশ্বাস অন্য হিসাবে আলোক ; কেন না, উহাই বিষয় আবিষ্কার করিয়া আনিয়া উপস্থিত করে।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮

কেচিৎ দ্রব্যযজ্ঞাঃ, কেচিৎ তপোযজ্ঞাঃ, কেচিৎ যোগযজ্ঞাঃ, তথা অপরে সংশিতব্রতাঃ যতয়ঃ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ।

ব্যবহারিক অর্থ।—সাধারণ কর্ম্মযজ্ঞকারীদিগের মধ্যে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ এবং স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞরূপ চারি প্রকার ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। এবং এই চতুর্থ অবস্থায়ই জীব আত্মসংযত হইয়া সর্ব্ববিধ ব্রত-নিয়মাদি কৌশল হইতে নিরস্ত হইয়া থাকে।

যৌগিক অর্থ।—ব্রহ্মযজ্ঞ কেমন করিয়া হয়, পূর্ব্বশ্লোক অবধি মা তাহাই বর্ণনা করিয়া, এইবার সাধারণ কর্ম্মযজ্ঞসকল বিশ্লেষণ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন। যজ্ঞ সাধারণতঃ চারি প্রকার,— দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ। দেবতা উদ্দেশ্যে দ্রব্যসকলকে দান করার নাম দ্রব্যযজ্ঞ, সিদ্ধকাম হইবার জন্য উপবাস, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত বা সংযম সাহায্যে দেহাত্মভাবকে ক্ষীণ করার নাম তপোযজ্ঞ। আপনার ঈপ্সিত বস্তু যাকে লাভের জন্য চিত্তবৃত্তিকে তন্মুখে একীকৃত করার নাম যোগযজ্ঞ, এবং জ্ঞানচক্ষে অথবা যাহার জন্মিয়াছে, তাহার পক্ষে বিশ্বাসের চক্ষে, সে বস্তুকে দর্শন করা বা উপলব্ধি করার নাম জ্ঞানযজ্ঞ। কর্ম্মসকল এই প্রকারে স্থূলতর চারি ভাগে বিভক্ত। তুমি যখন আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার্য্য গ্রহণ কর বা আহার কর, তখন তুমি দ্রব্যযজ্ঞ করিতেছ ; যখন তুমি আর্ত্ত কোন জীবের জন্য দয়াময় হইয়া, তাহাকে অন্নবস্ত্রাদি দান করিতেছ, তখন তুমি দ্রব্যযজ্ঞ করিতেছ। যখন তুমি স্বীয় অভীষ্ট পূরণের জন্য দেবতার উদ্দেশে অন্ন, জল, বস্ত্র অর্পণ করিতেছ, তখন তুমি দ্রব্যযজ্ঞ করিতেছ।

যখন তুমি কোন উদ্দেশ্য হৃদয়ে লইয়া কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত বা উপবাসাদি দ্বারা দেহ বা দেহাভিমান শীর্ণ করিতেছ, তন্মুখে যাইবার চেষ্টা করিতেছ, তখন তুমি তপোযজ্ঞ করিতেছ।

যখন তুমি ঈপ্সিত পদার্থ দেখিয়া, চিত্তবৃত্তিকে তাহাতে ধরিয়া রাখিতেছ, তখন তুমি যোগযজ্ঞশীল পুরুষ। আর যখন তুমি সে পদার্থের ভাবে ভাবময় হইয়া, তাহাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছ, তাহাকে উপভোগ করিতেছ, তখন তুমি জ্ঞানযজ্ঞশীল পুরুষ। ভগবৎ-সাধনার বিকাশের ক্রম বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা তাহাতেও এই চারিটি স্তর দেখিতে পাই। জীব যখন সর্ব্বপ্রথম ভগবানের শরণাপন্ন হয়, জ্ঞানবিকাশের সেই শৈশবাবস্থায় আমরা ভগবদুদ্দেশ্যে পত্র, পুষ্প, জল, হবি ইত্যাদি অর্পণ করিয়াই

ভগবৎসাধনা হইল বলিয়া মনে করি। দ্রব্যাদি দিয়া বা দ্রব্যাদির সাহায্যে ভগবানের তৃপ্তিবিধানে যত্নবান্ থাকি। সাধনা অর্থে প্রাণকে প্রাণ সমর্পণ করা; আত্মাকে আত্মদানই সাধনা। এই আত্মায় আত্মায় সম্মিলনের প্রথম আকাঙ্ক্ষায় জীব উদ্বেলিত হইলে স্থুল জড়ত্বাভিমানী জড়গতপ্রাণ জীব, জড় পদার্থ অর্পণ করিয়াই প্রাণ অর্পণরূপ মহাযজ্ঞের উপক্রমিক সাধনা পরিসমাপ্ত করে। পদার্থ অর্পণ করিয়াই বা ধর্ম্মকার্য্যে অর্থাদি ব্যয়িত করিয়াই প্রাণের সহিত মিলনের উদ্যমে নিরস্ত হয়।

প্রাণ-সম্মিলনরূপ সাধনার দ্বিতীয় স্তরে জীব আরোহণ করিলে তপোযজ্ঞশীল হইয়া পড়ে। ভগবৎলাভের জন্য দ্রব্যাদি সমর্পণই যথেষ্ট মনে না করিয়া, তাহার চিত্ত আকুল হইতে থাকে; ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে ক্রমশঃ তাহার ঔদাসীন্য আসিয়া উপস্থিত হয়,—জাগতিক উপভোগ-সকলে তাহার প্রাণ আর পরিতৃপ্ত হয় না; সুতরাং উহাতে শিথিল-যত্ন হইয়া পড়ে, অথবা ভোগ-সকলই সাধনার অন্তরায় বলিয়া তাহার পরিবর্জ্জনে যত্নবান্ হয়। জীবের প্রাণ কিছুতে প্রাণের সন্ধান না পাইয়া, সাধনার দ্বিতীয় স্তরে আরূঢ় হয়—আপনার চিত্তকে সে তখন ভগবৎমুখে বা আত্মাভিমুখে সংহরণ করিতে ব্যস্ত হয়। তার পর বাহ্য পদার্থের সাহায্যে বা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্মসকলের পরিবর্জ্জনে অথবা চিত্তপ্রত্যাহরণের দ্বারা ভগবৎলাভ হইতে পারে না বুঝিয়া, প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেই প্রাণের প্রীতিকরণের জন্য বিবিধ প্রকারে যুক্ত থাকিতে যত্নবান্ থাকে; অথবা কল্পনার সাহায্যে ভগবানে সংযুক্ত হইতে সচেষ্ট হয়। ইহাই সাধনার তৃতীয় স্তর বা এইরূপ অবস্থার সাধককেই যোগযজ্ঞশীল পুরুষ বলা হয়।

কিন্তু ইহাতেও প্রাণে প্রাণে পূর্ণ সম্মিলন সংঘটিত হয় না; মহাপ্রাণে আপনার ক্ষুদ্র প্রাণ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সম্মিলিত করিতে না পারিয়া, কালে জীব সাধনার চতুর্থ স্তরে আসিয়া পৌঁছে। সে বুঝে, মহাপ্রাণকে দ্রব্যাদির দ্বারা বা তদুদ্দেশ্যে কায়িক সুখাদির পরিত্যাগের দ্বারা বা চিত্তকে তদুদ্দেশ্যে ধাবিত করার জন্য অশেষ প্রকারের যত্নাদির সাহায্যে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। প্রাণকে লাভ করিতে হইলে প্রাণ অর্পণ করিতে হয়। প্রাণকে দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে হইলে এই ভুবনকে প্রাণময় দর্শন করিতে হয়; অথবা যখন পূর্ব্বোক্ত স্তরত্রয়ে মহাপ্রাণের সন্ধান না পাইয়া, তাহার প্রাণে ভগবৎলাভের আকুল পিপাসা চরম সীমায় পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন প্রাণের দ্বারা প্রাণে যুক্ত হইতে থাকে। শুধু তখনই জগতের সর্ব্বত্র সে মহাপ্রাণের সন্ধান লাভ করে; জগতের প্রত্যেক পদার্থেই সে আপনার প্রাণকে অধ্যয়ন করে। ইহাই চতুর্থ স্তর। জগতের সর্ব্বত্র সে জ্ঞানচক্ষে মহাপ্রাণকে পরিদর্শন করে—আপনার প্রাণের দ্বারা মহাপ্রাণকে অন্তর্ব্বাহে উপলব্ধি করিয়া সে সংশিতব্রত হয়, অর্থাৎ ভগবৎলাভের জন্য যে সমস্ত উপায় বা কৌশল সে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা হইতে সে নিরস্ত হয়। অধ্যয়ন অর্থে সম্যক্ প্রকারে অধিগমন করা এবং স্বাধ্যায় অর্থে আপনাতে সম্যক্

প্রকারে গমন করা বা আপনাকে অধ্যয়ন করা। সাধনার পূর্ব্বোক্ত তিনটি স্তরে পূর্ণকাম না হইয়া, এই চতুর্থ স্তরে সে আপনার প্রাণের ভিতর মহাপ্রাণকে দর্শন করে, অথবা মহাপ্রাণময় এ মহাবিশ্বের চার ধারে সে সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ, সর্ব্বজীবের প্রাণদাতা, সর্ব্বজীবের প্রাণের দেবতা, তাহার নিজের প্রাণ, তাহার প্রাণের প্রাণ মহান্ মহিমময়ী প্রাণেশ্বরীর সন্ধান লাভ করিয়া সে কৃতকৃতার্থ হয়। ভগবৎদর্শন যেমন আত্মদর্শনমাত্র, জগৎদর্শন বা জগৎ অধ্যয়ন আত্ম-অধ্যয়নমাত্র, ইহা তখন সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করে। এইরূপ প্রাণকে অনুভব করা বা উপলব্ধি করা বা জ্ঞান করার নামই জ্ঞানযোগী হওয়া। সাধনার চতুর্থ স্তরে জীব স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞশীল হইয়া থাকে। এবং এইরূপে জ্ঞানযজ্ঞশীল হইয়াই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করে, অর্থাৎ সংশিতকর্ম্মত্ব লাভ করে বা সংশিতব্রত হয়।

অথবা সাধনার প্রথম স্তরে জীব, মাকে কোনও এক বিশেষ দেহধারী ব্যক্তিভাবে উপাসনা করে। দ্বিতীয় স্তরে তাঁহাকে মাত্র শক্তিমান্ বলিয়া বোধ করে, তৃতীয় স্তরে তাঁহাকে চিন্ময়ী বলিয়া বিবেচনা করে বা মাত্র চিৎশক্তি বলিয়া ধারণা করিয়া, চৈতন্য ব্যতীত সমস্ত পদার্থ, ভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করে ; তখনও সে চৈতন্য হইতে জগৎকে স্বতন্ত্র দর্শন করে। শুধু চতুর্থ স্তরে আরোহণ করিয়া তবে জীব, জগৎকে আত্মবৎ পরিদর্শন করে, পরমাত্মা বলিয়াই চিনিতে পারে।

সাধারণতঃ লোকে অধ্যয়ন ও শাস্ত্রজ্ঞান বিচারকেই স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ বলিয়া বুঝে। সে অধ্যয়ন অধ্যয়নই নয়। জগতের পত্রে পত্রে আত্মস্বরূপিণী মায়ের অধিগমন করার নামই স্বাধ্যায়। জগতের অণুতে অণুতে, জ্ঞানের প্রত্যেক তরঙ্গে মাতৃদর্শন-সুখে সংবেদিত হওয়ার নামই জ্ঞানযোগ। বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরীকে আত্মায় পাওয়াই জ্ঞানযোগ। শুধু এইরূপে মাকে দেখিতে পাইলে ব্রতসকল ক্ষীণ হয়, কর্ম্মসকল আত্মা হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯

দ্রব্যযজ্ঞকারিণঃ অপানে প্রাণং জুহ্বতি, তথা অপরে তপোযজ্ঞকারিণঃ প্রাণে অপানং জুহ্বতি, যোগযজ্ঞকারিণঃ প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ভবন্তি, অপরে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞকারিণঃ নিয়তাহারাঃ সন্তঃ প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—এইরূপ দ্রব্যযজ্ঞকারিগণ অপানে প্রাণের আহুতি, তপোযজ্ঞকারিগণ প্রাণে অপানের আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। যোগযজ্ঞকারিগণ প্রাণ এবং অপানের গতি রোধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হন, এবং স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞকারী পুরুষগণ

নিয়ত মাতৃআহরণশীল হইয়া সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত প্রাণকে এক অখণ্ড মহাপ্রাণে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে সাধনার যে চারিটি স্তর বলিয়াছি, এই শ্লোকে মা সেই স্তর বা অবস্থার কথা বর্ণনা করিতেছেন। অহো! কালের সর্ব্বগ্রাসী বিবরের মধ্যে পতিত হইয়া আজ ধর্ম্মের বিকাশ, প্রাণধর্ম্মের জ্ঞান কি রসহীন, শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। প্রাণের আদান প্রদানেই যে সাধনা, এই কথা শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রাণময়ী মা আমার, কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া, প্রাণময় ভারতবর্ষের ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, আপনার প্রাণের অংশস্বরূপ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া যে প্রাণধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই মহতী শিক্ষার মহাবিশ্লেষণযুক্ত এই শ্লোকটির অর্থ করিতে গিয়া, জগতের অদ্বিতীয়নামধারী পণ্ডিতেরা কি নির্জ্জীবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! এমন প্রাণের ছবি আঁকিতে গিয়া, এমন প্রাণের ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিতে গিয়া, এমন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মহাপ্রাণকে পাইবার জন্য গীতার ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া, তাঁহারা এই শ্লোকটির ভিতর মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলনটুকু লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। রেচক, পূরক ও কুম্ভক বর্ণনামাত্র যদি ভগবানের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নের আর আবশ্যকতা ছিল না। প্রাণময়ীকে বুকে ধরিতে গিয়া—যদি বায়ু আকর্ষণের এবং বিক্ষেপণের প্রণালী অভ্যাস করিতে হয় বা তাহাই যদি যজ্ঞ বলিয়া বলা মায়ের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে মা আমার গীতাশাস্ত্র উপদেশ না করিয়া, একখানি বৈদ্যশাস্ত্রের রচনা করিয়া যাইলে আরও ভাল হইত। যাহা হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, প্রাণময়ী মা আমার যাহাই লক্ষ্য করিয়া বলুন, আমি তাহা অন্য অর্থে গ্রহণ করিতে পারিব না। আমরা পূর্ব্বে সাধনার যে চারিটি স্তরের কথা বলিয়াছি, এই শ্লোকটিতে সেই চারিটি স্তরই প্রাণধর্ম্মের বিকাশটুকু লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। আমি একে একে তাহা মিলাইয়া বলিতেছি। যাহারা দ্রব্যযজ্ঞশীল পুরুষ, অর্থাৎ সাধনার প্রথম স্তরে মাত্র বিচরণ করিতেছে, তাহাদিগের প্রাণের অবস্থা যাহা, তাহাই 'অপানে জুহ্বতি প্রাণং' এই অংশটুকুতে বর্ণিত হইয়াছে। অপান অর্থে প্রাণের অধোমুখী বা বহির্মুখী গতি। যাহারা দ্রব্যযজ্ঞশীল পুরুষ অর্থাৎ যাহারা দ্রব্যাদি দিয়া ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিতে চাহে বা ভগবান্‌কে কোন ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করে, তাহাদিগের প্রাণ কার্য্যতঃ বহির্মুখে ধাবিত হয়। অর্থাৎ বহির্মুখী গতিতে আপনার প্রাণকে আহুতি দেয়। প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেওয়া বা প্রাণে প্রাণকে মিলানের নামই সাধনা, ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং যখন কেহ দ্রব্যাদি দ্বারা ভগবান্‌কে ভুলাইতে চাহে বা যদি কেহ ভগবান্‌কে সুদূর স্বর্গলোকের অধিপতি বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা হইলে কার্য্যতঃ তাহার প্রাণ কি বহির্মুখে ধাবিত হইতেছে না? ইহারই নাম—অপানে প্রাণের আহুতি প্রদান।

তার পর সাধনার দ্বিতীয় স্তর—তপোযজ্ঞ। আমি বলিয়াছি—যাহারা ভগবদুদ্দেশ্যে

বা ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য বাহ্য দ্রব্যের সাহায্য ত্যাগ করিয়া, বাহ্য জগতের সুখ-দুঃখ স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিয়া, মাতৃলাভের জন্য লালায়িত হয় ও চিত্তকে অন্তরে প্রত্যাহরণ করিতে প্রযত্নশীল হয়, তাহারাই তপোযজ্ঞশীল পুরুষ। তখন কার্য্যতঃ তাহার অপান, প্রাণে আহুতিরূপে অর্পিত হয়। অর্থাৎ তাহার বহির্মুখী গতি অন্তর্মুখী গতিতে আসিয়া মিশিতে থাকে। জীবচৈতন্যের বহির্মুখী গতির নাম অপান এবং অন্তর্মুখী গতির নাম প্রাণ। ইহারই নাম প্রাণে অপানের আহুতি।

তার পর সাধনার যে তৃতীয় স্তর পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, তাহাই এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে লক্ষিত হইয়াছে। আমি বলিয়াছি—সাধনার তৃতীয়স্তরীয় জীবকে যোগযজ্ঞশীল পুরুষ বলে। যখন জীব আপনার চিত্তে আপনার চিত্ত সংযত করিতে থাকে, আপনার চিৎ বা চৈতন্যকেই ভগবান্ বলিয়া বোধ করিতে থাকে, তখনই জীব তৃতীয় স্তরের সাধক। তখন কার্য্যতঃ তাহার প্রাণ এবং অপান, উভয় গতিই রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ তাহার বহির্মুখী বিক্ষেপ এবং অন্তর্মুখী আকর্ষণ, উভয়ই সমতা প্রাপ্ত হইতে থাকে; এবং তাহার আপনার প্রাণে বা আপনার অভ্যন্তরে সে আয়াম বা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ইহারই নাম—প্রাণায়াম।

এই শ্লোকটির তৃতীয় চরণে সাধনার চতুর্থ স্তর লক্ষ্য করা হইয়াছে। যেমন সাধনার চারিটি স্তরই বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ আবার একই শ্লোকের ভিতর সাধনার এই চারিটি স্তর বর্ণনা করিবার জন্যই এই শ্লোকটি তিনটি চরণে সমাপ্ত করা হইয়াছে। আমি বলিয়াছি—সাধনার চতুর্থ স্তরে জীব ব্রহ্মাণ্ডময় মাকে দেখে; তাহার অন্তর্বাহ্যে মা ছাড়া আর কিছুই উদিত হয় না; তাহার অন্তরে বাহিরে সে আপনাকে বা আপনার প্রাণকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পায় না, সে জগতের ধূলিকণা বক্ষে ধারণা করিতে গিয়া বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরীকে আপনাতেই পায়। এই অবস্থার নামই 'প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি' বা প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেওয়া। এই অবস্থাতেই তাহার বহুধাবিভক্ত প্রাণ, জগতের বহু বহু মূর্ত্তিতে প্রাণকেই দর্শন করিয়া তাহাতেই মিলিত হয় বলিয়া বহুবচনাত্মক প্রাণ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এক মহাপ্রাণই জগতে বহুরূপে বিকাশ লাভ করেন, এই জন্য প্রাণ শব্দ বহুবচনান্ত।

শুধু এই চতুর্থস্তরীয় সাধকেরাই নিয়তাহার হয়। নিয়তাহার শব্দের মানে কি ? মাকে নিয়ত যাহারা আহরণ করে। কি অধ্যাত্ম চিন্তায়, কি জগতের কাম-সম্ভোগে, মাকে যে নিয়ত সম্ভোগ করে, তাহার নাম নিয়তাহার পুরুষ। আর সেই ওরূপ করিতে পারে, যে আত্মাতেই বিশ্বকে পাইয়াছে। সগুণকে নির্গুণকে এক করিতে পারিয়াছ কি ? —কামনাকে নিষ্কামকে এক করিতে পারিয়াছ কি ?—পাপকে পুণ্যকে, ধর্ম্মকে অধর্ম্মকে, জড়কে চৈতন্যকে, এককে বহুকে, ভোগকে ত্যাগকে এক করিতে পারিয়াছ কি ? যদি পারিয়া থাক, তবেই তুমি মাকে চিনিয়াছ—তবেই তুমি চতুর্থ স্তরের সাধক হইয়াছ।

আর সাধারণ কর্ম্মজগৎ দর্শন করিলে তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার চারিটি ক্রমোন্নতির স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। জীবের কর্ম্মসকল প্রথম স্থূল জড়াভিমানীয় হইয়া থাকে; জড়ের উপরেই নির্ভরতা, জড়ের সঙ্গেই সুখসম্ভোগ, জগতের জড়ত্ব মাত্র লইয়াই জীব প্রথমতঃ বসবাস করে। তাহারা অন্যের আচরণেরও মাত্র জড় অংশ দেখিতে পায়, এবং তাহা দেখিয়াই ও তাহারই নিন্দা স্তুতি লইয়াই তাহারা প্রাণকে ব্যস্ত রাখে।

তদপেক্ষা ঈষৎ উচ্চস্তরীয় জীব, যাহাদিগকে তপোযজ্ঞশীল বলা হইয়াছে, তাহারা শক্তির উপর নির্ভরশীল। তাহারা জড়ত্ব উপেক্ষা করে এবং বস্তুগত শক্তি বা গুণ দর্শন করে। কর্ম্মগত ব্যবহার-সকলের উদ্দীপনা আদি তাহারা লক্ষ্য করে এবং কর্ম্মী না হইলেও তাহারা কর্ম্মে অগ্রসর হইতে জীবকে অনুমোদন করে। দ্রব্যাদির আস্বাদন তাহারা গ্রাহ্য করে না, তাহার গুণসকল বিচার করিয়া তাহা গ্রহণ বা ত্যাগ করে।

আরও উচ্চে অর্থাৎ তৃতীয় স্তরে জীবচক্ষু কর্ম্ম বা পদার্থ বা ব্যক্তিগত স্থূল ভাব না লইয়া, তাহারা সে কর্ম্মসকলের ভিতর ভিতর ভালবাসার অন্বেষণ করে। কর্ম্মীর ভিতর আত্মীয়তা তাহারা সর্ব্বত্র পাইতে প্রয়াস পায় এবং সাধারণতঃ তাহারা আত্মদুঃখে উপেক্ষাশীল হয়। চতুর্থ স্তরে সাধক সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকে।

প্রথম স্তরে জীব জড়দর্শী। দ্বিতীয় স্তরে শক্তিদর্শী হয়, ব্রহ্মাণ্ড শক্তিময় দেখে; জড় উপেক্ষা করে এবং জড়ের ভিতরস্থ শক্তিপ্রবাহ দর্শন করে। তৃতীয় স্তরে জীব মাত্র চৈতন্যসত্তার জন্য লালায়িত হয় এবং গুণাত্মক জগতের উপর হইতে নির্গুণ আত্মার উপর চিত্ত পরিচালিত করিতে থাকে। চতুর্থ স্তরে জড় বলিয়া কিছু নয়নগোচর হয় না; জড় জগৎও চৈতন্যময় বিকাশ বলিয়া উপলব্ধি করে।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩০

এতে সর্ব্বে অপি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ সন্তঃ যজ্ঞবিদো ভবন্তি ততঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি।

ব্যবহারিক অর্থ—ইহারা সকলেই যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোগ করিয়া, যজ্ঞের দ্বারা ক্ষয়িতকল্মষ হইয়া যজ্ঞবিৎ হয়, তৎপর সনাতন ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে।

যৌগিক অর্থ।—সেই যজ্ঞকারী সকলেই যজ্ঞশিষ্ট অমৃত ভোগ করিয়া, যজ্ঞের দ্বারা ক্ষয়িতকলুষ ও যজ্ঞবিদ্ হইয়া ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। শুন মায়ের অমৃতময় বাণী। মা বলিতেছেন, যজ্ঞকারী সকলেই ক্রমশঃ প্রত্যেক স্তর হইতেই যজ্ঞশিষ্ট অমৃত লাভ করিয়া, তদ্দ্বারা ক্ষয়িতপাপ হইয়া, অবশেষে যজ্ঞবিদ্ হইয়া মায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে, মাকে পাইতেছে। প্রত্যেক স্তর হইতেই জীব যজ্ঞশিষ্ট অমৃত বা জ্ঞান, উপলব্ধি, সংস্কার লাভ করিয়া, পরবর্ত্তী স্তরে উঠিতেছে এবং শেষ এ ব্রহ্মাণ্ডকে

যজ্ঞাগার বলিয়া বুঝিয়া, যজ্ঞবিদ্ হইয়া ব্রহ্মত্বের দিকে ছুটিতেছে—ব্রহ্মত্ব লাভ করিতেছে।

যখন জীব যজ্ঞবিদ্ হয় অর্থাৎ এ কর্ম্মক্ষেত্রকে মায়ের কর্ম্মযজ্ঞাগার বলিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্মার্পণ"মাদি শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মকর্ম্ম বলিয়া পরিদর্শন করে, তখনই তাহারা সাক্ষাৎভাবে সনাতন ব্রহ্ম লাভ করে; নিত্য ব্রহ্মত্ব লাভ করে, নিত্য ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়। আর যাহারা এখনও তত দূর উন্নত হয় নাই, যাহারা প্রথম হইতে তৃতীয় স্তরের মধ্যে অবস্থিত, তাহারা সাক্ষাৎভাবে নহে—পরোক্ষভাবে এবং নিত্য নহে—মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়। যজ্ঞবিদ্ হইয়া তবে নিত্য অবিচ্ছিন্নভাবে জীব তাঁহাতে সংযুক্ত হইতে সক্ষম হয়; সেই জন্য এখানে সনাতন শব্দটি ব্রহ্মের বিশেষণ করিয়া সনাতন ব্রহ্মত্ব বা ব্রহ্ম লাভ হয় বলা হইয়াছে।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১

হে কুরুসত্তম! অযজ্ঞস্য অয়ং লোকঃ ন অস্তি, কুতঃ অন্যঃ পরলোকঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—যাহারা এইরূপ কর্ম্মমাত্রকে যজ্ঞরূপে পরিদর্শন করে না, অথবা যাহারা এই কর্ম্মাত্মক জগৎকে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী, সেই অযজ্ঞ জনগণের এই পরিদৃশ্যমান ভূলোকই আশ্রয় হয় না। সুতরাং তাহাদের ইহা অপেক্ষা উন্নত দেবাদি লোকের আশ্রয়লাভ কিরূপে সম্ভব হইবে?

যৌগিক অর্থ।—অযজ্ঞ পুরুষের ইহলোকই নাই, তবে আর অন্য লোক কি থাকিবে? অযজ্ঞ হইয়া কেহ কোথাও থাকিতে পারে না। এই ভূলোক সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ। ইহাতে যখন কেহ অযজ্ঞ হইয়া থাকিতে পারে না, তখন আর অন্যান্য উর্দ্ধতর লোকে কেমন করিয়া থাকিবে? এমন কোথাও কোন লোক বা ক্ষেত্র নাই,
কল্পিত কোন অযজ্ঞ জীব যথায় গিয়া বলিতে পারে, এই আমার লোক বা ক্ষেত্র।
সুতরাং তাহার আবার পরলোক কেমন করিয়া থাকিবে? কোথাও কেহ যে অযজ্ঞশীল
থাকিতে পারে না, এই মাত্র বলা এ শ্লোকের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা এ ব্রহ্মাণ্ডকে
মায়ের কর্ম্মযজ্ঞাগার বলিয়া না দেখে, যাহারা জগৎকে জড় বা ভ্রান্তি ইত্যাদি চক্ষে
দেখে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই উপসংহারক শ্লোকটি বলা হইয়াছে। মা বলিতে-
ছেন, যাহারা যজ্ঞরূপে না দেখা বশতঃ অযজ্ঞ জীব, তাহাদিগের চক্ষে ইহলোকই প্রতি-
ভাত হয় না, তবে ব্রহ্মাদি লোক কেমন করিয়া প্রতিভাত হইবে? দেখ, যাহারা প্রকৃতি-
বাদী অর্থাৎ নিত্য জড় প্রকৃতিকে ভিন্ন বলিয়া জানে, তাহাদিগের ত কথাই নাই—
যাহারা ব্রহ্মকে ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ বলে, অথচ জগদ্ব্যবহারকে মিথ্যা
মায়ার অধ্যাস বলে, তাহারাও এ অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহের আত্মরতিকে উড়াইয়া দিয়া,
কেবল দুঃখ ও ত্রিতাপের আগার বলিয়া জগৎকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করে।
সুতরাং তাহারা স্নেহের পরিবর্ত্তে নিত্য বিষসমুদ্রে আপনাদিগকে নিমজ্জিত দেখে এবং

তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যত্নবান্ হয়। সুতরাং যদি তাহারা আত্মদর্শনরূপ মহামৃত লাভের পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করে, তবে তাহাদিগের গতি কি হওয়া সঙ্গত ? সাধনা অনুযায়ী মাত্র যদি ফল হইত, অর্থাৎ মনে কর, যদি পূর্ব্বকর্ম্মজনিত কর্ম্মাশয় কোন এক জীবের নাই ; এবং মাত্র সে ইহ জন্মে জগৎকে মিথ্যা বা জড় বলিয়া পরিত্যাগের চেষ্টায় রত থাকে—তাহা হইলে তাহার পারলৌকিক গতি কি প্রকার সম্ভব হইতে পারে ? অব্যক্ততত্ত্ব হইতে সুরু করিয়া, অহংতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ইত্যাদি সমস্তই যদি মিথ্যাবোধে পরিত্যাগের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত হয়, অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাত্মতত্ত্বে উপস্থিত না হইতে পারে, তাহা হইলে জীবের পক্ষে কোন্ লোক বা ক্ষেত্র লাভ হওয়া সম্ভবপর থাকে ? সকল লোক হইতেই তাহার আশ্রয় কি বিনষ্টপ্রায় হয় না? অবশ্য ভগবৎকৃপায় আমরা ডুবিয়া থাকি বলিয়া মায়ের স্নেহ-পীযূষধারায় আমরা অহর্নিশ পুষ্ট হইতেছি এবং তাঁহারই ক্রোড়ে অবস্থান করিতে করিতে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতম ক্ষেত্রে নীত হইতেছি এবং সেই জন্য আমরা শূন্যবাদী হইলেও আমরা ক্ষেত্র বা আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হই না, ইহা সত্য ; কিন্তু আমরা আমাদিগের ক্ষেত্রগত প্রাপ্য সাহায্য হইতে যে বঞ্চিত হই, ইহা স্থির। আমরা যখন কর্ম্ম উপলক্ষ্য করিয়া যেরূপ অবস্থার অধিকারী হই, তখন আমরা সেইরূপ অবস্থার পরিপোষক ক্ষেত্র বা লোকেতে উপনীত হইয়া পড়ি। জীবসকলের অবস্থানুযায়ী আশ্রয় ভূঃ ভুবাদি সপ্ত লোক ; লোকসকল ক্ষেত্রচৈতন্য মাত্র, সেই ক্ষেত্রগত চৈতন্যকে বা চৈতন্যের সেই ক্ষেত্রগত ব্যবহারকে যদি মিথ্যা ভ্রান্তি ইত্যাদি ভাব লইয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখি বা ক্ষেত্রগত চৈতন্য স্বীকার না করিয়া, মাত্র জড় চক্ষে দেখি, তাহা হইলে আমরা সেই চৈতন্যের নিকট হইতে কেমন করিয়া সাহায্য লাভ করিব ? দেবতার সম্বর্দ্ধনা না করিলে, দেবতাদিগের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইবার আশা করা দুরাশা মাত্র। এই জন্য ভগবান্ বলিলেন,—অযজ্ঞ পুরুষ, অর্থাৎ যাহার চক্ষে এ বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্র মায়ের যজ্ঞাগার বলিয়া প্রতিভাত হয় না, তাহার সাহায্যের জন্য ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। রাজাকে না মানিলে যেমন রাজ্যে স্থান পাওয়া দুরূহ, লোকচৈতন্য না মানিলে, তাঁহাকে যথোচিত সম্মান না করিলে তদ্রূপ লোকে যথোচিত স্থান পাওয়া দুরূহ।

এ স্থলে কেহ আশঙ্কা করিতে পারে যে, জগৎকে জড় বা ভ্রান্তি বলিলেও আত্মাকে যখন সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, তখন কার্য্যতঃ তাঁহার সাহায্য পাওয়া যায়, সুতরাং লোকবিচ্যুতির সম্ভাবনা কোথায় ? এইরূপ আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, তাঁহারা নির্গুণ নিরুপাধিক আত্মার উপাসক মাত্র ; সুতরাং লোকব্যবহারে তাঁহার ভাবের ইতরবিশেষ হয় না। সে ক্ষেত্র হইতে লোকত্ব বা লোকসকলই পরিদৃশ্যমান হয় না।

যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তিনি নির্লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁহারই উপর জগদ্ব্যবহার চলিতেছে বা তাঁহার সান্নিধ্যবশতঃই প্রকৃতি কর্ম্মশীলা হইয়াছে, তখন

তাঁহার আশ্রয় লইলে লোকসকল যে আশ্রয় দিতে বাধ্য হইবে না, ইহা অযৌক্তিক। এরূপ আশঙ্কাও অসঙ্গত। কেন না, তাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন বা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই মায়ার প্রহেলিকা—ইহা বলা আর তৎকর্তৃত্ব স্বীকার করা, একই কথা। সান্নিধ্যবশতঃই হউক, তাঁহার আশ্রিত বলিয়াই হউক, আর তাঁহার ইচ্ছাতেই হউক, অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা, এই ভাবে দর্শনই সঙ্গত এবং সেই দর্শনই ঈশ্বর-দর্শন। সুতরাং মুখে বা তর্কচ্ছলে না মানিলেও কার্য্যতঃ ঈশ্বরত্ব মানাই হয়। অথচ এইরূপ কার্য্যে ও জ্ঞানে পার্থক্যবশতঃ ভ্রান্তিবাদীরা মিথ্যাচারী হইয়া পড়ে; সুতরাং সত্যকামী, সত্যদর্শী পুরুষের মত লোকচৈতন্যের আশ্রয় হইতে তাহারা আপনাদিগকে আপনারাই অপসারিত করে। যাহারা ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত ব্যবহারিক বলিয়া তদবস্থিত কর্ম্মমহিমা ক্ষুণ্ণ করে, তাহারা বাচনিক অস্বীকার না করিলেও, কার্য্যতঃ কর্ম্মসমূহ তাহাদের নিকট অলীক হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদের এই কর্ম্মময় ক্ষেত্রে ঈশ্বরত্বে পর্য্যন্ত আশ্রয় লাভের সম্ভব থাকে না। অতএব বাধ্য হইয়া মহিমময় দর্শনের জন্য কর্ম্মমাত্রকেই সত্যরূপে ধারণা করিতে হইবে। অন্যথা লোকচৈতন্যের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। তাই ভগবান্ বলিলেন যে, অযজ্ঞশীল পুরুষের পক্ষে ইহলোকস্থ বা পরলোকস্থ অধিপতি-চৈতন্য কেহই আশ্রিত বলিয়া সহানুভূতি করেন না; সুতরাং তাহাদের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। যতক্ষণ এই জগৎ যজ্ঞরূপে পরিদৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ ইহা জীবের চক্ষে লোক বলিয়াই উপলব্ধ হয় না এবং ইহাই সত্যদর্শন।

লোক কাহাকে বলে? ব্যক্তিগতভাবে যেমন আমরা এক একজন লোক, তদ্রূপ ভূরাদি লোকসকল এক একজন লোক, এইরূপ ভাবে দর্শন করিতে হইবে। আমি দেবতাতত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে এ কথার আভাস দিয়াছি। বিশিষ্ট বিশিষ্ট গুণ বা ধর্ম্মান্বিত চৈতন্যকে দেবতা বলা হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মনুষ্যলোক বলিলে মহাচৈতন্যের সেই অংশকে বুঝায়—যে অংশে মনুষ্যধর্ম্মসকল বিম্বিত হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া মনুষ্যরূপী জীবসকল সৃষ্ট, স্থিত ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সেই চৈতন্য-পুরুষের নাম মনু অর্থাৎ মনুই এই মনুষ্যলোকের অধিপতি দেবতা। যেমন আমরা চৈতন্য এবং দেহ লইয়া আমি বলিয়া একটা জীব উপলব্ধিতে পাই, তদ্রূপ মনু-নামীয় চেতন পুরুষ এবং তদাশ্রিত—তাহাতে বিম্বিত মনুষ্যনামীয় জীব-সকল লইয়া, মনুষ্যলোক বলিয়া যেন একজন লোক, এইরূপ দেখিতে হইবে। এইরূপ সকল লোক সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। লোক শব্দ বলিলে শুধু জড় ক্ষেত্র বলিয়া বোঝা ভুল। তদধিপতি চৈতন্যস্তর উপলব্ধি করাই প্রকৃত উপলব্ধি। এইরূপ সজীব বা সচেতন বলিয়া লোক-সকলকে যতক্ষণ না জীব দেখিতে পায়, ততক্ষণ ব্রহ্মাণ্ডকে যজ্ঞাগার বলিয়া বুঝা যায় না, লোক-সকলের সচেতনত্ব উপলব্ধি না হইলে জগদ্ব্যাপী চৈতন্য উপলব্ধিতে আসে না। ক্ষুদ্ররূপিণী মাকে না চিনিলে বিরাট্‌রূপিণী মাকে চেনা যায়

না, ক্ষুদ্র মায়ের স্নেহাভিঘাতে হৃদয়তট অভিষিক্ত না হইলে বিরাট্ মায়ের স্নেহ উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা বৃথা। মূর্ত্তিমতী মাতৃস্নেহ উপেক্ষা করিলে, অমূর্ত্ত মা কল্পনার জীব হইয়া পড়ে। স্নেহ ছাড়াইয়া মাকে দেখা, আর শৈত্য ছাড়াইয়া জল আস্বাদন করা একই কথা। হৃদয়ের কর্ত্রীরূপিণী বলিয়া মাকে হৃদয়ে ধরিতে না পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রীরূপে মাকে দেখিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। অকর্ত্তা অভোক্তা নির্গুণা মাকে যদি বুকের ভিতর টানিয়া আনিয়া কর্ত্তা ভোক্তা সগুণা না করিতে পার, তবে কর্ত্তা ভোক্তা সগুণরূপে অভিব্যক্ত তুমি কেমন করিয়া অকর্ত্তা, অভোক্তা, নির্গুণ হইবে? তুলাকে যদি বস্ত্রে না দেখিতে পাও, তবে বস্ত্রত্বকে তুলাত্বে কেমন করিয়া বিলীন করিবে? সেই জন্য মা বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, অযজ্ঞশীল পুরুষ অর্থাৎ যাহারা জগৎকে যজ্ঞ বলিয়া দর্শন করে না, তাহারা ইহলোকেই চৈতন্যাধিপত্য দেখিতে পায় না, অন্যান্য লোকে কেমন করিয়া দেখিবে? ইহলোকেই অর্থাৎ ইহলোকস্থ চৈতন্যই যখন তাহাদিগের চক্ষে আসে না, তখন অন্য লোকাধিপতি চৈতন্য তাহারা কেমন করিয়া দেখিবে? অতএব অযজ্ঞ পুরুষের ইহলোক নাই। তাই মা এখানে 'কুরুসত্তম' বলিয়া অভিভাষণ করিলেন—হে কর্ম্মীদিগের শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ এবং আমার কর্ম্মাগার বলিয়া জগৎকে দর্শন করাই আমাকে দেখার প্রথম সোপান।

কর্ম্মসকলের যজ্ঞত্ব দর্শন করা একান্ত আবশ্যক বলিবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ এই শ্লোকটি বর্ণনা করিয়াছেন।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২

এবং বহুবিধা যজ্ঞা ব্রহ্মণো মুখে বিততাঃ। তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি, এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।

ব্যবহারিক অর্থ।—এই প্রকারের বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মমুখে বিস্তৃত রহিয়াছে, সে সকলকে কর্ম্মজ বলিয়াই বুঝিবে এবং তদ্রূপ বুঝিলেই মুক্তিলাভ করিবে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে যজ্ঞ-সকলের যে কয়টি প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সেই প্রকারের বহু বহু যজ্ঞ ব্রহ্মমুখে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। মায়ের আমার সর্ব্বত্র এই প্রকারের বহুবিধ যজ্ঞ হইতেছে। সেই যজ্ঞ-সকলকে কর্ম্মজ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সে সকল যজ্ঞই কর্ম্ম হইতে সঞ্জাত। যজ্ঞের স্থূল বাহ্যাংশই হউক, অথবা আত্মিক ব্যাপারমাত্রই হউক, যে অংশই বিচারের চক্ষে দেখিবে, দেখিতে পাইবে, কর্ম্মই উহার একমাত্র কারণ। কর্ম্মময়ী মায়ের আমার অমৃতসমুদ্রে কর্ম্মতরঙ্গ-সকল হিল্লোলিত। জ্ঞান অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণে যে ঘাতপ্রতিঘাত সমুত্থিত হয়, তাহাও কর্ম্ম। বাহ্যেন্দ্রিয়ে হউক, অথবা অন্তরিন্দ্রিয়ে হউক, সকল উদ্বেলনই কর্ম্ম; সুতরাং জ্ঞানও কর্ম্মমাত্র। ইহাই এ শ্লোকের প্রধান বক্তব্য বিষয়।

মা ও মায়ের কর্ম্ম, অথবা কর্ম্মময়ী মাকে দর্শন করিতে পারিলে আর কর্ম্মের বন্ধন থাকে না। তোমরা সহজে মাকেও দেখ না, কর্ম্মও দেখ না। তোমরা দেখ, বিপুলকায়া ধরণী নিত্য বিপুল বক্ষ বিস্তার করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তোমরা দেখ, বিপুল বায়ুসমুদ্র, বিপুল গগন, চন্দ্র সূর্য্য তারকাপুঞ্জ, সব যেন স্থির সত্তামাত্র। তোমরা দেখ না যে, তাহাদিগের সে সত্তা বলিয়া যাহা তোমাদিগের উপলব্ধিতে আসিতেছে, তাহা মায়ের আমার কর্ম্মপ্রবাহ মাত্র। তোমরা ধরণী দেখ, মাকে দেখ না। যদি সূক্ষ্ম চক্ষে দেখিতে, তবে দেখিতে পাইতে, তাহার যে স্থির বক্ষোবিস্তারের উপর তোমরা সংলগ্ন, তাহা বস্তুতঃ স্থির নহে—তাহা জ্ঞানময়ীর জ্ঞানশক্তিতরঙ্গের কম্পন বা দ্রুত গতি। সে গতি এত দ্রুত, সে গতির তরঙ্গশ্রেণী এত পরস্পর সংলগ্ন, এত বিচ্ছেদশূন্য, মায়ের আমার সে জ্ঞানোল্লাস এত প্রখর যে, উহা একটি স্থির সত্তাবোধ ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছে। যেমন একটি কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিয়া সবেগে চক্রাকারে বিঘূর্ণিত করিলে একটি অগ্নিচক্র স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা তদ্রূপ। পদার্থমাত্রই এইরূপ। সুতরাং যাবতীয় সত্তাবান্ পদার্থ ই বস্তুতঃ কর্ম্মপ্রবাহ মাত্র। কর্ম্ম শক্তিপ্রবাহমাত্র, শক্তি জ্ঞানপ্রবাহ মাত্র, জ্ঞান চৈতন্যপ্রবাহ মাত্র; ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে সক্ষম হয়। তবেই জগতের দিকে চক্ষু পড়িলে ইহার স্বতঃসিদ্ধ স্থির ভিন্ন ভিন্ন পদার্থময় মায়ের স্বাভাবিক যে রূপ, তাহা সূক্ষ্মদর্শনে এক মহতী শক্তির বিপুল তরঙ্গবিবর্ত্তন বা কর্ম্মরচনা। ইহাতে সংশয় বা সন্দেহ স্থান পায় না।

এইবার বুঝিয়া দেখ, এ শক্তি বা কর্ম্ম কাহার এবং কোথায় অবস্থিত ? ভগবান্ বলিতেছেন, ইহা তাঁহারই মুখে অবস্থিত অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয়ে এ শক্তিলীলা সুপ্রকাশ বা সহজ কথায় ইহা তাঁহার জ্ঞান। তিনি জ্ঞান করিতেছেন বা তাঁহার জ্ঞানে যাহা গঠিত হইতেছে, তাহাই এ শক্তিবিলাস বা কর্ম্মময় ব্রহ্মাণ্ড; সুতরাং এ শক্তি বা জ্ঞান কর্ম্মমাত্র। আবার জ্ঞান, অনুভূতি বা বিশেষ প্রকারের চেতনা; সুতরাং সর্ব্বব্যাপী মহান্ চৈতন্যময়ী মা-ই এ জগৎমূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছেন। এবং জ্ঞান, শক্তি, কর্ম্ম, ইহা একই।

এই প্রকারে কি অন্তরে, কি বাহ্যে, সকল বিষয়ই মায়ের আমার কর্ম্ম বলিয়া দর্শন করিলেই, জীব মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। জগতের সসীম খণ্ড খণ্ড বাহ্য সীমাবদ্ধ রূপমাত্র দর্শন করিয়া, তাহাতে মুগ্ধ হইলে জীব বদ্ধ হয়, আর তাহার কারণাত্মক এক অসীম অনাবদ্ধ জ্ঞানময় চৈতন্যময় রূপদর্শনে মুগ্ধ হইলে বন্ধনমুক্ত চৈতন্যময় মুক্ত পুরুষ হয়, ইহাই শাস্ত্রের সহজ তাৎপর্য্য।

যাহা হউক, আমরা শুধু এই শ্লোকটির অন্তর্গত যে তাৎপর্য্য, তাহাই এই স্থলে দেখিব। যজ্ঞ-সকলের প্রধান উদ্দেশ্য অন্তরভিঘাত, অর্থাৎ তাহার দ্বারা অন্তরের যে পরিবর্ত্তন, যে ভাবোদ্বেলন হয়, তাহাই যজ্ঞের ফলপ্রদ শক্তি, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি;

আর সেই অন্তরগত শক্তিবিবর্ত্তনও যে কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানও যে কর্ম্মবিশেষ, ইহা বলাই এখানে ভগবানের অভিপ্রায়। অন্তরের কর্ম্ম জ্ঞানময় কর্ম্ম, সাক্ষাদ্‌ভাবে জ্ঞানেরই তরঙ্গ, আর বাহ্য কর্ম্ম দ্রব্যময় কর্ম্ম, এই প্রভেদ। এই কর্ম্মই বেদান্তে ঈক্ষণ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। তবে দ্রব্য-সকলও তাঁহার জ্ঞানের বিবর্ত্তন মাত্র বলিয়া পরোক্ষভাবে দ্রব্যময় কর্ম্মও জ্ঞানময় কর্ম্ম, ইহা সিদ্ধান্তস্বরূপ বুঝিয়া রাখিবে।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩

হে পার্থ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্। সর্ব্বং অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে পরন্তপ পার্থ! সমস্ত কর্ম্ম ফলসহিত জ্ঞানেতেই পরিসমাপ্ত হয়, সেই জন্য দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানময় যজ্ঞই শ্রেয়।

যৌগিক অর্থ।—যখন সমস্তই জ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন এবং জ্ঞানেতেই প্রতিষ্ঠিত, আর এইরূপ জ্ঞানময় ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলে যখন স্বতন্ত্র কিছু পরিদৃষ্ট হয় না, জ্ঞানই যখন এ বিশ্বের উপাদান, কর্ম্মসকলও যখন জ্ঞানের বিবর্ত্তন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের এ জ্ঞানময় মূর্ত্তি দেখিলেই আর কর্ম্ম উদ্ভূত হইবে না। কর্ম্মের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এ জগৎকে জ্ঞানময়ী মা বলিয়া দেখ, জড় জগৎ বলিয়া দেখিও না, জড়ত্ব চক্ষু হইতে অপসৃত হইবে। জীবের হৃদয়ে যেমন কল্পনাসকল, মায়ের হৃদয়ে তদ্রূপ জগৎ। জীবের কল্পনা যেমন তাহার জ্ঞানের বিবর্ত্তন মাত্র,—হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, হৃদয়ে অবস্থান করে, আবার হৃদয়ে লয় পায়, তদ্রূপ আমরা—তদ্রূপ এ ব্রহ্মাণ্ড মায়ের হৃদয়ে কল্পনারূপে ফুটিয়া উঠে, অবস্থান করে ও লয় পায়। ইহা জ্ঞানে গঠিত। আমরা যাহা দেখিতে পাই, যাহা লইয়া ব্যবহার করি, যাহা কিছু পদার্থ বলিয়া বোধ করি, এ সমস্তই জ্ঞানের অভিব্যক্তি মাত্র। এই প্রকারের দর্শন অভ্যাস হইলে আর জড় জগদ্দর্শন থাকে না, চিন্ময়ী জগন্মূর্ত্তি দেখা যায়। যেমন বরফের কণাসকল আপন আপন স্বরূপ দেখিতে চাহিলে আপনাদিগকে জল ব্যতাত অন্য কিছু বলিয়া বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ আমাদিগের স্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা হইলে আমরা আমাদিগকে জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু বলিতে পারি না। এবং দ্রব্য দর্শনেও তাহাকে জ্ঞানপ্রকাশ ভিন্ন কিছু বলিতে পারি না। এই জ্ঞানেই কর্ম্মের পরিসমাপ্তি। সেই জন্য চলিত দ্রব্যময় যজ্ঞকে জ্ঞানযজ্ঞে পরিণত করিবে; অথবা দ্রব্যময় যজ্ঞের ভিতরও এই প্রকারের জ্ঞানময় সত্তার দর্শন করিবে। দ্রব্যেও মাকে দেখিবে। শুধু দ্রব্য ব্যবহাররূপ যজ্ঞমূর্ত্তি দর্শন অপেক্ষা তদন্তরস্থ জ্ঞানমূর্ত্তি দেখাই শ্রেয়ঃ। দ্রব্যযজ্ঞ করিতে না পার, জ্ঞানযজ্ঞ কর। জ্ঞানই যজ্ঞের লক্ষ্য।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪

প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি। তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে তুভ্যং জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—সে জ্ঞান প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার সাহায্যে জানিয়া লইবে। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী, তাঁহারা সে জ্ঞান উপদেশ দিবেন।

যৌগিক অর্থ।— মাতৃজ্ঞান গ্রহণ করিবার তিনটি উপায় বলিলেন,—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা। এ তিন প্রণালী পরিত্যাগে জ্ঞান লাভ হয় না। প্রণিপাত কাহাকে বলে ? যাঁহার নিকট জ্ঞানপ্রার্থী হইবে, তাঁহাকে গিয়া কায়গত প্রণতি মাত্র দেখানকে প্রণতি বা প্রণিপাত বলে না, সে প্রণামে জ্ঞান লাভ হয় না। আপনার বুদ্ধিতে যে সকল জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছ, যে সকল জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া তুমি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া হৃদয়ঙ্গম কর, সেই সকল জ্ঞানকে প্রণত করার নাম প্রণিপাত। সাধারণতঃ তোমাদিগের স্বভাব এমনই যে, যখন কাহার নিকট জ্ঞান লাভের আশায় যাও, তাঁহার উপদেশ তোমাদিগের জ্ঞানের সমর্থক না হইলেই তোমরা আপনাদিগের পাণ্ডিত্যের গর্ব্বকে খর্ব্বিত না করিয়া, তাঁহাকেই অল্পজ্ঞানী বুঝিয়া লও এবং আপনার জ্ঞানদম্ভকে আরও পরিবর্দ্ধিত কর। প্রণিপাত আজ জগৎ ভুলিয়াছে বলিয়াই আজ আত্মজ্ঞান জগতে বিরল। আপনার বুদ্ধিকে যথাসম্ভব খর্ব্বিত করিয়া, তবে জ্ঞানদাতার জ্ঞান গ্রহণে অগ্রসর হইতে হয়, নতুবা জ্ঞান মিলে না। দশখানা পুস্তক স্বেচ্ছানুসারে পাঠ করিয়া বা দশ স্থান হইতে দশ কথা সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানী সাজিয়া তোমরা আত্মাকে দম্ভময় করিয়া রাখ—মনে ধারণা কর, বুঝি সব বুঝিয়া ফেলিয়াছ; তত্ত্বদর্শী পুরুষের নিকট গিয়া জ্ঞান গ্রহণকালে সে দম্ভকে নমিত করিতে তোমাদিগের গর্ব্বিত প্রাণ চাহে না; সুতরাং তোমাদিগের জ্ঞানলাভ মাত্র বাক্যালাপে পর্য্যবসিত হয়। প্রণিপাত সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। করদ্বয় সঞ্চালনে বা মাত্র মস্তক অবনমনে প্রণিপাত হয় না; অন্তরকে নমিত করিতে হয়, স্বীয় বুদ্ধিকে নমিত করিতে হয়, তবে উহা জ্ঞান গ্রহণোপযোগী হয়; তবে তত্ত্বদর্শীদিগের মুখ হইতে নিঃসৃত অমূল্য জ্ঞানসকল তোমার হৃদয়ে মঙ্গল-বারি বরিষণ করিতে সমর্থ হয়। নতুবা তোমাদিগের প্রণাম বিড়ম্বনা—লোকাচার মাত্র।

যাহা হউক, প্রথম এই প্রকারের স্বীয় উপার্জ্জিত জ্ঞানসকল যথাসাধ্য প্রণত করিয়া জ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে। তার পর পরিপ্রশ্ন। যে জ্ঞান গুরু দিবেন, সেই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান্ হইতে গিয়া, যে সকল সংশয় সন্দেহ উদিত হয়, সেইগুলি শ্রদ্ধার সহিত জিজ্ঞাসার নাম পরিপ্রশ্ন। গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানের বিমর্দ্দনের জন্য লগুড়োত্তোলনের নাম পরিপ্রশ্ন নহে। স্বীয় বুদ্ধি বা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া কূট তর্কজাল বিস্তার পরিপ্রশ্ন নহে। গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান প্রথম একান্ত অসঙ্গত বোধ হইলেও তাহা স্বীকার করিয়া লইবে; এবং আপন বুদ্ধি সাহায্যে তাহা হৃদয়ে বসাইতে,

বুদ্ধিকে তদনুসারে গঠিত করিতে যত্নবান্ হইবে। এইরূপ যত্নবান্ হইলে যাহা তোমার বুদ্ধি একান্ত অসঙ্গত বোধ করিবে বা যে যে অংশে সংশয় জন্মিবে, তাহা শ্রদ্ধা সহকারে তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট পুনরায় নিবেদন করিবে। ইহাই পরিপ্রশ্ন।

তার পর সেবা। সেবা অর্থে ব্যক্তিবিশেষের পদসেবা নহে। যদি কোন তত্ত্বজ্ঞানীকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া থাক, তবে তাঁহার সাধারণ সেবা-সকল নিশ্চয়ই তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন করিয়া, তোমার জন্য মঙ্গল আশীষ বহন করিয়া আনিতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎপ্রদত্ত জ্ঞানের সেবাই তাঁহার চিত্তে সমধিক প্রিয়কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তুমি জ্ঞানী পুরুষের সেবা করিলে তিনি যত সন্তুষ্ট হন, তৎপ্রদত্ত জ্ঞানকেই গুরু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়া, সে জ্ঞানবীজের অঙ্কুরোদ্‌গমনের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিলে তিনি তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অবশ্য উভয় প্রকার সেবা ততোধিক মঙ্গলজনক। কিন্তু প্রধানতঃ জ্ঞানের সেবাই সেবা। তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবের নহে। জ্ঞানের সেবা অর্থে জ্ঞান যাহাতে তোমার অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তির উপর বিস্তৃত হইয়া, তোমার হৃদয়ের উপর সম্যক্ অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার যত্ন করার নামই সেবা। আর এ সকল তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট করণীয়। আজ দেখিতে পাই, কুলগুরুসকল ব্যবসায়ীর দলে পর্য্যবসিত, সাধারণ জনসমুদ্র চরিত্রহীনা যুবতীর মত যথেচ্ছভাবে গুরুনির্ব্বাচনে ব্যতিব্যস্ত। আর বরং মূর্খ কুলগুরু ছিল ভাল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে উদ্ভট জ্ঞানী, উদ্ভট কর্ম্মী কতকগুলি জীব —সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, সাধু ভক্ত, অবতার আদি ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া সমাজের কোণে কোণে আসিয়া দিব্য গুরু সাজিতেছে; খেয়ালমত একটা একটা ঈষৎ নব্য অভিমত গঠিত করিয়া অমনি একটা সম্প্রদায়বদ্ধ হইতেছে, আর ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইতেছে। ধর্ম্ম মৃতপ্রায় সত্য—মরে নাই—মরিবে না; কিন্তু এ দিকে শ্রাদ্ধ বেশ সমারোহে চলিতেছে। তত্ত্বদর্শী পুরুষ নাই,—ঈষৎ ভগবদ্ভাবযুক্ত হইলেই তত্ত্বদর্শী হয় না। প্রণিপাত নাই। কেন না, সে সকল গুরু শিষ্যকে গঠিত করিতেছে না, শিষ্যেরাই গুরুকে গড়িয়া তুলিতেছে। পরিপ্রশ্ন নাই—কেন না, উদ্ভট প্রশ্ন ও উদ্ভট মীমাংসাতেই সেথা সকলে ব্যস্ত, পরিপাকের আবশ্যকতা তাহারা বোধ করে না। সেবা গুরুর নাই—জ্ঞানই যে গুরু, এ কথা দেশ ভুলিয়াছে; গুরুর আসন স্পর্শ করিবার অধিকার মনুষ্যের নাই, ইহা জগৎ বিস্মৃত হইয়াছে। মনুষ্যগুরুর মনুষ্যোচিত সেবা অবশ্য পরিপাটিরূপে ব্যবস্থিত হয়, জ্ঞানগুরু জীর্ণ শীর্ণ হইয়া সুদূরে প্রস্থান করেন। যাহা হউক, এ সকল লইয়া মিথ্যাদর্শী হইব না।

আমি পূর্ব্বে মন্ত্রচৈতন্যের কথা কিছু বলিয়াছি। মন্ত্র, গুরু ও চৈতন্য বা দেবতা এক করিয়া লইতে পারিলে, তবে মন্ত্রচৈতন্য হয়। যাহা মনন করিলে ত্রাণ পাওয়া যায়, তাহাকে মন্ত্র বলে। মন্ত্র শব্দবিশেষ। সেই শব্দগত যে সাধারণ জ্ঞান, তাহাকে

গুরু বলে। সেই শব্দগত যে মুখ্য জ্ঞান, সেই জ্ঞান বেদনময় হইলে অর্থাৎ সেই জ্ঞান মাত্র বুদ্ধিতে আবদ্ধ না থাকিয়া, অন্তরে তদ্ধর্ম্মীয় অনুভূতি ফুটাইতে সক্ষম হইলে বা চৈতন্য স্পর্শ করিলে তাহাই যথার্থ গুরু বা সদ্‌গুরুপদবাচ্য। আর সেই অনুভূতিকে দেবতা বা চৈতন্য বলা হয়। প্রণিপাতের সাহায্যে মন্ত্র গ্রহণ, পরিপ্রশ্নের সাহায্যে সদ্‌গুরু বিকাশ এবং সেবার সাহায্যে দেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫

হে পাণ্ডব! যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি। যেন জ্ঞানেন অশেষাণি ভূতানি আত্মনি, অথো ময়ি দ্রক্ষ্যসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে পাণ্ডব, যে জ্ঞান লাভ করিলে আর পুনরায় এ প্রকার মোহ আসিবে না—যাহা দ্বারা অশেষ এ ভূতসংঘকে তুমি আপনার আত্মাতে এবং তার পর আমাতে দেখিতে পাইবে, তাহাই সে জ্ঞান।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞান কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া লাভ করিতে হইবে, তাহা বলিয়া, এই শ্লোকে সে জ্ঞানের ফলশ্রুতি দিতেছেন। গুরুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিতে তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এবং সেই জ্ঞান লাভ হইলে যে দুইটি মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটি মোহ নিরাকরণ এবং দ্বিতীয়টি এ সমস্ত ভূতাত্মক জগৎ আপনাতেই পরিদর্শন এবং তৎপরে সমস্তই যে ভগবানে সংলগ্ন রহিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করা। ইহাই সে জ্ঞানের মহিমা—ফল।

সে জ্ঞান কি? যে বিরাট্ জ্ঞানের আভাস ভগবান্ পূর্ব্বে দিয়া আসিয়াছেন, উহা সেই জ্ঞান। সংক্ষিপ্তভাবে সেই জ্ঞানের সারাংশ আলোচনা করিলে অর্থাৎ ভগবান্ এই জ্ঞানযোগ বর্ণনছলে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল যে তাহা হইতে লাভ হইতে পারে, তাহা আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু সে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার প্রয়োজন, নতুবা সুকঠিন। যাহা হউক, আমরা সংক্ষেপে সেটুকু আলোচনা করিতেছি।

মা বলিতেছেন,—দেখ, তোমরা আমারই অনুবর্ত্তন করিতেছ। আমি যেমন করাইতেছি, তোমরা তেমনি করিতেছ। ব্রহ্মাণ্ডরূপ এ বিরাট্ জগৎ, কর্ম্ম ছাড়া অন্য কিছু নহে। কর্ম্ম অর্থে শক্তিপ্রবাহ। ইহার জড়বৎ প্রতীতিও শক্তির ঘন আবর্ত্তন মাত্র, সুতরাং কর্ম্ম। গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে এ জগদ্‌বৈচিত্র্য—ইহা আমারই রচনা। চৈতন্যরূপিণী আমিই এ কর্ম্মের কর্ত্তা। কিন্তু কর্ত্তা হইয়াও আমি অবিকৃতই রহিয়াছি। যেমন বরফের আকার ধরিয়াও জল তাহাতে জলই থাকে, যেমন বস্ত্রের আকার ধরিয়াও তুলার তুলাত্বের বিকার ঘটে না, তদ্রূপ এ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র, কি

বাহিরে এ জড় জগতে, কি জীবের অভ্যন্তরে, আমি—চৈতন্য—জ্ঞান অব্যাহতই রহিয়াছি। আমি জ্ঞানরূপে বিকশিত হইয়া, শক্তির আকারে উপলব্ধ পদার্থ-সকল আমাতে বার বার কল্পিত করি। তাহাই জগৎ নামে খ্যাত। তোমার অন্তর বাহিরে শুধু জ্ঞানের বিস্তার মাত্র। কর্ম্ম, কর্ত্তা, ক্রিয়া, সবই আমি—সবই আমার কার্য্য। সকল কর্ম্মই আমার দিকে লক্ষিত হইলেই যজ্ঞ নামে খ্যাত হয়; এবং সেই যজ্ঞের সাহায্যে ক্রমে জীবের এই জ্ঞান স্ফুটতর হইয়া জীব আমাকে প্রাপ্ত হয়। তোমরা যখন যাহা কিছু কর—ইন্দ্রিয়াদি-সাহায্যে বিষয় ভোগ বা তোমাদিগের পরস্পর প্রাণের আদান প্রদান, সে সমস্তই আমার দিকে তোমাদিগের অব্যাহত গতির ক্রম। তোমরা আপন আপন আত্মাতেই জগৎ ভোগ করিতেছ; তোমরা যাহা জগৎ বলিয়া ভোগ কর, তাহা আমি কল্পনাসাহায্যে যে জগদ্‌বোধ বা অভোক্তারূপে থাকিয়া ভোগ করি, তাহারই প্রতিবিম্বপাতে তোমাদিগের আত্মায় রচিত হয় এবং তোমরা তাহা উপভোগ কর। ইহাই তোমাদিগের জগদ্দর্শন। সুতরাং জগৎ বলিয়া তোমরা যাহা উপলব্ধি কর, তাহা তোমাদিগের আত্মারই রচনা। আবার তোমরা আমারই তদ্রূপ রচনা। সুতরাং জগৎ তোমাদিগের অন্তঃকরণে এবং তোমরা আমার অন্তঃকরণে বিদ্যমান। আমি কোন সম্বন্ধশূন্য বিদেশীয় ক্ষমতাবান্, তোষামোদপ্রিয় পুরুষ বা কঠোর দণ্ডধারী শাসক বা ইন্দ্রজালবিস্তারকারী ক্রূর যাদুকর বা নির্ম্মম আত্মসুখমগ্ন, তোমাদিগের সুখদুঃখে উদাস শক্তিধর নহি। আমি নিত্য সম্বন্ধে তোমাদিগের আশ্রয়, তোমাদিগের মোহের অজ্ঞানতা বিদূরিত করিবার গুরু, তোমাদিগের আনন্দ উল্লাসের সখা, তোমাদিগের বিপদ্‌বারণের বন্ধু, তোমাদিগের দুর্ব্বলতা দূর করিবার শক্তিকেন্দ্র, তোমাদিগের অনন্ত যাত্রার পথে চিরসাথী, তোমাদিগের শঙ্কটের শঙ্করী, অণু হইতে মহত্ত্বে লইয়া যাইবার জন্য তোমাদিগের কর্ম্মফলের রক্ষাকর্ত্তা, ফলদাতা, তোমাদিগের মহাতৃষ্ণা দূর করিবার, ত্রিতাপ শীতল করিবার অমৃতস্তন্যা জননী। আমার বক্ষে, আমারই ইঙ্গিতে, আমারই শক্তিতে, আমারই আত্মাতে তোমরা আমার স্নেহের আদরের আত্মজ।

এই জ্ঞান। এই প্রকারের জ্ঞান প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা প্রজ্ঞায় পরিণত করিয়া লইতে পারিলেই এ আত্মসম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। এই মন্ত্র চৈতন্যযুক্ত হইলে, এই মন্ত্র সজীব হইলে মহাজীবন লাভ হয়; জীবন মরণের অনাদি সংঘাত অন্তর্হিত হয়।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬

চেৎ সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ অসি, তথাপি সর্ব্বং বৃজিনং জ্ঞানপ্লবেন এব সন্তরিষ্যসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—যদি সমস্ত পাপী হইতেও তুমি সমধিক পাপকারী হও, তবু জ্ঞানপোত সাহায্যে নিশ্চয়ই সে পাপসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

যৌগিক অর্থ।—ভয় নাই পাপী। দুরিতার্ণব-নিমজ্জিত, দুষ্কৃত ঘোরকর্ম্মী, ভয় নাই—ওই শুন মায়ের অভয়বাণী। ওই শুন আশার মোহন ঝঙ্কার। ওই শুন বিজয়ার বিজয়ঘোষণা। ভয় নাই—পাপ করিয়াছ, কর্ম্মের পিচ্ছিল সোপানে পদস্খলিত হইয়াছ, ভগ্নপদে নিরাশার হুতাশ বক্ষে চাপিয়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছ—ভয় নাই। মায়ের ওই বাণী শুন—হৃদয়ে সহস্র হস্তীর বল পাইবে। মায়ের উদ্বোধিত জ্ঞান প্রণিপাত দ্বারা গ্রহণ কর—হৃদয় সত্যে, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইবে। পরিপ্রশ্নের সাহায্যে, সেবার সাহায্যে তাহার সম্বর্দ্ধনা কর—তোমার নিরাশার অন্ধরজনী অবসান হইবে, জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে, সত্যের সূর্য্যোদয়ে নবপ্রভাত উদিত হইবে। দুরিতার্ণব হইতে ওই মহাজ্ঞানের তরণী তোমায় অনায়াসে অমৃতের কূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। জ্ঞান গ্রহণ কর—গ্রহণ কর, প্রণিপাত সাহায্যে গ্রহণ কর, নিশ্চিন্ত থাকিও না।

এই অভয়প্রদ মাতৃবাণীতে দুইটি সংশয় উঠিতে পারে। পাপকারী জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ কি না, এবং যদি পাপসত্ত্বেও জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, তবে সে পাপ-সমুদ্র হইতে সে পাপের ফল ভোগ করিয়া তবে উদ্ধার লাভ করে, কিম্বা পাপের ফল ভোগ না করিয়াও উদ্ধার পাইতে সমর্থ হয়? প্রথম সংশয়ের অবকাশ নাই বা ওরূপ সংশয় করিতে পারা যায় না। কেন না, পাপীর পক্ষে যদি জ্ঞান লাভ অসম্ভব হইত, তাহা হইলে মায়ের ও আশ্বাসবাণী বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। পাপীর পক্ষে সম্ভব বলিয়াই মা বলিলেন যে, যতই পাপ করনা কেন, জ্ঞান লাভ করিলে তাহার সাহায্যে সে পাপ-রাশি হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইবে, সুতরাং পাপীর জ্ঞানপ্রাপ্তি সম্ভব। তার পর পাপের ফলভোগ সম্বন্ধে। যদি বল, পাপের ফল ভোগ করিয়া, তবে জ্ঞান সাহায্যে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, তাহা হইলে আর জ্ঞানের মাহাত্ম্য কি থাকে? কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে স্বতঃই ত সে কর্ম্মের হাত হইতে পরিত্রাণ হয়। কর্ম্মের ফল ভোগ হইল অর্থেই—কর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ হইল। যদি পাপের ফলই ভোগ করিতে হইল, তবে আর তাহা হইতে জ্ঞান উদ্ধার করিল কি প্রকারে? সুতরাং মায়ের বাক্য এ বিচারেও বৃথা হইয়া যায়। যদি বল, পাপকর্ম্ম, কি সাধারণ কর্ম্ম, সকল কর্ম্মই ফলপ্রসূ ও সে ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী; কর্ম্মসকল স্বীয় স্বীয় ফল ভোগ করাইয়া আপনা আপনি ক্ষান্ত হইয়া গেলেও তাহারা নূতন কর্ম্মের বীজ সৃজন করিয়া রাখিয়া যায় ও তাহারা আবার নূতন কর্ম্মের উৎপত্তি ঘটাইয়া জীবকে ফলভোগ করাইতে বাধ্য করে; জ্ঞানলাভে এই নূতন কর্ম্মের বীজ আর হয় না; মূল কর্ম্মঘটিত ফলটুকু ভোগের পরেই উহার সম্যক্ পরিসমাপ্তি হয়। এই আশঙ্কা অন্য প্রকারেও কেহ কেহ করিয়া

থাকে। তাহারা বলে, যে ফলভোগটুকু আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ক্ষয় হয় না; তবে অবশিষ্ট যাহা সঞ্চিত আছে, তাহার ক্ষয় হয়। না। সকল আংশিক ফল ধ্বংসের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া মায়ের আশ্বাসবাণীকে খর্ব্বিত করিবার কোন কারণ নাই। মাতৃজ্ঞানের মহিমা তত সংকীর্ণ নহে। মাতৃজ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত কর্ম্ম সমস্ত ফল সহ বিনষ্ট হয়। তবে জ্ঞানের পরিমাণের তারতম্য আছে। যে পরিমাণে সে জ্ঞান লাভ হয়, সেই পরিমাণে কর্ম্ম ও ফলের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলে সমস্ত কর্ম্মফলভোগ যে অবসান হয়, ইহাই মায়ের বাক্যের তাৎপর্য্য। “সর্ব্বং” শব্দটি এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আর এই কথাটি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্যই পরবর্ত্তী শ্লোকের অবতারণা।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭

হে অর্জ্জুন। যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ-সকল ভস্মীভূত করে, জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে তদ্রূপ ভস্মীভূত করে।

যৌগিক অর্থ।—আত্মজ্ঞান সম্যক্ লাভ হইলে সমস্ত কর্ম্মই এককালে ভস্মীভূত হয়। কর্ম্মের শক্তিতে আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বা অবস্থায় উপনীত হই ও সেই সেই অবস্থাজনিত সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতে থাকি। এই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ও অনুভূতি, সকলই কর্ম্মফলপদবাচ্য। এই ফলগুলিও কর্ম্ম মাত্র—ইহা পূর্ব্বে আমি বুঝাইয়াছি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক কর্ম্মপ্রবাহই তাপ বা ভোগ। তাপ—প্রবাহের ধর্ম্ম। তাপশূন্য শক্তিপ্রবাহ বা কর্ম্মপ্রবাহ হয় না। সুতরাং সর্ব্বকর্ম্ম বলাতে কর্ম্ম ও ফল সমস্তই সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে ভস্মীভূত হয়, ইহা বলাই মায়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। সমিদ্ধ অগ্নি বলিবার তাৎপর্য্য, সম্যক্ জ্ঞান উদয় হইলে তবে সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হইবে। অগ্নির পরিমাণ অনুসারে যেমন কাষ্ঠরাশ দগ্ধ হয়, জ্ঞানের তদ্রূপ পরিমাণ অনুসারে কর্ম্মসকল ধ্বংস হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আমরা মায়ের বাক্যের এই সারাংশটুকু পাইলাম যে, পাপী জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ এবং সে জ্ঞানের সাহায্যে বিনা ভোগে কর্ম্মের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। কর্ম্ম—শক্তি-প্রবাহ মাত্র। সে শক্তিপ্রবাহ বিষ প্রসব করিতে করিতে অমৃত প্রসব করিতে পারে।

একটি কথা বুঝিবার আছে, ভাল করিয়া বলি। মনে কর, এক জন বড় লোভী। সে যদি জ্ঞান লাভ করে, তাহার সে লোভরূপ যে চিত্ত-শক্তিপ্রবাহ, তাহা কি প্রকারে আর ফল প্রসব না করিয়া নিরস্ত হইবে? মনে কর, তাহার ভগবদ্‌জ্ঞান

হইল; তখন তাহার চিত্তের সেই যে লোভরূপ একটি প্রবল প্রবাহ আছে, তাহা আর বিষয়াদিতে ছুটিবার অবসর না পাইয়া স্বীয় বেগে ভগবানে গিয়াই প্রশমিত হইতে থাকে। কেন না, ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয় তাহার জ্ঞান-দর্পণে আর মুকুরিত হয় না। তাহার লোভজনিত শক্তি—তাহার বিষয় অপহরণরূপ পাপের সহায়তা না করিয়া, ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়তা করিতে থাকে। এইরূপ সকল শক্তি বা সকল মোহ সম্বন্ধে। পাপই করিয়া থাক, আর পুণ্যই করিয়া থাক, তোমার শক্তি সঞ্চয় হইয়াছে। মাতৃজ্ঞান সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ে ধর, তোমার চিত্তের শক্তিপ্রবাহ তাহার সহিতই তোমায় সম্বন্ধযুক্ত করিবে। তিনি যোগ মাত্র দর্শন করেন, কি দিয়া তাঁহাতে যুক্ত হইতেছ, তাহার বিচার তিনি করেন না। কর্ম্মক্ষয়ের জন্যই ভগবান্। কর্ম্মফল শেষ করিয়া ভগবান্ পাইতে হইলে তাঁহাকে পাইবার আবশ্যকতা ছিল না।

এমন না হইলে কি প্রাণ দেওয়া যায়? দেখ, এ জগতে যাহাকেই প্রাণ দাও, বিচার না করিয়া কেহ গ্রহণ করে না। যদিও প্রথমে বিশেষ বিচার না করিয়া কেহ তোমায় গ্রহণ করে, কিছু ক্ষণ বিলম্বে তাহার স্বার্থের উপযোগিতা দেখিতে না পাইলে, তোমার প্রাণটী কেহ লইয়া রাখে না। এ সংসারে এমন কেহ নাই যে, নিত্য সু কু নির্ব্বিচারে তোমার প্রাণটি আদরে বুকে করিয়া রাখিবে। এমন কেহ নাই যে, তোমার গুণের বিচার না করিয়া তোমায় ভালবাসিবে। এমন কেহ নাই যে, তোমার দোষগুণ সহিত সমান স্নেহে তোমায় বক্ষে ধরিয়া থাকিবে। এ জগতে প্রাণের আদান প্রদান নাই, কেনাবেচা আছে। তাই প্রাণ যদি দিতে হয়, তবে যে তোমার সমস্ত প্রাণ নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে দাও। যাহার সমক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলে তোমার অঙ্গের ধূলি দেখিয়া যে তোমায় উপেক্ষা করিবে না, তোমার কুটিলতা বুঝিয়া তোমায় বিদ্রূপ করিবে না, তোমার অসমর্থতা দেখিয়া তোমায় উপহাস করিবে না, তোমার প্রাণের নীরসতা দেখিয়া তোমায় তাচ্ছিল্য করিবে না—দিতে হয়, তাহাকে প্রাণ দাও। সে তোমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা—মা। সে পূর্ণ—সে অপূর্ণতা জানে না। সে পূর্ণ দেয়, পূর্ণ গ্রহণ করে। সে অপূর্ণকে দিয়া পূর্ণ করে, সে অপূর্ণকে লইয়া পূর্ণ করে। মনুষ্য ত তুচ্ছ স্বার্থপর, তাহার কথা ছাড়িয়া দাও। তোমার কু দেখিয়া যদি বৃক্ষ তোমায় ফল না দেয়, যদি নদী তোমায় জল না দেয়, যদি চন্দ্র সূর্য্য তোমায় আলোক না দেয়, যদি বায়ু তোমায় শ্বাস না দেয়, যদি আকাশ তোমায় আসন না দেয়, যদি ধরণী তোমায় ক্রোড় না দেয়—সম্ভব; তবু সে—যে ধরণীর ধরণী, যে নদীর জল, যে বায়ুর জীবন, যে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিঃ, যে আকাশের আধার, যে সর্ব্বপ্রাণের প্রাণ, সে প্রাণ দিয়া তোমার প্রাণের আদর করিবে। তুমিই তার প্রাণ—তুমি তার প্রাণের। তুমি যে তার।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৮

ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং নহি বিদ্যতে। তৎ যোগসংসিদ্ধঃ সন্ কালেন আত্মনি স্বয়ং বিন্দতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—জ্ঞানের মত পবিত্র এ সংসারে আর কিছু নাই। বুদ্ধিযোগে যুক্ত কর্ম্মী, আপনি কালে আপনাতেই তাহা লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের নিকট হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার সাহায্যে জ্ঞান গ্রহণ করিবে। পাছে তাহা হইতে কেহ মনে করে যে, তবে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের মুখনিঃসৃত জ্ঞান শুনিতে পাইলেই বুঝি আত্মজ্ঞান হইয়া যায়, সেই আশঙ্কায় জ্ঞান লাভের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। আমরা পূর্ব্বে যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার কথা বলিয়াছি, তাহা জ্ঞান লাভের উপায়। জ্ঞানলাভের উপায় অর্থে জ্ঞান-ঘন মাতৃমূর্ত্তি দেখিবার উপায়। এ কথা যেন মনে থাকে। তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট যেমন স্থূল হিসাবে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সাহায্যে জ্ঞান উপদেশ লইতে হয়, তেমনি অন্তরে সেই জ্ঞানের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও তাহার সেবা করিতে হয়। তাহার নিকট প্রণিপাতাদি অর্থে তদনুসারে জীবনগতি প্রবর্ত্তিত করা। সেইরূপে জীবনগতিকে পরিবর্ত্তিত করাই বুদ্ধিযোগ বা কর্ম্মযোগ। মা বলিতেছেন, সেইরূপ যোগে সংসিদ্ধ হইলে তবে আত্মাতেই প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানলাভ হয় অর্থাৎ আত্মাতে জ্ঞান-ঘন মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। আমরা শ্রুতি আদির সাহায্যে যে জ্ঞান অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা বুদ্ধিতে পাই, আত্মায় নহে। বুদ্ধি-আশ্রিত জ্ঞানে কর্ম্মজ সিদ্ধি লাভ করিলে তবে আত্মায় তাহা লব্ধ হয়, এবং তাহাই আত্মজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্ম, একই কথা। ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া অর্থেই ব্রহ্ম হওয়া। আত্মাতেই আত্মলাভ বা ভগবৎলাভ হয় —অন্যত্র হয় না।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

শ্রদ্ধাবান্, তৎপরঃ, সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে। জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিং অধিগচ্ছতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—শ্রদ্ধাবান্, তৎপর এবং সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে এবং জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরেই সে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার কথা বলা হইয়াছে, সেই তিন কর্ম্ম তিন প্রকারের ধর্ম্ম বা স্বভাব ফুটাইয়া তুলিয়া জীবকে জ্ঞান লাভে অধিকার দেয়। প্রণিপাত হইতে শ্রদ্ধা, পরিপ্রশ্ন হইতে তৎপরায়ণতা, এবং সেবা হইতে সংযতেন্দ্রিয়তা লাভ। যখন এই তিনটি গুণ ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তখনই বুঝিতে হয় যে, প্রণিপাতাদি কর্ম্ম যথাপ্রয়োজন করা হইতেছে। শ্রদ্ধাশূন্য প্রণিপাত, তৎপরায়ণতাশূন্য

পরিপ্রশ্ন ও সংযতেন্দ্রিয়তাশূন্য সেবা হয় না; অথবা হইলেও বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রদ্ধাই প্রণামের প্রাণ, তৎপরায়ণতা পরিপ্রশ্নের প্রাণ, এবং সংযতেন্দ্রিয়তা সেবার প্রাণ; শ্রদ্ধা না ফুটাইয়া প্রণাম লোকাচার মাত্র বা সাময়িক সংস্কারগত বা উদ্দেশ্যবিশেষগত বাধ্যতা মাত্র। তৎপরায়ণতাশূন্য প্রশ্ন তর্ক মাত্র বা বিতণ্ডা মাত্র, সংযতভাবশূন্য সেবা বন্ধ্যার পুত্র-শোক মাত্র। স্থূল সেবায় যেমন কায়িক সংযম আবশ্যক, জ্ঞানের সেবায় তদ্রূপ নিজের চিত্তবৃত্তিকে তদ্জ্ঞানানুসারে সংযত করিতে হয়, তদনুসারে চালিত করিতে হয়, এবং তাহা হইতে ইন্দ্রিয়-সকল সংযত হয়। যে সেবা ইন্দ্রিয়কে সংযত না করে, সে সেবা সেবা নহে। স্থূলের বা জ্ঞানের, যাহারই বল না কেন, ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, ইন্দ্রিয়সংযমশূন্য সেবা হয় না। সেবাসাহায্যে জ্ঞান যত বিকশিত হয়, তত বিষয় হইতে মায়ের দিকে ইন্দ্রিয়সকল সংযত হয়।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

অজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানঃ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন, ন চ পরঃ, ন চ সুখং অস্তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান্, সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়যুক্ত পুরুষের ইহলোক, পরলোক বা সুখ, কিছু নাই।

যৌগিক অর্থ।—যে জ্ঞান পায় নাই, তাহাকে অজ্ঞ বলে। যে জ্ঞান পাইয়াও পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধা, তৎপরায়ণতা ও সংযতেন্দ্রিয়তা সাহায্যে সে জ্ঞানকে উজ্জীবিত না করিয়াছে, তাহাকেই অশ্রদ্ধাবান্ বলা হইয়াছে। এই প্রকার লোক সংশয়াত্মা হয়। যে জ্ঞান পায় নাই বা পাইয়াও তাহাতে শ্রদ্ধাদিযুক্ত হয় নাই, তাহাকেই মা সংশয়াত্মা বলিতেছেন। অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাবান্ শব্দ দুইটি সংশয়াত্মার বিশেষণরূপে মা বলিয়াছেন। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান্, সংশয়াত্মা, যেন তিন প্রকারের লোক, এরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নহে। অনেকে সেইরূপ করিয়াছেন, সেই জন্য বলিলাম। শ্লোকসকলের ভাষ্য করিতে হইলে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ যত অধিক রক্ষা করা যাইতে পারে, ততই রাখা আবশ্যক এবং সেই ভাষ্যই সমীচীন।

যাহা হউক, সংশয়াত্মা ব্যক্তি দেখিলেই আমরা বুঝিব, তাহার এই দুইটির একটির অভাব। হয় জ্ঞান সংগ্রহ হয় নাই অথবা জ্ঞান পাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে শ্রদ্ধাদি বা প্রণিপাতাদি পূর্ব্বোক্ত সাধনা সংযুক্ত করে নাই। মা বলিতেছেন, এইরূপ লোকের ইহলোক পরলোক কিছুই নাই, সুখও নাই। সংশয়াত্মা পুরুষ কর্ম্ম করিয়াও অকর্ম্মা, সুতরাং অযজ্ঞ বা যজ্ঞহীন। যজ্ঞহীনের ইহলোকই নাই, পরলোক দূরের কথা। "নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য" প্রভৃতি শ্লোকে সে কথা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। সংশয়াত্মা ও অযজ্ঞ, এইটুকু মনে রাখিতে হইবে। যে জ্ঞানচক্ষে এ

ব্রহ্মাণ্ডকে মা বা মায়ের যজ্ঞক্ষেত্র বলিয়া জানে না, সে অযজ্ঞ, এবং সংশয়াত্মাও অযজ্ঞ। ইহাই তাৎপর্য্য।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

হে ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং, জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং, আত্মবন্তং জনং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—যাহাদিগের কর্ম্মসকল বুদ্ধি বা কর্ম্মযোগের দ্বারা ভগবানে সংন্যস্ত, যাহাদিগের সংশয়সকল জ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট, সেই সকল আত্মবান্ পুরুষদিগকে কর্ম্ম বন্ধন করিতে পারে না।

যৌগিক অর্থ।—এই চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্গত সমস্ত জ্ঞানের এই শ্লোকে উপসংহার। কর্ম্মময় বা যজ্ঞময় বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলে এবং শ্রদ্ধার সহিত সেই জ্ঞানের আশ্রয়ে কর্ম্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ অবলম্বনে সমস্ত কর্ম্মকে ভগবানের সহিত যোগের অঙ্গ করিয়া তুলিলেই জীব আত্মবান্ হয়; সেইরূপ আত্মবান্ পুরুষকে কর্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না। পূর্ব্বশ্লোকে সংশয়াত্মা জীবকে দুইটি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন—অজ্ঞ আর অশ্রদ্ধাবান্। তেমনি আবার আত্মবানের দুইটি বিশেষণ—যোগসংন্যস্তকর্ম্ম এবং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়। যাহারা জ্ঞান পায় নাই কিম্বা যাহারা জ্ঞান পাইয়াও সে জ্ঞানে বা ভগবানে অশ্রদ্ধাবান্, তাহারা নিশ্চয়ই সংশয়াত্মা পুরুষ। তদ্রূপ আবার যাহারা জ্ঞান পাইয়াছে এবং সেই জ্ঞানকে শ্রদ্ধার সহিত ধারণা করিয়া, সমস্ত কর্ম্মকে বুদ্ধিযোগে ভগবানে যুক্ত করিয়াছে, সুতরাং আত্মায় সমস্ত জ্ঞানের লাভ হইয়া সংশয় নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা আত্মবান্। জ্ঞান না পাইয়া বা পাইয়াও শ্রদ্ধার সহিত সে জ্ঞানের সেবা না করিলে জীব সংশয়চিত্ত থাকে। আর জ্ঞান পাইয়া, তাহার পূর্ব্বকথিত সেবা করিয়া, জীব সংছিন্নসংশয় হয়। জ্ঞান পাইয়া সেবা করিতে করিতে ক্রমে সংশয়সকল বিদূরিত হইতে থাকে এবং সমস্ত সংশয় সম্যক্‌রূপ বিদূরিত হইলে তবে সেই জীবকে আত্মবান্ বলে বা আত্মবান্ হইলে সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানে যুক্ত থাকিতে থাকিতে তাহার স্বরূপ দর্শন হয় ও আলোকাগমে অন্ধকারের মত সমস্ত সংশয় দূর হইয়া যায়। ধীরে ধীরে জীব যত অধিক পরিমাণে তাঁহাতে যুক্ত হইবে, তত অধিক পরিমাণে সে ক্রমে আত্মবান্ হইতে থাকে ও তার সংশয় মুছিয়া যাইতে থাকে। তাহার উপর কর্ম্মের বন্ধন-শক্তিও সেই পরিমাণে হ্রাস হইতে থাকে। শেষ পূর্ণরূপে আত্মদর্শন হইয়া সে পূর্ণ আত্মবান্ হয়, সমস্ত সংশয়ের সম্যক্ অপগম হয় এবং কোন কর্ম্মই আর তাহাকে ফলে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারতঃ ॥ ৪২

তস্মাৎ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং এনং আত্মনঃ সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ। হে ভারত! উত্তিষ্ঠ।

ব্যবহারিক অর্থ।—সুতরাং তুমি জ্ঞানাসির দ্বারা আপনার হৃদয়স্থিত সংশয় ছেদন করিয়া যোগের অনুষ্ঠান কর। হে ভারত—উঠ।

যৌগিক অর্থ।—সাধক, তবে আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না। আমার নিকট যে মহান্ জ্ঞান লাভ করিলে, সেই জ্ঞানের সাহায্যে, সেই জ্ঞানের সেবায় আপনার সংশয় ছিন্ন করিয়া আমাতে যুক্ত হও। আমার মুখনিঃসৃত জ্ঞানে হৃদয়ের বল সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হও। সেই জ্ঞানচক্ষে জগতের কর্ম্মসকলকে দর্শন করিয়া সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হও, তোমার সংশয় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, তুমি পূর্ণরূপে আমাতে যুক্ত হইবে। উঠ—কর্ম্ম কর।

ওইটুকু। ওই "উঠ, কর্ম্ম কর" ওইটুকু পারি না মা! সব পারি; শুনিতে পারি, বুঝিতে পারি, অপরকে বুঝাইতে পারি, সমগ্র শাস্ত্রসমুদ্র আবৃত্তি করিতে পারি, অন্যের দোষ না থাকিলেও তর্কে বাহির করিতে পারি, তাহাদিগের কেন মুক্তি হইতেছে না, তাহার কারণ আবিষ্কার করিতে পারি, তাহাদিগের ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারি—সব পারি মা, কিন্তু ওই ক্ষুদ্র "উঠ" ওইটুকু পারি না! ওই শব্দটি কর্ণে প্রবেশ করিলেই যত সন্নিপাত আসিয়া ঘেরে, যদি দাঁড়াইয়া থাকি ত বসিয়া পড়ি, যদি বসিয়া থাকি ত শুইয়া পড়ি—ওইটুকু পারি না।

তুমি সব বলিয়াছ মা, আমি সব শুনিয়াছি, কিন্তু উঠিলাম কৈ মা? তুমি "উঠ" বলাতে অর্জ্জুনও ত উঠিয়া দাঁড়ায় নাই? তবে আমরা কেমন করিয়া উঠিব? কেমন করিয়া সংশয়রাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তোমাতে যুক্ত হইবার জন্য সমুত্থিত হইব? উঠ বলিলে উঠিতে পারিব না—তুলিয়া দাও। কর বলিলে করিতে পারিব না, করাইয়া লও। চল বলিলে চলিতে পারিব না—চলাইয়া দাও মা! অথবা তুমি এরূপে বলিলে ত হইবে না; যেমন করিয়া বলিলে হইবে, তেমনি করিয়া বল। তুমি যে রূপ ধরিয়া এ অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে উঠাইতেছ, করাইতেছ, চলাইতেছ, সেইরূপে একবার এস মা! তোমার যে কোটিরবিকরোজ্জ্বল বিভাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সভয়ে চন্দ্র সূর্য্য বিভ্রান্ত, তোমার যে স্তিমিত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত, বায়ু প্রবাহিত, আকাশ স্তব্ধ, মৃত্যু ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসে ব্যস্ত, সেই মূর্ত্তিতে একবার এস মা! তোমার যে মূর্ত্তি দেখিয়া হরিহরবিরিঞ্চি সন্ত্রস্তে তোমার রক্ত চরণে শির সংলগ্ন করিয়াছে, তোমার যে মূর্ত্তির অভিব্যক্তিতে অনন্ত কোটি বিশ্বচালক দেবতাবৃন্দ সভয়ে "প্রসীদ প্রসীদ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে, তোমার যে মূর্ত্তিভঙ্গিমায় ভীত হইয়া সারে সারে সিদ্ধ মুক্ত ঋষিরা নগ্ন শিশুর মত মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তোমার যে ভ্রুকুটীতে ইন্দ্র বিদ্যুৎচমকে চমকিত, রুদ্র রৌদ্রিত, বিষ্ণু বিশ্বব্যাপ্ত, ব্রহ্মা বিশ্বপ্রসূ, সেই মূর্ত্তিতে একবার এস মা—সেই সর্ব্বভূতমহেশ্বর মূর্ত্তিতে একবার—একবার এ আলস্যমুগ্ধ, অজ্ঞান-তিমিরাবৃত সন্তানের সম্মুখে সমুদিত হইয়া পুত্র বলিয়া ডাক মা—একবার, শুধু একবার তোমার চরণধূলিতে তোমার নয়ন সমক্ষে মা মা করিয়া আমায় গড়াগড়ি দিতে দাও মা—একবার, শুধু একবার "সত্য আমি তোর মা," সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই অমৃত ঘোষণা করিয়া, বিশ্বাসের অচল-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও মা—তোমায় আর "উঠ" বলিতে হইবে না। উঠি না এই বিশ্বাসের অভাবে। বুঝিয়াও বুঝি না, করিয়াও করি না, শুনিয়াও শুনি না—শুধু এই বিশ্বাসের ধ্রুব জন্মায় নাই বলিয়া। উত্তানপাদ হইয়াই রহিলাম, উঠিতে পারিলাম না। এই "উঠ"টুকুর মীমাংসার জন্যই পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি মাকে আবৃত্তি করিতে হইয়াছিল ও ওইরূপে অর্জ্জুনের সমক্ষে আসিতে হইয়াছিল। আমরাও তোমার মুখের সুধা শুনিতেছি, আমাদের সম্মুখেও তুমি তেমনি করিয়া আসিবে,

আমাদেরও তেমনি করিয়া তুমি মোহ বিনষ্ট করিয়া দিবে, আমরাও গীতা শুনিতে শুনিতে অর্জ্জুনের মত বিশ্বময় তোমার বিশ্বরূপ দেখিয়া, তোমার বিশ্বের অণুতে অণুতে নমস্কার করিব। আমরা কর্ম্মে অগ্রসর হইব, আমরা উঠিব।

অথবা তাহা যদি না কর, যদি তোমায় সেই রূপে দেখিতে আমাদিগকে অযোগ্য বিবেচনা কর, তবে ভিক্ষুকের মত এস। আমরা জগতে প্রাণ বিতরণের কল্পতরু হইয়া বসিয়া আছি; আমরা প্রাণ বিতরণ করি নাই—বুঝি এমন কিছু জগতে নাই। তুমিও এস, বলির দুয়ারে ক্ষুদ্র বামনমূর্ত্তি ধরিয়া ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে গিয়া, যেমন করিয়া তাহার নিকট ত্রিপাদ ভূমি চাহিয়াছিলে, তেমনি করিয়া—ওগো, তেমনি করিয়া ক্ষুদ্রত্বের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া, প্রাণ-বিতরণপটু, আত্মাভিমানপূর্ণ, আত্মগরিমায় রাজতুল্য আমাদের দুয়ারে একবার আসিয়া ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা কর। আমি অজ্ঞাতসারে তোমায় ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা দিব, তুমি গ্রহণ করিবে। তোমার এক পাদে আমার বাহ্য জ্ঞান, দ্বিতীয় পাদে আমার অন্তর্জ্জগৎ আবৃত হইয়া যাইবে, আমার অন্তর বাহ্য এইরূপে চরণদ্বয়ে আক্রান্ত করিয়া, তৃতীয় পাদ সংরক্ষণের জন্য আমায় স্থান দেখাইয়া দিতে বলিবে; তোমার অন্তর্বাহ্যব্যাপী চরণ-বিস্তার দর্শন করিয়া, তোমার পদ-নখরে কোটি বিশ্বের আবর্ত্তন দেখিয়া, আমার আমিত্বের উচ্চ শির প্রণত হইয়া যাইবে। তোমার তৃতীয় চরণ আমার সেই প্রণত শিরে সংরক্ষিত করিয়া, অচ্যুতভাবে আমার শিরোদেশে তোমার চরণ সংস্থাপিত করিয়া, স্বর্গে কিম্বা নরকে, অন্তরীক্ষে, মর্ত্তে অথবা পাতালে, তোমার অভিরুচিমত আমায় স্থান দাও, আমি ধন্য হই—কৃতকৃতার্থ হই।

সংশয় দূর করিয়া দাও—সন্দেহ বিদলিত কর, আস্তিক্য-বুদ্ধির অপরাজেয় বলে আমার দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেও, আর কিছু করিতে হইবে না। সাধনরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সর্ব্বত্র ভিত্তিহীন প্রাসাদের মতন সাধন-মন্দিরসমূহ দেখিতে পাই। "তুমি অচ্যুতভাবে সর্ব্বত্র বিরাজিত"—এ মহান্ সত্য হৃদয়কে বলবান্ না করিলে সাধনা বৃথা। অথবা এই সত্য লাভের জন্যই সাধনা, সাধনা করিতেছি এই সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে। জগতের চারি ধারে যেন এই দৃশ্যই দেখিতে পাই; সাধনায় দিন দিন যদি অন্তরালোক কেহ লাভ করিতে থাকে, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ অথবা যে কোন প্রকারে যদি কেহ তোমার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছে বলিয়া আপনাকে বোধ করে, তবে সে একটি মহান্ সত্য আপনার হৃদয়ে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়; সমস্ত জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা—যাগ-যজ্ঞ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি করিয়া, অবশেষে সে দেখে—আমার যাহা কিছু কর্ত্তব্য, সব করিয়াছি—তোমাকে পাইবার জন্য যাহা যাহা করিতে হয়, সে সমস্তেরই প্রায় অনুষ্ঠান করিয়াছি, কেবল একটী কাজ করি নাই—"তোমায় আমরা চাই নাই।" হৃদয়ের অভ্যন্তরে তপ্ত লৌহ-দ্রববৎ জ্বালা অনুভব করিয়া তখন সে মূর্চ্ছিত হয়। তাই যদি কিছু না কর, শুধু এইটুকু কর, যেন ইহ জীবনের শেষ বায়ু প্রশ্বাসের সময়ে বুঝিতে পারি, বলিতে পারি—আপনার অন্তরকে বুঝাইয়া দিতে পারি—"আমি তোমায় চাহিয়াছি।" আমাদিগের সমস্ত সাধনা সফল হইবে।

ইতি চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ সমাপ্ত।

ওঁ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পঞ্চম অধ্যায়

[কর্ম্মসংন্যাস যোগ।]

সাধকের চিত্তের অবস্থা ভগবন্মুখে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইতে হইতে বিশেষরূপে যে সকল ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়, গীতায় সেই ভাবান্তরগুলি ক্রমান্বয়ে এক একটি অধ্যায় আকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কর্ম্মের ভিতর জ্ঞান এবং জ্ঞানের ভিতরে কর্ম্মানুসন্ধান করিতে যখন জীব কৃতকার্য্যতা লাভ করে, তখন হইতে তাহার কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ সূচিত হয়। সে কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ এই পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন; কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস, এ উভয়ের বাস্তবিক কোনও বিশিষ্টতা নাই। কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাসযোগ, বস্তুত উভয়ই এক। গার্হস্থ্য কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকিলে যে ফল লাভ হয়, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকিলেও তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্ম গ্রহণ ও কর্ম্মত্যাগ, ইহার কোনও বিশিষ্টতা নাই—বিশিষ্টতা যোগাংশের। কর্ম্মসাহায্যে বা কর্ম্মত্যাগের সাহায্যে, যে উপায়েই হউক না কেন, ভগবানে যে পরিমাণে যে যুক্ত হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়, সে সেই পরিমাণেই মাত্র ফল লাভ করে। এবং সেইরূপ যুক্ত হইয়া থাকার নামই যথার্থ কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ, নতুবা গৃহস্থাশ্রমে কর্ম্মের ও সন্ন্যাসাশ্রমে কর্ম্মত্যাগের কোন মূল্যই নাই।

এই যে প্রকৃত আত্মিক সন্ন্যাস, ইহা লাভ করিতে হইলে কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়া লাভ করাই ভগবানের অভিপ্রায়। কর্ম্মত্যাগের ভিতর দিয়া এ সন্ন্যাস লাভ করা দুরূহ—ভগবান্ ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যে কর্ম্মী তাঁহাতে সংযুক্ত হইয়া জগতে কর্ম্ম করে, কর্ম্মফলসকল তাহাতে লিপ্ত হয় না। কর্ম্ম-সাহায্যে তাঁহাতে যুক্ত হওয়াই স্বল্পায়াসসাধ্য। কর্ম্মময় এ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মতরঙ্গ-চাঞ্চল্যের দ্বারাই আমরা তাঁহার সত্তা উপলব্ধি ও তাঁহার মহিমা দর্শন করিতে সমর্থ হই। এবং সেইরূপ দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহাতে আমরা আকৃষ্ট হইতে থাকি। কর্ম্ম দেখিতে দেখিতেই স্বতঃ আমাদিগের চিত্ত এ কর্ম্মাবর্ত্তনের তলে তলে কর্ত্তাকে অন্বেষণ করে। কর্ম্ম দেখিলেই কর্ত্তা মনে পড়ে এবং কর্ম্মের বৈচিত্র্য তাঁহার মহিমা দৃঢ়রূপে আমাদিগের চিত্তে অঙ্কিত করিয়া দেয়। কর্ম্মের মূল্য অনুভূতিতে। জগদ্ভোগ অর্থই অন্তরে

জগদ্দর্শন। কর্ম্মের সাহায্যে অন্তরে জ্ঞানময় জগদ্দর্শন এবং জ্ঞানময় জগতের তলে জ্ঞান যাঁহার মহিমা, সেই পরমেশ্বরের দর্শন, ইহাই কর্ম্মযোগের লক্ষণ। সে দর্শন হৃদয়ময় কর্ম্ম ভিন্ন হয় না, তিনি হৃদয়গ্রন্থির অভ্যন্তরে; মাত্র মনোগ্রন্থির তলায় তিনি নহেন। সুতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমের হৃদয়ের অনুশীলন জগদ্‌ভোগের সঙ্গে থাকা চাইই। তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া, তাঁহার চরণে আমরা আত্মসমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপে কর্ম্মের সাহায্যে আমরা তন্ময়তা লাভ করিতে পারি ও করি। যত দিন না এ তন্ময়তা আসে, তত দিন আমাদিগকে হৃদয়ময় কর্ম্ম লইয়াই অবস্থান করিতে হইবে। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহাতে যুক্ত হইব, কর্ম্মবিভ্রমে যুক্ত হইতে পারিতেছি না—এই ভাবিয়া যাহারা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তাহারা কস্মিন্ কালেও তাঁহাতে যুক্ত হইতে পারে না বা যুক্ত হওয়া সহজসাধ্য নহে। তাহারা কার্য্যতঃ অযোগী হইয়া দুঃখই ভোগ করে।

ভগবান্ সেই জন্য বলিয়াছেন—কর্ম্মসর্ম্ম্যাস বা যথার্থ সন্ন্যাস লাভের একমাত্র উপায়—কর্ম্ম-সাহায্যে তাঁহাতে যুক্ত হওয়া। কর্ম্মের সাহায্যে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে জীব তাঁহাতে অস্থাবান্ হয়—যথার্থ ভাবে তাঁহার সত্তায় বিশ্বাসবান্ হয়। তিনি প্রত্যক্ষভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন, এই ধ্রুব সত্য তাহার হৃদয়ে জ্বলন্তভাবে আধিপত্য বিস্তার করে। এ সত্যজ্ঞান হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইলে বিষয় লাভের জন্য বিষয়ীর চিত্তের মত যথার্থ ভাবে জীবের মন প্রাণ তাঁহার চরণে নমিত হইয়া পড়ে; জীবকর্ত্তৃত্ব বলিয়া সে আর কিছু দেখিতে পায় না। সে ভগবানের বশে চলিতে থাকে; ভগবানের বশে কার্য্য করিতে থাকে, ভগবানের বশে এ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুর আবর্ত্তন বিবর্ত্তন হইতেছে দেখিতে পায়।

আর এক অপূর্ব্ব জিনিষ সে দেখে। সে দেখে, ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞায় চালিত হয়, এ অনন্ত জগৎ সে ভাবে তাঁহার আজ্ঞায় চালিত হইতেছে না। লোকসকলকে তিনি কর্ম্মে নিবদ্ধ করিতেছেন না। কর্ত্তৃত্বাভিমান দিয়া জীবকে তিনি বিমূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না। লোকসকলের কর্ম্ম তিনি সৃজন করিতেছেন না। কর্ম্মের ফল-বিধানও তিনি করেন না। লোকসকলের স্ব স্ব ভাব সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। জীবসকল স্ব স্ব স্বভাববশে পরিচালিত হইতেছে। সূর্য্যকিরণসম্পাতে কুসুমদল যেরূপ প্রস্ফুটিত হয়, তাঁহার জ্যোতিঃসম্পাতে জীব-স্বভাব তেমনিই কর্ম্মময় হইয়া, জীবকে কর্ম্মফলে আবদ্ধ করে। সমুদ্র-বক্ষ অবলম্বন করিয়া তরণীসকল যেমন স্বেচ্ছানুসারে দিকে দিকে যাত্রা করে, জীবও তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব স্বভাবানুসারে তদ্রূপ চালিত হয়। মাতৃঅঙ্কে শিশু স্বীয় স্বভাবানুসারে যেমন কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, জগন্মাতার অঙ্কে জগৎ ও জীবসকল তদ্রূপ স্বীয় স্বভাব অনুসারে কর্ম্মবৈচিত্র্য রচনা করে। ইহাই জীবের স্বাধীনতা। যত ক্ষণ জীব তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তত

ক্ষণ সে দেখে, কে যেন তাহাকে অপরাজেয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে চালিত করিতেছে। ইহাই প্রথম অবস্থা। কর্ম্মফলাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, ভগবানে যুক্ত হইয়া জীব যখন কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, তখন সে দেখে, কেহ তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করে নাই। স্নেহময়ের স্নেহে সে আপনার ইচ্ছানুযায়ী বর গ্রহণ করিতেছে। আপনার ইচ্ছায় বিচিত্র কর্ম্ম করিয়া, কল্পতরুর তলায় সে স্বেচ্ছানুযায়ী ফল কুড়াইতেছে এবং হর্ষ বিষাদ প্রাপ্ত হইতেছে। তখন তাহার ধাঁধা ছাড়িয়া যায়। তখন সে তাহার ইচ্ছাকে বহুমুখ হইতে সংযত করিয়া ভগবচ্চরণে একমুখী করে। তাঁহার উদার অনাবিল মুক্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, জীব মুক্ত উদার অনাবিল হইবার জন্য ইচ্ছাময় হয়। জীব-স্বভাব বহির্ম্মুখে না ছুটিয়া, অন্তর্ম্মুখে তাঁহারই চরণতলে জীবকে ছুটাইয়া লইয়া যায়। ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা। তৃতীয় অবস্থায় জীব-স্বভাব ভগবৎস্বভাবে বিলীন হইয়া তাঁহার সহিত একীভূত হয়। তখন দেখা যায়, সমস্ত কর্ম্মের যথার্থ কর্ত্তা ভোক্তা, সর্ব্বলোকের, সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ একমাত্র মহান্ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ নহে। কেন না, জীব স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে ফল উপভোগ করে এবং উপভোগ করিলেও তাঁহার মঙ্গল ঈক্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া উপভোগ করিতে জীব-বাসনা সক্ষম হয় না।

যাই হউক, ভগবদ্‌যুক্ত হইয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিলে জীব কার্য্যতঃ অন্তর্ম্মুখী হইয়া পড়ে। বরফখণ্ড জলান্বেষী হইলে যেমন সে স্বীয় অন্তরেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তদ্রূপ জীব ভগবদন্বেষী হইলে স্বতই তাহার নিজ অন্তরের দিকে লক্ষ্য পড়ে। তাই জীব এ অবস্থায় অন্তর্জ্জ্যোতি, অন্তঃসুখ, অন্তরারাম অন্বেষী হয়। তাহার কার্য্য মাত্র বহির্ম্মুখী থাকে না, বাহিরে কার্য্য করিলেও সে অন্তরের দিকে চাহিয়াই কার্য্য করে। বাহিরের সেবা করিয়াও কার্য্যতঃ সে অন্তরেরই সেবা করে। জগজ্জীবের সেবা করিলেও কার্য্যতঃ সে অন্তর্য্যামীরই সেবা করে। এইরূপে বাহির ছাড়িয়া অন্তদ্র্ষ্টা হওয়াই কর্ম্মসন্ন্যাসের লক্ষণ। এবং ইহাই ধ্যানের ও নৈষ্কর্ম্ম্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ, কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং পুনঃ যোগঞ্চ শংসসি ; এতয়োঃ যৎ শ্রেয়ঃ, তদেকং মে সুনিশ্চিতং ব্রূহি।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে কৃষ্ণ, তুমি কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ, উভয়েরই প্রশংসা করিতেছ। এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়, আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ ইতিপূর্ব্বে যে ভাবে কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে

উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে সাধারণতঃ মনে হয়, তিনি কোথাও কর্ম্মের, কোথাও জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। যদি মাত্র জ্ঞানানুশীলনে অথবা মাত্র জ্ঞানহীন কর্ম্মে শ্রেয় লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ভগবানের উপদেশে অর্জ্জুনের সংশয় আসিত না। ভগবান্ কর্ম্মের ভিতর জ্ঞান ও জ্ঞানের ভিতর কর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, সেই জন্যই প্রাণে এ সংশয়।

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ,—সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ। তয়োঃ তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস, উভয়ই শ্রেয়স্কর। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কর্ম্ম-সন্ন্যাসাপেক্ষা কর্ম্মযোগই বিশিষ্টভাবে মঙ্গলপ্রদ।

যৌগিক অর্থ।—সন্ন্যাসী যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী হয় এবং গৃহস্থ যদি প্রকৃত কর্ম্মী হয়, তাহা হইলে উভয়েই পরম মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু পারিলেও সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই প্রশস্ততর। সাধনায় অন্তরের অবস্থাই প্রধানতঃ লক্ষণীয়। সাধকের চিত্ত ভগবদ্বেদনে কতটুকু সম্বেদিত, এইটুকুই লক্ষ্যের বিষয়। সে সম্বেদন কর্ম্মত্যাগের সাহায্যেই হউক বা কর্ম্মযোগের সাহায্যেই হউক, তাহাতে কিছু ইতরবিশেষ হয় না। কিন্তু তত্রাচ কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই উত্তম।

যদি সাধক হইতে চাহ, তবে মায়ের এই কথাটি ভুলিও না। এই অমৃতময়ী মহাবাণী বিস্মৃত হইয়া যে উন্মার্গ-গতি মনুষ্যসমাজে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহার জ্বালাময় সংঘাত লোকসমাজের স্তরে স্তরে আজ ধর্ম্মকে ব্যথিত করিতেছে। সন্ন্যাসীদিগের ত কথাই নাই, তাহারা ত এখন কর্ম্ম না করিয়াই কর্ম্মত্যাগী, গৃহীরাও কর্ম্ম করে, কিন্তু যেন করিতে বাধ্য হয়, তাই করে। আমি মাত্র নিত্যকৃত্য উপাসনাদির কথা বলিতেছি না, সাধারণ কর্ম্ম সম্বন্ধেও সমভাব। আলস্যপরায়ণ, নির্জীব, জাড্যভাবালম্বী, ভগ্নহৃদয়, আশা উৎসাহশূন্য, কোন প্রকারে দিন কয়টা অতিবাহিত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে যেন পরিত্রাণ পায়, এই শ্রেণীর লোকে আজ সমাজ পূর্ণ। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ জাগতিক সুখ-সম্পদে যাহারা প্রতিষ্ঠিত, মদ্যাদি উত্তেজক ঔষধ সেবনে সান্নিপাতগ্রস্ত রোগীর জীবনের ন্যায় তাহাদের জীবন সাময়িক উদ্দীপনাময়, কিন্তু বস্তুতঃ নির্ব্বাণোন্মুখ। ঈষৎ বিষয়স্বার্থ হইতে বঞ্চিত হইলে অমনি ব্রহ্মাণ্ড তাহাদের চক্ষে অন্ধকার। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উঠিলেই পণ্ডিত মূর্খ সকল শৃগালের এক সুর—গৃহে হইবে না, সংসার না ছাড়িলে কিছু হয় না—সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের ও মহাপুরুষের বাক্য আবৃত্তি। এ সকল যামঘোষ মাত্র রাত্রিরই ঘোষণা করে—দিবার ঘোষণা করিবার

ইহাদিগের ক্ষমতা নাই। এই সকল যামঘোষের ঘোষণা স্তব্ধ করিয়া সংসারের দিবা ঘোষণা করিবার জন্যই মা আমার আবির্ভূতা হইয়া, সাধক অর্জ্জুনের অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া বজ্রনির্ঘোষে গীতার ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন ও তুলিয়া থাকেন। এই কর্ম্মযোগ যে সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেয়স্কর, অর্জ্জুনকে এই কথা শুনাইবার জন্যই গীতা। তাই বলি, যদি সাধক হইতে চাহ, তবে এ মহাবাণী ভুলিও না, ভুলিও না। কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ, এ অপৌরুষেয় বাণী বৈদিক যুগের মত আজ জগতে আবার চৈতন্যময় হউক। জগতে সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩

যঃ ন দ্বেষ্টি, ন কাঙ্ক্ষতি, স নিত্যসন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ। হে মহাবাহো, হি যতঃ নির্দ্বন্দ্বঃ জনঃ সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যিনি দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। হে মহাবাহো, নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ অনায়াসে বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায়।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ কিসে শ্রেয়স্কর, তাহা বুঝাইবার জন্য আগে প্রকৃত সন্ন্যাসের মর্ম্ম কি, তাহাই বলিতেছেন। সন্ন্যাসের মর্ম্ম—নির্দ্বন্দ্ব ভাব। দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব হইতে যাহার হৃদয় মুক্ত হইয়াছে, তাহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলে। কর্ম্ম না করিলে এ নির্দ্বন্দ্ব ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কর্ম্মক্ষেত্রে না বিচরণ করিলে, কর্ম্মসংঘাতের মধ্যে অবস্থান না করিলে দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষার ঘাত-প্রতিঘাত উদ্দীপিত হইবার অবসর কোথায়? দরিদ্রকে সর্ব্বত্যাগী বলিলে যেমন একটি অসার হাস্যোদ্দীপক বাক্য মাত্র হয়, কর্ম্মসংঘাতে না থাকিয়া, কর্ম্মময় গৃহস্থাশ্রমের বাহিরে বসিয়া নির্দ্বন্দ্ব হইয়াছি ভাবা ঠিক্ তদ্রূপ। মা পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে বুঝাইয়াছেন যে, লোকের নিষ্ঠা দুই প্রকারের—কাহারও জ্ঞানযোগে, কাহারও বা কর্ম্মযোগে। কিন্তু যাহাদিগের নিষ্ঠা কর্ম্মে নহে—জ্ঞানে, তাহারাও যেন ভুলিয়া না যায় যে, কর্ম্ম না করিয়া কেহ নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না। কেন না, শরীরযাত্রার জন্যও অন্ততঃ কর্ম্ম করিতে হইবে। সুতরাং সেখানে মা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যদি জীবের সন্ন্যাসেই নিষ্ঠা থাকে, তত্রাচ তাহার পক্ষে অগ্রে কর্ম্মই করণীয়। তার পর ইচ্ছা হয়, কর্ম্ম বর্জ্জন করিতে পার। ইহা বুঝাইবার পর যদি কেহ এমন ভাবে যে, কর্ম্মের উদ্দেশ্য—মাত্র সন্ন্যাসাশ্রমের জন্য প্রস্তুত হওয়া অর্থাৎ মায়ের অভিপ্রায় এই যে, সকলেই আগে কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর, তার পর চিত্তশুদ্ধি হইলে, সকলকেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্যই এই পঞ্চম অধ্যায়ে মা বিশেষ করিয়া সন্ন্যাসের প্রকৃত মর্ম্ম প্রথমে বলিতেছেন। দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা যাহার প্রাণে জাগে না—তাহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া বুঝিবে। দ্বেষ আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত

হইলেই সমস্ত বন্ধনের কবল হইতে জীব মুক্তি লাভ করিয়াছে বলিতে হয়। এই দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষার আক্রমণ জয় করিতে হইলে, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী হইতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে এ দ্বেষাকাঙ্ক্ষা সম্যক্ উদ্দীপিত হয় না। সুতরাং ইহাদিগকে জয় করারও অবসর পাওয়া যায় না। এমন ভাবিও না যে, যেখানে দ্বেষাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইবার অবসর পায় না, কার্য্যতঃ সেই ক্ষেত্রই সমধিক মঙ্গলকর। দ্বেষ আকাঙ্ক্ষার বীজ প্রতি জীবের অন্তরে সংস্কাররূপে নিহিত থাকে, এবং উহা কাল দেশাদি সুযোগ পাইলেই নিশ্চয় জাগ্রত হইয়া থাকে। যত দিন ভগবদ্‌যুক্ত হইয়া ভগবান্‌কেই সর্ব্বত্র ভোক্তা কর্ত্তা, সর্ব্বত্র একমাত্র বিভু বলিয়া বোধ না জন্মায়, তত দিন দ্বেষাকাঙ্ক্ষা শরীরী মাত্রেরই হৃদয়ে উদ্দীপিত হইবে। সুতরাং যেখানে উহা সত্বর স্পষ্ট উদ্দীপিত হইবার সুবিধা পায় এবং ভগবানের কর্ম্ম ভাবিয়া জীব যেখানে উহা দমন করিতে পারে, সেই ক্ষেত্রই প্রশস্ত। কেন না, নির্দ্বন্দ্ব হইতে হইলে দ্বন্দ্বের আবশ্যক—নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন। দ্বন্দ্বই যদি বিশেষ ভাবে না থাকে—নির্দ্বন্দ্ব কি করিয়া হইবে? কর্ম্মই যদি না থাকে, নিষ্কর্ম্ম কেমন করিয়া হইবে? বন্ধ্যার পুত্রশোক কি?

সন্ন্যাস নৈষ্কর্ম্ম্য। কর্ম্মবর্জ্জনে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয় না। কর্ম্মজয়ে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয়। যাঁহারা ত্যাগ ত্যাগ করেন, তাঁহারা যদি বুঝিয়া দেখেন যে, প্রকৃতি ত্যাগ করিবার উপায় নাই; প্রকৃতি ত্যাগ করা শরীরীর পক্ষে একটা হাস্যোদ্দীপক কথা মাত্র; প্রকৃতিজয়ই কর্ম্ম এবং প্রকৃতিজয়ই সন্ন্যাস, তাহা হইলে ত্যাগের কথা মুখে আনেন না। এই জয় শিক্ষার জন্যই গৃহস্থাশ্রম। দয়া, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, সরলতা, প্রীতি, প্রসাদ, মাধুর্য্য, অক্রোধ প্রভৃতি, যম, দান, তপস্যা, ধ্যান, অধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, উপস্থনিগ্রহ, স্নান, মৌন প্রভৃতি নিয়ম—এ সকল সংসারীর একান্ত পালনীয়। এইরূপ শম, দম, যম, নিয়ম ও অন্যান্য নৈতিক নিয়মাবলী বিশেষ ভাবে পালন করিয়া বৃত্তি জয় করাই সংসারের অন্যতম উদ্দেশ্য। স্বেচ্ছাচারের পক্ষে এ সকল শৃঙ্খলবৎ যন্ত্রণাদায়ক, সুতরাং দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সহজেই সংসার কঠোর কারাগারবৎ প্রতীয়মান হয় এবং আলস্যপরায়ণ জীব এ দুরূহ ভার বহনে সহজেই পশ্চাৎপদ হইয়া গৈরিক বসনে তনু আবৃত করতঃ নিশ্চিন্তে বিচরণ করিতে অগ্রসর হয়। বিশেষতঃ এ অন্নদ্বন্দ্বের দিনে, দ্বন্দ্ব না করিয়া, নির্দ্বন্দ্ব হইতে অনেকেরই সাধ জাগে। এখন সংসারে শম, যম, দম, নিয়মের বাঁধাবাঁধি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু না থাকিলেও লোকসমাজে অন্যান্য নিদারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্ব্বতোমুখী। তার উপর জ্ঞান হইয়াছে—সংসার অনিত্য। কে কার? সুতরাং গেরুয়া লও। ইহাই এখন অনেক স্থলে যুক্তি। কিন্তু এ যুক্তি শক্তিলাভের ক্ষেত্র হইতে—প্রকৃতিজয়ের রণস্থল হইতে তাহাদিগকে যে দুরে অপসৃত করে, ইহা তাহারা ভাবিয়া দেখে না।

মা বলিতেছেন—নিত্যসন্ন্যাসের অর্থ—দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা। প্রাণে কোন অবস্থার উপর বিদ্বেষ রাখিবে না। আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মাকে আকাঙ্ক্ষা করিবে। বিদ্বেষ করিও না অর্থে মাকে আকাঙ্ক্ষা করা। আকাঙ্ক্ষা রাখিও না অর্থে মাকে আকাঙ্ক্ষা করা। মাকে আকাঙ্ক্ষা না করিলে বিদ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষার কবল হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। মাকে আকাঙ্ক্ষা না করিলে এ ব্রহ্মাণ্ড স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি ধারণ করিবে না,—বিভীষিকাময়ী রাক্ষসীরূপে বিদ্বেষ-বহ্নি অন্তরে জ্বালিয়া রাখিবে, সংকীর্ণ ভোগের সংকীর্ণ মোহে আচ্ছন্ন করিয়া পলে পলে তোমায় চর্ব্বণ করিবে, চূর্ণ করিবে, অচ্যুতের মহান্ সঙ্গে বঞ্চিত করিয়া বিচ্যুতিময় সুখমোহের বিচ্ছেদে বার বার তোমায় ধূল্যবলুণ্ঠিত করিতে থাকিবে।

মাকে কেমন করিয়া আকাঙ্ক্ষা করিবে?—হিন্দুর দশমবর্ষীয়া কন্যা অবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া আসনে উপবিষ্টা। অপরিজ্ঞাত অপরিচিত বিদেশী একটি পুরুষ কন্যার সম্মুখে। কন্যার পাণি পুরুষের পাণিতে সংযুক্ত হইল; চারি ধারে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল; প্রজাপতিস্মরণে পুরোহিত কন্যার বোধাগম্য কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করিল ও করাইল। কন্যার পিতা যেন বলিয়া দিল—বৎসে! এই পুরুষ তোমার স্বামী। চারি চক্ষু হয় ত একবার মিলিত হইল মাত্র; অথবা ব্রীড়াবনতা বালিকা সেটুকুতেও বঞ্চিতা। কেমন রূপ, কেমন গুণ, কেমন আচার, কেমন ব্যবহার—পুরুষের ধর্ম্ম, প্রকৃতি, হাব ভাব, কিছুই সে বালিকা জানে নাই, শোনে নাই, কিছুমাত্র অবগত নহে; পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সে অপরিচিত পুরুষকে দেখিলে ভীতি-বিজড়িতা হইয়া হয় ত ছুটিয়া পলাইত। তবু,—তবু বালিকার প্রাণের দিকে প্রভাতে চাহিয়া দেখ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড —তাহার স্বদেশ, স্বগৃহ, স্নেহের আত্মীয়-স্বজন, ভ্রাতা ভগ্নী, পিতা-মাতা, বালিকার হৃদয়ে সেই পুরুষ অপেক্ষা দূরে! গত নিশায় যে অপরিচিত বিদেশী পুরুষ, প্রভাতে সে সর্ব্বাপেক্ষা সুহৃৎ প্রিয়। দশ বৎসর পিতা মাতা বক্ষে ধরিয়া যে মায়ার তন্ত্রীতে ওতপ্রোত বিজড়িত করিয়াছিল, আজ সহসা কোন যাদুমন্ত্রে এক সুদৃঢ় অবিচ্ছেদ্য কুসুমমেখলার কোমল বন্ধন সে পিতা মাতার বন্ধনকেও শ্লথ করিয়া দিয়াছে। আজ জগতে সে অসঙ্কোচে বলিতেছে—সেই পুরুষই তাহার একমাত্র একান্ত আপনার।

কেন এমন হইল? এ স্বামী কোথায় ছিল? স্বামী ছিল হৃদয়ে। সংস্কারে স্বামিত্ব নির্ম্মিত হইয়াছিল, আজ ওই পুরুষবিশেষে সেই স্বামিত্বের আরোপ হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার এবং ইহজন্মের সামাজিক ও সাংসারিক দৃষ্টান্ত তাহার হৃদয়ে স্বামী গড়িয়াছে। আজ ওই পুরুষবিশেষের উপর আরোপিত হইয়া, উহা সত্য সজীব ব্যবহারময় স্বমী হইল।

তদ্রূপ হৃদয়ের অন্তস্থলে মাতৃসংস্কার নির্ম্মাণ করিতে হয়। সে সংস্কারের সেবা করিতে হয়। আমার মা আছে—এই নিশ্চয়বৃত্তি সজীব সচেতন করিয়া তুলিতে

হয়। তবে মাতৃলাভ হইবে। মা আসুক না আসুক, তাহাতে মায়ে আত্মদানের কি অন্তরায় ঘটে? মাকে দেখিতে পাও বা না পাও, তাহাতে কি মাতৃসেবার, মাতৃ-আরাধনার, মাতৃচরণে শির লুণ্ঠিত করিবার বিঘ্ন হয়? তুমি যদি অন্ধ হও, তোমার গৃহে বর্ত্তমান পিতা, কি মাতার চরণ পরশের কৃতার্থতা কি তাহাতে রুদ্ধ হয়? হইতে পার তুমি অজ্ঞান, জ্ঞান-চক্ষুহীন, তাহাতে কি? এ বিশ্বে এমন কোন্ পরমাণু আছে, যেখানে শির লুণ্ঠিত করিলে মায়ের চরণে সে প্রণাম পৌঁছিবে না? কে আছে পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, দার্শনিক—এমন কে কোথায় আছে, যে তোমায় বলিতে পারে, ওখানেও পরমাণুতে তোমার মাতা নাই? তুমি কোন্ পরমাণুতে অর্ঘ্যপুষ্প দিলে ওখানে মা নাই বলিয়া কেহ তোমার মাতৃসেবা-পুণ্য-স্ফীত বক্ষ সঙ্কুচিত করিয়া দিতে পারে? জলে, স্থলে, অনলে, বায়ুতে, আকাশে, মনে, কল্পনায়—কোথায় কে নির্দ্দেশ করিবে—ওখানে তোমার মা নাই? কোথায় জল তাঁহার চরণ ধৌত করিবে না—কোথায় পুষ্পগন্ধাদি তাঁহার অঙ্গ রঞ্জিত করিবে না—কোথায় আহার্য্য তাঁহার দর্শনের বহির্ভূত থাকিবে—কোথায় বায়ু তাঁহাকে ব্যজন করিবে না—কোথায় অগ্নি তাঁহার নিকট আহুতি বহন করিবে না—কোথায় তোমার আত্মনিবেদন তাঁহার বেদনলাভে বঞ্চিত হইবে—কোথায় তোমার করুণ মাতৃআহ্বান তাঁহার শ্রোত্রে বাজিবে না—কোথায় কোন্ গ্রহে, কোন্ নক্ষত্রে, কোন্ আকাশের তলে তোমার প্রাণের আকুল আত্মসমর্পণ শূন্যে পর্য্যবসিত হইবে? যে মাকে মানিয়াছে, তাহার আর জানিবার অপেক্ষা থাকে না। যে মানে নাই, তাহার শত জানাতেও মানা হয় না। মাত্র মানার সুত্রপাত হয়।

এই মানাই প্রকৃত সন্ন্যাস। মাকে যে মানিয়াছে, সে দ্বেষ আকাঙ্ক্ষা করিবার অবসর পায় না। চিত্তে তাহার ভাববিপর্য্যয়ের দ্বন্দ্ব উঠে না। হারান সন্তান বক্ষে ফিরিয়া পাইলে মায়ের প্রাণ কি আপন সংসারের সুখ দুঃখ ভুলিয়া যায় না? সন্তানের পুনঃপ্রাপ্তির আনন্দ কি তাহার বক্ষের সমস্ত অবসাদ দূর করিয়া দেয় না? দুঃখ জ্বালা, অভাব অভিযোগময় সংসার কি ক্ষণেকের জন্যও অমৃতময়, আনন্দময় হইয়া উঠে না? সে আনন্দ উল্লাসের ক্ষণে তাহার মর্ম্মে কি দ্বেষাকাঙ্ক্ষা থাকে? মাকে মানিলে এইরূপ হয়। তার পর এ ভাবের ঐকান্তিক আতিশয্যে নৈষ্কর্ম্ম্য আসে।

মা এই ভাবেরই পক্ষপাতী। কর্ম্মত্যাগেও শ্রেয়োলাভ হয়; কিন্তু তাঁহাকে মানিয়া, তাঁহার কর্ম্মযজ্ঞে, তাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে করিতে অগ্রসর হওয়াই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। তাঁহাকে মানিয়া চলা যাহারা কঠিন মনে করিয়া, সংসার ছাড়িয়া তাঁহাকে মানিয়া চলিব, এইরূপ ধারণা পোষাণ করে, তাহারা জানে না—মানা কাহাকে বলে। সে কথা মা পরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। শুধু বুদ্ধির মানা মানা নহে। হৃদয়ের মধ্যে দিয়া তাঁহাকে মানাই মানা। এবং হার্দ্দ বৃত্তি ফুটাইয়া অন্তরাত্মাকে হৃদয়ময় না দেখিয়া, নিঃসঙ্গভূমিতে যাওয়া যায় না।

কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস, এই উভয়ের প্রসঙ্গ কার্য্যতঃ পরমাত্মার ঈশ্বরভাব ও নিগুর্ণভাব, এই উভয় ভাবেরই প্রসঙ্গ। সর্ব্বত্র মায়ের ঈশ্বরভাবে অবস্থান লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করাই প্রশস্ততর, ইহাই মায়ের বক্তব্য। যুক্তিস্বরূপ প্রকৃত সন্ন্যাসের লক্ষণ এই শ্লোকে বলিলেন।

মা এ স্থলে অর্জ্জুনকে 'মহাবাহো' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন। বাহু—বায়ুতত্ত্বের কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ইহার ধর্ম্ম স্পর্শগ্রহণ। কর্ম্ম গ্রহণ করা বা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা, লিপ্ত থাকাই মায়ের অভিপ্রেত। "মহাবাহো" সম্ভাষণে ইহাই মা ইঙ্গিত করিয়াছেন। কর্ম্মসংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া ভগবৎসাধনা কর, তবেই তুমি যথার্থ 'মহাবাহু' আখ্যা লাভ করিবে।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪

সাংখ্যযোগৌ পৃথক্, ইতি বালাঃ প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ। অনয়োঃ একং অপি সম্যক্ আস্থিতঃ সন্ উভয়োঃ ফলং বিন্দতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ বা গৃহস্থাশ্রম, অজ্ঞান বালকেরাই পৃথক্ বলে, পণ্ডিতেরা বলেন না। কেন না, এ উভয়ের যে কোন একটী সম্যক্ ভাবে অবলম্বন করিলে তুল্য ফলই লাভ করা যায়।

যৌগিক অর্থ।—গীতার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারেরা মায়ের এরূপ স্পষ্ট উভয়ের তুল্য ফল বলা সত্ত্বেও কর্ম্মযোগকে সন্ন্যাসযোগের উপায়স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা যথার্থ সন্ন্যাস, তাহা লাভ করা উভয় আশ্রম হইতেই যে হইতে পারে, ইহা মা এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। গৃহস্থ আশ্রমে হইবে না, সন্ন্যাসে হইবে, ইহা বালকেরাই বলিয়া থাকে। একমাত্র সন্ন্যাস যে কৈবল্যের সহায়ক, ইহা বালকদিগের ধারণা, পণ্ডিতের নহে। উভয়ে যে তুল্য ফল লাভ হয়, ইহা যখন মা সবিশেষ ভাবে বলিয়াছেন, তখন মাতৃবাণীর অর্থ সঙ্কোচ করিয়া, ভাষ্যকারেরা আপনাদিগের সাম্প্রদায়িকতাই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেন এ চেষ্টা? স্বয়ং ভগবান্ গুরুরূপে অর্জ্জুনের অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া, যে সার্ব্বজনীন কর্ম্মধর্ম্মে তাহাকে অগ্রসর করিবার জন্য এ অমৃতময় বেদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, গীতার ভাষ্য লিখিবার সময় তাঁহার সে গুরুমূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, আপনাদিগের সাম্প্রদায়িক সংস্কারে চক্ষু আবৃত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? রোগ-শোক-জ্বালা-যন্ত্রণাময়, আশার দুর্নিবার প্রজ্বলিত চিতানল-পূর্ণ, বিচ্ছেদের বিকট শিবাধ্বনি-শব্দিত, ভগ্ন হৃদয়ের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্থিপঞ্জর-পূর্ণ বলিয়া অজ্ঞান জীব যখন সংসারকে দেখিতে থাকে, তখন স্নেহময়ী মা আমার স্নেহের ধারা বুকে করিয়া বহিয়া আনিয়া, যে মহামন্ত্রে সেই শ্মশানসদৃশ সংসারকে অমৃত-কর্ম্মময় করিতে চাহিয়াছেন, যে মহামন্ত্রে চিতানলকে দীপ্ত আলোকমালায় সাজাইয়া গিয়াছেন, যে মহামন্ত্রে যন্ত্রণার

বিকট শিবাধ্বনিকে সন্তানের কাতর মাতৃআহ্বানে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, ভগ্ন হৃদয়ের চূর্ণাস্থিবিস্তারকে পুণ্য পবিত্র আত্মত্যাগের শক্তিময় মহাবজ্রস্বরূপ করিয়া গিয়াছেন—সে মন্ত্রের অর্থ সঙ্কোচ করিতে কে তোমাদের অধিকার দিল ? আশার চিতানলে মুগ্ধ হইয়া যখন দহন-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলে, তখন কে আসিয়া বলিল—উহা তোমার দহন নয় বৎস, উহা আমারই সেবা ? রোগ-শোক-জ্বালা-যন্ত্রণার হা-হুতাশে যখন তোমার হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইতেছিল, তখন কে আসিয়া বলিল—উহা তোমার আর্ত্তনাদ নহে বৎস, উহা তোমার মাতৃআহ্বান ? পুত্র-কলত্র, পিতামাতার ভার বহনে হৃদয়ের অস্থি-পঞ্জর যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছিল, তখন কে আসিয়া বলিল, উহা তোমার ভারবহন নহে বৎস, উহা তোমার দধীচি মুনির আত্মত্যাগ ? যে মা এমন করিয়া আসিয়া মৃত্যুর ভিতর এমন করিয়া অমৃতের সন্ধান দেখাইয়া গিয়াছেন—সেই মায়ের সেই মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্রের অর্থ সঙ্কোচ করিতে তোমাদিগের কুণ্ঠা আসিল না ? হায় সাম্প্রদায়িকতা ! হায় জীবত্বের ছদ্মবেশ !

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫

সাংখ্যৈঃ যৎ স্থানং প্রাপ্যতে, যোগৈরপি তৎ গম্যতে। সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ একং পশ্যতি, স সম্যক্ পশ্যতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—সন্ন্যাসের সাহায্যে যে ব্রহ্মে উপনীত হওয়া যায়, গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যেও সেই ব্রহ্মেই যাওয়া যায়। সুতরাং সন্ন্যাস ও গৃহস্থাশ্রম ফল হিসাবে যে এক বলিয়া দেখে, সেই যথার্থ সাধক।

যৌগিক অর্থ।—মায়ের বাণী আবার শুন, সন্ন্যাসের আড়ম্বরে গৃহস্থাশ্রমকে মলিন চক্ষে দেখিও না। বলিও না—এ সংসার কারাগার, জ্বালা-যন্ত্রণার নরকগহ্বর। বলিও না—এ সংসার ছলাময় পরীক্ষার পিচ্ছিল ভূমি ; বলিও না—সংসারের প্রতি পদস্খলন জীবকে নিম্নমুখে আকর্ষণ করে ; বলিও না—সহায়সম্পদ্‌শূন্য অনাশ্রয় জীব শুধু যন্ত্রণা সহিতে, শুধু পেষণ বহিতে, শুধু মর্ম্মপীড়নের রক্ত বমন করিতে সতত নিযুক্ত। ইহা ব্রহ্মসেবায় ব্রহ্মলাভের, ব্রহ্মানুষ্ঠানের পুণ্য আশ্রম। মায়ের স্নেহের কর সংসারের দিকে দিকে প্রসৃত। শুধু তুলিতে, শুধু ধরিতে, শুধু সন্তানের অশ্রুধারা মুছাইতে মা আমার এ সংসারে চতুর্ভুজা, দশভুজা, সহস্রভুজা। ত্যাগের ঘরে, সন্ন্যাসের ঘরে, মায়ের আমার এ মূর্ত্তি নাই। সেথা মা আমার শুধু দ্রষ্টা, নির্গুণ, সাক্ষী। হেথা, এ সংসারে মা আমার হৃদয়ময়ী, কর্ম্মময়ী, স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, আনন্দ উল্লাসময়ী, সোহাগময়ী, ব্যবহারময়ী ; সেথা তোমার সন্ন্যাসের ঘরে অপ্রাণ, অমল, শুভ্র বজ্রস্বরূপ। সংসারে মায়ের এ আদরে পালিত, পুষ্ট না হইয়া, কে কবে তাঁহার স্নেহের—করুণার পরিচয় পাইয়াছে ?

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬

হে মহাবাহো, অযোগতঃ সন্ন্যাসঃ আপ্তুং দুঃখং। যোগযুক্তস্তু মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ বিনা সন্ন্যাস দুরূহ (কেন না, সন্ন্যাসীদিগেরও কর্ম্মযোগ না হইলে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞাননিষ্ঠা হয় না)। কিন্তু কর্ম্মসাহায্যে যুক্ত পুরুষ অতি সহজে ব্রহ্মকে লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—মা আমার প্রকৃত সন্ন্যাস কাহাকে বলে, সর্ব্বাগ্রে তাহা ব্যক্ত করিয়া, তার পর বলিয়াছেন—সন্ন্যাস ও গৃহস্থাশ্রম, ফল হিসাবে উভয়ই এক। সন্ন্যাসে বা গৃহস্থ আশ্রমে, উভয়েতেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। যথার্থ সন্ন্যাস যাহা, তাহা সন্ন্যাসে ও গৃহে, উভয়েতেই তুল্যরূপে লাভ হয়। সুতরাং উভয় মার্গই এক। কিন্তু শুধু তাহা নহে, পাছে কেহ মনে করে—যখন উভয়ই এক, তখন জীবসকল যদৃচ্ছা আশ্রম অবলম্বন করিলে ক্ষতি নাই। সেই আশঙ্কায় তিনি এই শ্লোকে গৃহস্থাশ্রমের বিশেষত্ব দেখাইতেছেন। রে ভগবানের শিষ্য জীববৃন্দ! আজি এ ধর্ম্মবিশৃঙ্খলার দিনে যুগান্তের পূর্ব্বে ঘোষিত মায়ের এ বাণীর দিকে একবার কর্ণপাত কর। কর্ম্ম বিহনে প্রকৃত সন্ন্যাস হয় না। কর্ম্ম না করিলে অর্থাৎ ভগবদনুভূতি বুকে না ফুটিলে নিষ্ঠা হয় না, সুতরাং জ্ঞানময়ী মায়ে নিষ্ঠা কর্ম্মসাহায্য বিনা অসম্ভব। যাহারা শাব্দিক জ্ঞানকে জ্ঞান মনে করিয়া আপনাদিগকে জ্ঞানবান্ ভাবে, প্রকৃত জ্ঞানলাভ কি, তাহা তাহারা জানে না। জ্ঞান—শব্দগতমাত্র যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ উহা মৃত, প্রাণপ্রতিষ্ঠাশূন্য প্রতিমার মত; উহাতে পরের কাজ হইতে পারে, নিজের কিছু হয় না। প্রকৃত জ্ঞানলাভ ও মাতৃলাভ একই কথা। বিনা কর্ম্মে, বিনা হৃদয়ের আদানপ্রদানে, বিনা প্রাণের উচ্ছ্বাসে, বিনা মাতৃঅস্তিত্বে নিষ্ঠাবশতঃ মায়ের সহিত সত্য ব্যবহারে, চিত্ত জ্ঞানময়ী মায়ের নিকটে অগ্রসর হইতে পারে না। সে সত্য ব্যবহার কর্ম্ম, গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য পালন ও তাহার মধ্য দিয়া সেই অন্তর্যামিনীর সেবা হইতেছে, ইহা দর্শন। মাতৃকর্ম্মভাবে ভাবময় হইয়া কর্ম্ম করাই প্রকৃত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। সুতরাং এ আশ্রম-ধর্ম্মে থাকিয়া পূর্ণরূপে অন্তর্য্যামিনীকে লাভ না হইলে, প্রকৃত সন্ন্যাস বা নৈষ্কর্ম্ম্য অসম্ভব। সেই জন্য বিশ্বব্যাপিনী মাতৃমূর্ত্তি ধারণা কর—মুখে নয় বুকে; আর সেই মায়ে আত্মসমর্পণ কর—মুখে নয়, বুকে। প্রতি কর্ম্ম উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তোমার অন্তরকে অন্তর্য্যামিনীর পূজায় অগ্রসর কর—মুখে নয়, বুকে। প্রতি আত্ম-সুখকে, প্রতি আত্মসেবাকে মাতৃসুখ, মাতৃসেবা জানিয়া, দুর্ব্বহ সংসারের ভার বহন করিতে থাক—মুখে নয়, বুকে; তোমার কর্ম্মক্লান্তি ঘুচাইতে, তোমার অবসাদ-অশ্রু মুছাইতে, তোমার মাতৃঅভাব পূরণ করিতে মা যদি না আসেন, তবে তোমায় মা বলিতে আর বলিব না।

কিন্তু বুক দিয়া ছোট—বুক দিয়া এ কর্ম্মসংগ্রামে উভয় সেনার মধ্যে মায়ের গুরুমূর্ত্তি পরিদর্শন কর। জগদ্‌গুরু তোমার অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া, বিজয়বৈজয়ন্তীতে তোমায় মণ্ডিত করিবেন।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭

যোগযুক্তঃ, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়ঃ, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা জনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—ভগবানে যুক্ত হইয়া আশ্রমোচিত কর্ম্মে বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতেন্দ্রিয় ও বিজিতাত্মা, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাকে স্বীয় আত্মা বলিয়া জ্ঞাত পুরুষ, কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মমাত্রেই বন্ধনভয় আছে, এই আশঙ্কায় আশ্রমোচিত কর্ম্ম পরিহার্য্য বলিতে পার না। কেন না, ভগবানে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না। মায়ের কর্ম্ম করিতেছি ভাবিয়া কর্ম্ম করিলে আত্মা বিশুদ্ধ হয়। আত্মা বিশুদ্ধ হয় অর্থে জীব আপনাকে পবিত্র, শুদ্ধ, নির্ম্মল বলিয়া অনুভব করে, নতুবা বস্তুতঃ আত্মার আর অবিশুদ্ধতা কি? গৃহস্থ আশ্রম সন্ন্যাস আশ্রমের অবলম্বন।

গৃহস্থ আশ্রম নৈষ্কর্ম্ম্যের অবলম্বন বলিয়াই গৃহে থাকিতে হইবে, প্রকৃত যোগযুক্ত কর্ম্ম করিবার অধিকার লাভ করিতে হইবে, সেই অধিকারে বিচরণ করিয়া বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে, এবং জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধাত্মা হইয়াও কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। যথার্থ সন্ন্যাস এইরূপে সংসারে থাকয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। সন্ন্যাসনামক কোন আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে না। চতুর্থ আশ্রম তখনই মাত্র অবলম্বনীয়, যখন কর্ম্মতরঙ্গ আর ইন্দ্রিয়ে উত্থিত হইবে না। যত ক্ষণ কর্ম্ম উঠিবে, তত ক্ষণ জানিবে, অবিশুদ্ধতা আছে, এবং তত ক্ষণ সংসারে অবশ্য কর্ম্মময় হইয়া থাকিতে হইবে। বাক্য উচ্চারণের প্রয়াস অবধি থাকিলেও বুঝিবে, এখনও কর্ম্ম করণীয়। অবিশুদ্ধ জীব কাহাকে বলে? মায়ের সহিত সম্বন্ধহীন, ক্ষুদ্র, নিরাশ্রয়, মাত্র ইহজন্মদর্শী জীবই অবিশুদ্ধ জীব, এইরূপ ভাবই আত্মার অবিশুদ্ধতা। মায়ের সহিত সম্বন্ধ আছে, এই বোধ জীবের অবিশুদ্ধতা দূর করিয়া দেয়। বিশুদ্ধাত্মা হইলে তার পরে জীব বিজিতাত্মা, লব্ধাত্মজ্ঞান হয়। স্থূলদেহাভিমানী জীবকে অবিজিতাত্মা বলে। আত্মবিশুদ্ধতা যত হইতে থাকে, দেহাভিমান তত দূর হয় এবং তখন ইন্দ্রিয়সকল বশে আসিতে থাকে। অর্থাৎ জীব জিতেন্দ্রিয় হয়। এইরূপে সর্ব্বভূতাত্মভূত মাই আমার আত্মা, এই প্রজ্ঞায় যখন আরূঢ় হয়, তখন জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায়।

ইচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টা করিয়া যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, সেই সকল কর্ম্মও গায়ের সঙ্গে তাহার যুক্ত হইয়া করা হয় বলিয়া তাহাকে অনুলিপ্ত করে না।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯

যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ পশ্যন্, শৃণ্বন্, স্পৃশন্, জিঘ্রন্, অশ্নন্, গচ্ছন্, স্বপন্, শ্বসন্, প্রলপন্, বিসৃজন্, গৃহ্নন্, উন্মিষন্, নিমিষিন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ অহং কিঞ্চিৎ নৈব করোমি, ইতি মন্যেত।

ব্যবহারিক অর্থ।—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আহার, গমন, মনন, শ্বাসগ্রহণ ইত্যাদি কর্ম্মসকল, 'আমি কিছু করিতেছি না, ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয়ে আবর্ত্তিত হইতেছে,' তত্ত্ববিৎ কর্ম্মযোগী পুরুষ এইরূপ ধারণা করেন।

যৌগিক অর্থ।—কেমন করিয়া কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে কর্ম্মযোগী পুরুষ লিপ্ত হন না, এই শ্লোকে তাহাই বলিবার সূচনা করা হইয়াছে। কর্ম্মযোগী পুরুষ ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত স্বাভাবিক ও সঙ্কল্পজ কর্ম্মসকলের আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না। ইন্দ্রিয় ও বিষয়সকলের সম্মিলন-জনিত যে সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল 'আমি করিতেছি না,' যুক্ত পুরুষ এইরূপ ধারণায় আপনার সংস্কার নির্ম্মাণ করে।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০

ব্রহ্মণি আধায়, সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি, স অম্ভসা পদ্মপত্রমিব পাপেন ন লিপ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, সঙ্গশূন্য হইয়া, যে কর্ম্মসকল সমাধান করে, সে পদ্মপত্রে জলের ন্যায় কর্ম্মবন্ধনরূপ পাপে লিপ্ত হয় না।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ এ অধ্যায়ে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ বিবৃত করিতেছেন। কর্ম্মসন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস, অন্যথা সন্ন্যাসের কোনও মূল্য নাই, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় এবং সে সন্ন্যাস, তাঁহাতে কর্ম্মসকল সমর্পণ করিতে পারিলেই সার্থকতা লাভ করে, অন্যথা কর্ম্মত্যাগমাত্রের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কেন না, শরীরী জীবের পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। শঙ্করপ্রমুখ মহাপুরুষেরা বলেন, যাহাদের সন্ন্যাসে অধিকার হয় নাই, তাহাদের জন্য ভগবান্ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সন্ন্যাসবাদকে প্রশ্রয় দিবার জন্য ভগবদ্‌বাক্যে এরূপ স্বমন্তব্য সংযুক্ত করিয়া দেওয়া অনধিকারচর্চ্চা মাত্র। ভগবান্ প্রকৃত সন্ন্যাসের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন, সন্ন্যাস আশ্রমের বর্ণনা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

যাক সে কথা। ভগবান্ বলিতেছেন, তাঁহাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া করিলে আর কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। কিন্তু তাঁহাতে কর্ম্ম সমর্পণ কেমন করিয়া করিব ? কে তাঁহাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিবে ? আত্মকর্তৃত্ববোধ-মগ্ন মূঢ় জনসঙ্ঘ—মায়ের অস্তিত্ব যাহাদের চক্ষে অপ্রতিভাত—মাতৃঅস্তিত্ববোধ যাহাদিগের জ্ঞান-গগনের পূর্ব্বপ্রান্তে নবারুণের ন্যায় উদিত হয় নাই, তাহারা কেমন করিয়া তাঁহাতে কর্ম্ম অর্পণ করিবে ? গুরুর কৃপায়—গুরুরূপিণী তুমি,—তোমার কৃপা-কটাক্ষে যাহাদিগের চক্ষের কালিমা দূর হইয়াছে—যাহারা তোমায় দেখিয়াছে—যাহাদিগের জ্ঞানচক্ষুঃ তোমার জ্ঞান-মূর্ত্তিতে সম্পাতিত হইয়াছে—"তুমি আছ" ইহা যাহারা মানিয়াছে, তাহারাই না তোমাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে পারে। যাহারা জানে নাই, গণে নাই, মানে নাই, তাহারা কেমন করিয়া তোমাতে কর্ম্ম অর্পণ করিবে? যাহারা জানিয়াছে, মানিয়াছে, গণিয়াছে, তাহাদিগের অর্পণ স্বতঃসিদ্ধ। তোমাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিলে কর্ম্মসঙ্গ ত্যাগ করা হয়। কিন্তু তুমি রহিয়াছ, ইহা জানিলেই যে সকল সঙ্গ আপনিই ছুটিয়া যায়। তুমি রহিয়াছ—জ্ঞানের এ সৌরোদয়ে সমস্তই যে স্বতঃ সমর্পিত হয়। তুমি রহিয়াছ—শুধু এই জ্ঞান, জীবত্বের গণ্ডি হইতে জীবকে তোমার অঙ্কে টানিয়া লইয়া যায়। অর্পণের অবসর কোথায় ? অথবা অর্পণ ত আপনিই সংসাধিত হয়।

আসে অবসর—মহাজ্ঞান উদিত হইলেও, গুরুকৃপায় তোমার অস্তিত্ববোধ হৃদয়ে সঞ্জীবিত হইলেও—কর্ম্মের আবর্ত্তনে এ জগদ্বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তোমায় হারাইয়া ফেলি ; থাকিয়া থাকিয়া তোমাশূন্য জগদ্জ্ঞানের ভিতর অবশে প্রবিষ্ট হইয়া যাই।

তখন হারাইয়া যায় বটে, কিন্তু তুমি থাক। সর্ব্বদা আমরা আমাদিগের প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রদিগকে স্মরণ না করিলেও যেমন তাহাদের অস্তিত্ববোধ প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বকর্ম্মের তলদেশে লুক্কায়িত থাকে, দিবারাত্রি আমাদিগের প্রিয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত না থাকিলেও যেমন তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তদ্রূপ তোমার অস্তিত্ব সত্যরূপে হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে, আমাদিগের সকল কর্ম্ম তোমাকে কেন্দ্র করিয়াই সম্পাদিত হইতে থাকে। তখনই কর্ম্মসকল, যেমন ভাবেই করি, তোমাতেই সমর্পিত হয়।

আজ এ সত্যাপলাপের দিনে, ঘোর এ কলির আবর্ত্তনে, তোমার এ অমৃতময় গীতা-ব্রহ্ম অনুশীলনের পূর্ব্বক্ষণে তোমার অস্তিত্ববোধ আমাদিগের হৃদয়ে জাগাইয়া দাও। তুমি রহিয়াছ, ইহা জানিতে দাও—মানিতে দাও—জ্ঞানচক্ষে দেখিতে দাও। যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা, জপ, ধ্যান ধারণা থাক বা না থাক, কর্ম্মসকল তোমাকে কেন্দ্র করিয়া সম্পাদিত হইবে। সংসার-মূঢ়, পুত্রকলত্রমায়াচ্ছন্ন কে কোথায় প্রিয়তম পুত্রকলত্রের নাম লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া জপ করে, কে কোথায় নির্জ্জনে তাহাদের রূপ চিন্তা করে,

কে কোথায় দিবানিশি ভালবাসার সামগ্রীকে মাত্র ধ্যান করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রয়াস পায়? অথচ তাহাদিগের অন্তর অন্বেষণ কর, দেখিবে—অন্তরের সিংহাসনে সম্রাট্‌ হইয়া তাহাদের প্রিয় আত্মীয় স্বজনই অবস্থান করিতেছে। জীবনের সকল কর্ম্মই তাহাদের সেবাতেই নিষ্পন্ন হইতেছে। ঠিক তেমনই ভগবদস্তিত্ববোধ হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইলে, তুমি বিরলে বসিয়া তাঁহার রূপ চিন্তা, গুণকীর্ত্তন, জপ তপ, ধ্যান ধারণা কর বা না কর, তোমার সকল কর্ম্ম তাঁহারই চরণসেবায় নিযুক্ত হইবে। তুমি তোমার পুত্রকে ভালবাস। কিন্তু কয় মুহূর্ত্ত তুমি নির্জ্জনে বসিয়া তাহার নাম স্মরণ কর বা তাহার রূপ চিন্তা কর? তুমি তোমার পত্নীকে ভালবাস, কিন্তু তুমি কয় মুহূর্ত্ত বিরলে বসিয়া ধ্যানযোগে তাহাতে মগ্ন হইতে চাও? অথচ ভাবিয়া দেখ, তোমার জীবনের প্রত্যেক চেষ্টা, প্রত্যেক উদ্দীপনা তাহাদেরই সেবার জন্য তোমায় অক্লান্ত পরিশ্রম করাইতেছে। ঠিক তদ্রূপ যদি তোমার হৃদয়ের সিংহাসনে তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তোমার উদ্যম, তোমায় সর্ব্বদা তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, অথবা তোমার সকল সাধারণ কার্য্য তাঁহাতেই সমর্পিত হইবে। ধ্যান জপ যোগাদি যাহা তোমরা স্বভাবতঃ কৃত্রিম ভাবে কর, উহা অকৃত্রিম হইবে, অথবা উহার আবশ্যকতাই খুঁজিয়া পাইবে না।

শ্লোকে 'লিপ্যতে ন স পাপেন' এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। পাপ পুণ্য, কিছুতেই সে লিপ্ত হয় না। ভগবৎসঙ্গশূন্য কর্ম্ম—পুণ্যকর্ম্মই হউক, আর পাপকর্ম্মই হউক, উহা বন্ধনময়; সুতরাং পাপ।

মায়ে কর্ম্ম অরোপ করিয়া করিলে সে কর্ম্ম আর বন্ধনের কারণ হয় না। মা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, কর্ম্মযোগী পুরুষ কর্ম্ম করিতে করিতেই মাতৃলাভ করিতে পারে, কর্ম্মত্যাগের প্রয়োজন হয় না। কর্ম্মই বন্ধন, সুতরাং কর্ম্ম করিলে নিশ্চয়ই বন্ধন হইবে, এইরূপ আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে মা বিশদভাবে দেখাইতেছেন যে, মাতৃভাবে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে কি প্রকারে উহা আর বন্ধনজনক থাকে না, মুক্তিদায়ক হয়। মায়ে যুক্ত হইয়া যখন জীব কর্ম্ম করে, তখন সে কর্ম্মে আর তাহার কর্ত্তৃত্ব জন্মে না। কেন না, মায়ের দ্বারা চালিত হইয়া মায়ের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতেছি, ইহা ভাবিলে, উহা জীবের অস্মিতাকে জীবভাবের সংকীর্ণতায় সঙ্কুচিত না করিয়া, মাতৃভাবের উদারতায় উদ্ভিন্ন করে। ব্রহ্মময়ীর বিরাট্‌ ব্রহ্মযজ্ঞে আমি আহুতি দিতেছি—আমার কর্ম্মসকল ব্রহ্মময়ী মায়েরই সেবা—তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইতেছে—আমি কিছুই করিতেছি না, এই ভাবে জীবভাবীয় আমিত্বের মলিনতা বিদূরিত হইয়া, মাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ উহা এক পুণ্য, পবিত্র, নির্ম্মল, উদার, অব্যয় আমিত্বে পরিণত হয় ও ক্রমশঃ মাতৃজ্যোতিতে বিলীন ও যুক্ত হইয়া যাইতে থাকে। সুতরাং কার্য্যতঃ জীবভাবের লোপ ও মাত্র ব্রহ্মভাব

হৃদয়ে আধিপত্য করিতে থাকে। মায়ে অন্তর বাহ্য ভরিয়া যায়—ভূমি নাই, জল নাই, অগ্নি নাই, বায়ু আকাশ কিছু নাই, শুধু মা—শুধু মা—সর্ব্বব্যাপিনী—সর্ব্বরূপিণী—সর্ব্বাত্মিকা মা শুধু রহিয়াছেন। আর কিছু নাই, আর কেহ নাই, ইহাই বার বার সাধক দেখিতে থাকে। সুতরাং কর্ম্মসংস্কার সেখানে আবর্ত্তন নির্ম্মাণ করিতে না পারিয়া, প্রশান্ত প্রবাহে মাতৃত্বে বিলীন হইয়া যায়।

পূর্ব্বে মা বলিয়াছেন,—আমি কিছুই করিতেছি না, কর্ম্মী এইরূপ মনে মনে ধারণা করেন। আমি করিতেছি না, তবে কি প্রকারে আমার কর্ম্মসকল সংসাধিত হইতেছে? ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ে বর্ত্তিত হইতেছে—সেই জন্য কর্ম্ম হইতেছে। যোগী কর্ম্মের এই প্রকার বিশ্লেষণ করে। কিন্তু মাত্র এইটুকু বুঝিলে হইবে না। উহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মে প্রক্ষেপ বা সমর্পণ করিতে হইবে বা ব্রহ্ম-প্রক্ষিপ্ত দর্শন করিতে হইবে। এই ব্রহ্মে প্রক্ষেপ বা সমর্পণ, ইহাই আত্মসমর্পণ—মায়ে আত্মদান বা আত্মলাভ। কর্ম্ম সমর্পণ করিতে করিতে বিষয় ও ইন্দ্রিয়সকল সমর্পিত হয়; দেহ, মন, প্রাণ, ক্রমশঃ সমস্তই মায়ের ইন্দ্রিয়, মায়ের দেহ, মায়ের মন, মায়ের প্রাণে পরিণত হইয়া যায়। ইহা আর আমার থাকে না। এইরূপ আত্মসমর্পণ প্রথম সাময়িক হইতে থাকে। ইহাই সাধনার ভাষায় সাময়িক সারূপ্যলাভ। যাহারা সাধনা-পথে ঈষৎ অগ্রসর হইয়াছে, তাহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে বা এ কথা বুঝিতে সমর্থ হইবে। মুক্তির সাধারণতঃ চারিটি স্তর আছে—সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। সেই জন্য সাধনাকালে সাধনাতেও সাময়িকভাবে চারিটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। মাকে স্মরণ করিলে, যাহারা সাধনায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাদের অন্তরে একটি আকাশ উদ্ভাসিত হয়—উহা অন্তরাকাশের আভাস। সাধক উপলব্ধি করে, যেন সে এই খণ্ড খণ্ড পদার্থপুঞ্জসম্বলিত জগৎ হইতে অন্য এক অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল বোধাত্মক একটি আকাশরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম প্রথম মাকে বিশেষভাবে ধারণা করিবার সময় এ ভাব উদিত হয়; ক্রমশঃ মাতৃচরণে প্রাণ একটু বিশেষভাবে আশ্রয় লইলে, মাকে যখন হউক, স্মরণ করিবামাত্র এই ভাব অন্তরে প্রকাশ পায়। প্রথম প্রথম উহা যেন সাধক আপনার বাহিরে দেখিতে পাইতেছে—কাহারও কাহারও এইরূপ বোধ হইলেও উহা কার্য্যতঃ সাধকের অন্তরেই উদিত হয় এবং সত্বরে উহা অন্তরস্থ বলিয়াই সাধক বুঝিতে পারে।

যাহা হউক, এইরূপে বাহিরে এই সমস্ত জগৎ এক ভগবানে অবস্থান করিতেছে, এই ধারণায় সাধক যখন যথার্থ ভাবে অবস্থান করে, তখন তাহার সাময়িক সালোক্যলাভ। তার পর সাধক আরও উন্নত হইলে, যখন তাহার প্রাণের আবেগ, সে ভাবের অন্তরে আরও কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে, অন্তরেরও অন্তরে প্রবেশ করিতে থাকে, ব্যক্তিগত ভাবে মাকে যেন পাইবার জন্য অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে থাকে, তখন তাহাকে সামীপ্য

অবস্থা বলে। পরে ওইরূপে আরও উন্নত হইলে, কিছু দূর অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে হইতে তাহার প্রাণ মাতৃময় হয়। যদি রূপ ধারণা থাকে, তবে তাহার প্রাণ সেই রূপেই পরিণত হইয়া যায় ও আপনার চৈতন্য, প্রাণ, মন, দেহ, সবই যেন সেই সাধ্য রূপের মত বা তাহারই হইয়া যায়—ইহাই সারূপ্য। এ অবস্থা মাতৃস্মরণমাত্র উন্নত সাধকের সঙ্গে সঙ্গে হয়—স্মরণ মাত্রেই হয়। মাতৃবেদন প্রাণে স্ফুরিত হইবা মাত্র সে মাতৃময় হয়—মা হইয়া যায়। সাযুজ্যমুক্তি সমাধি অবস্থায় হয়—সে কথা এখানে নহে।

যাহা হউক, এই যে সারূপ্যলাভ, ইহা আত্মসমর্পণের একটি লক্ষণ। কৌশল-বিশেষের দ্বারায় সাহায্য হইলেও ইহা যথার্থ আত্মসমর্পণেরই লক্ষণ। প্রত্যেক সাধকের এ ভাব স্ফুরিত হয়। কে কি পরিমাণে অন্ততঃ সাময়িক আত্মসমর্পণ করিতে পারে, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এমন কি, কোন ব্যক্তিবিশেষ সাধক হইয়াছে কি না, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। একটি কথা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে; সাধক চিনিবার একটি উপায়স্বরূপ এটি কাজে লাগে। যথার্থ সাধক হইলে, তাহাতে তিনটি ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে—তাহার জীবভাব, ভক্তভাব ও ঈশ্বরভাব। অবশ্য নকল করিয়া যাহারা ভক্ত বা ঈশ্বর সাজে বা ব্রহ্মজ্ঞ সাজে, তাহাদের কথা বলিতেছি না। কিন্তু যথার্থ সাধক আত্মজ্ঞ হইতে থাকিলে জীবভাব ব্যতীত অন্য ভাব দুইটি তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবেই। তাহাকে কখনও দেখিব, মা বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে; কখনও দেখিব, সে উপাস্য ও উপাসকের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। এই লক্ষণ দেখিয়া অনেক সময় লোকে সাধককে ঈশ্বর বা তাঁহার অবতার বলিয়া গ্রহণ করে। কিন্তু যাক্।

ব্রহ্মে কর্ম্মসমর্পণ বা আত্মসমর্পণের কথা বলিতেছিলাম। ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, আসক্তি—এ সকল এই আত্মসমর্পণেরই নামান্তর ও ক্রমান্তর বলিলেও চলে। ব্রহ্মে কর্ম্মাধান হইতেই ইহার সূত্রপাত বা ইহাই আত্মসমর্পণের লক্ষণবিশেষ। আমি কিছু করিতেছি না, তিনিই করিতেছেন, তাঁহারই কার্য্য আমি করিতেছি, এই সকল ভাবের সাহায্যে ব্রহ্মে কর্ম্ম আরোপিত হইয়া, কর্ম্মসঙ্গ হইতে জীব পরিত্রাণ পায় ও তাহার মাতৃসঙ্গে বিচরণ ও আত্মসমর্পণ আরম্ভ হয়। কিন্তু মনে রাখা চাই, সে কর্ম্ম-সমর্পণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাঁহার কাজ—আমি কি জানি, সুতরাং যদৃচ্ছা করিতে থাকি, ইহা আত্মসমর্পণ নহে। যাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, তাঁহার ইচ্ছার অধীনে আপনার সমস্ত শক্তি, এমন কি, নিজস্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে ঢালিয়া দেওয়ার নাম আত্মসমর্পণ। তাঁহার আদেশ বা ইচ্ছা বেদে ও শাস্ত্রে প্রকাশিত। সুতরাং আত্মসমর্পণের প্রারম্ভেই বেদ-বিধান অনুসারে আপনার জীবনকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা পরিগ্রহণ করিতে হয়। প্রাণ যত দিন না বেদোক্ত শ্রেয়ঃকার্য্য-সকলকে প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তত দিন যথার্থ আত্মসমর্পণের সূচনা হয় নাই, এরূপ বোঝা

উচিত। যাহাতে আত্মসমর্পণ করিব, যদি সে না প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়, যদি না বোধ হয়—সে প্রিয়, তাহার গুণ, রূপ, ধর্ম্ম, ব্যবহার, কার্য্য, সমস্ত প্রিয়, তাহার সমস্ত আমার নিকট মধুময়, তবে আত্মসমর্পণ হয় নাই বুঝিতে হইবে। অবশ্য তাহার সমস্তই প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করা একেবারে হয় না; সুতরাং প্রিয় বলিয়া আমার সে ব্যতীত অন্য যাহা আছে, সে সকলের জন্যও প্রাণ ব্যাকুল হইতে পারে এবং তাহা দোষের নহে। মহেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সতীও পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। তাই বলিয়া সতীর অতুলনীয় আত্মসমর্পণ কলঙ্কিত হয় নাই। বরং সে আত্মসমর্পণের নিদর্শন অন্য কোথাও কল্পনাতেও ফুটিতে দেখি নাই। সে আত্মসমর্পণ-কাহিনীর স্মরণও পুণ্য, পবিত্র, রোমহর্ষ, সদ্যঃপাপ-বিনাশক, মনুষ্য-কল্পনার অতীত। পুরাণে ও ইতিহাসে অনেক প্রীতির কাহিনী, বিচ্ছেদের অনেক মর্ম্মদাহ, মিলনের অনেক উচ্ছ্বাস দেখিয়াছ, সে সকল সুদীর্ঘ কাহিনী সহস্র তরঙ্গে হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, মর্ম্মকে দ্রবীভূত করে, মাতাইয়া দেয়; কিন্তু স্মরণে মুহূর্ত্তের মধ্যে স্তব্ধ, চকিত, বজ্রাহতবৎ করিয়া তোলে না। এক একটি প্রীতির কাহিনীতে প্রীতির গভীরতা বা আত্মসমর্পণের সার্থকতা অসংখ্য ঘটনার দ্বারা সুদীপ্ত, সুপ্রকাশ, পরিস্ফুট হইয়াছে; এমন কি, আদর্শরূপে সে প্রীতির প্ররোচনাসকল মনুষ্য-হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু মনুষ্য-কল্পনার শেষ সীমায় উঠিয়াও ছাপাইয়া যায় নাই। আত্মসমর্পণের যে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তের কথা আমি বলিতেছি, তাহা সতীর দক্ষালয়ে প্রাণত্যাগ। প্রিয়তমের নিন্দা মৃত্যুবৎ যন্ত্রণাদায়ক হইতে পারে, কিন্তু উহা যে সাক্ষাৎ মৃত্যু, ইহা মা আমার সতীরূপে যেমন দেখাইয়াছেন, এমন আর কোথাও নহে। তাই উহা অতুলনীয়। কিন্তু সেখানেও মাকে দেখিলাম, শিবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিত্রালয়ে যাইতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, আত্মসমর্পণ হইলেই যে আপনার সমস্ত প্রিয় একবারেই বর্জ্জিত হইবে, এমন নহে। তুমি মায়ে আত্মসমর্পণ করিলেই যে তোমার জগতে প্রিয় বলিয়া আর কিছু একেবারে থাকিবে না বা জগতে প্রিয়বোধ থাকিতে আত্মসমর্পণ হইবে না, এমন নহে। আত্মসমর্পণে ওরূপ ভয় পাইবার কথা নহে। মা তাহা বলেন না। আগে জগতের উপর প্রিয়বোধ হৃদয় হইতে মুছিয়া যাউক, তবে ত মায়ে আত্মসমর্পণ হইবে—ইহা মায়ের কথা নহে। মা বলেন, তোমার আর পাঁচটি যেমন প্রিয় আছে, আমাকেও তাহাদের একজন কর। তাহাদেরই পাঁচ জনের একজন করিয়া, আমায় তোমার হৃদয়ের এক কোণে স্থান দাও। আমি বলি না যে, তুমি তোমার হৃদয় হইতে মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, সমস্ত মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া, আমার জন্য আসন রচনা কর, তবে আমি তোমার হৃদয়ে পাদারোপ করিব, তবে তোমার আত্মসমর্পণের অর্ঘ্য গ্রহণ করিব। মা বলেন, "তোমার হৃদয়ে যাহারা আছে থাকুক, তুমি তাহাদের ভালবাস বাস; আমাকেও তাহাদের মত একটু জায়গা দাও—একটু বসিতে দাও। বেশী নয়, তাদের মত তুমি আমায় ভাল-

বাসিতে নাও পার—শুধু একটু বসিতে দাও। তোমার সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, আলোক আঁধারময় হৃদয়ে যেথা তোমার সকলে আছে—যেথা সমগ্র জগৎ আছে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে আসন সঙ্কুলান হইয়াছে, যেখানে সমগ্র জগতের জন্য আদর অনাদর আছে, সেইখানে—আর কিছু না দাও, একটু বসিতে দাও। তাদের অপেক্ষা বেশী মানিতে বলিতেছি না। তুমি যেমন জান, তোমার পিতা আছে; তুমি যেমন জান, তোমার মাতা আছে; তুমি যেমন জান, তোমার পুত্র-কলত্র আছে; তুমি যেমন জান, এ জগৎ আছে; তুমি তেমনি, বেশী নহে, তেমনি জান, আমি আছি—এইটুকু আসন দাও। আমি আপনার গুণে তোমার প্রিয় হইয়া পড়িব। দেখ, তোমার পাঁচটি পুত্র আছে; তুমি সকলকেই ভালবাস। তোমার মনে হয় না যে, তোমার ভালবাসা পাঁচ টুকরা হইয়া গিয়াছে। যখন যাহাকে দেখ, তোমার মনে হয়, সেটি তোমার প্রাণসর্ব্বস্ব। একটির যদি মৃত্যু ঘটে, অবশিষ্ট চারিটি আছে বলিয়া তোমার পুত্র-বিয়োগজনিত দুঃখ উদ্বেগ এক-পঞ্চমাংশ মাত্র হয় না, পূর্ণই হয়। কেন না, তুমি বোঝ, সত্যই তোমার একটি পুত্র চলিয়া গেল। তেমনি তাদের সেই পাঁচটির স্থলে আমাকে শুদ্ধ ছয়টি করিয়া লও। বেশী নহে, এমনই পাঁচ জনের সঙ্গে আমিও তোমার একজন হই; দেখিবে, আমিও তোমার তেমনি একজন প্রিয় হইয়া পড়িব এবং তাহা হইলেই তোমার আত্মসমর্পণ সূচিত হইবে। কিন্তু আবার বলি—সত্যভাবে। তোমার পুত্র যেমন সত্য, তোমার পিতা যেমন সত্য, তোমার বিষয় যেমন সত্য, তোমার আমি মা, ভগবান্—তেমনি সত্য—তেমনিই সত্যের আমি তোমার আছি। এইরূপে আত্মসমর্পণের সূত্রপাত হইবে এবং অচিরে উহাই অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ দানে তোমায় কৃতকৃতার্থ করিবে। দেখিবে, আমিও তোমার ওদের মত একজন প্রাণসর্ব্বস্ব।"

শুধু 'রহিয়াছে' এইটুকু সত্যভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলেই কি প্রকারে আত্মসমর্পণ সূচিত হইবে? না হইয়া থাকে না। যে সত্যভাবে তাঁহার সত্তা স্বীকার করে, সে প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারে না। মা আমার আপনার আলোকে আপনি তাহার চক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়েন। আপনার আলোকে আপনি দেখাইয়া দেন, তিনি কেমন করিয়া তোমার হৃদয়ে অলক্ষ্যে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। আপনি দেখাইয়া দেন, কেমন করিয়া তোমার সমস্ত কর্ম্ম—তুমি দাও বা না দাও, তাঁহারই প্রসাধন করিতেছে। সুতরাং তুমি আর তাঁহাকে না দিয়া খাইতে পার না, তাঁহাকে না দেখাইয়া কাজ করিতে পার না। আত্মলাভ ও আত্মসমর্পণ এক কথা। আত্মসমর্পণ করিলে আত্মলাভ হয়। কিন্তু আত্মলাভ না হইলে, কেমন করিয়া আত্মসমর্পণ হইবে? কাহাকে আত্মসমর্পণ করিবে? সুতরাং আমাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লাভ কর—সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ হইতে থাকিবে। তোমার কর্ম্মময় সত্তার অন্তরে যে বিশুদ্ধ "নিজ"বোধাত্মক অপরিণামী আত্মবোধ আছে, সেই তুমিও যখন তাঁহারই বলিয়া বা

তিনিই বলিয়া উপলব্ধি হইবে, তখনই আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণরূপে হইবে। সেই তোমাকে দেখিবার জন্য প্রথম ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ে ধাবিত হইতেছে, 'আমি অকর্ত্তা' এইরূপ ধারণায় আপনার সেই সত্তাটিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য মা উপদেশ দিলেন। মনোময়, প্রাণময় ও ইন্দ্রিয়ময় চাঞ্চল্যের তলে তোমার যে অপরিণামী স্বয়ংবোধ, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখার জন্য এ উপদেশ।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

কায়েন, মনসা, বুদ্ধ্যা, কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—যোগীরা ফলসঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া, আত্মশুদ্ধির জন্য কেবল কায়মনোবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমি কিছু করিতেছি না, মা করিতেছেন—মায়েরই কর্ম্ম, এই প্রকারের ভাবাবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্ম বন্ধনজনক হয় না। সুতরাং কর্ম্মযোগীরা যে সকল কার্য্য করেন, কার্য্যতঃ সে সকল আত্মাভিমানশূন্য; মাত্র কায়, মন, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত। তাহাতে কর্ম্মীর বড় কর্ত্তৃত্ব থাকে না। এই ভাবে কৃত কর্ম্মের সাহায্যে তাঁহাদিগের আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত অপরিণামী নিজবোধে লক্ষ্য থাকিলে সে আত্মশুদ্ধি দ্রুত হয়।

শুদ্ধাত্মবোধ উপলব্ধিই সম্যক্ আত্মশুদ্ধির যথার্থ লক্ষণ। আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নাই বা যাহা কিছু আছে, সমস্তই আত্মা—এই বোধকে শুদ্ধাত্মবোধ বলে। মাকে দেখিতে গিয়া যে দর্শনে অন্য কিছু প্রতিভাত হয়, সে দর্শন শুদ্ধ দর্শন নহে—তাহা অবিশুদ্ধ দর্শন। চক্ষুঃপল্লবপ্রান্তে কজ্জলের মত যত দিন এ জগৎ সম্বন্ধে অন্য জ্ঞান থাকিবে, তত দিন বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। জগৎপ্রপঞ্চ পদার্থ নহে, মায়ের কার্য্য,—মায়েরই স্থূল বিকাশ—ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাময়তার অভিব্যক্তি—অলীক ভ্রান্তি বা মা হইতে অন্য কিছু নহে, মা হইতে ইহা কোন প্রকারে ভিন্ন নহে—এ দর্শন ভিন্ন অন্য দর্শন অবিশুদ্ধ, আত্মার অবিশুদ্ধ দর্শন। আত্মাতিরিক্ত যদি কিছু থাকে, তবে তাহা অবিশুদ্ধ। আত্মাই বিশুদ্ধ। সুতরাং আত্মাতিরিক্ত অন্য কিছু আছে—ইহা কোন প্রকারে বলিতে গেলেই জ্ঞানচক্ষে অবিশুদ্ধ দর্শন হইল বলিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্ববিষয়চাঞ্চল্যের তলে অপরিণামী আত্মবোধ দেখাও ওইরূপ আত্মশুদ্ধির হেতু।

যোগীদিগের এ কর্ম্ম স্বতঃপ্রণোদিত। তাহাদিগের কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় স্বতঃ নিঃসঙ্গ হইয়া অথবা আত্মসঙ্গ হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন করে। অনেকে এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করেন যে, আত্মশুদ্ধি-সঙ্কল্পে কায়মনোবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ফলাসঙ্গশূন্য

হইয়া কর্ম্মসকল সম্পাদন করেন; কিন্তু তাহা নহে। ভগবদস্তিত্ববোধযুক্ত পুরুষ আত্ম-শুদ্ধির জন্য ফলকামনা না করিয়া, মাত্র কায়, মন বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম করিব, এরূপ ভাবিয়া কর্ম্ম করেন না, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়কায়মনোবুদ্ধ্যাদি স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবণতাবশতঃ কর্ম্ম করিতে থাকে। কিন্তু সে কর্ম্মের দ্বারা তাঁহারা ফলাসঙ্গ লাভ না করিয়া, পরমাত্ম-সঙ্গ লাভ করেন এবং স্বতঃ তাঁহাদিগের কর্ম্মস্বভাবময় কায়মনোবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকল সেই পরমাত্ম-সঙ্গের ফলস্বরূপ আত্মশুদ্ধি লাভ করে। ভগবদ্‌বুদ্ধিতে জীব যুক্ত হইলেই ইন্দ্রিয়াদির বিষয়-গ্রহণ ঘুচিয়া যায় না, সুতরাং তাহাদের স্বাভাবিক কর্ম্মও সহসা বন্ধ হয় না। তাহারা পূর্ব্বস্বভাববশতঃ কর্ম্ম করিতে থাকে। কিন্তু সর্ব্বচাঞ্চল্যের অন্তরে ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে কর্ম্ম অন্য ফলকামনাময় না হইয়া, পরমাত্মসেবাময় হয়—পরমাত্মার সেবা করিতেছি, তাঁহারই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতেছে, এইরূপ বোধ হৃদয়ে উজ্জীবিত হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ সেই ইন্দ্রিয়, শরীর, মন ও বুদ্ধিসকল বিশুদ্ধ হয়—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিতেছি, এ ভাবিয়া যোগীরা কর্ম্ম করেন না। তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সকল কর্ম্ম আত্মশুদ্ধিরূপ ফল তাঁহাদিগকে প্রদান করে। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন না, কর্ম্মের দ্বারাই আত্মশুদ্ধিরূপ ফল লাভ হয়। আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিতেছি, এ জ্ঞান যত দিন থাকে, তত দিন সে কর্ম্মের দ্বারা আত্মশুদ্ধি বিশেষভাবে লাভ হইতে পারে না এবং তত দিন তাহাদিগকে প্রকৃত যোগী বলা যায় না। তবে প্রথম অবস্থায় সেরূপ ভাব না থাকিতে পারে; সেই জন্য সঙ্গ পরিহারের চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। ভগবদ্‌যোগী ভগবানের মুখ চাহিয়া কর্ম্ম করে, আত্মযোগীর কর্ম্ম আত্মার সেবার জন্য স্বতঃ প্রধাবিত হয়—ফল তাহার আত্মশুদ্ধি। পুত্র সন্তুষ্ট হইবে, ইহা ভাবিয়া মা যেমন পুত্রকে ভালবাসে না—পুত্রকে লালন পালন করে না, কোন উদ্দেশ্য বুকে লইয়া মা যেমন পুত্রের প্রতি হৃদয় ঢালিয়া দেয় না;—সে ভালবাসা, সে লালন-পালন, সে হৃদয়-দান যেমন মাতৃত্বের লক্ষণ মাত্র, মাতৃত্বের স্বাভাবিক গতিমাত্র, যোগীর কর্ম্মও তদ্রূপ কোন উদ্দেশ্য বুকে লইয়া সংসাধিত হয় না, উহা স্বাভাবিক—স্বতঃ-প্রণোদিত। মাতৃস্নেহের ফলস্বরূপ পুত্র তৃপ্তি লাভ করে, মাতার মন প্রাণ, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় পুত্রময় হয়। যোগীর কর্ম্মে পরমাত্মা তৃপ্তি লাভ করেন, যোগীর কায় মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মাতৃময় হয়—ইহাই আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি কাহাকে বলে? আত্মময় হইয়া যাওয়ার নাম আত্মশুদ্ধি। এ শরীর আত্মার—এরূপ জ্ঞান হইলে তবে শরীরের আত্মশুদ্ধি হয়। এ মন আত্মার—এরূপ জ্ঞান হইলে পরে মনের আত্মশুদ্ধি হয়। এ বুদ্ধি আত্মার—এরূপ জ্ঞান হইলে পরে বুদ্ধির আত্মশুদ্ধি হয়। এ ইন্দ্রিয়সকল আত্মার—এরূপ জ্ঞান হইলেই তবে ইন্দ্রিয়সকলের যথার্থ আত্মশুদ্ধি হয় এবং ঐরূপে আত্মশুদ্ধি হইলেই তবে কর্ম্মে কর্ম্মে ফলসঙ্গ লাভ না হইয়া, আত্মসঙ্গ লাভ হইতে থাকে; ইহাই যোগীর কর্ম্ম বা যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করা।

তোমরা মাকে কখনও হৃদয়ে বসাইয়াছ কি? কখনও তোমাদিগের নিভৃত অন্তরের রত্নসিংহাসনে মাতৃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছ কি? যদি করিতে, তবে দেখিতে পাইতে, তোমাদিগের কায়মনোবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, যে যেমন আছে, তেমনই অবস্থায় মাতৃদর্শনে ছুটিত; সাজসজ্জা, বেশবিন্যাসের মুখ চাহিয়া বিলম্ব করিত না, পরিশুদ্ধির জন্য অপেক্ষা করিত না, স্ব স্ব দীন ও মলিন বেশভূষার দিকে লক্ষ্য করিয়া লজ্জিত হইত না, শুদ্ধ পবিত্র বেশভূষার জন্য অপেক্ষা রাখিত না—স্বতঃ ছুটিত। চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত স্বতঃ গিয়া তাহারা মাতৃসমীপে উপস্থিত হইত; তাহাদিগের দীনতা মলিনতা তাহাদের চক্ষেও ঠেকিত না, মাতৃচক্ষেও প্রতিভাত হইত না।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্‌।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্‌ আপ্নোতি। অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ সন্‌ নিবধ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যুক্ত পুরুষ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, (কর্ম্ম করিয়াও) নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেন। অযুক্ত পুরুষ, কামনাবশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মের কোনও দোষ নাই। মাত্র যুক্ত অযুক্ত অবস্থাভেদে ফলভেদ হয়, ইহা মা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন। যুক্ত পুরুষ নিষ্ঠাবান্‌ হয় অর্থাৎ ভগবানে নিঃশেষরূপে অবস্থান করে। সুতরাং নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করে। অযুক্ত পুরুষ কামকারী হয় অর্থাৎ কামনা দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে, কামনার পর কামনার দ্বারা আবর্ত্তিত হইতে থাকে, সুতরাং ফলে আবদ্ধ হয়। সন্ন্যাস-মতাবলম্বীরা ভগবানের এ বাক্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলে কর্ম্মের নিন্দুক হইতেন না।

কিন্তু যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার অবসর কোথায়? ঐ যে উর্দ্ধে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহমালা নিত্য পরিভ্রমণ করিতেছে, ঐ যে নক্ষত্ররাজ্যের অনন্ত বিস্তার, অনন্তকোটি বিশ্বের দৃষ্টি-বহির্ভূত কোন মহাশূন্যের অবস্থান দেখাইয়া দিতেছে—ঐ যে মহাশূন্য, অনন্ত শূন্য, বক্ষে অনন্ত বিশ্ব ধরিয়াও আপনার শূন্যত্ব পরিপূর্ণ করিতে পারিতেছে না, এ সমস্তই যে কর্ম্মময়—কর্ম্মে আবদ্ধ, কর্ম্মে বিভ্রান্ত, ইহারা কি যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে? এই যে অনন্ত বিশ্ব, অনন্তকোটি জীব বক্ষে লইয়া নিত্য কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতেছে, ইহারা কি যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে? জল, স্থল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যাহারা এই বিশাল বিশ্বমেখলা গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, ইহারা কি যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে? যদি যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিত, তবে তাহাদের এ নিত্যচাঞ্চল্য, এ আবর্ত্তনের উত্থান পতন চিরদিনের জন্য লয় হইত। কর্ম্মবিপাক বন্ধ হইত। জগৎসৃজন লোপ হইত। ইহারা অযুক্ত-কামকারী। এ অযুক্ত-কামকারী জীব-ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার অবসর কোথায়?

আছে অবসর—অন্তরে চাহিয়া দেখ, অবসর খুঁজিয়া পাইবে। পৃথিবীর অন্তরে দেখ—পৃথিবী যাঁহার শরীর, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহাতে অবস্থান করে, পৃথিবীর অন্তর যিনি সংযমিত করেন, সেই অন্তর্য্যামী আত্মার বিদ্যমানতা দর্শন কর—স্বীকার কর, যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার অবসর পাইবে। জল যাঁহার শরীর, জল যাঁহাকে জানে না, জলে যিনি অবস্থান করেন, জলের অন্তর যিনি সংযমিত করেন, সেই অন্তর্য্যামী আত্মাকে স্বীকার কর। অগ্নি যাঁহার শরীর, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, অগ্নিতে যিনি অবস্থান করেন, অগ্নির অন্তর যিনি সংযমিত করেন, সেই অন্তর্য্যামী আত্মাকে দর্শন কর। বায়ু যাঁহার শরীর, বায়ু যাঁহাকে জানে না, বায়ু যাঁহাতে অবস্থান করে, বায়ুর অন্তর যিনি সংযমিত করেন, সেই অন্তর্য্যামী আত্মাকে দর্শন কর। আকাশ যাঁহার শরীর, আকাশ যাঁহাকে জানে না, আকাশে যিনি অবস্থান করেন, আকাশের অন্তর যিনি সংযমিত করেন, সেই অন্তর্য্যামী আত্মাকে দর্শন কর। মন যাঁহার শরীর, মন যাঁহাকে জানে না, মনে যিনি অবস্থান করেন, মনের অন্তর যিনি সংযমিত করেন, সেই অন্তর্য্যামী আত্মাকে দর্শন কর। প্রাণ যাঁহার শরীর, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, প্রাণে যিনি অবস্থান করেন, প্রাণের অন্তর যিনি সংযমিত করেন, সেই অন্তর্য্যামী আত্মাকে দর্শন কর। অন্তর যাঁহার শরীর, অন্তর যাঁহাকে জানে না, অন্তর যাঁহাতে অবস্থিত, অন্তরের অন্তর যিনি সংযমিত করেন, সেই অন্তর্য্যামী আত্মাকে দর্শন কর। তুমি যাঁহার শরীর, তুমি যাঁহাকে জানিতেছ না, তোমাতে যিনি অবস্থান করেন, তোমার অন্তর যিনি সংযমিত করেন, সেই অন্তর্য্যামী আত্মাকে দর্শন কর—যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার অবসর পাইবে।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩

বশী দেহী মনসা সর্ব্বকর্ম্মাণি পরমাত্মনি সংন্যস্য, নবদ্বারে পুরে নৈব কুর্ব্বন্, ন কারয়ন্, সুখং আস্তে।

ব্যবহারিক অর্থ।—ভগবচ্চরণে বশীভূত অথবা আত্মবশগতচিত্ত পুরুষ সমস্ত কর্ম্ম বুদ্ধিযোগ দ্বারা তাঁহাতে সংন্যস্ত করিয়া, নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে নিশ্চিন্তে অবস্থান করেন, তিনি কর্ম্মসকল করিয়া এবং করাইয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না।

যৌগিক অর্থ।—ভগবানের এই শ্লোকটি সন্ন্যাসবাদীরা স্বমত-প্রতিষ্ঠার্থে সন্ন্যাসের লক্ষণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ আসন দিবার জন্য জ্ঞান-চক্ষু সংকীর্ণ করিয়া, কূট অর্থগ্রহণে সত্যার্থ সঙ্কোচ করিতে বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া, সন্ন্যাসসেবীরা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। সত্যের চক্ষুকে তাঁহাদিগের সে কুটিলতা বঞ্চনা করিতে পারে না। তাঁহাদিগের ধৃষ্টতা গৃহস্থ আশ্রমকে লোকচক্ষে যেরূপ অবনমিত করিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী তাঁহারাই। ভগবান্ এ অধ্যায়ে কর্ম্ম-

সন্ন্যাসযোগ বর্ণনা করিতেছেন, কর্ম্ম করিয়াও জীব কিরূপে সন্ন্যাসী থাকে, উহাই এ অধ্যায়ে ভগবানের প্রধান বক্তব্য। সেই কথা বলিতে বলিতে সহসা সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা ভগবানের অভিপ্রায় হইতে পারে না। এই শ্লোকে ভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন, যুক্ত পুরুষ দেহে অবস্থান করিয়াও সমস্ত কর্ম্ম বুদ্ধিযোগের সাহায্যে ভগবানে অর্পণ করিয়া, কর্ত্তৃত্বাদিজনিত ফলে লিপ্ত না হইয়া, সুখে অবস্থান করিতে পারে। যুক্ত পুরুষ কর্ম্ম করিয়াও নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করে—এ কথা মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। যুক্ত পুরুষ কেমন করিয়া দেহে অবস্থান করেন, উপস্থিত শ্লোকে ইহা বলাই মায়ের অভিপ্রায়। সমস্ত কর্ম্ম মায়ে সমর্পণ করিয়া, সমস্ত অন্তরটুকু পূর্ব্বোক্ত অপরিণামী আত্মবোধের কারণস্বরূপ অন্তর্য্যামীর চরণে নিবেদন করিয়াও কি এ নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে যোগীকে বিষয়ের ঘাত প্রতিঘাতে চঞ্চল হইয়া থাকিতে হয়? দেহের এ নব দ্বার উন্মুক্ত থাকিতে যোগী মায়ের চরণে মন সমর্পণ করিয়াও কি স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে না? এই নবদ্বারে বিষয়সকলের আগমন নির্গমন যোগীকে কি সাধারণ জীবের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া তোলে? ইহাই আশঙ্কা এবং এই আশঙ্কা পরিহারার্থেই মায়ের এই স্পষ্ট ঘোষণা।

না, তোলে না—তুলিয়াও তোলে না। মাতৃচরণে যে কর্ম্ম সমর্পণ করে, মাকে অন্তরের অপরিণামিনী অধীশ্বরী দেখিয়া যাহার কর্ম্মসকল মায়েরই কর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, সে পুরুষ করিয়াও করে না—চঞ্চল হইয়াও চঞ্চল হয় না—বিষয়-সংঘাতে আন্দোলিত হইয়াও সে স্থির থাকে। সে দেখে, এক দিকে সকল কর্ম্মই সে করিতেছে, অন্য দিকে বা অন্তরে চাহিয়া দেখে, কর্ম্মময় হইয়াও সে কিছুই করিতেছে না। স্বীয় আত্মার এই উভয়মুখী মহিমা দেখিয়া সে আত্মাকে ঈশ্বরী বলিয়া চিনিয়া ফেলে। বুদ্ধি এক দিকে আত্মগ্রাহী, অন্য দিকে বিষয়গ্রাহী। যে দিকে বুদ্ধি "আমি নিজে" এইরূপ নিজবোধাকার গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে, সেই দিকে দেখা যায়, আমি কিছুই করিতেছি না, অথবা সব করিয়াও স্থির আছি। এক দিকে চিত্ত, সকল ভাবময় আয়তন গ্রহণ করিতেছে, অন্য দিকে মাত্র "নিজ" এই আকারে অবস্থান করিতেছে। বুদ্ধির নানা বিষয়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যেমন ঠিক করি, জগৎ বা বিষয় রহিয়াছে, তেমনই অন্য দিকে নিজবোধরূপ অপরিণামী বোধ দেখিয়া স্থির করি, অপরিণামী আত্মসত্তা রহিয়াছে। যে এইরূপে উভয় দিকের দ্রষ্টা, সে এ দেহে সুখে অবস্থান করে, নির্ভীক হয়, নিশ্চিন্ত হয়। সে যে মায়ের বশীভূত জীব, কেহ তাহাকে অবশ করিতে পারে না।

দূরে যাও তুমি সন্ন্যাসী—তোমার সন্ন্যাসের শূন্যতার চাক্‌চিক্য গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে অপসারিত কর। তোমার শূন্যতার অন্তঃশূন্য জড়তা লইয়া কর্ম্মী গৃহস্থকে অবসাদগ্রস্ত করিও না। গৃহস্থের পুণ্য-কর্ম্ম-আলিপনাঙ্কিত আঙ্গিনা তোমার অঙ্গের অসার ভস্মপ্রলেপে কলঙ্কিত করিও না।

যাহার সত্যদর্শন হইয়াছে, তাহার চক্ষুঃ তোমায় জড়তাময় শূন্যবাদীর আসনের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখে। তুমি আজ কর্ম্ম-সমস্যার মীমাংসা করিতে ভগবন্মুখ-ঘোষিত গীতার আলোচনা করিতে বসিয়া, তাহার স্তরে স্তরে প্রচ্ছন্নভাবে কর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া, সন্ন্যাসবাদ অনুপ্রবিষ্ট করিতে গিয়া অনধিকারচর্চ্চা করিতেছ। তুমি গীতা-প্রসঙ্গে বিরত হও।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

প্রভুঃ লোকস্য কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি, কর্ম্মাণি ন সৃজতি, তথা কর্ম্মফলসংযোগং ন সৃজতি, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।

ব্যবহারিক অর্থ।—ভগবান্ লোকের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম সৃজন করেন না, কর্ম্মফল-সংযোগও তিনি করেন না। সর্ব্বত্র স্বভাব মাত্র প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে।

যৌগিক অর্থ।—এ লোকজগৎ তাঁহারই শক্তি। প্রতি জীব, প্রতি পদার্থ, তাঁহার শক্তিবিশেষ মাত্র। শক্তি ও ভাব একই কথা। 'ভূয়তে ইতি ভাবঃ' যাহা ঘটে, তাহার নাম ভাব, সুতরাং শক্তিবিবর্ত্তনই ভাব। মা বলিতেছেন, তিনি লোকের জন্য কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম বা কর্ম্মে ফলসংযোগ, এ সকল করেন না, তাঁহার স্বীয় শক্তি স্বতঃ প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে এবং তাহা হইতে এ বিশাল কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব ও ফলপূর্ণ বিশ্ব-বিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। মহাশক্তি স্বীয় আনন্দলীলায় নিত্য মত্তা। তাহারই ফল এ জীব-প্রবাহ। সুতরাং তিনি করিতেছেন না, এ কথা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? জীবকর্ত্তৃত্ব, জীব-কর্ম্ম এবং সে কর্ম্মে ফলসংযোগ, এ সমস্তই ত তাঁহারই লীলানর্ত্তনের বিম্বরাশি। তবে তিনি করেন না, এ কথা কেমন? জীব কি তবে স্বাধীন? স্বাধীন স্বেচ্ছাচারই কি এ জীবজগৎ? সুখদুঃখময় কর্দ্দমলিপ্ত জীবস্বেচ্ছাচারে কি জগৎ গঠিত—স্বেচ্ছাচারেই কি জীব ঊর্দ্ধে অধে নিয়ত ভ্রাম্যমাণ? বিশ্বরূপ এ মহাসংসার-গৃহে কর্ত্তা বলিয়া কি কেহ নাই? অথবা উচ্ছৃঙ্খল সংসারে বৃদ্ধ কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইয়া, পরিবারবর্গ স্ব স্ব কর্ত্তৃত্বে চলিয়া, সংসারকে যেমন শৃঙ্খলাহীন করে, এ বিশ্বসংসারের, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত জীববৃন্দ কি তদ্রূপ স্ব স্ব কর্ত্তৃত্বানুসারে কর্ম্ম করিতেছে এবং কর্ম্ম স্বীয় আপেক্ষিক ও গুরুত্বগতি অনুসারে ফল লাভ করিতেছে? ইহাই কি জগতের বিধান?

না, ঠিক তাহা নহে। এই কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মতত্ত্ব একটু বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আমরা যাহাকে কর্ত্তৃত্ব বলিয়া বুঝি, সে কর্ত্তৃত্ব বস্তুতঃ আমাদের নহে—প্রকৃতির। আমরা প্রকৃতির বশীভূত—আমরা প্রকৃতির অধীন, তাই আমরা জীব। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে চালিত হইয়া, নিজেরা প্রকৃতি হইয়া, প্রকৃতির সুরে আপনাদিগকে কর্ত্তা ও কর্ম্মময় বলিয়া ভাবি। তিনিই প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করেন—তিনিই প্রকৃতির প্রভু। তাঁহার ইচ্ছায় অথবা বিশ্বসিতবৎ তাঁহা হইতে তাঁহার প্রকৃতি বা শক্তি এই

লোকজগৎ রচনা করিতেছেন, কর্ম্মের শৃঙ্খলা সংস্থাপিত করিয়া ফলসংযোগ করিতেছেন। আমাদের মত, খণ্ডবুদ্ধি জীবের মত, তিনি প্রকৃতির অধীন নহেন—স্বীয় শক্তির অধীন নহেন। তাই তিনি স্রষ্টা হইয়াও স্রষ্টা নহেন—কর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা নহেন—কর্ম্মফলদাতা হইয়াও কর্ম্মফলদাতা নহেন। যত দিন জীব খণ্ডবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন থাকে, যত দিন এ বিরাট্ বিশ্বপ্রভুর অস্তিত্ব তাহাদিগের চক্ষে উদ্ভাসিত না হয়, তত দিন জীব স্ব স্ব কর্ত্তৃত্বাভিমানে আচ্ছন্ন থাকে। তত দিন ভগবৎশক্তির কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম নিজ কর্ত্তৃত্ববোধে গ্রহণ করিয়া, আপনাকে কর্ত্তা ভাবে ও কর্ম্মসকল নিজকৃত কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহার ফলস্বরূপ সেই কর্ম্মের পরিণাম বা ফলে আপনি সংযুক্ত হয়। প্রভুর অস্তিত্ববোধক জ্ঞান বিকশিত হইলে জীব হৃদয়ঙ্গম করে—বস্তুতঃ জীবকর্ত্তৃত্ব কিছু নাই। ভগবৎশক্তির কর্ত্তৃত্বই প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে এবং তিনি জীবের মত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হন না, তিনি শক্তিরও প্রভু।

তাঁহার এই অকর্ত্তৃত্বাত্মক প্রভুত্ববোধক জ্ঞান জীবহৃদয়ে বিকশিত হইলে তখনই জীব উপলব্ধি করে, এ বিরাট্ বিশ্বের যেখানে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, আমাদের অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু বিবর্ত্তন বিবর্ত্তিত হইতেছে—আমাদিগের আমিত্ব পর্য্যন্ত তাঁহারই শক্তির বিবর্ত্তন মাত্র। তাঁহার শক্তি কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, তাঁহার শক্তি কর্ম্মাকারে উপলব্ধ হইতেছে এবং সেই কর্ম্মই ফলরূপ স্থূল পরিণতি গ্রহণ করিতেছে। তিনি প্রভুবৎ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তখন জীব স্বকর্ত্তৃত্ব দেখিতে পায় না, সুতরাং কৃত কর্ম্মসকলও নিজের কর্ম্ম বলিয়া দেখিতে পায় না। কর্ম্মফল কর্ত্তৃত্বেই সংযুক্ত হয়, ইহাই শক্তিশৃঙ্খলার বিধান। যে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া ভাবে, কর্ম্মফল তাহাতেই সংযুক্ত হয়, এই বিধানানুসারে ভগবৎস্বভাবের বিবর্ত্তনোদ্ভূত ফল ভগবৎস্বভাবেই সংযুক্ত থাকে। তিনি অসঙ্গ বলিয়া করিয়াও অকর্ত্তাই থাকেন।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে, সুকৃতং চ নৈব আদত্তে; অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতং, তেন হেতুনা জন্তবঃ মুহ্যন্তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—ভগবান্ আপ্তকাম বিভু, কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত থাকা বশতঃ জীবসকল মোহগ্রস্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে মা আপনার প্রভুত্বের কথা বলিয়া, এইবার বিভুত্বের কথা বলিতেছেন। তিনি বিভু অর্থাৎ পরিপূর্ণ আপ্তকাম। সেই জন্য তিনি কাহারও কৃত কর্ম্ম গ্রহণ করেন না। সুকৃত বা দুষ্কৃত, যে কর্ম্মই হউক, সেই পরিপূর্ণ প্রভুতে তাহা লিপ্ত হয় না। কিন্তু খণ্ডবোধাত্মক অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত থাকায় জীবসকল মোহগ্রস্ত হয়। অজ্ঞানের দ্বারা কোন জ্ঞান আবৃত আছে? কোন্ জ্ঞান আবৃত থাকায় জীব-

সকল মুহ্যমান, কর্ম্মে আবদ্ধ, কর্ম্মের আবর্ত্তনে নিত্য ঘূর্ণমান? আপ্তকাম, পরিপূর্ণ প্রভুর এই কর্ত্তৃত্বসম্বন্ধীয় জ্ঞান। এই বিশ্বের প্রতি পরমাণুর অভ্যন্তরে একজন রহিয়াছেন, যিনি পরিপূর্ণ, আপ্তকাম এবং প্রভু অথচ অকর্ত্তা। এ জ্ঞানে যত দিন না সত্যরূপে জীবহৃদয় উদ্ভাসিত হয়, তত দিন জীব মোহের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না। যত দিন না জীব হৃদয়ঙ্গম করে, কর্ত্তৃত্বাদি আমাদিগের নহে, এক মহান্ প্রভুশক্তির পরিচালনে ধূলিকণা হইতে ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তিনি প্রভু এবং বিভু হইয়াও অকর্ত্তা—তত দিন মূঢ় জীব মূঢ়ই থাকে। যত দিন জীব ধারণা করিতে সক্ষম না হয় যে, সেই মহান্ প্রভু বিশ্বের পরিচালক হইয়াও তিনি তাহাতে লিপ্ত নহেন, প্রতি কর্ম্মবিবর্ত্তন তাঁহার শক্তিতেই উৎপন্ন হইলেও তিনি তাহার অধীন নহেন, তাঁহার শক্তি তাঁহারই অধীন, তত দিন জীবের দুর্দ্দশা বিদূরিত হয় না। ভগবদ্ধারণা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কর্ম্মের ভিতর দিয়া সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, তাঁহার এই প্রভুত্ব ও বিভুত্ব উপলব্ধি করিতে হয়। কর্ম্মী জীব, কর্ম্মময় এ বিরাট্ বিশ্বচক্রের প্রতি কেন্দ্রে বিভিন্ন কর্ত্তৃত্ব দর্শনে অভ্যাসশীল এবং সেই জন্য কর্ম্মসকল তাঁহাতে সমর্পণ করা তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তির বহির্ভূত। কিন্তু যদি সে শিক্ষা করে, বস্তুতঃ বিভিন্ন কর্ত্তৃত্ব এ জগতে নাই, যাঁহার কর্ত্তৃত্বে এ অনন্ত লোকসংঘ সৃজিত হইয়াছে, তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি ধূলিকণার স্থানচ্যুতি পর্য্যন্ত সম্পাদিত হইতেছে, যাঁহার কর্ত্তৃত্বে অনন্তকোটি সূর্য্য ভ্রাম্যমাণ, তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে একটি ক্ষুদ্র কৃমি স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতেছে। যাঁহার কর্ত্তৃত্বে হরিহরব্রহ্মাদি জগৎশাসক-পদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে একটি ক্ষুদ্র অণু, বুঝি অন্য শত পরমাণুর আশ্রয়স্থল হইয়া অবস্থান করিতেছে। এইরূপ বহুকর্ত্তৃত্ব এক-কর্ত্তৃত্বে সমাধান করিতে পারিলে, তবেই এ অনন্ত কর্ম্মবৈচিত্র্য এক কর্ত্তায় সমর্পিত হয়। কর্ত্তা একজন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইলেই তবে সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাকে সমর্পণ করা যায়, নতুবা কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মসন্ন্যাস লাভ দুরূহ। আর সেই কর্ত্তা বিভু অর্থাৎ আপ্তকাম, পরিপূর্ণ, নির্লিপ্ত—এই জ্ঞান থাকিলেই তবে সে অর্পণ মুক্তিপ্রদ হয়। সেই জন্য কর্ম্মসন্ন্যাস যোগে তাঁহার প্রভুত্ব ও বিভুত্বের ধারণাই প্রশস্ততম। তাঁহাকে ওই ভাবে ধারণার অর্থই নিজ আত্মাকে ওই ভাবে ধারণা করা। কেন না, তিনিই আত্মা এবং এই আত্মাই পরমাত্মায় একীভূত হয়।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্‌॥ ১৬

আত্মনঃ ভগবতঃ জ্ঞানেন যেষাং তৎ অজ্ঞানং নাশিতং, তেষাং হৃদয়ে তৎ পরং জ্ঞানং আদিত্যবৎ প্রকাশয়তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—ভগবদ্‌জ্ঞানের দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিদূরিত হয়, তাহাদিগেরই হৃদয়ে পরম ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যবৎ উদিত হয়।

যৌগিক অর্থ।—হে সন্ন্যাসশীল মহাপুরুষগণ! তোমরা একবার ভগবানের এই উক্তিটি লক্ষ্য করিয়া দেখিবে কি? তোমরা জীবত্বের ন্যায় ঈশ্বরত্বকে অনিত্য প্রতিপাদন করিতে কতই না উদ্যম প্রকাশ করিয়াছ এবং তোমাদের কল্পিত যুক্তির বলে তোমরা গৃহস্থ জীববর্গকে কর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া, ঈশ্বরসেবার তুচ্ছতা তাহাদিগের হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দিয়া, একেবারে তাহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানে উন্নীত করিবার জন্য কতই না বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াছ! তোমরা ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পার বা না পার, ঈশ্বরজ্ঞানের অলীকতা প্রতিপন্ন করিয়া, জগতে যে নাস্তিকতার প্রকারান্তর বিস্তীর্ণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছ, তোমাদের সে প্রয়াস ভগবানের এই স্পষ্ট অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াও কি বিরত হইবে না? এ স্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়াও ব্রহ্মের প্রভুত্ব ও বিভুত্বরূপ মহিমময় ঈশ্বরভাব অগ্রে উপলব্ধি করিলে, তবে তাঁহার সমব্রহ্মভাব উপলব্ধ হয়, ইহা কি তোমরা বুঝিবে না? এই মহা উপদেশ শ্রবণ করিয়াও যদি তোমরা তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইয়া থাক, তবে বুঝিব, তোমরা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য উন্মার্গগামী মাত্র। আর যদি অমনোযোগিতাবশতঃ এ জ্ঞান উল্লঙ্ঘন করিয়া থাক, তবে তাঁহার এ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ প্রাণে ধারণা করিতে সচেষ্ট হও। তোমাদিগের সন্ন্যাসের মোহ দূরীভূত হইবে। তোমরা ভগবৎসেবাপরায়ণ হইয়া কর্ম্মিরূপে সংসারে অমৃত ছড়াইতে থাকিবে।

মা এ শ্লোকে জ্ঞানকে দুই স্তরে স্পষ্ট করিয়া বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম, আত্মার প্রভুত্ব ও বিভুত্বরূপ ঈশ্বরজ্ঞান এবং দ্বিতীয়, পরমার্থবোধক পরমাত্মজ্ঞান। আবার এই উভয় স্বরূপের মধ্যে প্রথম প্রভুত্ব ও বিভুত্বময় ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সেবা করিলে, তবে পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হয়। করিয়াও অকর্ত্তা থাকা, ইহাই প্রভুত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয়; এবং সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সর্ব্বের বাহিরে বিদ্যমান থাকা, ইহাই বিভুত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই দুই প্রকৃষ্ট পরিচয় বিজ্ঞাত হওয়াই স্বীয় অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশের উপায়। এইরূপে অজ্ঞান নাশ করিলে আদিত্যবৎ পরমাত্মজ্ঞান প্রকাশ পায়। এই অমৃতময় স্পষ্ট উপদেশ কেহ যেন কখনও ভুলিও না। ইহাই সন্ধিক্ষণের পূজা, জীব ও ব্রহ্মের চিরমিলনের ইহাই মহাসন্ধ্যা। মহাসন্ধিপূজায় জীবত্বের মহাবলি না হইলে, নবদ্বারবিশিষ্ট এ মহাপুরে মহানবমীর পূজা সম্পাদিত হয় না। নির্ব্বিচারে সুকৃত দুষ্কৃত, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমস্ত অমৃতরূপে ব্রহ্মে অর্পণ করা যায় না।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনারব্বৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭

তদ্‌বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠাঃ, তৎপরায়ণাঃ, জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ পুরুষাঃ অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—ভগবদ্‌বুদ্ধিযুক্ত, ভগবন্নিষ্ঠ, ভগবানে সমর্পিতাত্মা, ভগবৎপরায়ণ, ভগবদ্‌জ্ঞান-বিধৌতপাপ পুরুষসকল মুক্তি লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—ভগবানে যাহারা বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইয়াছে, তাহারাই ভগবান্‌কে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করে অর্থাৎ তদাত্ম হয়। এই তদাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে নিষ্ঠা সঞ্জাত হয়। তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জীব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে, সেই জীব তন্নিষ্ঠ হয় অর্থাৎ তাঁহাতে নিঃশেষরূপে অবস্থান করে এবং তখনই তন্মুখে ধাবিত হয় অর্থাৎ তৎপরায়ণ হয়। তখন ভগবদ্‌বেদনের সাহায্যে জীবের পাপ বিদূরিত হইয়া যায় এবং যেখানে গেলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, সেই মুক্তিধাম লাভ করে। সর্ব্বপ্রথম ভগবদ্‌বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করা চাই। তিনি যে রহিয়াছেন, এ বুদ্ধি সবলে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তোমরা সকলেই সাধনা-রহস্য শিক্ষার জন্য সর্ব্বদা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাক—সাধনাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া, নানারূপ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ রচনা কর; শাস্ত্রের বহুবিধ মীমাংসায় অগ্রসর হও; মেধার সাহায্যে তত্ত্বসকলের দুরূহ জ্ঞান লাভ করিতে যত্নবান্ হও; কিন্তু তোমরা সত্য করিয়া বল দেখি, তিনি আছেন—এ কথা মান কি? তোমরা কত প্রকারের যোগ শিক্ষা কর, কত ভক্তির উচ্ছ্বাসে হৃদয় দ্রবীভূত কর, জ্ঞানের বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে লোকচিত্ত মুগ্ধ কর অথবা পরার্থপর কর্ম্মী হইয়া জগৎহিতে অগ্রসর হও; কিন্তু সত্য করিয়া বল দেখি, তিনি আছেন—এ কথা তোমরা মান কি? তোমাদিগের আস্তিক্যবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি? আস্তিক্যবোধের বেদনে তোমরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছ কি? হয় ত তোমরা আমার এ প্রশ্নে হাস্য করিবে, হয় ত তোমরা এ প্রশ্ন অসার ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া, সহস্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিবে, 'তিনি আছেন' ইহা আমরা খুব স্বীকার করি; নতুবা এত অন্বেষণ, এত ত্যাগ স্বীকার করিব কেন? দিবানিশি তাঁহার নাম জপ করিতেছি, তাঁহার বিচ্ছেদে দিবানিশি অশ্রুজল ঢালিতেছি, তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানে শাস্ত্ররাশি মন্থন করিতেছি, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হইয়াছি, তাঁহাতে সমাধিস্থ হইবার জন্য যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিতেছি, তাঁহাকে পাইবার পথে অগ্রসর হইয়া কত বিভূতি লাভ করিলাম, জগতে মহাপুরুষ বলিয়া ঘোষিত হইলাম, আর আজ সহসা আপনি তুচ্ছ আস্তিক্যবুদ্ধি হয় নাই বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন? ইহাপেক্ষা অবিমৃষ্যকারিতা আর কি আছে!

না, হয় নাই। ভগবৎসম্বন্ধে আস্তিক্যবুদ্ধি সাধনার সূত্রপাত এবং আস্তিক্যবুদ্ধির প্রতিষ্ঠাই সাধনার শেষ। তোমরা হয় ত মনে কর, খুব মানিয়াছ; কিন্তু তোমরা জান না যে, যে মুহূর্ত্তে তাঁহাকে সত্য মানা যায়, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে সত্য লাভ করা যায়। হে ভক্তচূড়ামণি! তোমার ও বিরহের ক্রন্দন যদি যথার্থ মানার ক্রন্দন হইত, তাহা হইলে প্রথম অশ্রুবিন্দু ঝরিবার পূর্ব্বেই মাতৃঅঞ্চল তোমার সে অশ্রু মুছাইবার জন্য তোমার চক্ষে বিন্যস্ত হইত। হে কর্ম্মী! যথার্থই মানিয়া যদি তুমি কর্ম্মে অগ্রসর হইতে, তাহা হইলে এ কর্ম্মক্লান্তি তোমার মুখ বিশুষ্ক করিবার বহু পূর্ব্বেই মাতৃক্রোড়ে

বিরামের জন্য তুমি স্থান লাভ করিতে। হে জ্ঞানী! তুমি মেধার সাহায্যে অজস্র শাস্ত্ররাশি মন্থন করিয়া যে জ্ঞান-সম্ভার সঞ্চয় করিতেছ এবং তোমার যে জ্ঞানের প্রতিভায় জগতে গুরুর পদে আসীন হইতেছ, যদি যথার্থ মানিয়া ওই জ্ঞান অনুশীলন করিতে, তাহা হইলে সেই জ্ঞানস্বরূপ জগৎগুরু সর্ব্বপ্রথমেই তোমার সাক্ষাৎ গুরুরূপে উদিত হইতেন। হে যোগী! তোমার চিত্তবৃত্তিনিরোধের অফুরন্ত পরিশ্রম যদি যথার্থই তাঁহাকে মানিয়া করা হইত, তাহা হইলে তুমি চক্ষুঃ মুদিত করিবার পূর্ব্বেই মাতৃচক্ষের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে তোমার সকল বৃত্তি স্বতঃ নিরুদ্ধ হইয়া যাইত। কোনও বিষয় লাভের জন্য যখন তোমরা ধাবিত হও, সে বিষয়ের অপ্রাপ্তি তোমাদের চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত করে, সে বিষয়ের অন্বেষণে তোমাদের সমস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি হয় ত নিয়োজিত হয়, সে বিষয় লাভের জন্য হয় ত তোমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে বিরত হও না, সে বিষয়ে তোমাদের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া হয় ত তোমাদিগকে প্রহরের পর প্রহর তাহার ধ্যানে বা অনুচিন্তনে নিযুক্ত রাখে; কিন্তু এ সকল ঘটিবার পূর্ব্বে সে বিষয়ের অস্তিত্ব ও পরিচয় তোমাদের মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বুদ্ধিতে বা তোমাদিগের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিতে বিষয়ের অস্তিত্ব বা পরিচয়বোধ কথঞ্চিৎ থাকে বলিয়াই তোমাদিগকে সেরূপ চেষ্টা যত্নে, অনুশীলনে ও বেদনে উজ্জীবিত করে। সে বিষয়ে আস্তিক্যবোধ যদি না থাকে, স্বল্পাধিক পরিচয় যদি তোমাদিগের জ্ঞানে উদ্ভাসিত না হয়, তাহা হইলে তোমাদিগের কায়িক, মানসিক বা আত্মিক চেষ্টাময় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে না। যে পরিমাণে তাহার পরিচয় তোমাদিগকে লুব্ধ করে, সেই পরিমাণে তোমরা ধাবিত হইয়া থাক। ভগবৎসাধন সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। যদি তিনি আছেন—এ কথা জানা থাকে এবং 'তিনি' বলিতে কি বুঝায়, ইহা যদি তোমাদের বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবেই তোমাদিগের সাধনা গতিযুক্ত হয়। অবশ্য এ পরিচয় কথঞ্চিৎ। বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবিত হইবার সময়ে সে বিষয়ের সমস্ত ধর্ম্মের পরিচয় না জানা থাকিলেও স্বল্পাধিক কথঞ্চিৎ পরিচয় যেমন আমাদিগকে চেষ্টাময় করে, মায়ের সম্বন্ধে তেমনই কথঞ্চিৎ স্বল্পাধিক পরিচয় বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে,—বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত কথা বলিতেছি—বুদ্ধিতে অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিতে বা নিশ্চয়ভাবে অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে জানা থাকিলে, তবে উহা আমাদিগকে তাঁহাকে লাভের জন্য চেষ্টাময় করিতে পারে। দেখ, তোমরা একটা সরল সত্যকে বড় উপেক্ষা করিয়া থাক। অচেতন বিষয় লাভের জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা, যত্ন ও কৌশল না করিলে তাহা লাভ করা যায় না। কেন না, উহা অচেতন, তাহার নিজের তোমার নিকট আসিবার কোন ক্ষমতা নাই। সচেতন জীবের জন্য তুমি লুব্ধ হইলে তাহাতেও তোমার চেষ্টা যত্ন ও কৌশল প্রয়োজন। কেন না, সচেতন সকলেই স্বার্থপর। স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষণে সকলেই সচেষ্ট। নিজের স্বার্থ বলিদান দিয়া, তোমার স্বার্থ পরিপূরণ করিতে কেহ তোমার মুখ চাহে না। কিন্তু মায়ের সম্বন্ধে এ অচেতনতা ও স্বার্থপরতার প্রতিবন্ধক না থাকায় তোমাদিগের চেষ্টা, যত্ন ও কৌশল

নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন বুঝিতে হইবে। কেন না, তিনি আত্মারও আত্মা। আত্মীয় বলিলেও তাঁহাকে দূরে রাখা হয়, যাঁহার সহিত সম্বন্ধের এইরূপ ঘনিষ্ঠতা ; এইরূপ বলি কেন, এতদপেক্ষা শত গুণ, সহস্রগুণ সম্বন্ধে যাঁহার সহিত আমরা আবদ্ধ, তাঁহাকে লাভ করিবার পক্ষে আমাদিগের চেষ্টা যত্ন কৌশল অর্থশূন্য ; ক্রন্দনের প্রথম উচ্ছ্বাস ফুটিবার পূর্ব্বেই তাঁহার স্নেহ ঝরিয়া পড়িবার কথা, বাহু প্রসারণের প্রথম আবেগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার বাহুতে আবদ্ধ হইবার কথা, তাঁহাকে দর্শনেচ্ছু চক্ষের প্রথম চাহনি তাঁহারই চক্ষে সংন্যস্ত হইবার কথা। যিনি আমাদিগকে আত্মদান করিয়াছেন বলিয়া আমরা আত্মময়, সেই আত্মার সম্বন্ধের সীমা বর্ণনায় আনা যায় না। আত্মদান কাহাকে বলে ?

আত্মদান অর্থে নিজের নিজস্ব দান করা। সেই আত্মদান অর্থাৎ সেই নিজের নিজত্ব যিনি আমাদগকে দান করিয়াছেন এবং সেই আত্মদানের ফলস্বরূপ আমাদের অস্তিত্ব উপলব্ধ হইতেছে, তাঁহাকে কি অন্বেষণ করিতে হয় ? অথচ আমরা তাঁহাকে লাভের জন্য কত চেষ্টা, যত্ন, বুদ্ধি ও ভালবাসার জাল পাতিতে সচেষ্ট হই এবং পাইলাম না বলিয়া কতই না ক্রন্দন করি। এই উভয় বিপরীত ভাব লক্ষ্য করিলেই সহজেই প্রতীয়মান হইবে, ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন অস্বাভাবিক অন্তরায় বিদ্যমান। আমি সেই অন্তরায় লক্ষ্য করিয়াই আজি আস্তিক্যবুদ্ধি ও তৎপরিচয়ের সম্বন্ধে বলিতেছি। আমরা সবই করি আকাশকুসুমবৎ ; গোল ঐখানে। মা কাকে বলে, আমরা স্থূলতঃ যদি এই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, আমাদিগের আস্তিক্যবোধকে জীবন্ত রাখিতাম, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, আমাদিগের প্রতি আহ্বান তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যুত্তর বহন করিতেছে।

অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তোমরা যখন মাকে আহ্বান কর, তখন তোমরা সত্যই লক্ষ্য রাখ না, কাহার অন্বেষণে তোমরা সচেষ্ট হইয়াছ। মুখে তাঁহার ধর্ম্মের পরিচায়ক নাম আদি ব্যবহার করিলেও তোমার বুদ্ধিতে সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত করিয়া সে নাম উচ্চারণ কর না। তোমার সহিত স্থূলতঃ তাঁহার যে কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা যুক্তিবিচারের সময় স্বীকার করিলেও যখন তোমরা তাঁহাকে আহ্বান কর, তখন সে কথা মনে রাখিতে পার না। তোমরা যখন ডাক অথবা ডাকিতেছ বলিয়া মনে কর, তোমাদিগের মনের সেই সময়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমার এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। যেন কোনও অনির্দ্দিষ্ট, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য স্বতন্ত্র একজনকে ডাকিতেছ, এইরূপ ভাবে আহ্বান পর্য্যবসিত হয়। মুখে তাঁহাকে আত্মা, মা, ঈশ্বর, প্রভু প্রভৃতি সম্বন্ধে সংযুক্ত করিয়া ডাকিলেও তোমাদের অন্তর সে সকল সম্বন্ধের একটি ভাবও গ্রহণ করে না। অন্তরের অবস্থা তখন এইরূপ থাকে—যেন কে কোথায় একজন তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কোথাকার কে একজন আছে, তাহাকেই ডাকিতেছ—ইহাই তোমাদের

সাধনার পথের প্রথম অন্তরায়। মুখে যাহা বলিবে, অন্তর সেই সম্বন্ধ যদি গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সেই আহ্বান বৃথা হয়। তোমরা হয় ত মুখে বলিতেছ—মা। কিন্তু তোমাদিগের অন্তর ঠিক যেন একজন অজ্ঞাত, অপরিচিত কাহারও সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে—এইরূপ ভাবই প্রকাশ করে। ভিক্ষুক আসিয়া গৃহস্থের দ্বারে নানাপ্রকার আত্মীয়তাসূচক শব্দ ব্যবহার করিলেও তাহার অন্তরে যেমন সে আত্মীয়তার কোন ভাব প্রকটিত হয় না, তাহার অন্তর শুধু বাঞ্ছিত ভিক্ষা লাভের দিকে চাহিয়া থাকে, তোমাদের মাতৃআবাহনও তদ্রূপ এবং ওই কারণেই সে আহ্বান ফলবান্ হয় না। এই জন্য তাঁহার সহিত প্রধান সম্বন্ধ-জ্ঞান কথঞ্চিৎ ভাবে হৃদয়ে প্রকটিত রাখিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হয়। তুমি ডাকিতে যাইতেছ, তুমি ভগবৎসাধনা করিতে অগ্রসর হইতেছ; কিন্তু জানিয়া ডাক, কাহাকে ডাকিতেছ—কাহার সাধনায় অগ্রসর হইয়াছ? তাঁহার সহিত তোমার প্রধান সম্বন্ধ কি? প্রধানতঃ তাঁহার সহিত জীবের কার্য্যকারণসম্বন্ধ—তিনি কারণ, জীব কার্য্য। তাঁহা হইতে তুমি জাত হইয়াছ, তাঁহাতে অবস্থান করিতেছ ও তাঁহাতেই লয় হইবে—ইহাই জীবের ভগবানের সহিত সর্ব্বপ্রধান সম্বন্ধ। এই বোধ হৃদয়ে ফুটাইয়া রাখিতে হইবে। তুমি যখন ডাকিবে, তখন সত্যভাবে বোধ করিতে হইবে, তুমি তাঁহাকেই ডাকিতেছ, যাঁহা হইতে যথার্থই তুমি সঞ্জাত হইয়াছ, যাঁহাতে তুমি অবস্থান করিতেছ এবং সত্য সত্যই যাঁহাতে তুমি লয় হইবে। সত্য সত্যই তুমি তাঁহাকে ডাকিতেছ। সাধনা বলিয়া তুমি কোনও ক্রিয়াবিশেষ করিতেছ না, সত্যই তুমি তাঁহাকে তোমার সমীপস্থ হইবার জন্য ডাকিতেছ—যিনি তোমায় গড়িয়াছেন, যাঁহাতে তুমি ভাঙ্গিয়া লীন হইয়া যাইবে এবং উপস্থিত যাঁহাতে তুমি অবস্থান করিতেছ। সত্যই তাঁহাকেই তুমি ডাকিতেছ, অন্য কোন অনির্দ্দিষ্ট, সম্বন্ধশূন্য কাহাকেও অন্বেষণ করিতেছ না। "তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"—তাঁহা হইতে জাত হইয়াছ, তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছ এবং তাঁহাতেই লয় হইবে, এইরূপ ধারণা সহকারে শান্ত ভাবে তাঁহাকে আবাহন করিতে হইবে।

সত্যই একজন আছেন, যাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ উক্তরূপ এবং সত্য সত্যই আমি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি—এই বোধে বোধময় হইয়া ডাকিতে হইবে। ইহারই নাম তদ্‌বুদ্ধি হইয়া ডাকা। ডাকিবার সময় এইরূপ বুদ্ধিসমন্বিত হইয়া ডাক না বলিয়াই তোমাদিগের আহ্বান বিফল হয়।

আর একটি অন্তরায়ের কথা বলি। আহ্বানের সময় তোমাদিগের চিত্তে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাবের পরিবর্ত্তে অন্য একটি বিপরীত ভাব কর্ত্তৃত্ব করে; সেটি আশা চরিতার্থতার ভাব। যত ক্ষণ না তাঁহার সহিত উক্ত সম্বন্ধ উদ্বোধিত হয় অর্থাৎ যথার্থই আমার জন্ম, লয় ও পরিপুষ্টির বা অবস্থানের কর্ত্তা রহিয়াছেন—এইরূপ জ্ঞানে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হও, তত দিন তোমার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার কোন অধিকার

নাই—ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। মায়ের নিকট চাহিতে দোষ নাই। কিন্তু পুত্রের মত চাহ, ভিখারীর মত চাহিও না। তোমরা ভিখারীর মত চাহ, তাই মুষ্টিভিক্ষার অধিক কিছু পাও না।

জীব পূর্ব্বোক্তরূপে তদ্‌বুদ্ধি হইলে তদাত্মভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তখন জীব বোঝে, তিনি আমাদের আত্মা। যাহা হইতে কোনও পদার্থবিশেষ উৎপন্ন হয়, যাহাতে অবস্থান করে এবং যাহাতে লয় হয়, তাহাই সেই পদার্থের আত্মা। বিষয়ের দৃষ্টান্তে আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার উপায় নাই—আত্মজ্ঞান ভিন্ন আত্মভাব কখনও বুঝান যায় না। যেমন বন্ধ্যাকে পুত্রস্নেহ বুঝান যায় না—যেমন বেশ্যাকে সতীধর্ম্ম বোঝান যায় না—যেমন ভিক্ষুককে রাজসম্পদ্ বোঝান যায় না, তদ্রূপ আত্মবোধ না হইলে আত্মভাব বুঝা অসম্ভব। তত্রাচ পদার্থের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। তোমার পরিধৃত বস্ত্রখানি যদি উহার আত্মা অন্বেষণ করে, তবে সে দেখিতে পাইবে, তুলাই উহার আত্মা অর্থাৎ সে বুঝিবে, আমি তুলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তুলাতে অবস্থান করিতেছি এবং তুলাতেই পর্য্যবসিত বা লীন হইব; তুলাই আমার জন্মস্থল, তুলাই আমার আশ্রয়, তুলাই আমার চরম বিশ্রামের বা লয়ের আবাস, তুলাই আমার সর্ব্বস্ব, তুলাই আমার প্রাণ, তুলাই আমার আত্মা—তুলা ভিন্ন আমার অন্য কিছু নাই—অন্য কেহ নাই। তরঙ্গ যদি জলের দিকে চক্ষু ফিরায়, তবে যেমন সে দেখে, আমি জলেই উৎপন্ন, জলেতেই অবস্থান করিতেছি এবং জলেই লয় হইব; জলই আমার প্রভু, জলই বিভু, জলই আমার সর্ব্বস্ব, প্রাণ, প্রিয়। জল ব্যতীত আমার অন্য কেহ কোথাও নাই। জীবও ঠিক তদ্রূপ যদি ভগবানের দিকে চক্ষু ফিরায়, তবে দেখে—তাঁহাতেই সে উৎপন্ন, তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে, তাঁহাতেই লীন হইবে—ভগবান্ ব্যতীত জীবের অন্য কেহ নাই—তিনিই জীবের আত্মা। এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করার নাম তদাত্মভাব। বস্ত্রের চৈতন্য থাকিলে বস্ত্র যেমন তুলাকে আত্মা বলিয়া বুঝিত, তরঙ্গ চেতনাময় হইলে, সে যেমন জলকে আত্মা বলিয়া বুঝিত, তেমনই ভাবে জীব যদি ভগবান্‌কে ধারণা করিতে পারে, তবেই ঠিক তদাত্মভাব হওয়া হয়। এইরূপ জ্ঞান ও এইরূপ ভাব লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইতে হয়। নতুবা তন্নিষ্ঠ হওয়া যায় না। নিষ্ঠা অর্থে নিঃশেষরূপে স্থিতি। আমার আমিত্বের সার সম্পদ্ চেতনা, সুতরাং চিন্ময়তাই আমার আত্মার স্বরূপ। নিজের চিন্ময়তা অবলম্বন করিয়া প্রাণ যদি এমন করিয়া মাকে আপনার বলিয়া না জানে, তবে তাঁহাতে নিষ্ঠা কেমন করিয়া হইবে? কেমন করিয়া সমস্ত প্রাণটুকু তাঁহার দিকে লক্ষ্য ফিরাইবে? এমনই আপনার বুঝি না বলিয়াই আমরা মায়ের দিকে প্রাণ ফিরাইতে পারি না। মা—কে, কেমন, তাহা জানি না; কিরূপ—কোথায়, তাহাও জানি না; কিন্তু জানি, আমি তাঁহাকেই ডাকিতেছি, যিনি আমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যিনি আমাকে পোষণ করিতেছেন, যাঁহাতে আমি অবস্থান করিতেছি, যাঁহাতে আমি

লয় হইব। যিনি আমার প্রাণ, যিনি আমার আত্মা, যিনি ভিন্ন আমার অন্য কেহ নাই, অন্য কিছু নাই, তাঁহার নাম যাহাই হউক, রূপ যাহাই হউক, ধর্ম্ম যাহাই হউক, তিনি মাতা হউন, পিতা হউন, ঈশ্বর হউন বা নির্গুণ ব্রহ্ম হউন, আমি তাহা জানি না ও জানিতে চাহি না। ভগবান্ বলিয়া, মা বলিয়া তাঁহাকেই ডাকিতেছি—বস্ত্রের পক্ষে তুলার মত বা তরঙ্গের পক্ষে জলের মত যিনি আমার আত্মা। ইহাই আস্তিক্যবুদ্ধি ও আত্মভাব।

দেখ, শব্দের অর্থবোধ হৃদয়ঙ্গম না করিলে, সে শব্দ উচ্চারণ করা বা না করা উভয়ই সমান। জীব শব্দের নিরুক্তগত অর্থ যাহা হউক, আমি একটি ভাবগত অর্থ বলিতেছি। তোমরা এটি মনে রাখিতে পারিবে কি? জীব শব্দে 'জ,' 'ঈ' ও 'ব' এই তিনটি অক্ষর আছে। 'জ' অর্থে যাহা জাত হইয়াছে বা যাহা যাইতেছে, 'ঈ' অর্থে শক্তি, 'ব' অর্থে ব্রহ্ম। ব্রহ্মশক্তি হইতে যাহা জাত হইয়াছে, তাহাই জীব বা ব্রহ্মশক্তি যে আকারে গতিযুক্ত হইয়াছে, তাহাই জীব। ইহাই বিলোমক্রমে ধরিলে ব্রহ্ম বা বীজ পাই। অর্থাৎ 'ব' 'ঈ' 'জ'—যাহা হইতে শক্তি ধাবিত হয় বা জীব সঞ্জাত হয়, তাহাই বীজ বা ব্রহ্ম। এই মধ্যস্থ শক্তি বা 'ঈ,' ইহা ঠিক থাকে। ঐ শক্তিকে আমার বলিয়া বুঝিলে অর্থাৎ 'জ'এ যুক্ত করিয়া রাখার নামই জীবত্ব, আর 'ব'এ যুক্ত করিয়া দিলেই অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি বলিয়া বুঝিলেই বীজত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। জীব ও বীজের এই অনুলোম ও বিলোম অক্ষরাত্মক অর্থদ্বয় হৃদয়ে ধারণা করিতে চেষ্টা করিও। 'ঈ' 'জ'এ দিও না, 'ব'এ দাও; 'জ'কে মূলে বসাইও না, 'ব'কে বসাও, তোমার সাধনা পূর্ণ হইবে।

শুধু উল্টাইয়া লও—সাধক! শুধু উল্টাইয়া লও। নতুবা নিষ্ঠা হইবে না, নিষ্ঠা না হইলে গতিও তন্মুখী হইবে না। তন্মুখী গতির নামই তৎপরায়ণতা—গতির পরম অয়নকে পরায়ণ বলে। বিশেষভাবে কোনও নির্দ্দিষ্ট দিকে অয়ন বা গতি হইলে, তাহাকে তৎপরায়ণ বলে। তোমরা দিক্ ঠিক করিয়া লও না; তোমাদের সাধনার গতি কি প্রকারে হইবে? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমরা যখন সাধনা কর, তখন মুখে তাঁহাকে আত্মা বা প্রাণ বলিলেও যেন কোন এক নির্দ্দেশশূন্য ব্যক্তিকে খুঁজিতেছ—এইরূপ তোমাদের অন্তরের অবস্থা থাকে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি এই বিশ্বের সর্ব্বত্র যেখানে ইচ্ছা, তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করিতে পার, যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অন্তরে বা বাহিরে, চন্দ্রে সূর্য্যে গ্রহে, জলে স্থলে, অগ্নিতে বায়ুতে আকাশে, বৃক্ষে লতায়, ধূলায় পর্ব্বতে, যেখানে হউক, জীবত্ব বীজত্বের এই সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া আহ্বান কর, দেখিবে —তোমার সাধনা 'পরায়ণতা' লাভ করিয়াছে বা গতিযুক্ত হইয়াছে।

তাঁহাতে গেলে আর ফিরিতে হয় না, তাঁহাকে দর্শন করিলে আর স্বতন্ত্র সত্তা কিছু দেখা যায় না—এই জন্য মুক্তির অপর নাম 'অপুনরাবৃত্তি'। তরঙ্গ যদি জলকে দেখে, তবে যেমন সে বোঝে, জলই আমার বীজ; আমার প্রকাশ, আমার নর্ত্তন, আমার

অস্তিত্ব, এ সকল আমার নহে—জলেরই ; জলই প্রকাশ পাইতেছে, জলই নর্ত্তন করিতেছে, জলই রহিয়াছে। ভগবান্ অর্থাৎ বীজকে দেখিলে জীবও তদ্রূপ আপনাকে হারাইয়া ফেলে। অর্থাৎ দেখে—আমাদের এই প্রকাশ, এই নর্ত্তন, ইহা তাঁহারই প্রকাশ, তাঁহারই নর্ত্তনমাত্র। দীর্ঘ 'ঈ'কার তাঁহারই। সে আর আপনাকে খুঁজিয়া পায় না, মা ভিন্ন কোথায় কিছু আর দেখে না, তাহার চেতনার কোনও অংশে আর নিজ অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না, জীবভাবে সে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না, ইহারই নাম 'অপুনরাবৃত্তি'।

কিন্তু আবার বলি—কাহার এরূপ হইবে ? যাহার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ; উক্ত জ্ঞান হৃদয়ে ধারণা করিয়া যাহার পাপ বিধৌত হইয়াছে, সেই পারিবে, অন্যে নহে। অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ভগবান্ যত ক্ষণ থাকিবেন, তত ক্ষণ পাইবে না।

তাই বলি, 'জান' তাঁহাকে, যাঁহাকে ডাকিতেছ ; জানিয়া ডাক—নির্দ্দেশ করিয়া ডাক। যদি এত জানা হৃদয়ে ধারণ করিতে না পার, ইহা সামান্য হইলেও যদি ইহা ভারী বলিয়া তোমাদের বোধ হয়, তবে 'আছে' মাত্র এইটুকু জানিয়া ডাক—অন্ততঃ তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে করিতে ডাক ; তাহা হইলেও তোমাদের আশা পরিপূর্ণ হইবে। কেন না, আমি যে জানাটুকুর কথা বলিলাম, ইহা মাত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। নিজ অস্তিত্ব অবলম্বনে তাঁহার অস্তিত্ব স্থির করা। কে আছে—কাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে বলিতেছি ? আছে বলিতে গেলেই 'কে' এ কথা স্বতঃ মনে উদিত হয়। তাহার উত্তরে যখন তোমরা বলিবে, ঈশ্বর, ভগবান্ বা মা, যাহা কিছু তখন জানিবে, তিনি কে—এই বিরাট্ পুরুষ, যিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছেন—এ বিশ্ব যাঁহার স্থূল অঙ্গ, এই বিশ্ব যাঁহা হইতে জাত হইয়াছে—যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে ও যাঁহাতে লয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ বিশ্বের বীজস্বরূপ চেতনঘন এবং আমার অন্তরে চেতনা—ইহাই তদ্‌বুদ্ধি। আর তুমি এই বিরাট্ বিশ্বরূপের একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ মাত্র। জীবের শরীরের বিভিন্ন বিভিন্ন অংশের উপর যেমন তাহার একই আত্মার আধিপত্য, তোমার শরীরের বিভিন্ন বিভিন্ন অঙ্গের যেমন বিভিন্ন বিভিন্ন আত্মা নয়—একই আত্মা তোমারই বলিয়া তুমি যেমন জান, ঠিক তেমনই একই আত্মা, তুমি আমি ও বিশ্বাদি এই মহাদেহের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন ; সুতরাং বিশ্বাত্মাই আমার আত্মা—আমার নিজনামীয় বোধের দ্বারা যাঁহার অস্তিত্ব জানিতেছি। ইহাই তদাত্মভাবের অন্যতম পরিণতি। তোমরা তদবুদ্ধি, তদাত্ম, তন্নিষ্ঠ ভাবসকল ভুলিও না। কেন না, এ ভাব হইতে বিচ্যুত হইলে কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে পারে না।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি, শুনি চ, শ্বপাকে চ এব পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ভবন্তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—জ্ঞানী পুরুষ, বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে অথবা চণ্ডালে, গো, হস্তী, কুক্কুরাদি জীবে অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শন করিয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—জ্ঞান লাভের লক্ষণ সমদর্শন। আত্মৈকদর্শনই সমদর্শনের চূড়ান্ত পরিণতি। একই আত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত, এইরূপ বোধযুক্ত হওয়াই সমদর্শন। এই শ্লোকে মা যদিও 'গবি হস্তিনি' প্রভৃতি শব্দে মনুষ্যেতর পশু-জগৎকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তথাপি পূর্ব্বে বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং শেষে শ্বপাক বা চণ্ডালের উল্লেখ থাকায় মধ্যস্থ গরু, হস্তী প্রভৃতি পশুবাচক শব্দ, মনুষ্যশ্রেণী-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাও ধারণা করা যাইতে পারে। উহাই বরং অধিক সঙ্গত, নতুবা ব্রাহ্মণ শব্দের পর শ্বপাক শব্দ উল্লিখিত হইত। ছন্দের অনুরোধে প্রথমে ও শেষে মনুষ্যের উল্লেখ ও মধ্যে পশুসকলের উল্লেখ, এরূপ বলা যায় না। জ্ঞানহীন অথচ নিরীহ মনুষ্যসকল গো শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। স্থূল দেহাত্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন মনুষ্যশ্রেণী, স্থূলদেহপ্রধান হস্তী শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। বিষয়-পদলেহী, বিষয় চিন্তায় সর্ব্বদা নিদ্রাহীন, বিষয়প্রসাদভোগী, বিষয়ের সর্ব্বগ অনুচর মনুষ্যবৃন্দকে কুকুর বলিলে হানি হয় না। ক্রোধাদি দুরন্ত রিপুর বশবর্ত্তী পুরুষ চণ্ডাল। এই সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যশ্রেণী পণ্ডিতের চক্ষে কোন বৈষম্য সৃজন করে না। অথবা মনুষ্য, পশু প্রভৃতি সর্ব্ববিধ জীবের মধ্যে ওই এক আত্মাকেই দর্শন করে। কেন না, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান লাভে তাহাদিগের আত্মা সর্ব্বত্র একই আত্মার বিভিন্ন বিকাশ পরিদর্শন করে।

আজ জগতে যে উদ্ভট সাম্যবাদ অসুরের মত আধিপত্য করিতেছে, তাহা এ সমদর্শন হইতে একান্ত বিভিন্ন এবং একান্ত বিপরীত। উহারা বিকাশের বিভিন্নতা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহে। আত্মার বিভিন্নতাজ্ঞান ঘুচাইতে না চাহিয়া, বরং আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ফেলে। পণ্ডিতের সমদর্শন—আত্মার বিভিন্নতা ঘুচাইয়া, একই আত্মার অঙ্গে বিভিন্ন বিভিন্ন শৃঙ্খলময় বিকাশ পরিদর্শন করিয়া, সে বিকাশের মধ্যে সমতা সন্দর্শন করে। আর ইহারা বাহ্য বিকাশ-সকলকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাল পাকাইতে চাহে। স্বতন্ত্র আত্মবোধের গণ্ডি আরও সুদৃঢ় করে; প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্ত্তৃত্ববোধকে ঘন করিয়া আরও জড়তা ও তামসিকতা লাভ করে। যতক্ষণ সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় না হয় অর্থাৎ যত ক্ষণ অন্তরে আত্মবোধ ফুটিয়া আত্মৈকদর্শনে জীব সিদ্ধ না হয়, তত ক্ষণ বাহ্য গুণ বা ধর্ম্মবিকাশসকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া, জীবকে বৈষয়িক তামসিকতায় অত্যধিক মাত্রায় নিমগ্ন হইতে দেয় না, প্রত্যেকের গুণকর্ম্মের বিশিষ্টতা তাহাদিগের জন্য স্ব স্ব একটি সীমাময় কক্ষ রচনা করিয়া রাখে, বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্মময় জীব-সম্প্রদায় সেই সীমা অতিক্রম করিয়া সহজে যায় না; তাহারই ভিতর শৃঙ্খলা গঠিত করিয়া, তাহাতেই আবর্ত্তন করিতে থাকে। আত্মবোধ বিকশিত হইবার পূর্ব্বে এই গুণকর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে প্রয়াস পাইলে, প্রতি জীব উচ্ছৃঙ্খল ভাবে

স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে থাকে এবং সেই জন্য আধুনিক এই আসুরিক সাম্যবাদ জগতে সাম্যের নামে অবিরাম উৎকট বৈষম্যের সৃজন করিতেছে।

তাহার ফলে আজ জগৎ শূদ্রপ্রধান হইতে চলিয়াছে। এত দিন জগৎ বৈশ্যপ্রধান ছিল, এখনও কতক অংশে আছে; ইহার পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়প্রধান ছিল এবং তাহারও পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপ্রধান ছিল। পাশ্চাত্ত্যদেশে যে বিপ্লব চলিয়াছে, ইহা শূদ্রাধিপত্যের অধিকার বিস্তারের সূচনা মাত্র। শ্রমজীবীদিগের নাম লইয়া এই শূদ্রাধিকার বিস্তার লাভ করিতেছে। বৈষম্যময় এই আসুরিক সাম্যবাদের ইহাই পরিণতি।

কিন্তু সে কথা যাক। আমি প্রকৃত সমদর্শনের কথা বলিতেছি। আত্মদর্শনই যথার্থ সমদর্শন। গুণানুসারে কর্ম্ম ও ব্যবহারের প্রবর্ত্তিত শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া, সকলে যথেচ্ছাচারী হওয়া সমদর্শনের লক্ষ্য নহে। সর্ব্বরূপে মা-ই বিরাজ করিতেছেন—এ জগৎ আত্মারই লীলাময়ী মূর্ত্তি, এই ভাবে হৃদয় অনুপ্রাণিত হইলে তবে সমদর্শন হয়। সমদর্শনের ফল সমবেদন বা সহানুভূতি। পাশ্চাত্ত্য পুরুষদিগের মধ্যে এক প্রকার উদ্ভট সহানুভূতি দেখা যায়। পালিত অশ্বাদি বিকলাঙ্গ বা অকর্ম্মণ্য হইলে অথবা দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হইলে পুরুষবৃন্দের সেই সহানুভূতি জাগে এবং তাহারা সেই বিকল পশুটিকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়া, তাহার পরবর্ত্তী জীবন লাভের পথে তাহাকে সত্বর প্রেরণ করে। উদ্ভট সমবেদনার উদ্ভট ফল। যথার্থ সমদর্শন হইতে যথার্থ সমবেদন উদ্বোধিত হয়। আত্মস্তরে ভিন্ন অন্য কোন গুণপ্রধান স্তরে সর্ব্বতোভাবে সমতা সম্ভব নহে, গুণের বৈষম্য পরিলক্ষিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য ব্রহ্মদর্শন বা আত্মদর্শনই যথার্থ সমদর্শন।

তোমরা একবার সেই মাকে দেখিবে? যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবকে আপনার প্রাণের ধন, আপনার আত্মার বিকাশ, আপনার অন্তরের প্রিয়তম বলিয়া দেখিতেছেন। যাঁহার চক্ষে বৈষম্য নাই, দোষ নাই, ছোট বড় নাই; শুধু প্রিয়—শুধু আত্মা—শুধু প্রাণ বলিয়া যিনি সকলকে দেখিতেছেন, একবার সেই দর্শনময়ীকে দর্শন করিবে? যাঁহার চক্ষে শুধু অমৃত ঝরে—ভাবান্তরের চাঞ্চল্য নাই বলিয়া যাঁহার চক্ষু পলকহীন, যাঁহার সেই পলকহীন চক্ষুর এ আত্মবোধময় সমদর্শন উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, অলব্ধবেদ, অজ্ঞ, বেদান্ত অনুশীলনকারীরা যাঁহাকে নির্গুণ বলিয়াছে—যাঁহার হৃদয় না বুঝিয়া, যাঁহার দর্শন বা ঈক্ষণকে দৃষ্টিশূন্য ঈক্ষণ মাত্র বলিয়াছে—যথার্থ লব্ধবেদন বেদান্তবিৎ হইলে যাঁহার অপলক চক্ষে অবিচঞ্চল প্রীতি ঝরিতে দেখা যায়—সেই আত্মার আত্মা মাকে একবার দেখিবে? দেখিয়া তোমাদের দৃষ্টি সাম্যময় করিবে? তবে সমদর্শী হও।

‘স’ সৃষ্টিবাচক, ‘ম’ লয়বাচক; সৃষ্টি ও লয় যাহাতে একত্র গ্রথিত, তাহাই

সম। সৃষ্টি ও লয়, উভয় বিপরীত ভাবই যে এক মহাভাবে বিলীন হইয়া থাকে, তাহাই সম। জীবনে মরণে, দোষে গুণে, আলোকে আঁধারে, জ্ঞানে অজ্ঞানে, অনিত্যে নিত্যে, সর্ব্বপ্রকার 'বিপরীতদ্বয়ে' যাহা মাত্র অভিব্যক্ত হয়; যে আত্ম-ধর্ম্ম, যে আত্মবেদন সর্ব্ব 'বিপরীতদ্বয়' সংঘর্ষের ও মিলনের মূল কারণ, তাহারই নাম সম। রামকে রাম হইতে দিয়া, শ্যামকে শ্যাম হইতে দিয়া, জলকে অগ্নি হইতে না দিয়া ও অগ্নিকে জল হইতে না দিয়া অর্থাৎ সর্ব্বগুণের স্বাধিকার অনুসারে বিকাশ হইতে দিয়া যিনি বাহ্যতঃ এত বৈষম্যময় সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে আপনারই অঙ্কে লীন করিবার যিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনিই সম। পাপীকে পাপী হইতে দিয়াছেন—আত্মবেদনের উদ্দীপনায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য ক্রোড় পাতিয়া বসিয়া আছেন, সেই আত্মধর্ম্মেরই খাতিরে। জীবনে ও মরণে একই আত্মবেদনের সুখক্রীড়া; তাই তিনি সম। এই সাম্যময় মাকে স্বীকার কর, দেখিতে পাইবে—জগৎরচনায় অজ্ঞানতার বৈষম্য নাই।

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯

যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতং, ইহ এব তৈঃ স্বর্গঃ জিতঃ। হি যতঃ ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ; তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—যাহারা এই সাম্যে মনোনিবেশ করে, তাহারা এই লোকেই স্বর্গাধিকারী হয়। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম; সেই জন্য সমদর্শীরা ব্রহ্মেই অবস্থান করে।

যৌগিক অর্থ।—সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ বৈষম্যদোষ রচিত করিয়াও তিনি সমরূপে বিরাজ করেন—এই জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করিয়া জগতে বিচরণ করিতে পারিলে, মনকে এই সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে পারিলে ব্রহ্মে অবস্থান করা হয়। এই মৃত্যুবৈষম্যময়—দোষগুণসমন্বিত এই বিচঞ্চল জীবক্ষেত্রে স্বর্গের অমৃত ভোগ করা যায়—যদি এই সাম্যসম্বেদনে মন সম্বেদিত হয়। মা নির্দ্দোষ। যে কর্ম্মচাঞ্চল্য আমাদের বন্ধনের কারণ, সেই কর্ম্মচাঞ্চল্য রচনা করিয়াও তিনি নিজের সমতা হইতে বিচ্যুত হন না,—সেই জন্য তিনি নির্দ্দোষ। পুত্রের দোষ গুণ মাতৃস্নেহকে সহসা বিচলিত করে না—ইহা আমরা জগতে দেখিতে পাই। জগৎমাতার তুলনায় নারীরূপিণী মাতার স্নেহ নগণ্য হইলেও সেখানে যখন এ সমবেদনা আমরা দেখিতে পাই, তবে যিনি জগন্মাতা, যাঁহার হৃদয় মাত্র মাতৃত্বে পরিপূর্ণ, তাঁহার হৃদয়ে সমবেদনা যে সম্যক্ অবিচঞ্চলভাবে বর্ত্তমান থাকে, ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া লইতে পারি। জগতের মা যদি পুত্রের শত অপরাধ অবিচল হৃদয়ে উপেক্ষা করিয়াও সন্তানের প্রতি তাঁহার অবিচল স্নেহ রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তবে এ বিরাট্ বিশ্বজগতের দোষগুণ-চাঞ্চল্য-দূষিত জগদ্ব্যবহারে পরমাত্মরূপিণী মায়ের হৃদয় যে স্থির অবিচঞ্চল থাকে—ইহা বিচিত্র

কি ? যাহা হৃদয়, যাহা প্রাণ, তাহা দোষ গুণে অস্থির হয় না। প্রাণ সমতাময়, নিত্য সমভাবে অবস্থান করাই প্রাণের ধর্ম্ম। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণ লইয়া জগতে বিহার করি, সেই জন্য জগদ্ব্যবহার আমাদের প্রাণকে সুখে দুঃখে বিচলিত করে, সেই জন্য আমাদের বেদন সদা চঞ্চল। সেই জন্য প্রিয়ে অপ্রিয়ে আমরা সমবেদনা রক্ষা করিতে পারি না। যিনি মহাপ্রাণস্বরূপ হইয়াও অপ্রাণ, সমবেদন রক্ষা করা তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি। কেন না, তিনি প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছু লইয়া থাকেন না, প্রাণ তাঁহার সপ্রকাশ। সন্তানের সন্তানত্বটুকু মাকে যেমন পুত্রের প্রতি নিত্য সম্বেদিত রাখে, ঐরূপ সম্বেদনের অনন্ত উচ্ছ্বাসে তিনি প্রপূরিত, অথচ অপ্রাণ। সুতরাং তিনি প্রাণে ও অপ্রাণে সর্ব্বতোভাবে সম। সেই জন্য এই সম্বেদনের ধর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করিলে জীবের সমবেদনময়ী মায়েতেই অবস্থান করা হয়। নিজের মধ্যে নিজের যে অসঙ্গ স্বরূপ রহিয়াছে, তাহাতে দৃষ্টি ফিরাইলে এই সমত্ব দেখা যায়।

মায়ের হৃদয় চিনিলে ? যিনি হৃদয়স্বরূপ, প্রাণই যাঁহার মূর্ত্তি, আত্মত্বই যাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহাকে যদি চিনিতে চাহ, তবে জগতে প্রিয় প্রিয়ের প্রতি যে ভাবে সমবেদনময় হইয়া থাকে, তাহা পর্য্যালোচনা কর। জগতের মায়ের প্রাণ লইয়া তাঁহাকে বিচার কর, তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা কর, জগতে জীবের সহিত সেইরূপ প্রাণ লইয়া ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হও এবং নিজের ভিতর নিজের সমত্বরূপ অপরিণামী সত্তা দর্শন কর। তবেই পরমাত্মার মহাপ্রাণের সাম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

ব্রহ্মণি স্থিতঃ, স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংমূঢ়ঃ ব্রহ্মবিৎ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ।

ব্যবহারিক অর্থ।—স্থিরবুদ্ধি, অসংমূঢ় ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মেই অবস্থান করেন, সেই জন্য তিনি প্রিয় পাইয়া আনন্দিত হন না বা অপ্রিয়লাভেও দুঃখিত হন না।

যৌগিক অর্থ।—মূঢ় ব্রহ্মবিদ্ হইলে চলিবে না, শাস্ত্রানুশীলন করিয়া বা তীক্ষ্ণ মেধার সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্বের ঈষৎ আভাস জ্ঞানে প্রকটিত করিয়াই ব্রহ্মবিদ্ হইলে চলিবে না ; হৃদয় ব্রহ্মবেদনময় হওয়া চাই, বুদ্ধি ব্রহ্মে স্থির হইয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই, জীবভাবীয় মূঢ়তা বিসর্জ্জন দিয়া, পরমাত্মায় বিমুগ্ধ হওয়া চাই, নতুবা ব্রহ্মবিদ্ শুধু কথার কথা। হৃদয় ব্রহ্মভাবে বিমুগ্ধ হইলে প্রিয় বা অপ্রিয় তাহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। প্রিয়লাভে আনন্দিত, অপ্রিয়লাভে বিষণ্ণ—ইহা ব্রহ্মবিদের লক্ষণ নহে। ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া তাহাকেই বুঝিবে, যাহাতে এই আনন্দ ও বিষাদের উত্তাল লহর দেখিতে পাওয়া যায় না। যে মাকে দেখিয়াছে, যে মাকে ভাবিতে শিখিয়াছে, জগতের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র দুঃখে তাহার হৃদয় বিচলিত হয় না। যে ভূমা সুখময় মায়ের অস্তিত্ব স্থিরবুদ্ধিতে গ্রহণ

করিয়াছে, মহাসুখের মহাকল্পনায় যাহার প্রাণ বিভোর, সে কি ভিখারীর মত ক্ষুদ্র সুখের লালসায় মুগ্ধ হইয়া থাকে ? মৃত্যুকেও যে অমৃতময় বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছে, সে কি ক্ষুদ্র দুঃখের ক্ষুদ্র অভিঘাতে বিক্ষুব্ধ হয় ? সুখে বা দুঃখে সে দেখে শুধু—মা, শোকে সঙ্কটে অথবা সুখে সম্পদে সে দেখে শুধু—মা। দেখে শুধু আপন অন্তরে আপনার অপরিণামী রূপ। তাহার জগতের সুখ দুঃখ তুচ্ছ হইয়া যায়, জগতের ঘাত প্রতিঘাত তাহার পর্ব্বতবৎ স্থির বুদ্ধিকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। সে টলে না—সে পড়ে না—সে বিকম্পিত হয় না। শুধু মাতৃত্বের মহাস্নেহের মহাঝঙ্কারে তাহার হৃদয় পরিপূরিত থাকে। গরলে ও অমৃতে সে শুধু অমৃতেরই আস্বাদ পায়, সে ভাবে শুধু—মা, সে দেখে শুধু—মা, সে ভোগ করে শুধু—মা। সে হাসে না, সে কাঁদে না—সে নীরব স্থির আনন্দে স্থির ভূমিতে বিচরণ করে। জগতের ঝটিকা তাহাকে বিক্ষুব্ধ করে না, জগতের আনন্দ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় না। মায়ের অঙ্ক হইতে জগতের কোন তরঙ্গ তাহাকে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় না। শুধু তাই নহে।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে॥ ২১

বাহ্যস্পর্শেষু যৎ সুখং, অসক্তাত্মা পুরুষঃ আত্মনি তৎ সুখং বিন্দতি। স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—বাহ্য পদার্থে যা সুখ, অসক্তাত্মা পুরুষ আপনাতেই তাহা লাভ করেন। সেই ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা পুরুষ অক্ষয় সুখের অধিকারী হন।

যৌগিক অর্থ।—সুখ কোথায় ? ওই যে সুন্দর কুসুমটি তোমার চক্ষের সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইয়া, সৌন্দর্য্যে ও গন্ধে তোমায় মুগ্ধ করিতেছে ; তুমি ভাবিতেছ, আহা কি সুন্দর ফুল, কি সুন্দর গন্ধ—কিন্তু জান কি, তুমি যে সৌন্দর্য্য ও গন্ধে আত্মহারা হইতেছ, উহা কুসুমের নহে ? তোমার যিনি আত্মা, তোমার যিনি প্রাণ, উহা তাঁহারই সৌন্দর্য্য—উহা তাঁহারই রূপ। তুমি একটি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিলে যে আস্বাদন লাভ কর, ভাব—উহা ওই ফলেরই আস্বাদন। কিন্তু জান কি—উহা ফলের নহে, তোমার যিনি আত্মা, তোমার যিনি প্রাণ, উহা তাঁহারই সুস্বাদ ? বাহ্য বিষয়সকল যাহা বহিয়া আনে, তোমরা উহা বাহ্য বিষয়েরই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু জান না যে, বাহ্য বিষয় স্পন্দন ব্যতীত রূপ, স্বাদ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, কিছু বহন করিয়া তোমার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয় না। ঐ যে কণ্টকটি তোমার পদে বিদ্ধ হইল এবং তুমি বেদনা পাইলে, ওই বেদনা কাহার ধর্ম্ম ? কণ্টকের, না তোমার ? কণ্টকে কি বেদনা বলিয়া কোন উপাদান ছিল, যাহা তোমার চরণের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া গেল ? না, ও বেদনা তোমাতেই সুপ্ত ছিল, অব্যক্ত ছিল, কণ্টকটি ফুটিয়া তাহা উদ্দীপ্ত করিয়া দিল মাত্র। ঠিক তেমনই ফলের সুস্বাদটি বা ফুলের সুগন্ধটুকু বা আলোকের রূপ বা

ভ্রমরের ঝঙ্কার বলিয়া তুমি যে আস্বাদ, গন্ধ, রূপ, শব্দ, স্পর্শ ভোগ কর, উহা তোমরাই অভ্যন্তরস্থ ধর্ম্মের উদ্দীপনা মাত্র। গোলাপের গন্ধ তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে এমন স্পন্দন তুলিয়া দেয় যে, তোমারই আত্মার গোলাপগন্ধে তুমি পূর্ণ হইয়া যাও। ভক্ষ্য পেয় তোমরা জিহ্বার উপর এমন স্পন্দনের ঝঙ্কার দেয় যে, তোমার আত্মার স্বাদ তোমাতে অভিব্যক্ত হয়। ইহা একান্ত সত্য। শব্দ স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ বা সুখ দুঃখ, এ সব বাহিরের বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষ নহে, ইহা তোমার আত্মারই, তোমার প্রাণেরই ধর্ম্ম। সমবেদনায় উহা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। ইহাই তন্মাত্রাবিজ্ঞান। তবে তুমি ফুলের গন্ধের জন্য ফুলের দ্বারে ভিখারীর মত যাইবে কেন? মিষ্টতার জন্য ফলের অভ্যর্থনা করিবে কেন? সৌন্দর্য্যের জন্য রমণীর মুখে বা চন্দ্রের অঙ্গে তাহার প্রত্যাশী হইবে কেন? উহারা আসিয়া তোমারই আত্মার রূপ তোমায় দেখাইয়া যে তোমায় পদানত করে—এই মহাসত্য উপেক্ষা করিয়া থাক বলিয়াই তোমরা আপনার ধনে আপনি কাঙ্গালী, পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়া থাক। যদি বাচনিক না হইয়া, সত্য সত্যই এই তত্ত্ব জানিতে, তবে তুমি ইচ্ছামাত্রে ব্যক্তি বা বস্তুর সাহায্য না লইয়াও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ভোগ করিতে পারিতে। যদি জানিতে, তোমার যিনি আত্মারূপে অবস্থিত, তোমার অন্তরে তুমি যেখানে "সম"রূপে অবস্থিত, সেইখানকার সমবেদনাই তন্মাত্রাবিজ্ঞান। এ সব তাঁরই—তোমারই হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রাণদেবতারই —এ সকল ধর্ম্ম; তোমার বাহ্য জগদভিমান-জড়িত দেহাত্মবোধকে সমবেদনা দিতে তিনিই উহা প্রকাশ করেন—তবে কি আর তুমি এমন সর্ব্বগুণের আধার ছাড়িয়া, যাদুকরদিগের পাছু পাছু ছুটিতে? তাই মা বলিতেছেন, সুখ বলিয়া যাহা তোমরা ভোগ কর, মাতৃপ্রাণ জীব আপনাতেই স্বচ্ছন্দে তাহা ভোগ করে। শুধু সত্য সত্য যদি তোমার জানা থাকিত যে, তোমারই আত্মরূপিণী মায়ের উহা অঙ্গবিভূতি মাত্র।

মাতৃময়প্রাণ না হইলেও স্বচ্ছন্দে জীব ইহা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। শুধু স্থিরভাবে জানিলেই অনায়াসে ইহা ভোগ করা যায়। অনেক সাধারণ সাধুনামীয় পুরুষকে নানাপ্রকারের গন্ধাদি আপনা হইতে বাহির করিতে যে প্রায়ই তোমরা দেখিতে বা শুনিতে পাও, ইহা তাহাই। অজ্ঞ সাধুরা মন্ত্রবিশেষ জপাবলম্বনে কার্য্যতঃ আত্মাভিমুখে ঐরূপ সঙ্কল্পানুসারে চিত্ত পরিচালনা করে; ক্ষিতিতত্ত্বের বীজাদি সাহায্যে গন্ধ, রসতত্ত্বের বীজাদি সাহায্যে জল, দুগ্ধ ইত্যাদি স্বচ্ছন্দে বাহির করে। আর যাহারা বিজ্ঞ, তাহারা কোন জপাদি অবলম্বন না করিয়াও মাত্র তন্মাত্রাচিন্তনে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরে বিভূতিযোগে বিস্তারিত করিয়া প্রণালী বলিব।

যাক্। মা বলিতেছেন, শুধু শব্দ স্পর্শ, রূপ রসাদিজনিত সুখমাত্র এ প্রকারে লভ্য নহে। প্রকৃত সুখ—নিজের অসক্ত বা অসঙ্গ রূপে। উহাই সু-খ অন্তরাকাশ বা সুলভ আকাশ, দুঃখ অর্থে দুর্লভ অন্তরাকাশ। যদি কেহ মায়ে মুগ্ধ হয়, মাকে

যদি কেহ ভালবাসে—সত্য সত্য ভালবাসে—প্রাণময়ী আত্মাকে যদি সত্য সত্য কেহ প্রাণ দেয়—আত্মনিবেদন করে, তবে সে ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা পুরুষ অক্ষয় সুখভোগ করিতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যগাত্মায় মাত্র মনোনিবেশ করিলে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর পরমাত্মায় যুক্ত হইলে তাহার সুখের আর ক্ষয় ব্যয় থাকে না। ভগবান্ প্রথমে প্রত্যগাত্ম-দর্শনের কথা বলিয়াছেন। কেমন করিয়া পুরুষ আপনার মধ্যে আপনার অকর্ত্তা বা অপরিণামী সত্তা দেখিতে সক্ষম হইবে, তাহা বলিয়াছেন। তার পর সেই অসক্ত আত্মার প্রভুত্ব ও বিভুত্বের কথা বলিয়া, ঈশ্বরত্বের মধ্যেও তাঁহার অসঙ্গত্ব দেখাইয়াছেন। তার পর সেই প্রভুত্ব ও বিভুত্বের মূলে যে সমত্ব, সেই ব্রহ্মসম্ভারের কথা বলিয়াছেন। তার পর বলিতেছেন, বাহ্য বিষয়ে অসক্তাত্মা হইলে সুখ কি বস্তু, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ আত্মাই সুখস্বরূপ, ইহা জানা যায়। তার পর সেই আত্মতত্ত্ব অবলম্বনে (ঈশ্বরতত্ত্বের ভিতর দিয়া) ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইলে অক্ষয় সুখলাভ হয়। বাহ্য বিষয়ে অসঙ্গ হইলে উপশমাত্মক সুখ, আর ব্রহ্মতত্ত্বে অক্ষয় সুখ।

আহা সুখ! যদি তোমার কেন্দ্রকে জানিতাম, তুমি যাঁহার স্বরূপ, যদি সেই ভূমা সুখময়ীর চরণে আত্মসমর্পণ করিতাম—যদি সুখ সুখ করিয়া পরের দুয়ারে না ছুটিয়া, সেই সর্ব্বসুখের ভাণ্ডারের দ্বারে কর প্রসারণ করিতাম, তবে আমাদিগকে অভাবের তৃষা এমন করিয়া কি দহন করিত? তুমি সর্ব্বব্যাপী সুখ, সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের ঘাত প্রতিঘাতে শুধু সমবেদনার সোহাগ তুমি ফুটাইতেছ, তুমি সুখ—সর্ব্বত্র বিষয় আকারে স্পন্দিত হইয়া রহিয়াছ—ইন্দ্রিয়ের সহিত যে বিষয়ের সংস্পর্শ হয়, সেই বিষয় যেরূপ স্পন্দনে স্পন্দিত, সেই স্পন্দনানুসারে অমনি তুমি হৃদয়ে সমবেদনা বা সমস্পন্দন ফুটাইয়া থাক; উহাই বিশিষ্ট বিশিষ্ট সুখরূপে আমরা ভোগ করি। এই সমবেদনাই বিশিষ্ট বিশিষ্ট সুখের কারণ। এই জন্যই সমদর্শনের সাহায্যে এই সুখতত্ত্ব অক্ষয়রূপে পাইতে, মা এই শ্লোকটি বলিয়াছেন। উপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন,—"যো বৈ ভূমা, তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—যাহা ভূমা, তাহাই যথার্থ সুখ; অল্পে সুখ নাই—খণ্ডজ্ঞানে রচিত খণ্ডিত বিষয়, সুতরাং উহা যথার্থ সুখময় নহে। সেই জন্য বিষয়সংস্পর্শজাত সুখ দুঃখময়—এই কথাই পরশ্লোকে বলিতেছেন।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২

হে কৌন্তেয়, সংস্পর্শজাঃ যে ভোগাঃ, তে হি দুঃখযোনয়ঃ এব, তথা আদ্যন্তবন্তঃ, অতঃ বুধঃ তেষু ন রমতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—বিষয়-সংস্পর্শ-জনিত সুখ আদ্যন্তবান্, সুতরাং দুঃখময়। কৌন্তেয়! সেই জন্য বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাহাতে রত হন না।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুখ বিষয়ে নহে, সুখ মায়ের ধর্ম্ম। বিষয়ের

সংস্পর্শ-সাহায্যে উদ্দীপিত যে সুখ, আত্মা হইতে যদিও সেই সুখ উদ্দীপিত হয়, তবুও যখন আমরা বিষয় হইতে সুখ পাইতেছি, তখন সেই সাধারণ সুখলাভের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, সেই সুখেরই জন্য আত্মার দিকে মন ফিরাইবার প্রয়োজনীয়তা কি ? মায়ের দিকে মন ফিরাইলে তিন প্রকারের সুখ লাভ হয়—ইহা মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এক, বাহ্য বিষয়-জনিত যে সুখ, সে সুখও পাওয়া যায় ; দুই, অসঙ্গত্ব হইতে উপশমাত্মক সুখ পাওয়া যায় এবং তিন, তদ্ব্যতীত অক্ষয় ভূমা সুখ লাভ হয়। অক্ষয় ভূমা সুখের জন্য না হয় মায়ের দিকে মন ফিরাইলাম, কিন্তু বিষয়-জনিত সুখ যখন আমরা আপনা হইতে পাইতেছি, তখন তাহার জন্য মায়ের দিকে মন ফিরাইবার আবশ্যকতা কি ? এইরূপ আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য মা বলিতেছেন, না বৎস ! বিষয়-জনিত সুখের জন্যও আমার দিকে মুখ ফিরাও। কেন না, আমার হাত হইতে সে সুখ গ্রহণ করিলে, তাহা দুঃখের যোনি হইবে না। কিন্তু বিষয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিলে তাহা দুঃখময় হইবে। বিষয় তোমায় সে সুখ অসীমভাবে দিতে পারিবে না ; সে যাহা দিবে, তাহা আদি ও অন্তময়। বিষয়ের সংস্পর্শ লাভ করিলে, তবে তাহা উদিত হইবে এবং সে বিষয় চ্যুত হইলে তাহা ফুরাইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে ; সুখ ফুরাইবে, কিন্তু তৃষা ফুরাইবে না—সে তৃষা তোমায় জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বিষয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইবে। আর বিষয়, সুখ দিতে আসিয়া শুধু সুখমাত্র দিবে না, তাহাতে নিহিত তাহার অন্যান্য ধর্ম্মগুলি তোমাতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া, তোমাতে নানা বিকার উৎপাদন করিবে। তোমার যাহা প্রার্থিত নহে, সেইগুলিও তোমাতে ঢালিয়া দিয়া, তোমার শরীর মন, তোমার আত্মাকে উৎক্ষিপ্ত করিবে। কিন্তু আমিই সুখের আগার জানিয়া আমার নিকট হইতে যদি সেই সুখ প্রার্থনা কর, তবে আমি মাত্র সেই সুখই দিব—নির্ম্মল অফুরন্তভাবে দিব, ইচ্ছামাত্রে পাইবে, তাহাতে বিষয়ের ন্যায় অন্য কোনও ধর্ম্ম মিশ্রিত থাকিবে না। সুতরাং তাহা তোমার দুঃখযোনি হইবে না। বিষয়ভোগ করিলে বা বিষয় হইতে সুখ গ্রহণের প্রয়াস পাইলে, তাহাতে তিনটি বিপদ্ আছে। ১ম—তাহা আদি ও অন্তবান্, ফুরাইয়া যাইবার আশঙ্কা। ২য়—তাহা তোমার জন্য অনন্ত তৃষা রচনা করিবে। ৩য়—সে মাত্র সুখ দিবে না, তাহার অন্যান্য ধর্ম্ম তোমাতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া, তোমার পক্ষে নানা দুঃখের কারণ হইবে। একটি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিলে ; মাত্র সুস্বাদ তোমার অভিপ্রেত, কিন্তু পাইলে তুমি তিনটি,—সুস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই ফলের জন্য তোমার তৃষাসংস্কার, সেই ফল না পাইলে তজ্জনিত দুঃখ, তৎলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সুস্বাদ ব্যতীত তাহার অন্যান্য গুণগুলি তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তোমার উদরে গিয়া তোমার শরীর, তোমার মন পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত করিয়া দিবে। কিন্তু মায়ের নিকট হইতে সুস্বাদপ্রার্থী হইলে, আত্মায় সে সুস্বাদের যাচ্ঞা করিলে, মাত্র সুস্বাদ তুমি লাভ করিবে—বিষয়শূন্য বিষয়সুখ। তাহাতে তৃষা

বাড়িবে না। কেন না, তাহা তোমার ঘরেই রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। যাহা আয়ত্তীভূত, জীব-তৃষা তাহার জন্য থাকে না। যাহা আয়ত্তের বাহিরে, সাধারণতঃ তৃষা তৎপশ্চাতেই ধাবিত হয়। কেন না, অভাব হইতে তৃষার উৎপত্তি। ভাবের অভাব হইলেই তৃষা হয়। আপনার আত্মাতেই সুখ রহিয়াছে—ইহা জানিলে আর সুখের তৃষা হয় না। আর আমি যাহা দিব, আত্মা হইতে যাহা লাভ করিবে, তাহা মা, আত্মময়—মাত্র সোহাগ স্নেহ—মাত্র ভালবাসাময়—বিষয়ের মত তাহাতে অন্য কোন ধর্ম্ম মিশ্রিত নাই। কোন অচেতনতা তাহাতে লুকান থাকে না; সুতরাং কোনও জড়ত্বের অভিঘাতে তোমাকে লিপ্ত হইতে হয় না। তার পর তাহাই তোমার আত্মত্ব—অপরিণামী আত্মত্ব দেখাইয়া দিবে। কেন না, তাহার তলেই অসঙ্গ আত্মপ্রকাশ। আবার সেই অসঙ্গ আত্মদর্শন হইলে, তাঁহার বিভুত্ব ও প্রভুত্ব দেখিয়া ব্রহ্মত্ব দর্শন। সুতরাং বিষয়সুখ, বিষয়োপশমাত্মক সুখ ও ব্রহ্ম বা অক্ষয় সুখ, সমস্তই আমাতে পাইবে।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩

যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ ইহ এব কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ুং শক্নোতি, স যুক্তঃ, স নরঃ সুখী।

ব্যবহারিক অর্থ।—শরীর বিমোক্ষণের পূর্ব্বে এই দেহে থাকিয়াই যে পুরুষ কাম ও ক্রোধজনিত বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়, সেই যুক্ত এবং সেই সুখী।

যৌগিক অর্থ।—আত্মার নিকট হইতে সমস্ত সুখ লাভ করাই প্রশস্ত, বিষয়ের মুখাপেক্ষিতা যদি নিকৃষ্ট, তবে বিষয়সংজাত সুখ-পূর্ণ সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়-সংঘাত-বিরল সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করাই ত প্রশস্ত? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থে মা এই শ্লোকটি বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকার আত্মায় যুক্ত হইলেই তাহাকে যুক্ত পুরুষ বা সুখী পুরুষ বলা যায় না। উহার সহিত আর একটি অনুশীলন আছে—সেটি অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সেইটি হইলে যথার্থ যুক্ত পুরুষ হওয়া যায়। আত্মপরিসেবনে সমস্ত লাভ হইবে, এই লোভে যাহারা আত্মায় যুক্ত হয়, তাহারা যথার্থ যুক্ত পুরুষ নহে। মাতৃপরায়ণ হইলে অনন্ত সুখ লাভ হইবে, মাতৃপরায়ণ হইলে তাঁহারই নিকট বিষয়সুখ অবধি যথেচ্ছভাবে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে—আত্মানুশীলনে মোক্ষলাভ করিব—এই সকল কামনা লইয়া আত্মরত হওয়াকে যথার্থ যুক্ত হওয়া বলে না। কামনা ও ক্রোধের দমনই যুক্ত পুরুষের লক্ষণ। শুধু মায়ের জন্য মাকে চাই, মাতৃসেবার ফল মাতৃসেবা, অন্য কোন কামনা বা কামনাভঙ্গে ক্রোধ হৃদয়ে উঠিতে দিব না—ইহাই যথার্থ পুরুষার্থতা। কাম ও ক্রোধ হৃদয়ে উঠিতে দিব না বলিলেই রোধ করা যায় না—উঠিবার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেই তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না—এ কথা মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন।

সেই জন্য যে ক্ষেত্রে কামক্রোধাদি উদ্দীপিত হওয়া সম্ভব, সেই ক্ষেত্রেই অবস্থান

করিয়া, তাহাদিগের বেগ দমন করিতে পারাই প্রকৃত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান। বিষয় তোমাকে মুগ্ধ করিতে আসিবে এবং সে বিষয়-জনিত সুখ যে, সে বিষয়ের ধর্ম্ম নহে—তোমারই আত্মার ধর্ম্ম, এই জ্ঞানে তুমি সে বিষয়কে তুচ্ছ করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপ হওয়াই মায়ের অভিপ্রায়। সুখের প্রলোভন মুখে মাখিয়া, বিষয় যখন তোমাকে মুগ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে, তুমি হাসিয়া তাহাকে বলিতে সমর্থ হইবে, মায়াবিনি! যে সুখের মাধুরী তুমি মুখে মাখিয়াছ, তাহা তোমার নহে, উহা আমার আত্মারই মাধুরী, উহা আমাতেই আছে, উহা আমি ইচ্ছা করিলে আমাতেই ভোগ করিতে সমর্থ হই।' উহার জন্য আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহি। এই অবস্থা লাভ করিতে, ইহার অনুশীলন করিতে বলাই মায়ের উদ্দেশ্য। সেই জন্যই মা পূর্ব্বশ্লোকে সুখ কোথায় এবং কিরূপে লাভ হয়, তাহা অতি বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আত্মায় যখন সকল সুখ আছে, তখন বনে গিয়া আত্মসেবাপরায়ণ হইয়াই বসি,—স্বচ্ছন্দে সকল সুখ ভোগ করিব—এই সুবিধা দেখাইয়া দিবার জন্য মা পূর্ব্বশ্লোকে সুখের ভাণ্ডারগৃহ তোমাদিগকে দেখাইয়া দেন নাই ; ও সকল সুখ যে তোমার অনায়াসলভ্য—উহার জন্য বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে তোমাকে ধাবিত হইতে হইবে না, বরং বিষয়সকল ঐ সুখ লইয়া তোমার সম্মুখে আসিলে তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগের প্রাপ্তির জন্য তুমি উদ্বেলিত হইবে না—পাইবার বেগ উদ্দীপ্ত হইলেই দমন করিতে অনায়াসে সমর্থ হইবে—এই জন্যই মা সুখের কথা বলিয়াছেন। এই বেগ-দমন অভ্যাসই প্রকৃত অভ্যাস এবং এই বেগ মন্দীভূত হওয়াই যোগী পুরুষের ক্রমোন্নতি। যে সম্যক্ বেগ দমন করিতে সমর্থ হয়, সেই যথার্থ সুখী ও যুক্ত পুরুষ। যে লাভ করিতে পারে না বা পালাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে, সে যোগী নয়, সে সুখী নয়। যে যত আত্মতত্ত্বে প্রবিষ্ট হয়, সেই ক্রমশঃ তত এই অধিকার পায়।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভুতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪

যঃ অন্তঃসুখঃ, অন্তরারামঃ, তথা যঃ অন্তর্জ্যোতি, স এব যোগী ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং অধিগচ্ছতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—যিনি অন্তঃসুখ-সম্পন্ন, অন্তরে রমমাণ, অন্তর্জ্যোতিঃ বা আত্মবোধযুক্ত, তিনি কার্য্যত ব্রহ্মে অবস্থান করেন ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

যৌগিক অর্থ।—এই শ্লোকে মা, যুক্ত পুরুষদিগের প্রাণের বা হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। যুক্ত পুরুষ আপন অন্তরে, আপন প্রাণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুখের সন্ধান পায়, আপন প্রাণেই সুখে সে রমণ করে এবং সেই রমণ হইতে আত্মবোধময় জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া অবস্থান করে। এইরূপে অন্তঃস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মই অন্তররূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিত—এই জন্য ঋষিরা অন্তরকে

ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবার আদেশ দিয়াছেন। অন্তর ধারণা করিতে পারিলেই সাধনার পথে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যায়। তুমি আমার অন্তর, তুমি প্রতি জীবের অন্তর, তুমি সর্ব্বভূতের অন্তর, তুমি জলের অন্তর, তুমি অগ্নির অন্তর, তুমি বায়ুর অন্তর, তুমি আকাশের অন্তর, তুমি চন্দ্রের অন্তর, তুমি সূর্য্যের অন্তর, তুমি সমস্তের অন্তর। তুমি অন্তর—অন্তরই তোমার স্বরূপ—এই ভাবে সত্যপ্রতিষ্ঠার সহিত অন্তর্য্যামীর সাধনা করিলে অন্তরধারণা ফুটিয়া উঠে এবং আত্মবোধের আভাস পাওয়া যায়। যুক্ত পুরুষের অন্তর এইরূপে আত্মালোকে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে—সে আত্মরমণশীল হইয়া আত্মসুখ অনুভব করে।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫

ক্ষীণকল্মষাঃ, ছিন্নদ্বৈধাঃ, যতাত্মানঃ, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে।

ব্যবহারিক অর্থ।—ক্ষীণপাপ, ছিন্নসংশয়, সংযতাত্মা, সর্ব্বভূতহিতে রত ঋষিরা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে যুক্ত পুরুষের অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া, মা এই শ্লোকে তাহার মন ও বাহ্য ব্যবহারের কথা বর্ণনা করিতেছেন। পূর্ব্বোক্তরূপে অন্তরের আস্বাদন পাইলে জীবের সমস্ত পাপ ধ্বংস হইতে থাকে। সংশয়সকল ছিন্ন হইয়া যায়, আত্মাতেই তাঁর সমস্ত বৃত্তি সংযমিত থাকে এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, ঋষি হইয়া, সর্ব্বভূতহিতকর কর্ম্মে রত থাকেন ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। ভাষ্যকারেরা এই শ্লোকটিকে সন্ন্যাসের লক্ষণ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ইহা যে কর্ম্মসন্ন্যাস লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন—তাহা "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" এই কথা হইতেই প্রতীয়মান হয়। মোট কথা, এই অধ্যায়ে সন্ন্যাস লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ একটি শ্লোকও বলেন নাই, ইহা বিশেষ ভাবে মনে রাখিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাষ্যকারদিগের স্ব স্ব সম্প্রদায়গত মতপোষণকারী অর্থ তোমরা গ্রহণ করিও না। এইরূপে দুই শ্লোকে যোগীর হৃদয়ের এবং মন ও বাহ্য ব্যবহারের বর্ণনা করাই মায়ের অভিপ্রেত, সেই জন্যই 'ব্রহ্মনির্ব্বাণমধিগচ্ছতি' ও 'ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভতে' এক কথা দুই বার করিয়া বলিয়াছেন। কি লাভ করে, সেইটি বলিবার জন্য এ শ্লোক বলা হয় নাই—কি লাভ করে, তাহা পূর্ব্বশ্লোকেই বলা হইয়াছে, এ শ্লোকে তাহার পুনরুল্লেখ আবশ্যক ছিল না। সুতরাং এই শ্লোকে যোগীদিগের অন্তর ও বাহ্য ব্যবহারের বিশেষ বিশেষ ভাব বর্ণনা করিবার জন্যই যে তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬

কামক্রোধাবযুক্তানাং, যতচেতসাং, বিদিতাত্মনাং যতীনাম্ অভিতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যতচেতা, কামক্রোধবিমুক্ত, বিদিতাত্মা যোগীদিগের উভয়তঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান থাকে।

যৌগিক অর্থ।—যোগীর অন্তর ও বাহ্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যে পূর্ব্বশ্লোক দুইটি বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে 'অভিতঃ' শব্দ থাকায় তাহা স্পষ্টতর হইয়াছে। ভাষ্যকারেরা বলেন, 'অভিতঃ' শব্দ জীবন ও জীবনান্ত, এই দুই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। 'যতচেতা যতি' বলায় কর্ম্মসন্ন্যাসীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—সন্ন্যাসীকে নহে। কর্ম্মসন্ন্যাসী পুরুষ বাহ্যতঃ ও অন্তরতঃ উভয়তঃ কর্ম্ম করিয়াও সর্ব্বতোভাবে আত্মাকে বিদিত হন এবং তাঁহাতেই বিরাজ করেন—ইহা বলাই মায়ের অভিপ্রায়। তিনি কি মনে, কি প্রাণে, কি কার্য্যে, মায়েরই অনুচর—মায়েতেই সংযতপ্রাণ এবং মাতৃঅঙ্কেই অবস্থিত—ইহাই এ শ্লোকের মর্ম্মার্থ। সন্ন্যাসের উচ্চবাচ্য কোথাও নাই, গীতা সন্ন্যাসবাদের জন্য নহে, কর্ম্মসন্ন্যাসের জন্য—ইহা বার বার বলিতেছি।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮

বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা, চক্ষুশ্চ এব ভ্রুবোঃ অন্তরে কৃত্বা, নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা, যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ, মোক্ষপরায়ণঃ যঃ মুনিঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ ভবতি, স সদা মুক্ত এব।

ব্যবহারিক অর্থ।—বাহ্য রূপ রস আদি বাহিরে ফেলিয়া, চক্ষুকে ভ্রূমধ্যে আবদ্ধ করিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসকে নাসামধ্যে স্থির করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত করিয়া, মোক্ষপরায়ণ মুনি যখন ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধপরিশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, তখন তিনি মুক্ত পুরুষ।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মসন্ন্যাস করিলে তবে ধ্যানে অধিকার হয়। আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আরাম—এইরূপ জ্ঞানে বিষয়সকল উপেক্ষিত ও আত্মা যখন প্রিয় বলিয়া বোধে উদিত হইতে থাকে, বিহিতকর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মসন্ন্যাসযুক্ত পুরুষ তখন স্বতঃই অন্তরের অন্তরদিকে প্রাণকে প্রেরিত না করিয়া থাকিতে পারে না। থাকিয়া থাকিয়া তখন তাহার প্রাণ অন্তরের দিকে ছুটিতে থাকে। সংসারী জীব, স্ত্রী-পুত্রের জন্য সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, অবসর পাইলে, তাহাদিগের নিকট উপবিষ্ট হইয়া, যেমন তাহাদিগকে বক্ষে ধরে, আদর করে, সোহাগ করে, তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া

বিভোর হইয়া যায়, ভগবানের ধ্যান ধারণাদিও তদ্রূপ। যত ক্ষণ কর্ম্মের বেগ আসে বা প্রয়োজনীয়তা থাকে, তত ক্ষণ কর্ম্মসন্ন্যাসী বিহিত কর্ম্মসকল করে এবং অবসরসময়ে তাহার আদরের মায়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া, শুধু মা বলিয়া ডাকে ; মায়ের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বিভোর হইয়া যায়। এই বিভোর হওয়াকেই ধ্যান বলে। এই ধ্যানাবস্থা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্মসন্ন্যাসী এইরূপে কখনও কর্ম্ম করে, কখনও ধ্যানস্থ হয়। ভগবান্ এই শ্লোকদ্বয়ে সেই ধ্যানযোগের অবতারণা করিতেছেন। আমিও সেই জন্য ধ্যানের প্রকৃত মর্ম্মের ঈষৎ আবতারণা করিয়া রাখিলাম।

বাহ্য স্পর্শ-সকলকে বাহিরে ফেলিয়া অর্থাৎ কর্ম্মস্পন্দন ক্ষণেকের তরে অপসারিত করিয়া, চক্ষু ভ্রূযুগলের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া অর্থাৎ অন্তর্যামিনী মায়ের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া, শ্বাস প্রশ্বাস সমীকৃত করিয়া, জন্মমৃত্যুর চিন্তাস্পন্দন বিদূরিত করিয়া, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে মাতৃকর্ম্ম হইতে মায়ে সংন্যস্ত করিয়া, মাতৃসোহাগবিলাসী মুনি, কর্ম্মের ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধরূপ অবস্থাত্রয় পরিহার করিয়া যখন অবস্থান করে, তখনই তাহাকে মুক্ত পুরুষ বলা যায়। এই অবস্থা, ধ্যানের সাহায্যে সাময়িক ভাবে জীব লাভ করে। অপরিণামী নিজবোধের দিকে চাহিলেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। মায়ের জন্য কর্ম্ম করিতে করিতে থাকিয়া থাকিয়া মায়ের দিকে এমনি করিয়া জীব ফিরিয়া চাহে। সৃষ্টি ও লয় বা জন্ম ও মরণ, এই দুই প্রকার স্পন্দন জীবকে নিয়ত চঞ্চল করিয়া রাখে। তাহারই ফলে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। কর্ম্মমাত্রই এই সৃষ্টি ও লয়াত্মক দুই প্রকারের প্রবাহ উদ্দীপ্ত করে। সেই জন্য কর্ম্মবিরত হইলে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বতঃ শমিত হইয়া যায় এবং তাহারই অনুকরণে কৃত্রিম ধ্যানপরায়ণ পুরুষেরা শ্বাস-প্রশ্বাস শমিত করিবার প্রয়াস পায়। ধ্যানযোগে ইহা বিশেষ করিয়া বলিব। সাধারণ কর্ম্মের ঐ দুইটি জন্ম ও লয়াত্মক স্পন্দন যেমন আছে, চিন্তারূপ কর্ম্মের ভিতর তেমনই ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধরূপ তিনটি স্পন্দন থাকে অর্থাৎ ইচ্ছা, ভয় বা ক্রোধ, মানসিক চাঞ্চল্যের শ্রেণীবিভাগবিশেষ। মানসিক বৃত্তিসমূহকে সাধারণতঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। সেই জন্য মা ঐ তিনটি কথা উল্লেখ করিলেন।

ধ্যানযোগের বর্ণনা এ শ্লোকদ্বয়ের অভিপ্রায় নহে। কর্ম্মযোগের ও ধ্যানযোগের পরস্পর সম্বন্ধ দেখানই মায়ের এখানে অভিপ্রায়। কর্ম্মসন্ন্যাসীর কর্ম্মের মর্ম্ম কি এবং ধ্যানেরই বা মর্ম্ম কি—তাহাই মা লক্ষ্য করিতেছেন। কর্ম্ম ঘনীভূত হইয়া জীবকে ধ্যানের দিকে গতিশীল করে এবং ধ্যান ঘনীভূত হইয়া হৃদয়ে মাতৃত্ব যথাযথ ফুটাইয়া দেয়—শুধু এই অভিপ্রায়ে এখানে ধ্যানের উল্লেখ করিতেছেন। মায়ের জন্য কর্ম্ম করিতে করিতে জীব মায়ের দিকে চাহে। কর্ম্মের তিক্ততা, অবসন্নতা, ক্লান্তি যখন জীবকে মথিত করে, মায়ের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া, আপনার স্বরূপের দিকে

ফিরিয়া সে তখন আশ্বস্ত হয়; সংঘর্ষের ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জ্জরিত জীব তাহার অবসন্নতা ভোলে, ক্লান্তি ভোলে, কর্ম্মের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সুখ-দুঃখ যন্ত্রণাদি ভুলিয়া যায় এবং দেখে, এ কর্ম্মজঞ্জালে অনন্ত ব্যথা, অনন্ত বেদনা হৃদয়কে মথিত করিলেও উহা মায়েরই দেওয়া, উহার তলায় তলায় শুধু সৌহার্দ্দ, শুধু স্নেহ, শুধু প্রীতি। কর্ম্মসকল মাতৃযজ্ঞ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সর্ব্বভূতের সর্ব্বপ্রকার আবর্ত্তন, সর্ব্বভূতমহেশ্বরেরই আত্মরতিমাত্র এবং সে যজ্ঞ, সে আত্মরতি, বাহিরে দেখিতে সুখ-দুঃখ-জ্বালাযন্ত্রণাময় হইলেও ভিতরে উহা একান্ত সৌহার্দ্দেরই আস্পদ। কর্ম্মসাহায্যে মাকে এইরূপে চিনিতে জীব যেরূপে সক্ষম হয়—তাহাই বলিবার জন্য কর্ম্মসন্ন্যাস যোগের সহিত এই ধ্যানযোগের অবতারণা।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯

যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং, সর্ব্বলোকমহেশ্বরং, সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা জীবঃ শান্তিম্ ঋচ্ছতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—(ধ্যানের সাহায্যে) সর্ব্বযজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ আমাকে জানিয়া জীব শান্তি লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—যখন জীব ধ্যান করে, কর্ম্মক্লান্তিশুষ্ক মুখখানি জীব মায়ের দিকে যখন ফিরায়, তখন সংসারকে সে কি দেখে? এ ঘোর কর্ম্মসংগ্রামে বিধ্বস্ত হইয়া, যাহার জন্য এ সংগ্রাম করিতেছি, তাহার দিকে চক্ষু বিন্যস্ত হইলে—যে সংসারকে নরক বলিতে শিক্ষা করিয়াছি, যে সংসারের প্রতি তাড়না মোহময়, প্রতি আবর্ত্তন যন্ত্রণাময়, প্রতি উদ্দীপনা দুশ্চিন্তাময়, প্রতি ধূলি যার বজ্রময়, বন্ধনময়—প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালন শূলভেদব্যথাময়—যে সংসারকে এইরূপ দেখিতে ভাবিতে বোধ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি ও শিখিয়াছি, যে সংসারের ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য দার্শনিকেরা বিস্তর মেধা ব্যয়িত করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—যে সংসারকে পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়া কত জীব মহাপুরুষপদবাচ্য হইয়াছেন—সেই সংসারের তলদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া, মাকে দেখিলে ক্লান্ত কর্ম্মী দেখিতে পায়—ইহা শান্তির আগার—অমৃতসমুদ্রের তরঙ্গ। কর্ম্ম করিতে করিতে ক্লান্ত হই সত্য; কিন্তু যখন দেখি, এ কর্ম্ম এক মহাযজ্ঞ, এ উদ্যম এক মহাতপস্যা—যখন দেখি, এ যজ্ঞ, এ তপস্যার ভোক্ত্রী মা, তখন কি আর ব্যথা থাকে রে! কর্ম্ম করিয়াও তাহার মধ্যে দেখি, মা আমার অপরিণামিনী নিজবোধরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। লোকসঙ্ঘে আবর্ত্তিত হইয়া নিষ্পেষিত, বিদলিত হইতে হইতে যখন দেখি, এ পেষণে দলনে আমি মহেশ্বরের মহাক্রোড়ে অচ্যুতভাবে অবস্থিত রহিয়াছি, তখন কি আর পেষণে দলনে ত্রাস থাকে রে! পঞ্চ ভূতের সেবা করিতে করিতে থাকিয়া থাকিয়া বিফলে যখন ভাঙ্গিয়া পড়ি—সংসারের স্বার্থপরতায় হতাশ

হইয়া—নিরাশ্রয় হইয়া—নিরুপায় হইয়া, যখন দেখি, সে হতাশ, সে নিরাশ্রয়তার মাঝে সর্ব্বভূত-সুহৃদ্ মা আমার বিরাজিতা—মায়ের সৌহার্দ্দ্য তাহার প্রতি আন্দোলনে প্রস্ফুরিত, সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা, হতাশের সকল বিফলতা মাতৃসৌহার্দ্দ্যে মণ্ডিত, তখন কি আর মোহ থাকে রে! কর্ম্ম করিতেছি, না যজ্ঞ করিতেছি; এ যজ্ঞে আমি শক্তিহীন নহি, সর্ব্বলোকমহেশ্বরের মহাশক্তিতে আমি চালিত—আমি বন্ধুহীন, সখাহীন, সুহৃদ্‌হীন নহি—মা আমার সুহৃদ্। আমি জানি না—আমি বুঝিতে পারি না, যে পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্, সে কেমন করিয়া এ সংসারকে মোহের আগার বলে! আমি ধারণা করিতে পারি না, যাহারা পরমাত্মচিন্তনে রত, তাহারা কেমন করিয়া সংসারবর্জ্জনের উপদেশ দেয়! পরমাত্মা শব্দের অর্থবোধ মাত্র যাহার হইয়াছে, তাহার মুখ দিয়াও এরূপ প্রলাপ মুহূর্ত্তের জন্য বহির্গত হইতে পারে না। এ সংসার পরমাত্মময়—মুখে বলে, অথচ ইহাকে নরক বলিয়া যাহারা ধারণা করিতে শিক্ষা দেয়, তাহাদিগকে বাতুল ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। অবশ্য ইহা নরক—অবশ্য ইহা কারাগার—অবশ্য ইহা জ্বালা-যন্ত্রণাময়, মরীচিকাময়, ইহা ভ্রান্তি, যদি ইহার তলদেশে মায়ের বিদ্যমানতা জীব স্বীকার করিতে না পারে। যে আত্মভাব বিন্দুমাত্র আরোপ করিয়া, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি জীব-বিশেষকে আমরা প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয় করিয়া তুলি—যে আত্মভাবের ঈষৎ আরোপে জীববিশেষকে আমাদের চক্ষে পরমাত্মীয় করিয়া তুলে—এমন আত্মীয় যে, তাহার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হই না—জীবনটা তাহার পদতলে বিক্রয় করিয়া ফেলি—যে আত্মবোধের ঈষৎ আভাসে এইরূপ আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাই, সাক্ষাৎ সেই আত্মার লীলাবিলাস এই সংসারকে প্রহেলিকা বা নরক কোন্ প্রাণে বলে—আমি বুঝি না। আত্মবোধ হইতে আত্মীয়তার বিকাশ। যাহারা আত্মবোধের ব্যাখ্যা করে, আত্মতত্ত্বের বিচার করে, তাহারা আত্মধর্ম্ম কাহাকে বলে, জানিয়া যদি বলিত, জানিয়া যদি বিচার করিত, তবে প্রলাপোক্তিতে এ অমৃতের সংসার বিষের আগার হইয়া থাকিত না। আত্মীয়বোধ কত ঘনীভূত হইলে আত্মবোধের সদৃশ হয়—কত আত্মীয়তা সংস্থাপিত হইলে, তবে আমরা অন্য জীবকে 'আমার আত্মা' এ কথা বলিতে পারি—তাহা কি ঐ শুষ্ক আত্মবাদীরা ভাবিয়া দেখে? অন্যে বলে বলুক, যাহাদের আত্মবোধের অভিমান আছে, তাহারা কি করিয়া আত্মায় আত্মীয়তা দেখে না? সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন মুখে তাহারাও বলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি বুঝিত, কত আত্মীয়ভাবে দর্শন করিলে, তবে আত্মদর্শন সাধিত হয়, কত গভীর ভাবে কাহাকেও "সে আমার" বলিতে পারিলে, তবে তাহাকে "সে আমি" এ কথা বলা যায়। যাহার আত্মবোধ ফুটিয়াছে, এ সংসারের আত্মীয়তার পুণ্য আদান প্রদান—আত্মাকেই তাহার চক্ষে ফুটাইয়া দেয়। আত্মীয়তা দেখিয়া আত্মাকেই দেখিতে পায়। আত্মাকে যে সংসারের তলদেশে বিরাজিত দেখে, শুধু মনের মধ্যে নহে, হৃদয়ের মধ্যে সন্দর্শন করে, সেই ওই নিজবোধের

আকর আত্মার ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করে। মনে যিনি প্রত্যগাত্মা, হৃদয়ের মাঝে তিনিই ঈশ্বর এবং হৃদয়পারে প্রজ্ঞায় তিনি ব্রহ্ম। এ কথা পরে ভাল করিয়া বলিব। সুতরাং যাহার ধর্ম্মের নাম আত্মীয়তা বা হৃদয়, সেই আত্মাকে এই সংসারের মূল আশ্রয় বলিয়া যে ধারণা করিয়া লইয়াছে, তাহার চক্ষে ইহার প্রতি ধূলি মধু—অমৃত। হায় ঋষি! তোমার সে "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।....মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"... এই মহামধুময় দর্শনের, এই মধুময় ঘোষণার উপর ভাষ্যকারেরা, আজ আত্মবোধহীন আত্মবিচারকেরা কি বিষের প্লাবন উদ্গীরিত করিতেছে। আজ মধুময় পরমাত্মার অঙ্গ-স্বরূপ এ প্রিয়কান্তি ভগবদ্বপুঃ সংসারকে রাক্ষসের প্রতিকৃতি বলিয়া অর্ব্বাচীনেরা কি শিক্ষা দিতেছে! হে সত্য অমৃত! আর একবার—সত্যযুগের মত, আর একবার তুমি প্রকাশিত হও—তোমার আশ্বাসবাণী মূর্খের ব্যভিচার অপসারিত করিয়া সংসারের জীবকে অমৃতময় করুক। সংসারনিন্দা আত্মনিন্দামাত্র—এ জ্ঞান ভাষ্যকারদিগের বুকে ফুটিয়া উঠুক।

আত্মবোধ যে বুকে ফুটিয়াছে, সে বুকের ব্যথার ছবি একবার তোমাদিগের চক্ষে ধরি। আজিকার এ সংসার দেখিয়া, বার বার আমার দক্ষযজ্ঞের কথাই মনে পড়ে। আর মনে হয়, আজ ঋষিবৃন্দের প্রাণে এই সকল প্রলাপ কি ব্যথার সৃষ্টি করে। বার বার আমার মনে পড়ে, অনন্ত দেবতাবৃন্দ এক যজ্ঞক্ষেত্রে সমবেত। লেলিহান অগ্নি-শিখা চারি ধারে পুণ্যধূম উদ্গিরণ করিতেছে। দক্ষপুরুষ দক্ষতার সহিত তাহাতে আহুতি দিতেছে; যজ্ঞে ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে সূচনা করিয়া ইন্দ্র চন্দ্রাদি সকলে সমুপস্থিত। নাই—শুধু যজ্ঞেশ্বর! সহসা সে যজ্ঞস্থলের শত স্বর্ণশোভা ম্লান করিয়া আলুলায়িত-কুন্তলা, আভরণহীনা, ম্লান-বসনা, আনতমুখী কে বালিকা ধীর-মন্থর পাদক্ষেপে প্রবেশ করিল? দক্ষের কন্যা সতী—যজ্ঞেশ্বরের সতী। অনন্ত দেব-বৃন্দের অনন্ত চক্ষু সে শুষ্ক মুখে বিন্যস্ত হইল। আহুতি থামিল, স্তুতি থামিল, মন্ত্র থামিল, কর্ম্মচাঞ্চল্যময় মহান্ সে যজ্ঞস্থল, মহা এক নীরবতায় ভরিয়া গেল। যজ্ঞাধ্যক্ষ দক্ষের চক্ষু ফিরিল—তাহার সেই কল্পিত-পুণ্য যজ্ঞক্ষেত্রে অপবিত্র শিবের অপবিত্রা কামিনী প্রবিষ্টা—দেখিয়া সতীর পিতা গর্জ্জিল—"এ কি সতি, তুই এখানে? তোকে কে আনিল? তুই অপবিত্রের গৃহিণী—এ পুণ্যক্ষেত্রে তোর স্থান নাই! শিব দেবতা নহে—অপবিত্র উন্মার্গগামী!" শিবনিন্দা—শুধু নিন্দা, জগতের কর্ণে তাহা শুধু নিন্দা—শিবে আত্মবোধময়ী সতীর কর্ণে তাহা কি? অঞ্চল থামিল, রুক্ষ কেশ দুলিল, কুসুমাঙ্গ বজ্রফলক হইল, বাহু বিস্ফারিত হইল, মুখমণ্ডল ক্ষণস্থায়ী রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইল; পাংশু হইয়া, ত্রিনয়নে বারেকের তরে বিদ্যুতের ঝলক দেখা দিয়া স্তিমিত হইল। বারেকের তরে সেই অনন্ত দেবতাবৃন্দের অনন্ত কর্ণে একটি শব্দ মাত্র শূলের মত বাজিল—"শিবনিন্দা"! দেবতাবৃন্দ স্থির! বিশ্ব স্থির—অগ্নি, বায়ু, বরুণ,

ধরিত্রী অবিকম্পিত!—সতী নিভিল। এই আত্মবেদন, যাহা ভাবের উচ্ছ্বাস নহে—যাহা চিন্তনের তন্ময়তা নহে—পুরাণ-বর্ণিত পুণ্য প্রেমলীলার শত শত মর্ম্মবিপ্লাবী কাহিনী যাহার পার্শ্বে তুচ্ছ অন্তঃসারশূন্য; সতীর সেই শিবাত্মবেদন যদি ধারণা করিতে পার—যদি বিন্দুমাত্রও কল্পনায় ফুটাইয়া তুলিতে পার, তবে তোমরা আত্মার আত্মীয়তা কথঞ্চিৎ বুঝিবে। তবে বুঝিবে—এ সংসার আত্মার আত্মীয়তায় প্রতিষ্ঠিত—ইহা হৃদয়হীন মরু আত্মার মায়া নহে। এই সংসারকে ভূত-বিমর্দ্দিত শ্মশান বলিয়া দক্ষ জ্ঞানিবৃন্দ জীবকে যে শিক্ষা দিতেছে, ইহা শুধু শিবদর্শনহীনতার ফল। যদি এ সংসারের প্রতিষ্ঠা পরমাত্মায়—এ কথা সত্য বলিতে, তবে আজ জগৎকে তোমরা এমন করিয়া জ্ঞানের ছদ্মবেশে অজ্ঞানের কালিমায় আবৃত করিতে না। আত্মাকে না বুঝিয়া আত্মতত্ত্ব বিচার করিলে যাহা সম্ভব, উহা তাহাই। কিন্তু এ ত আত্মবোধের আভাসের কথা।

এই শ্লোকে মায়ের যে তিনটি বিশেষণ আছে, ঐরূপে মাকে না জানিলে শান্তিলাভ হয় না এবং ঐরূপে জানিলেই তবে পূর্ব্বশ্লোককথিত ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ-শূন্যতারূপ মুক্তি জীব লাভ করে। মাকে সর্ব্বকর্ম্মের ভোক্তা জানিলে ইচ্ছাতরঙ্গ আর উৎক্ষিপ্ত করে না। মাকে সর্ব্বলোকমহেশ্বর বলিয়া উপলব্ধি করিলে, সমস্ত ভীতি চিরদিনের জন্য দূর হইয়া যায় এবং মাকে সর্ব্বভূতের সুহৃৎ বলিয়া বুঝিলে ক্রোধের আক্রমণে জীবের হৃদয় আর জ্বালাময় হয় না। মায়ের এই ধর্ম্ম তিনটি যথাক্রমে ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধের সংঘাত হইতে জীবকে চিরমুক্তি দিয়া, তাহার জীবনকে শান্তিময় করে।

তোমরা মাকে ঐরূপ মূর্ত্তিতে দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হও—ধন্য হও; ধ্যানপরায়ণ হইয়া মায়ে প্রবিষ্ট হও। শান্তি লাভ কর—শান্তি লাভ কর।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রহ্মখণ্ড।

ভগবানে কর্ম্ম সংন্যস্ত না হইলে ধ্যানযোগে অধিকার হয় না। জীবের সাধনাধিকারের ক্রমবিকাশ ভগবান্ পর পর অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে পরিমাণে জীব ভগবানে কর্ম্ম ন্যস্ত করিতে সমর্থ হয়, ধ্যানেও জীবের সেই পরিমাণে অধিকার আসে। সেই জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ বিবৃত হইয়াছে। চিত্তের গতি যখন বিক্ষেপ হারাইতে হারাইতে একমুখে ধাবত হইতে থাকে, তখন সেই অবস্থার নাম ধারণা। আর যখন চিত্ত গিয়া কোনও বিষয়ে বিক্ষেপশূন্য একধারায় পড়িতে থাকে, তখন তাহার নাম ধ্যানাবস্থা। চিত্ত যখন সেইরূপে অবস্থান করিতে করিতে সম্যক্‌রূপে আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, তখন সেই অবস্থার নাম সমাধি। কর্ম্মসন্ন্যাসের পরিমাণ অনুসারে ধ্যানে অধিকার আসে; সেই জন্য কর্ম্ম করিবার সমকালে সময়ে সময়ে যাঁহার কর্ম্ম বলিয়া কর্ম্মসকল নিষ্পন্ন হয়, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা বলবতী হয় এবং সেই ইচ্ছার আবেগে জীব ধ্যানস্থ হইবার প্রয়াস পায় বা ধ্যান অভ্যাসে যত্নবান্ হয়। কি উপায়ে সেই অভ্যাস করণীয়, ভগবান্ এ অধ্যায়ে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই জন্য কেহ কেহ এই অধ্যায়কে অভ্যাসযোগ নাম দিয়া থাকেন। মহাভারতে ইহার নাম অধ্যাত্মযোগ। সাধারণতঃ ধ্যানরূপ চিত্তগতি ফুটাইতে প্রচেষ্টা অনেকেই করি সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাতে আসক্তি না জন্মিলে ধ্যান বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি রহিয়াছেন, তাঁহারই কর্ম্ম করিতেছি, তাঁহার সহিত এইরূপ সম্বন্ধ সত্যভাবে ফুটিলে, তবে তাঁহাকে দেখিবার জন্য সত্য ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং লালায়িত হইয়া প্রাণ তাঁহার দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহে। প্রাণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এইরূপে ঝাঁপাইয়া পড়িতে গিয়া, নিজের মধ্যেই ফিরিয়া আসে এবং সেই অন্তরে স্থির হইলে প্রকৃত ধ্যানাবস্থা হয়।

চিত্তকে আত্মায় সংলীন করার নাম যোগ। আত্মায় এই চিত্তসংযোগ করিবার দ্বিবিধ পন্থা আছে। এক, সমস্ত চিত্তবৃত্তি আত্মায় সমর্পণ ও অন্য সমস্ত বৃত্তি রোধ করিয়া, শুদ্ধচিত্ত হইয়া, সেই চিত্তকে আত্মপ্রকাশে লয় করা। যাহারা গৃহস্থাশ্রমী, তাহাদের প্রথমটি এবং যাহারা আশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসী, তাহাদের দ্বিতীয়টি বিহিত।

কর্ম্মের মধ্যে যাহারা থাকিবে, তাহারা সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই কর্ম্ম করিতেছি ধারণা করিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া বিহিত কর্ম্ম করিবে এবং অন্তর্ব্বৃত্তিকেও তাঁহাতে সংন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিবে বা স্বতঃ ব্রহ্মে সেরূপ আত্মসমর্পণ করিবার চেষ্টা তাহাদিগের অন্তরে উদ্ভূত হইবে। আর যাহারা সন্ন্যাসী, তাহারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার করিয়া, সুতরাং সমস্ত অন্তর্ব্বৃত্তি পর্য্যন্ত নিরোধ করিয়া, আত্মস্থ থাকিতে সচেষ্ট হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে, উভয় পথেই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যতা একটি লক্ষণ। বিহিত কর্ম্ম করা দ্বিতীয় লক্ষণ। কর্ম্মীর বিহিত কর্ম্ম—এ বিশাল বিশ্বযজ্ঞাগারে ভগবদ্‌যুক্ত হইয়া, তাঁহার অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে যুক্ত থাকা ও সমস্ত তাঁহার মহিমা বলিয়া চিনিয়া, সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহাতে সমগ্র চিত্ত নিমগ্ন করা। কর্ম্মত্যাগীর বিহিত কর্ম্ম—সর্ব্বদা নির্ব্বৃতচিত্ত হইয়া আত্মসমাহিত থাকা। কর্ম্মী চিত্তকে ভগবৎশক্তি বলিয়া ধারণা করিয়া, আপনাকে ও বিশ্বকে তাঁহারই জানিয়া, তাঁহাতে একীভূত হইবার জন্য লালায়িত হইবে। ত্যাগী চিত্তবৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া, আত্মসংলীনচিত্ত হইয়া থাকিবার প্রয়াস পাইবে। ইহাই হইল কর্ম্মবিধান। অবশ্য কর্ম্মত্যাগী হওয়া অপেক্ষা যে কর্ম্মী হওয়াই প্রশংসনীয়, এ কথা ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন এবং পরেও বলিবেন। তত্রাচ যদিই কেহ অনাশ্রমী হয়, তাহা হইলে তাহাকে ওই আত্মস্থ থাকিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রচেষ্টাময় হইয়া থাকিতে হইবে। মা এ অধ্যায়ে প্রথমে যোগী কাহাকে বলে, সেই কথাটি বিশদভাবে বলিয়াছেন। ত্যাগীরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকেন ও ধারণা করেন যে, যোগে কর্ম্মত্যাগীদিগেরই অধিকার। প্রকৃত কথা তাহা নহে। যোগী বলিতে বিশেষভাবে কর্ম্মীকেই লক্ষ্য করা হয়। গীতা জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়-শিক্ষাপ্রধান, এই জন্য ইহার প্রত্যেক অধ্যায়টিই একটি একটি যোগাধ্যায় নামে কথিত। চিত্তবৃত্তি নিরোধ অর্থে প্রধানতঃ যোগী বুঝায় না—ত্যাগী বুঝায়। কেন না, তাহারা চিত্তত্যাগেই কৃতসঙ্কল্প। বৃত্তিত্যাগ হইলেও প্রকৃতপক্ষে চিত্ত পরমাত্মাতেই অব্যক্তভাবে একীভূত থাকে, সেই জন্য উহাকেও যোগাখ্যা দিলেও দেওয়া যাইতে পারে। যাই হ'ক, মা এ অধ্যায়ে প্রথমেই বলিলেন, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যতা ও বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানতা যাহার আছে, সেই যোগী; শুধু সংসারে কর্ম্মব্যাপৃত থাকিলে বা শুধু কর্ম্মত্যাগী অনাশ্রমী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলে যোগী হওয়া হয় না। এই যোগী হইবার জন্য প্রথমে যোগেচ্ছু হইতে হয়। এবং যোগেচ্ছু হইবার একমাত্র উপায় কর্ম্মাধিকারে থাকা—আশ্রমধর্ম্মে যুক্ত থাকা। আশ্রমকর্ম্মে অনাস্থা আসিয়াছে, সুতরাং যোগেচ্ছু হইয়াছে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যোগারূঢ় হইবার অধিকার যোগেচ্ছুর—কর্ম্ম-বিরক্তের নহে। যোগারূঢ়ের লক্ষণ সর্ব্বভোগেচ্ছারাহিত্য, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্মেচ্ছার বিসর্জ্জন। আশ্রমবিহিত কর্ম্ম করিব না, কিন্তু দেশে দেশে ধর্ম্মবক্তৃতা দিয়া বেড়াইব, মঠ স্থাপন করিব, শিষ্যসংঘ গঠিত করিব, ইহা যোগারূঢ় হইবার অধিকারী পুরুষের

লক্ষণ নহে। সুতরাং সেরূপ আশ্রমত্যাগী পুরুষ ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ। যাই হ'ক, পুরুষ যোগেচ্ছু হইবার জন্য আশ্রমী থাকিবে এবং বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে এবং থাকিয়া থাকিয়া অন্তর্বৃত্তি পরমাত্মায় সংযুক্ত করিবার অভ্যাস করিবে। অথবা ইহাই হইবে যোগেচ্ছুর স্বতঃসিদ্ধ লক্ষণ। কেমন করিয়া সে সেই আত্মসংযুক্ত থাকিবার অভ্যাস করিবে, তাহাই এ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়বিধ যোগীর মধ্যে কর্ম্মী যোগীই মায়ের মতে যুক্ততম।

ঈশ্বরপ্রণিধান লইয়া, ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, সেই সমর্পণভাব ঘনীভূত হইলে, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার আদি অন্তর্ব্বৃত্তিসমূহ সমর্পণ করাই ধ্যানযোগের লক্ষণ। মূল তাৎপর্য্য, বাহ্য কর্ম্ম সমর্পণের নাম কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগ এবং অন্তর্বৃত্তি সমর্পণের নাম ধ্যানযোগ। বাহ্য কর্ম্মে ও অন্তরে আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, কর্ম্মসন্ন্যাস অভ্যাসকালে ধ্যানও অভ্যাস করিতে হয় বা কর্ম্ম অর্পণ করিবার সময় চিত্ত অর্পণ স্বতঃ ঘটিয়া থাকে; এই জন্য কর্ম্মসন্ন্যাস অধিকারে আসিবার সময় চিত্তসমর্পণের প্রণালী অবলম্বনে ধ্যানের অভ্যাস করা স্বাভাবিক। কর্ম্মবর্জ্জন সহজে যোগাবস্থা আনিয়া দিতে পারে না। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাহারা যোগী হইতে চাহে, অর্থাৎ বাহ্য বৃত্তি ভগবানে অর্পিত হইবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, যাহারা অন্তর্ব্বৃত্তি অর্পণের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহারা সন্ন্যাসী বা প্রকৃত যোগী নহে। তাহারা ভগবৎসাধন সমস্তটুকুই একটা কৌশলবিশেষ মাত্র, এই ভাবে অথবা নির্ব্বোধের বায়নার মত বিহিত কর্ম্ম ছাড়িয়া উদ্ভট কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়। শ্রদ্ধার প্রথম লক্ষণ—বাহ্য বৃত্তি ও অন্তর্ব্বৃত্তি অর্পণ, পরবর্ত্তী লক্ষণ—সম্যক্ আত্মসমর্পণ; এই উভয় লক্ষণ প্রকাশিত না হইলে যোগী হওয়া যায় না। শ্রদ্ধা জন্মিলে এই উভয় লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই পাইবে। এবং এইরূপ শ্রদ্ধাবান্ যে হইয়াছে, তাহার ইহজন্মে সম্যক্ যোগসংসিদ্ধি না হইলেও পরজন্মে ভগবান্ তাহাকে নিশ্চয় মুক্ত করিবেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ—যঃ কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ সন্ কার্য্যং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম করোতি, স এব সন্ন্যাসী চ যোগী চ; ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ সন্ন্যাসী যোগী বা ভবতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—যিনি ফলে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী এবং যোগিপদবাচ্য। অগ্নি-সাধ্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী বা ভগবদ্‌বোধশূন্য কর্ম্মময় গৃহী হইলেই যোগী হওয়া যায় না।

যৌগিক অর্থ।—ধ্যানযোগ বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে ভগবান্ ধ্যানাধিকার বর্ণন করিতেছেন। কর্ম্মসন্ন্যাস হইলে ধ্যানাধিকার হয়—কর্ম্মসন্ন্যাস না হইলে ধ্যানাধিকার হয় না। এই কর্ম্মসন্ন্যাস বিহিত কর্ম্ম বর্জ্জন করিলে হয় না, কর্ম্মফলে অনাশ্রিত হইয়া অর্থাৎ কর্ম্মফল অবলম্বন না করিয়া বা ফলের দিকে না চাহিয়া, স্ব স্ব আশ্রমোচিত বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তবেই যথার্থ কর্ম্মসন্ন্যাস হয়। ফলের দিকে না চাহিয়া যে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে-ই সন্ন্যাসী এবং সে-ই যোগী। যাগ যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম বা সংসার আশ্রমোচিত সাধারণ বিহিত কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিলেও সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আবার কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষেও তদ্রূপ; অক্রিয়াবান্ থাকিতে কখনও কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ যোগী হইতে পারে না। ভগবানে যুক্ত হইয়া যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম এবং ভগবানে যুক্ত না হইয়া যাহা অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই অকর্ম্ম, এ কথা কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বিচারকালে আমি বুঝাইয়াছি। কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ যদি ভগবদ্‌যুক্ত হইয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলে লক্ষ্য না করিয়া কর্ম্ম করিতে না পারে, তাহা হইলে সেও যোগী হয় না। কর্ম্ম ও অগ্নিত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না। আবার কর্ম্মে রত থাকিলেই যোগী হওয়া যায় না। আমি পরের শ্লোকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইতেছি। এখানে শুধু এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কর্ম্মত্যাগ করিলেই বা কর্ম্ম করিলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হওয়া যায় না। অনাশ্রিত-কর্ম্মফল হইয়া বিহিত

কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করিতে পারে, সে-ই সন্ন্যাসী, সে-ই যোগী অথবা সে সন্ন্যাসী হইলেও যোগী এবং যোগী হইলেও সন্ন্যাসী। অধিকন্তু ঐরূপ ধ্যানাধিকার লাভ করিতে হইলে অনাশ্রিত ভাবে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করা চাই। কেন না, যাহার প্রাণ ভগবৎশ্রদ্ধার আস্বাদ পাইয়াছে, সে কর্ম্মত্যাগ করিব বা কর্ম্ম করিব, কর্ম্ম সম্বন্ধে এ প্রকার কোনও সিদ্ধান্ত করিতে অগ্রসর হয় না। আমি আমার প্রাণতুল্য প্রিয় বলিয়া জগতে যাহাকে ভাবি, তাহার সেবায় রত থাকিব, কি তাহাকে বসিয়া বসিয়া দেখিব, এ প্রকারের কোন সঙ্কল্পই স্থায়িভাবে প্রাণে উদয় হয় না। আমি আমার পুত্রকে ভালবাসি বা তুমি তোমার কন্যাকে ভালবাস। আমরা বিহিত ভাবে যেমন তাহার লালন পালন করি, আবার কখনও বা বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অনিমেষলোচনে তাহার দিকে চাহিয়া থাকি—লালন পালন না করিয়া, শুধু মুখের দিকে চাহিয়া থাকি না, অথবা মুখের দিকে চাহিব না, শুধু লালন পালন করিব, এরূপ ভাবও প্রাণে উদিত হয় না। তেমনি ভগবৎসাধনা সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের বেগ যত দিন থাকিবে বা যখন যখন হৃদয় অধিকার করিবে, কর্ম্মরূপ যজ্ঞে আহুতি দিয়া তাঁহার সেবা করিতে হইবে। আবার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার আবেগ যখন আসিবে, তখন ধ্যানস্থ হইতে হইবে বা স্বতঃই ধ্যানস্থ হইয়া পড়িবে। ইহাই ধ্যান বর্ণনের পূর্ব্বে মা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

এই শ্লোকে "কার্য্যং কর্ম্ম" এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ বিহিত কর্ম্ম, সাধারণতঃ এইরূপ ধারণা আসে এবং সকলে সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত অর্থ উহা হইলেও ইহার মধ্যে আরও একটু ব্যাপক অর্থ আছে। কার্য্য অর্থে করণীয়। মা যেন বলিতেছেন, 'করণীয়' এই বোধ যত দিন থাকে, তত দিনই ত্যাগবুদ্ধি আসিলে তাহারই উপর আসিয়া থাকে অর্থাৎ ত্যাগ করিব বলিলেই বোঝায়, যেন কি একটা করণীয়রূপে রহিয়াছে এবং তাহারই ত্যাগে যত্নবান্ হইতেছি। 'ত্যাগ'রূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম 'কর্ম্ম';—কি ত্যাগ করিব ? 'কর্ম্ম' অর্থাৎ যাহা করণীয়। সুতরাং ত্যাগ-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করণীয় বুদ্ধি থাকে বা করণীয় ভাবে মনে জ্ঞানে উদিত হয়। যতক্ষণ এইরূপে কোন কর্ম্ম মনে জ্ঞানে করণীয় বলিয়া বা করণীয়ের বেগ লইয়া উদিত হইবে, তত দিন বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কর্ম্মবেগ যত দিন থাকিবে, তত দিন কর্ম্ম ছাড়িবে না—সে কর্ম্ম ইন্দ্রিয়বেগ-জনিত হউক, অথবা কর্ত্তব্য-বোধ-প্রণোদিতই হউক। যত দিন দেখিবে—তোমার জ্ঞান, তোমার মন, তোমার প্রাণ বা তোমার ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ কর্ম্ম করিতে চাহে, তত দিন তোমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। সুতরাং কর্ম্মবেগ থাকিতে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া সন্ন্যাসী হইতে চাহিও না ; পলাইলে উদ্ভট কর্ম্মী হইতে হইবে। পলায়নের আবশ্যকতা নাই, কেন না, সন্ন্যাসী ও যোগী একই জিনিষ ; অনাশ্রিত-কর্ম্মফল হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিলেই

সন্ন্যাসীও হওয়া হয় এবং যোগীও হওয়া হইল। কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও যদি আত্মসংস্থ থাকা ভিন্ন অন্য কর্ম্মসঙ্কল্প হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ থাকে, তবে সেরূপ সন্ন্যাস বিড়ম্বনাময় ও পাপজনক।

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

হে পাণ্ডব! জ্ঞানিনঃ যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ, তম্ এব ত্বং যোগং বিদ্ধি। হি যতঃ অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন যোগী ন ভবতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন! জ্ঞানিগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়াছেন, তুমি তাহাকেই যোগ বলিয়া অবগত হও। সঙ্কল্প ত্যাগ ভিন্ন কেহ কখনও যোগী হইতে পারে না।

যৌগিক অর্থ।—সন্ন্যাসও যাহা, যোগও তাহাই। কর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসের বা যোগের সম্বন্ধ নাই। সমস্ত সঙ্কল্প পরমাত্মায় সংন্যস্ত হইয়াছে কি না, ইহাই দ্রষ্টব্য। মাকে ছাড়া প্রাণ আর কিছু চাহে কি না, ইহাই দেখিতে হইবে। মাকে ছাড়া প্রাণ যত ক্ষণ আর কিছু চাহিবে, তত ক্ষণ সন্ন্যাস বা যোগ কিছুই সংসাধিত হয় না। কর্ম্ম জানি না, ত্যাগ জানি না, জানি শুধু মা—চাহি শুধু মা, ইহা না হইলে সন্ন্যাসীই হউক, আর কর্ম্মীই হউক, কেহই যোগিপদবাচ্য হইতে পারে না। সন্ন্যাস লইতে যাও বা কর্ম্মী হইতে যাও, লক্ষ্য মাতৃঅঙ্কে যুক্ত হওয়া—লক্ষ্য পরমাত্মায় নিজ আত্মা মিশাইয়া দেওয়া। ইহা না হইলে সন্ন্যাস বা কর্ম্ম কথার কথা, মূল্যহীন।

তোমরা ধ্যানযোগী হইতে চাহ—ধ্যানে মায়ে যুক্ত হইতে চাহ এবং তাহার পন্থা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া থাক। কর্ম্ম ছাড়িতে শিক্ষা দাও—আবার কেহ বা কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়া থাক—আবার সেই কর্ম্ম ছাড়া ও কর্ম্ম করার ভিতর কত বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায় রচনা কর। কিন্তু লক্ষ্য কর না, প্রাণ মাকে কতটা চাহিয়াছে। সঙ্কল্প কতটা একমুখী হইয়া, মাতৃমুখী হইয়া, লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার সমগ্র চেতনা, সমগ্র প্রাণ যদি মাতৃ-অস্তিত্ব স্মরণ মাত্রে ঝঙ্কার দিয়া উঠে—তোমার সমগ্র হৃদয় মাতৃ-বেদনায় যদি সম্বেদিত হয়—আমার মা বলিতে যদি তোমাদিগের চক্ষু অশ্রুপ্লুত হয়—আমার প্রাণ বলিতে যদি তোমাদের প্রাণ তোমাদের সমস্ত জড়তা ভুলাইয়া দেয়—আমার আত্মা বলিতে যদি তোমরা আত্মাকে বক্ষে খুঁজিয়া পাও, তবে জানিবে, তোমরা সন্ন্যাসী হইয়াছ, অথবা কর্ম্মী হইয়াছ, অথবা উভয়ের সাধারণ আখ্যা যাহা, সেই যোগী আখ্যা লাভ কারয়াছ।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩

যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে, যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণম্ উচ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যে মুনি যোগারোহণে অভিলাষী, কর্ম্মই তাঁহার একমাত্র সহায় এবং যিনি যোগারোহণ করিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগই তাঁহার তখন প্রশস্ত সহায়।

যৌগিক অর্থ।—সন্ন্যাসীই হও, আর গৃহীই হও, চাই তোমার যোগী হওয়া। কিন্তু যোগী হইবার পূর্ব্বে যোগী হইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছ কি না, এইটুকু দেখিতে হইবে। সন্ন্যাসী গৃহী প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দাও; দেখ শুধু দুইটা—যোগী হইয়াছ কি না, অথবা যোগী হইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছ কি না,—যুক্ত হইয়াছ কি না, অথবা যোগেচ্ছু হইয়াছ কি না,—মাকে দেখিতেছ কি না, অথবা মাকে দেখিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে কি না। যত ক্ষণ মাকে না দেখিবে, অর্থাৎ মায়ের ভাষায় যতক্ষণ না যোগারূঢ় হইবে, তত ক্ষণ কর্ম্মই তোমার সাধনা। আর মাকে দেখিলে 'শমঃ' বা কর্ম্মের উপশমতাই সাধনা। মাকে দেখিবার ইচ্ছা জাগিলে মাতৃমুখী কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। স্বতঃই সে কর্ম্ম-সকলকে মাতৃমুখী করিয়া লয়; স্বভাবতঃই তাহার কর্ম্মসকল মাতৃমুখী হয় এবং সেই মাতৃমুখী কর্ম্মসকলই তাহাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ডুবাইয়া লইয়া যাইতে থাকে ও মায়ের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। মাকে দেখা, মাকে তৃপ্ত করা ভিন্ন তাহার কর্ম্মে অন্য ফলাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য হয় না, এবং বাহ্য হইতে অন্তরে চিত্ত স্বতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে। এবং মায়ের নিকট উপস্থিত হইলে, পরমার্থ-দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইলে কর্ম্মসকল স্বভাবতঃই নিবৃত্ত হইয়া যায়, অথবা স্বভাবতঃই সে পরমাত্মবোধে কর্ম্মতরঙ্গ-সকল চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়া যাইতে থাকে। এই স্বাভাবিক গতি লক্ষ্য কর,—প্রাণের এই স্বাভাবিক গতি লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তব্য নিরূপণ কর। যোগেচ্ছু হইলেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে ছুটিও না।

যোগারূঢ় ত দূরের কথা—সত্য সত্য যোগেচ্ছু কয় জন হইয়াছ? কয় জন মায়ের প্রাণে সমগ্র প্রাণটুকু ঢালিয়া দিবার জন্য সাধনপথে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইতেছ? আত্মনিবেদনের জন্য যথার্থই কাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে? তবে কেন এত বিচার? কেন এত সম্প্রদায় গঠন? কেন এত স্বভাবসিদ্ধ সংসার আশ্রমের উপরে আক্রমণ? আবার সংসারীর ভিতরও কেন এত মতভেদ,—কেন এত তত্ত্ববিশ্লেষণ, কেন এত ত্যাগ গ্রহণের হুড়াহুড়ি, কেন এত প্রণালী নির্ব্বাচন—সম্প্রদায় নির্ব্বাচন?

দেখ শুধু দুইটা—যোগী হইয়াছ, অথবা যোগেচ্ছু হইয়াছ। কিংবা দেখ, যোগেচ্ছু হইয়াছ, অথবা যোগেচ্ছু হও নাই। এটা ছাড়, ওটা ধর, অথবা সব ছাড়, সব ধর, এ ভাব বুক হইতে মুছিয়া ফেল। যোগী হইলে কর্ম্ম আপনিই ছুটিয়া যাইতে চাহিবে।

'যোগারুরুক্ষু' বা যোগেচ্ছু হইলে তোমার কর্ম্মসকল মাতৃকর্ম্মে পরিণত হইতে থাকিবে। যদি যোগেচ্ছু যথার্থ হইয়া থাক, তবে কর্ম্মসকলকে সেই ভাবে সংকল্পশূন্য আত্মসংবেদনময় হইয়া করিতে প্রয়াস পাও, কর্ম্ম ছাড়িতে ব্যস্ত হইও না।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

যদা যস্যাং জ্ঞানঘনাবস্থায়াং ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিবিষয়েষু, কর্ম্মসু নিত্যনৈমিত্তিকাদিষু চ ন অনুষজ্জতে স্বভাবত এবানুরক্তিং ন করোতি, অথবা পরিদৃশ্যমানেষু বিষয়েষু কেবলং জ্ঞানঘনবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্ততে, সঙ্কল্পানাং যোগারোহণবিঘ্নকরত্বাৎ সর্ব্বান্ সঙ্কল্পান্ সম্যক্ ন্যসিতুং শীলমস্যেতি সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী ভবতি, তদা যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ উচ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যখন ইন্দ্রিয়বিষয়ে এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদিতে বুদ্ধি লিপ্ত হয় না ও সকল প্রকার সঙ্কল্প আপনি তিরোহিত হইয়া যায়, পুরুষ তখনই যোগারূঢ়-পদবাচ্য হইয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—যোগারূঢ় বা যোগী অর্থে জ্ঞাননিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসীকে বুঝায় না। জ্ঞান ঘনীভূত অবস্থা লাভ করিলে সমস্ত সংকল্প বিদূরিত হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়-আকাঙ্ক্ষিত কর্ম্মে তখন আর অনুলিপ্ত হইতে হয় না, ইন্দ্রিয়সকল তখন বিষয় দেখিতে যত্নশীল থাকে না, অথবা বিষয়সকলকে পরমাত্মারই মহিমা বলিয়া দর্শন করিয়া, বিষয় দর্শনে পরমাত্মদর্শন সংঘটিত করে; এবং তখনই যথার্থ জ্ঞানী বা যোগারূঢ় হইয়াছ বুঝিতে হইবে। যোগের ইচ্ছা প্রাণে জাগিতে না জাগিতে যোগারূঢ় হইয়াছি ভাবিয়া কর্ম্ম বর্জ্জন করিও না। প্রপঞ্চ দর্শনে যত দিন না মাতৃঅঙ্গ দর্শন করিবে, জগৎ দেখিতে যত দিন না জীবন্ত জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করিবে, অর্থাৎ বাহ্য বিশ্ব ও আমার অন্তর্বিশ্ব, উভয়ই একজন জ্ঞানময়ের জ্ঞানবিলাস বলিয়া যত দিন না হৃদয়ঙ্গম হইবে, অথবা জীবন্ত জগজ্জননীকে জগৎরূপে মূর্ত্তিমতী দেখিতে গিয়া তাঁহার বাহ্য জগন্মূর্ত্তি ভুলিয়া, মায়ের আত্মস্বরূপতায় পরমাত্মবোধময় হইয়া যত দিন না জগদ্‌বিজ্ঞান হারাইয়া ফেলিবে, তত দিন বুঝিও—তুমি যোগারূঢ় হও নাই। এবং তত দিন তুমি কখনও তোমার এই সাক্ষাৎ বিশ্বরূপিণী জীবন্ত মাকে দেখিতে দেখিতে বিষয়দর্শনসঙ্কল্পশূন্য ভাবে তাঁহার কর্ম্ম করিবে, কখনও বা তাঁহার রূপ ভুলিয়া তাঁহার আত্মধর্ম্মে আত্মহারা হইয়া যাইবে। কখনও মাতৃত্বের এ স্থূল বিকাশে, এই রূপময়ী মায়ে কর্ম্মের আকারে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, আবার কখনও তাঁহার রূপ গুণ ভুলিয়া, শুধু মাতৃধর্ম্মে, শুধু মাতৃত্বে, শুধু পরমাত্মবোধে আত্মহারা হইয়া যাইবে। তোমার বদ্ধ জীবত্বের পরিপোষক সঙ্কল্প কিছু থাকিবে না।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫

ফলাকাঙ্ক্ষারহিতেন কর্ম্মণা যোগারূঢ়ত্বমধিগম্য সংসারমগ্নং আত্মানং আত্মনা উদ্ধরেৎ, ন আত্মানমবসাদয়েৎ কর্ম্মপরিত্যাগেনাধো নয়েৎ; হি যতঃ আত্মৈব—নান্যঃ

কশ্চিৎ, আত্মনো বন্ধুঃ ভববিমুক্তয়ে উপকারকো ভবতি, আত্মৈব আত্মনো রিপুঃ অকালকর্ম্মপরিত্যাগেনাবসন্নঃ সন্ শত্রুর্ভবতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—আত্মা দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিবে ; আত্মাকে কখন অবসন্ন করিবে না। যেহেতু আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু হইয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিও না, আপনি আপনাকে উদ্ধার কর। আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার শত্রু। আত্মোদ্ধারের পূর্ব্বে কর্ম্মবর্জ্জন করিলে আত্মাকে অবসন্ন করা হয়, এই কথাটুকু বলিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা। পলাইও না—বীরের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থান কর—বীরের মত রুধিরপ্লাবিত হইতে হইতে কর্ম্ম কর। আত্মোদ্ধারের জন্য কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ জ্ঞানে আত্মসম্বন্ধযুক্ত হইয়া, সত্ত্বগুণ লক্ষ্য করিয়া, রজোগুণোৎপন্ন কর্ম্মচাঞ্চল্য অবলম্বন করিয়া, তমোগুণাত্মক অবসন্নতা হইতে নিষ্কৃতি পাও। সত্ত্বগুণের বিকাশ সম্যক্‌ভাবে তখনই হইয়াছে বুঝিবে, যখন ফলাকাঙ্ক্ষা আর উঠিবে না। যত দিন হৃদয়ে কর্ম্মতরঙ্গ উঠিলেও কর্ম্ম করিতে উদ্যম আসিবে না, তত দিন জানিবে, তুমি তমোগুণের অন্তর্ভুক্ত আছ। ঐ যে তুমি কর্ম্ম হইতে পলায়ন করিতে চাহিতেছ, উহা তমোগুণেরই অভিব্যক্তি। কেন না, তোমার বুকে কর্ম্মতরঙ্গ উঠে বলিয়াই তুমি কর্ম্মজঞ্জাল হইতে আপনাকে অপসারিত করিতে প্রয়াস পাইতেছ। ইহাতে তুমি আপনারই শত্রুতা করিতেছ মনে রাখিও। কেন না, সংসারাশ্রমের বাহিরে গিয়াও হয় তুমি অবিহিত কর্ম্মী অথবা আলস্যপরায়ণ হইবে।

এ ত সাদা কথা। কর্ম্মবীরকে আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড় করাইবার জন্য, আত্মবীর্য্যে নির্ভর করিতে শিক্ষা দিবার জন্য—বীর্য্যবান্ উপদেশের ছলে যাহা বলিলে, তাহা ত শুনিলাম। কিন্তু তোমার নিজ স্বরূপবাচক যে আত্মা শব্দ এই শ্লোকে ব্যবহার করিয়াছ, সেই আত্মস্বরূপের পরম ভাব যত দিন না হৃদয়ে প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত করে, তত দিন কি এ কর্ম্মাবর্ত্তনে ক্ষণেকের জন্যও অবসন্ন না হইয়া কেহ থাকিতে পারে ? টলিতে হয়, পড়িতে হয়, অবসন্ন হইতে হয়, বিফলতার পিচ্ছিলতায় বার বার পদ স্খলিত হয়। আবার তোমারই স্মরণে অবসাদাচ্ছন্ন প্রাণটাকে প্রভাতের সূর্য্যের মত নব উদিত করিয়া, উৎসাহ ও আশ্বাসের রক্তারুণে রঞ্জিত করিতে হয়। তুমি আমার আত্মা, বিশ্বের আত্মা, বিশ্বেশ্বরী তুমি, আমারও আত্মা তুমি ; সুতরাং আমিও তুমিই—এই সত্য অনুস্মরণে অবসন্নতার শীতল পরশ বিদূরিত করিতে হয়। যে পারে, সে তোমায় বন্ধুরূপে পাইয়াছে ; যে না পারে, সে আপনারই শত্রুতা সাধন করিতেছে অর্থাৎ সে আপনাকে সাক্ষাৎভাবে চাহিতেছে না। ইহাই এ শ্লোকের অন্তর্গত তাৎপর্য্য।

আত্মা শব্দের ব্যাখ্যা আমি পূর্ব্বে করিয়াছি—আত্মার ব্যাখ্যা হয় না। তুমি যে প্রাণটা দিয়া তোমার পুত্রকে ভালবাস, মায়ের চক্ষু দিয়া পুত্রের মুখের উপরে যে প্রাণটা প্রবাহিত হয়, ভাষাবর্ণনায় অপুত্রককে তাহা কি বুঝান যায় ? একটা মানুষকে বারেকের জন্য দেখিতে—শুধু দেখিতে যে প্রাণটা তোমায় দিবারাত্রি অপেক্ষার, উৎকণ্ঠার আবেগে মুক্তআঁখি করিয়া রাখে—জগতের একখানা মুখ শুকাইলে যে প্রাণটা তোমার সমগ্র জগৎটাকে মরুভূমির শুষ্ক বিস্তার দেখে, সে প্রাণটা কি ভাষার তুলিতে আঁকিয়া প্রাণবোধশূন্য শিশুর হৃদয়ঙ্গম করান যায় ? একটা পুত্র, একটা স্ত্রী, একটা বন্ধু, একটা আত্মীয়, যে কোনও একটা কাহাকেও আপনার বলিয়া বুঝিলে যে প্রাণটা আপনাকে একেবারে হারাইয়া, তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে, সে প্রাণটাকে কি প্রাণহীন জড় মনুষ্যকে বুঝান যায় ? আর সেই প্রাণ যার ধর্ম্ম, যাহার সবটা সেইরূপ প্রাণময়, সেই আত্মাকে আমি ভাষায় ফুটাইয়া কেমন করিয়া বুঝাইব ? আত্মা শব্দের ব্যাখ্যা আত্মাতেই হয়, ভাষায় হয় না। আত্মা শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইলে আত্মজ্ঞ পুরুষ আত্মহারা হয়, আর অনাত্মজ্ঞ পুরুষ তাহাকে জড়বৎ গ্রহণ করিয়া ফেলে।

আমি জড় ভাষায় আত্মা শব্দ বুঝাইতেছি—অততি ব্যাপ্নোতি ইতি আত্মা। পদার্থের মূল কারণ—যাহা পদার্থ আকারে ব্যক্ত হয়, তাহাই তাহার আত্মা। পদ অর্থাকারে ব্যাপ্ত হইলে পদার্থ হয়, আর সেই পদই সেই পদার্থের আত্মা। যিনি এই জগৎরূপ অর্থাকার গ্রহণ করিয়া ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছেন, তিনিই এ জগতের আত্মা। যে প্রাণ তুমি আমি সাজিয়াছে, যে প্রাণ শশী সূর্য্য সাজিয়াছে, যে প্রাণ গ্রহ উপগ্রহ সাজিয়াছে, যে প্রাণ আকাশ বায়ু অগ্নি সাজিয়াছে, যে প্রাণ দ্যুলোক ভূলোক সাজিয়াছে—যে প্রাণ দেবতা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর মনুষ্য সাজিয়াছে—যে তোমার আমার সবিতৃ মা— তোমার আমার প্রাণ—যে প্রাণ শশী সূর্য্যের সবিতৃ মা, শশী সূর্য্যের প্রাণ—যে প্রাণ গ্রহ উপগ্রহের সবিতৃ মা, গ্রহ উপগ্রহের প্রাণ—যে প্রাণ আকাশ বায়ু, অগ্নি জলের প্রাণ—যে প্রাণ দ্যুলোক ভূলোকের সবিতৃ মা—দ্যুলোক ভূলোকের প্রাণ—যে প্রাণ দেবতা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর মনুষ্যের সবিতৃ মা——দেবতা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর মনুষ্যের প্রাণ—যে প্রাণ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সাজিয়াছে—আব্রহ্ম স্তম্বের সবিতৃ মা—আব্রহ্ম স্তম্বের প্রাণ, সেই মাকে, সেই প্রাণকে, সেই অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মাকে আমার প্রাণ বলিয়া, আমার মা বলিয়া বার বার গ্রহণ করিয়া, আপনার অবসন্নতা বার বার বিদূরিত করিতে থাকিবে। বিশ্বের এই আত্মমূর্ত্তি দেখিলে ইহা বন্ধু, আর অনাত্মমূর্ত্তি দেখিলেই ইহা শত্রুরূপে প্রতিপন্ন হয়। যাহারা অনাত্মমূর্ত্তিতে দর্শন করে, তাহারাই শুধু পলায়নপর হয়—তাহারাই ইহাকে শত্রুরূপে পায়, ইহাই এ শ্লোকের মূল তাৎপর্য্য। পরশ্লোকে এই কথাই মা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। চিৎ ও চিত্ত বিভাগ করিয়া যাঁহারা শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব দেখিতে চাহেন, তাঁহা-

দিগের জন্য সন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগ প্রশস্ত এবং চিৎ ও চিত্তময় ঈশ্বরকে দেখিয়া, তাঁহাতে স্বীয় আত্মবোধ নিমজ্জিত করিয়া, যাঁহারা একমাত্র ভূমা আত্মাকে দেখিতে চাহেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মমার্গ প্রশস্ত। এ কথা পরে বিশদ ভাবে বলিব। চিত্তরূপ মহিমার সাহায্যে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা অথবা চিত্তরূপ মহিমা "নেতি নেতি" করিয়া বাদ দিয়া আত্মতত্ত্বে উপনীত হওয়া, এই দুই পথ ত্যাগ ও যোগ নামে অভিহিত। ধ্যান কিন্তু উভয়েরই অধিকারভুক্ত। সেই ধ্যানের সাহায্যে উভয়কেই আত্মতত্ত্বে উপনীত হইতে হইবে। যে এইরূপে আত্মাকেই বা আত্মাতেই ভগবান্‌কে পাইতে প্রয়াসী হয়, সে আপনার বন্ধু, আর যাহার সেরূপ আত্মোদ্ধারের প্রয়াস আসে না, অনাত্মদর্শনেই মুগ্ধ থাকে, সে আপনারই শত্রুতা সাধন করে। আত্মাকে পাইতেই হইবে অর্থাৎ অনাত্মদর্শন হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

তস্য আত্মন এব আত্মা বন্ধুর্ভবতি, যেনৈব আত্মনা আত্মা জিতঃ। কথম্ভূতঃ? বশীকৃতকার্য্যকারণসংঘাতঃ। যশ্চাত্মা ইন্দ্রিয়সংঘাতেন, মনসঃ সংকল্পবিকল্পাভ্যাঞ্চ ন বিকম্পতে, ব্যাধভীতানাং মৃগাণাং বনাৎ গ্রামগমনমিব নিঃসঙ্গসুখমোহতঃ কর্ম্মত্যাগং প্রতি ন যততে, এবম্ভূতশ্চাত্মা আত্মনো বন্ধুর্ভবতি। কথম্ভূতঃ শত্রুর্ভবতি? অনাত্মনঃ অবিজিতাত্মনঃ। যেন সর্ব্বস্বরূপ আত্মা ন জিতঃ, সর্ব্বরূপেণ স্থিতং আত্মানং যো ন পশ্যতি, সর্ব্বরূপেণ সর্ব্বভাবেন চ স্থিতস্যাত্মনঃ যং যং রূপং ভাবং বা শত্রুবন্মন্যতে, তস্যৈবাত্মা শত্রুবদ্‌বর্ত্তেত। সর্ব্বরূপস্যাত্মনঃ যস্মিন্‌ কস্মিন্‌ রূপে ভাবে বা শত্রুত্বে শত্রুভাবে স্থিতে সতি স এব ভাবো রূপো বা অশত্রুরপি শত্রুবদ্‌ভবতি। অতঃ সর্ব্বস্বরূপমেবাত্মানং মন্যেত আত্মৈবেদং সর্ব্বং ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—যে আত্মা আত্মা দ্বারা বিজিত হইয়াছেন, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং যে আত্মা আত্মার দ্বারা বিজিত নহেন, তিনিই শত্রুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—কেমন করিয়া মানুষ আপনি আপনার বন্ধু হয়, আবার কি করিলেই বা আপনি আপনার শত্রুতা সাধন করে? যে আপনি আপনাকে জয় করে, কার্য্যকারণ-সঙ্ঘাতে যে আপনাকে ভাসাইয়া না দিয়া, স্বাবলম্বন গ্রহণে স্থির থাকে—কর্ম্মে ভীত হয় না, ইন্দ্রিয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত হয় না, মনের সঙ্কল্প বিকল্পে উঠিতে পড়িতে থাকে না অথবা কর্ম্মজঞ্জাল হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে, কিংবা নিঃসঙ্গতার কল্পিত সুখময় অবস্থান লাভ করিতে ব্যাধভীত হরিণের মত বন ত্যাগ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করে না, কিংবা মৎস্যের মত নবসুখের আশায় জলধারা অবলম্বন করিয়া, সরিৎ ছাড়িয়া ধরণীতে উত্থিত হয় না, তাহাদিগেরই আত্মা আত্মার বন্ধু।

অরণ্যে ব্যাধ বিচরণ করিতেছে জানিয়া, হরিণ যদি প্রাণভয়ে বনবর্জ্জনে গ্রামে প্রবেশ করে, তাহার সে পলায়ন যেমন তাহার মৃত্যুর কারণ হয়, সে যেমন আপনি আপনার শত্রুতাচরণ করে, অথবা মৎস্য যেমন বর্ষার দিনে জলধারা অবলম্বন করিয়া, পুষ্করিণী হইতে ভূমিতে উঠিয়া, আপনি আপনার মৃত্যু আহ্বান করে—কর্ম্মভয়ে অথবা নিঃসঙ্গ হইবার প্রলোভনে সংসার পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মত্যাগী হইলে ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্তই হইতে হয়। আবার সংসারে থাকিয়াও যদি আত্মনির্ভরশীল না হয়—যদি আত্মবলকে আয়ত্তীভূত না করে, ভগবদ্‌বলে বলীয়ান্ বলিয়া আপনাকে না জানে, তাহা হইলেও দুরবস্থা ঐরূপই হয়। মনুষ্য এইরূপেই আপনার শত্রু আপনি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বশ্লোকের প্রথমাংশের ব্যাখ্যার ইহাই উপসংহার। শেষাংশের উপসংহারে মা এই শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, এইবার তাহা বলিতেছি। আমি তাহারই প্রাণের বন্ধু—যে প্রাণ দিয়া আমাকে জয় করে। "আত্মা আত্মনা জিতঃ" অর্থে প্রাণ দিয়া প্রাণকে জয় করা। অনাত্মদর্শনে আত্মজয় হয় না, প্রাণ দিয়া তাঁহাকে জয় করিতে হয়। আমাকে যে প্রাণ দেয়—সমগ্র প্রাণটা যে আমার করিয়া দেয়, সেই আমাকে বন্ধুরূপে পায়। যাহার প্রাণ আমা ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করে না—গ্রহণ করিতে চায় না;—যাহার প্রাণ আমা ভিন্ন অন্য কিছু জানে না—জানিতে চাহে না, যাহার প্রাণ আমা ভিন্ন অন্য কিছু মানে না—মানিতে পারে না, সেই আমাকে বন্ধুরূপে পায়। যে শুধু আমাকে গ্রহণ করে, শুধু আমাকে জানে, শুধু আমাকে মানে, সে জগতের রূপে রসে, শব্দে স্পর্শে, গন্ধে শুধু আমাকেই পায়। তোমার পুত্র রামকে দেখিলে অন্য লোকে রাম দেখে, কিন্তু তুমি যেমন "পুত্র রাম" দেখ, তোমার বন্ধু হরিকে অন্য লোকে হরি দেখিলেও তুমি যেমন "বন্ধু হরি" দেখ, আমাকে যে প্রাণ দেয় নাই, সে এ জগৎকে জগৎ বা মিথ্যা বা ভ্রান্তি বা অচেতন দেখিলেও আমাকে যে প্রাণ দিয়াছে, সে আমাকেই জগৎরূপে দেখে। তোমার পুত্র রামকে দেখিতে দেখিতে তুমি যখন আত্মহারা হইয়া যাও, তখন তোমার প্রাণে রাম থাকে না—শুধু পুত্রবোধ থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া রামের রামত্ব যেমন উড়িয়া যায় না, অথবা রামের রামত্বকে যেমন ঘৃণা বা বর্জ্জন করিতে হয় না, অথবা রামত্বে যেমন দ্বৈত বোধ আসে না, আমাকে যে প্রাণ দিয়াছে, সে আত্মরূপী আমার আত্মবোধে বিভোর হইলেও, আত্মহারা হইলেও আমার জগন্মূর্ত্তি উড়িয়া যায় না বা আমার জগন্মূর্ত্তিতে তাহার ঘৃণা বা দ্বৈতবোধ আসে না। কে কোথায় পুত্রকে চিরিয়া পুত্রত্ব বাহির করিতে প্রয়াস পায়, কে কোথায় পুত্রকে বক্ষে লইয়া তাহার দেহ, মন ও আত্মা বিশ্লেষণ করিতে বিচারে প্রবৃত্ত হয়? ঋষিদের মত যাহারা আমাকে প্রাণ দেয়—উপনিষদের মত আত্মবেদনের তাহারাই শুধু দ্রষ্টা হয়, তাহারাই শুধু ভোক্তা হয়, তাহারাই শুধু আমার ভূমাসুখময় মূর্ত্তিতে সমাহিত হয়।

কিন্তু এ শ্লোকটিতে জীবাত্মার কথা হইতেছে। প্রথমেই আত্মার দ্বারা আত্মাকে

জয় করিতে হইবে। যাহারা আত্মার দ্বারা আত্মাকে জয় না করে, তাহারা আপনারই শত্রুতা করে। আত্মার দ্বারা আত্মাকে বা আপনার দ্বারা আপনাকে জয় করা কিরূপ? দেখ, তোমার ভিতর সর্ব্বপ্রকার পরিণামময় চিত্তবৃত্তির তলে তলে অপরিণামী "স্বয়ম্বোধ"টি সেই সমস্ত চিত্তবৃত্তির আশ্রয়স্বরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। জগৎ ভোগ অর্থই তোমার চিত্তের জগৎমূর্ত্তিভোগ। বাহ্য জগৎ তোমার চিত্তজগৎ রচনার উদ্দীপক কারণ মাত্র। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বা সুখদুঃখ যাহা কিছু ভোগ কর, যত কিছু ভোগ্য ও ভোগ তুমি উপলব্ধি কর, সে সকল তোমার জ্ঞানেরই মূর্ত্তি। এই জ্ঞানমূর্ত্তিগুলি পরিণামী, সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক। সেইগুলির তলে তলে লক্ষ্য ফিরাইলেই দেখিতে পাইবে, স্বয়ংনামীয় এক অপরিণামী নিত্যবোধ রহিয়াছে। সেই নিত্য নিজনামীয় বোধটিকে আশ্রয় না করিয়া তোমার অন্তরে কোন জ্ঞানক্রিয়া হয় না। তোমার সমগ্র বিশ্ব, বিষয়জ্ঞান ওই নিজজ্ঞানটিকে লক্ষ্য করিয়াই যেন ক্রিয়াশীল রহিয়াছে দেখিতে পাও। তোমার জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি পারবর্ত্তন তোমার নিজত্বের ভোগ সংসাধন করিতেছে দেখিতে পাও। কিন্তু মাত্র ভোগ সম্পাদন করা ওই চিত্ত বা জ্ঞানক্রিয়ার যেন লক্ষ্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে উহা তোমার অপবর্গ বা মুক্ত স্বরূপও আভাসিত করে। প্রতি বোধক্রিয়ার তলে তলে জ্ঞানচক্ষু সংলগ্ন করিলেই দেখিতে পাইবে—তুমি এত চঞ্চল চিত্তবিলাসের আশ্রয়-স্বরূপ থাকিয়াও কিছুমাত্র পরিণত হইতেছ না—তোমার বিশুদ্ধ "নিজ" আকারীয় বোধটির কোন বিপর্য্যয় ঘটিতেছে না, কোন প্রকারেই সে নিজবোধটি পরিণমিত হইতেছে না—একান্ত অসঙ্গরূপে স্থির, সর্ব্বপরিবর্ত্তনের সাক্ষিস্বরূপ অবস্থান করিতেছে। প্রতি চিত্তপরিণতির তলে তলে এই অসঙ্গ নিজবোধ বা আত্মবোধটি লক্ষ্য করিতে অভ্যাস করিলেই 'স্বয়ং'রূপ বোধটি যাঁহার পরিচায়ক, সেই আত্মাকে মৃত্যু বা পরিণাম-ময় চিত্তবিলাসের মধ্যে প্রভাশীলরূপে রহিয়াছেন লক্ষ্য করা যায়। এইরূপে আত্ম-স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিতজ্ঞান হওয়ার নামই আত্মজয়। পরে বিশদভাবে এ কথা বলিতেছি। এখানে শুধু এইটুকু স্মরণে রাখ, মোটামুটি আত্মজয় বলিতে কি বুঝায়। এইরূপে যাহারা আত্মাকে জয় করে, তাহারাই আপনি আপনার বন্ধু। যে মাত্র চিত্তবিলাসের আবর্ত্তনে অহর্নিশ মুহ্যমান থাকে, এই অসঙ্গ নিজত্বের দিকে লক্ষ্য ফিরায় না, সে আপনার শত্রুতা সংসাধন করে।

এরূপে আত্মোদ্ধারের উদ্দেশ্য—পরমাত্মায় সমাহিত হওয়া। বিশুদ্ধ স্থির আপনাকে দেখিতে না পাইলে, বিষয়চঞ্চল বা বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট আপনাকে বা নিজ-বোধটিকে পরমাত্মায় সমাহিত করা যায় না, অর্থাৎ আত্মার পরমাত্মত্ব ও পরমেশ্বরত্ব উপলব্ধ হয় না।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭

৪৩

জিতঃ প্রাপ্ত আত্মা অসঙ্গরূপো যেন, স জিতাত্মা, তস্য জিতাত্মনঃ, অতএব প্রশান্তস্য শীতোষ্ণাদিশারীরধর্ম্মেষু তথা সুখদুঃখমানাপমানাদিম্বন্তঃকরণধর্ম্মেষু অসঙ্গত্বাৎ প্রশান্তভাবমুপগতস্য পুরুষস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ সম্যক্ আহিতো ভবতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—জিতাত্মা পুরুষ শীতোষ্ণাদি শারীর ধর্ম্মে ও সুখদুঃখাদি বা মানাপমানাদি আন্তর ধর্ম্মে প্রশান্তভাবে অবস্থান করিতে পারেন এবং তাঁহার আত্মা পরমাত্মায় সমাহিত হইতে থাকে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে অনাত্মভোগময় সাধারণ জীবভাবের মধ্যে প্রতি চিত্তবৃত্তির তলে তলে অপরিণামী আত্মবোধ দর্শনের কথা বলিয়াছি। "দৃশিঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ"—আত্মা একাধারে শুদ্ধ হইয়াও সর্ব্বপ্রত্যয়ের অনুভোক্তা। এক দিকে জীব সাজিয়া জীবত্বের লীলা সম্পাদন করিতে বিষয়ভোগে মুহ্যমান। আবার অন্য দিকে সেই জীবত্বের সাক্ষিরূপে প্রতিষ্ঠিত একান্ত অভোক্তা, অকর্ত্তা, অসঙ্গ। সেই অসঙ্গ দিকে তিনি অপরিণামী বোধরূপে প্রকটিত, জীবত্বের দিকে সদা বিচঞ্চল, সর্ব্বভোগমগ্ন বিষয়াধীন। বিষয় বা চিত্তের সর্ব্বপ্রকার পরিণামের ভিতর দিয়া স্বীয় অপরিণামী স্বয়ম্বোধটি অবলম্বন করিয়া দেখিলেই দেখা যায়, বিষয়-চাঞ্চল্যে বস্তুতঃ তিনি চঞ্চল হন না, পরিণমিত হন না। সেই অপরিণামিত্ব দর্শনে যে অভ্যস্ত হয়, শীতোষ্ণাদি বা সুখ-দুঃখাদিতে আর সে সত্য সত্য আপনাকে চঞ্চল বলিয়া উপলব্ধি করে না, সর্ব্ব অবস্থার মধ্যেই আপনাকে প্রশান্ত দেখিবার যোগ্যতা সে লাভ করে। এক দিকে এইরূপে সে স্বীয় প্রশান্ততা দেখিতে পায় এবং সেই প্রশান্ততাদর্শনে অধিকার যত সুদৃঢ় হয়, তত সে স্বায় আত্মাকে ভূমা পরমাত্মস্বরূপে সমাহিত দেখে। সে দেখে, তাহার যিনি আত্মা, তিনি মাত্র তাহার আত্মা নহেন; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনিই আত্মা—তাঁহাতেই বিশ্ব উদিত ও অস্তমিত হইতেছে। তিনিই সর্ব্ব আত্মার আত্মা পরমাত্মা।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮

জ্ঞানং শাস্ত্রগুরূপদেশতঃ প্রাপ্তং, বিজ্ঞানং তস্য অপরোক্ষানুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা যস্য, স জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, অতএব কূটস্থঃ আকাঙ্ক্ষাপরিশূন্যত্বাৎ বিক্ষেপবিকাররহিতঃ, বিজিতেন্দ্রিয়ঃ বশীকৃতেন্দ্রিয়লালসঃ, অতএব সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ হেয়োপাদেয়বুদ্ধিরহিতত্বাৎ, এতাদৃশঃ যোগী যুক্তঃ যোগারূঢ় ইতি উচ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যাঁহার আত্মা জ্ঞানবিজ্ঞানলাভে তৃপ্ত হইয়াছে, যিনি কূটস্থ এবং বিজিতেন্দ্রিয়লালস, মৃত্তিকা, প্রস্তর এবং স্বর্ণে যাঁহার সমান জ্ঞান এবং সতত যিনি আত্মযুক্ত, এইরূপ পুরুষকে যোগী বলা যায়।

যৌগিক অর্থ।—গুরু ও শাস্ত্রোপদেশে জ্ঞান লাভ হয়, তত্ত্বতঃ সেই জ্ঞানের উপলব্ধি হইলে বিজ্ঞান লাভ হয়। গুরু ও শাস্ত্র হইতে এ বিশ্ব যে ব্রহ্মমূর্ত্তি অর্থাৎ

জ্ঞানময় ব্রহ্মই বিশ্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং ‘সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম’ অর্থাৎ এ বিশ্বমূর্ত্তি জ্ঞানমূর্ত্তি, এই কথাটি আমরা শিক্ষা পাই। সেই জ্ঞান তত্ত্বতঃ প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হয়। শ্রুতি বলেন, ‘দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে’—ব্রহ্মের দুইরূপ প্রকাশ ; অর্থাৎ এই জগতের মূল কারণ পরমাত্মা দুই রূপে নিত্য প্রকাশিত হন। জ্ঞানের সেই দুই মূর্ত্তির নাম আমরা নানারূপে দিই—চিৎ অচিৎ, আত্ম অনাত্ম ইত্যাদি। আমি পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, অপরিণামী নিজবোধলক্ষণযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশকে আত্মজ্ঞান, তদ্‌ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত পরিণামী জ্ঞানকে অনাত্মজ্ঞান বা চিত্ত নামে অভিহিত করা হয়। এ উভয়ই জ্ঞানমূর্ত্তি, এই হিসাবে ঋষিরা এই বিশ্বকে ব্রহ্মমূর্ত্তি বলিয়া দর্শন করিয়াছেন। আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, যত কিছু বিষয় দর্শন করি, সে সমস্তই যে বাহ্য বিষয় বা বিষয়-সংস্কার-সাহায্যে কৃত চিত্তেরই মূর্ত্তি, যাহা কিছু দেখি, আমাদের জ্ঞানকেই যে দেখি, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং আমার নিজবোধস্বরূপ যে জ্ঞানময় আত্মতত্ত্ব, উনি জ্ঞানময় বিশ্ব লইয়াই অহর্নিশ ভোক্তা সাজিয়া রহিয়াছেন—জ্ঞানময় পুরুষ জ্ঞানময় বিশ্বের ভোক্তা, ইহাই হইল আমাদিগের স্থূল তত্ত্বমূর্ত্তি। এইরূপ ভোক্তৃত্বের মধ্যে ঐ আত্মস্বরূপ অপরিণামী মূর্ত্তিটি ভোক্তা হইয়াও অসঙ্গ অভোক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, ইহা আমরা তত্ত্বানুভূতির সাহায্যে দেখিতে পাই এবং সেইরূপ তত্ত্বানুভূতির সাহায্যে সেই অসঙ্গ আত্মপ্রত্যয়সার মূর্ত্তিকে ভূমা, সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বজ্ঞ ও বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরভাবের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। এই প্রকার প্রত্যক্ষতা পাওয়াকে বিজ্ঞান লাভ করা বলে। এইরূপে যে পুরুষ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা হইয়াছে, সে পুরুষ সর্ব্বদা আপনাকে কূটস্থ দর্শন করে—সে দেখে, সে আপনি বিশ্বের ভোক্তা হইয়াও সর্ব্বদা স্থির অসঙ্গরূপে হৃদয়াকাশের অন্তরদেশে অধিষ্ঠিত। সে পুরুষ ইন্দ্রিয়ব্যবহারশীল হইয়াও ইন্দ্রিয়লালসাদ্বারা পরিচালিত হয় না এবং সমস্ত পদার্থের মূল জ্ঞানস্বরূপ দেখিয়া মৃৎ-পাষাণ ও কাঞ্চনে পার্থক্য দেখে না। জগদ্‌ব্যবহারে ভেদবুদ্ধি প্রকাশ করিয়া ব্যবহারশীল থাকিয়াও সে অন্তরে সমস্তের সমত্বই পরিদর্শন করে। সে আপনাকে কখনও পরমাত্মবিচ্যুত দেখে না অর্থাৎ জলে বরফখণ্ডের মত সে আপনার অস্তিত্ব নিত্য পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত বোধ করিতে থাকে। এইরূপ লক্ষণযুক্তকে যোগী বা যোগারূঢ় বলা হয়। এইরূপ যোগী হইবার উপায় জিতাত্ম হওয়া, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রতি জ্ঞানোপলব্ধির, প্রতি চিত্তবিলাসের তলে তলে অপরিণামী নিজবোধটিকে উপলব্ধি করায় অভ্যস্ত হইলে, তবে যোগী হইতে সক্ষম হওয়া যায়। যাহারা ব্রহ্মের এই উভয় মূর্ত্তিকে প্রতিনিয়ত দেখিতে অভ্যস্ত নহে, চিত্তবিলাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিলাস যাহারা দেখে না, তাহারা যোগিপদবাচ্য হইতে পারে না। অপরিণামী বোধটির প্রভাবে পরিণামী বিশ্ববোধ যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, আত্মবোধের সংযোগে বিশ্ববোধের সৃষ্টি এবং অসংযোগে বিশ্ববোধের লয়, এইরূপে উভয় জ্ঞানমূর্ত্তির সম্বন্ধ দেখিতে না পাইলে যোগী হওয়া যায় না।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু সাধুষু পাপেষু চ অপি যঃ সমবুদ্ধিঃ, স যোগী বিশিষ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও পাপী, এই সকল ব্যক্তিতে যাঁহার সমবুদ্ধি প্রবাহিত, তিনিই বিশিষ্ট যোগিপদবাচ্য।

যৌগিক অর্থ।—সমবুদ্ধিতাই যোগীর বিশিষ্টতা। তত্ত্ববোধে যোগস্থ থাকিবার অধিকার যত বাড়িতে থাকে, যোগীর চিত্তে তত সমদর্শন ও সমব্যবহারের ভাব ফুটিয়া উঠিতে থাকে। পরমাত্মপ্রাধান্য হৃদয়ে এক দিক্ দিয়া সঞ্জীবিত হয়, অন্য দিক্ দিয়া আমি যে বিশ্ব ভোগ করি, সে সমস্ত আমার জ্ঞানের বা চিত্তেরই গঠিত মূর্ত্তি, এই দুই দিক্ দিয়া বুদ্ধিসাম্য সংঘটিত হইতে থাকে। বুদ্ধিসাম্য না আসিলে কর্ম্মফলে অনাসক্তি ও আত্মার অসঙ্গত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, ক্ষণস্থায়ী উপলব্ধি আসিলেও তাহা দৃঢ় হইবার অবসর পায় না। সমবুদ্ধি যত প্রতিষ্ঠিত হয়, তত যোগীর যোগস্থ থাকিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সেই জন্য পূর্ব্বে যোগীর লক্ষণ বলিয়া, সেই যোগের পরিপক্ক অবস্থায় সমবুদ্ধিতার কথা এখানে বলা হইল। সুহৃৎ বা প্রত্যুপকারের আশাশূন্য উপকারী, মিত্র বা স্নেহ-প্রবণতাময় উপকারী, অরি, উদাসীন বা নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ বা বিবাদশীল উভয় পক্ষের মধ্যে থাকিয়া উভয়ের কল্যাণকামী হইয়া যে ব্যবহারশীল, দ্বেষ্য অপ্রিয়, বন্ধু বা প্রিয়, পুণ্যে বা পাপকার্য্যে, সকলের সম্বন্ধে যোগীর এই সমবুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ সুহৃৎ হইতে পাপী পর্য্যন্ত যে নয় প্রকার মনুষ্যের কথা শ্লোকে বলা হইয়াছে, মনুষ্যের যাবতীয় ব্যবহার প্রধানতঃ ইহারই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং যাবতীয় মনুষ্য-ব্যবহারে সমবুদ্ধিপরায়ণতাই যোগীর বিশিষ্টতা, ইহাই বলা এ শ্লোকের উদ্দেশ্য।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০

যোগী একাকী সততং রহসি স্থিতঃ সন্ যতং চিত্তং আত্মনি যস্য তথাভূতঃ যতচিত্তাত্মা, নিরাশীঃ আকাঙ্ক্ষারহিতঃ, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহেষু চিন্তাসু বিগততৃষ্ণঃ সন্ আত্মানং প্রত্যক্‌রূপং পরমাত্মনি যুঞ্জীত।

ব্যবহারিক অর্থ।—যোগী একাকী নির্জ্জনে অবস্থানপূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা এবং পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া, চিত্তবৃত্তি প্রত্যগাত্মায় সংযত করিবে এবং সেই প্রত্যগাত্মাকে পরমাত্মায় সমাহিত করিবে।

যৌগিক অর্থ।—মা এ অধ্যায়ের প্রথম ছয়টি শ্লোকে কর্ম্মসন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া ও যুক্তি-প্রণোদিত ইচ্ছাকৃত কর্ম্মত্যাগে আত্মার তামসিকতা পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া, পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে যোগীর সমবুদ্ধিতার বিশিষ্টতা

দেখাইয়াছেন। এই বুদ্ধির সমতা হইতে অন্তঃসন্ন্যাস যথার্থভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। অথবা অন্তঃসন্ন্যাসের সাহায্যে সমতা আরও বিশিষ্টতা লাভ করিতে থাকে। ধ্যানযোগকে প্রকৃত পক্ষে অন্তঃসন্ন্যাস বা জ্ঞানসন্ন্যাসযোগ নামে অভিহিত করা যায়। বাহ্য কর্ম্ম ও বাহ্য ব্যবহারের সন্ন্যাস বা ভগবানে সমর্পণ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ নামে এবং প্রধানতঃ চিত্তবৃত্তিসকল ভগবানে সমর্পণ অন্তঃসন্ন্যাস বা ধ্যানযোগ নামে অভিহিত। পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মসন্নাস ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে জ্ঞানসন্ন্যাস বিবৃত হইয়াছে বলিলে ঠিক বলা হয়। জ্ঞান-সন্ন্যাসের প্রধান লক্ষণ, যোগী একান্তে একাকী অবস্থান করিয়া, সংযতচিত্ত, নিরাশী ও অপরিগ্রাহী হইয়া আত্মায় সর্ব্বদা সমাহিত হন। চিত্তের সংযতভাব, নিস্পৃহতা ও অপরিগ্রাহিতা, জ্ঞানসন্ন্যাসীর ইহাই প্রধান লক্ষণ। মূল শ্লোকে "যতচিত্তাত্মা" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ চিত্তের বৃত্তিসকলকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই তাহাকে "যতচিত্ত" বলা হয় এবং লোকে এইরূপ "যতচিত্ততা" লাভ করার প্রয়াসকে ধ্যানযোগের সোপানস্বরূপ ব্যবহার করে। কিন্তু বস্তুতঃ ধ্যানের মূল সোপান উহা নহে। আত্মায় "যতচিত্ততাই" অর্থাৎ ভগবানে সমস্ত চিত্তবৃত্তি প্রেরণাই ধ্যানযোগের সূচনা। চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বৃত্তিসকলকে চেষ্টার সাহায্যে বশীভূত করা, আর চিত্তের সেই বৃত্তিসকলকে ভগবানে সমর্পণ করিবার প্রয়াস পাওয়া, এ দুইয়ে পার্থক্য বিশেষ কিছু না থাকিলেও অসঙ্গ আত্মধারণারূপ একটু বিশেষত্ব শেষেরটিতে আছে। প্রথমেই যোগীকে চিত্তবৃত্তির তলে তলে এই অসঙ্গ আত্মানুভূতি অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সেই জন্য বৃত্তিসকলকে ওই আত্মতত্ত্বেরই সেবাব্যাপৃতারূপে দেখিতে হইবে। আত্মতত্ত্বরূপ জ্ঞানমূর্ত্তি বা পুরুষের চিত্ততত্ত্বরূপ শক্তি বা প্রকৃতি আকারীয় জ্ঞানমূর্ত্তি, ভোগ ও অপবর্গ সংসাধন করিতে নিয়ত যে ব্যাপৃতা, এইটি তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করিতে হইবে। যেখানে যেখানে ব্রহ্মের জগদ্‌বিলাস, সেইখানে সেইখানেই জ্ঞানাত্মক উভয় মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া এইরূপ লীলার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। চিত্ত যেখানে যেখানে ক্রিয়াশীল, সেইখানে সেইখানেই যুগপৎ আত্মার ভোক্তৃত্ব ও মুক্তত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, যোগীর ইহা উপলব্ধব্য। সাংখ্যদর্শনমতে পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সংসাধন করাই প্রকৃতির কার্য্য। বস্তুতঃ দেখাও যায়, চিত্তসংযোগে এক দিকে যেমন আত্মা ভোগময়রূপে পরিদৃষ্ট হন, অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অসঙ্গ মুক্তস্বরূপ প্রকট হয়। সাধারণ লোকে নিজের ভোক্তৃত্বটি অহর্নিশ দেখে, সর্ব্বদা সুখ দুঃখে মুহ্যমানরূপে আপনাকে বোধ করে; কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ তাহারই মুক্ত অসঙ্গ রূপটি যে ফুটিয়া রহিয়াছে, সেইটি দেখিতে পায় না এবং সেই জন্য আত্মা যে ভোক্তা হইয়াও অভোক্তা, কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, এ তত্ত্বের ধারণা করিতে পারে না। ঐ অসঙ্গ আত্মবোধটি ভোক্তৃত্বের তলে তলে উপলব্ধি করিয়াই পুরুষ যোগিপদবাচ্য হয় এবং সম্যক্ আত্মজ্ঞান ক্রমশঃ লাভ করে।

সেই পুরুষই এই অসঙ্গ আত্মবোধটি তত উজ্জ্বলরূপে দেখিতে সমর্থ হয়, যে একমাত্র আত্মকামনা ছাড়া অন্য আশা, অন্য কামনা পরিহার করে। অন্য আশা, অন্য আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে না রাখিলে পুরুষ অপরিগ্রাহী হয়, সেই জন্য নিরাশী ও অপরিগ্রহ বলিয়া যোগীকে এই শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে। চিত্তের কোন ভাবকেই সে পুরুষ গ্রহণ করে না। কেন না, সে কিছু চাহে না—সে চাহে আপনাকে। সে চাহে ভগবান্‌কে, সে চাহে আত্মার পরম আত্মাকে। জগতে অর্থাৎ চিত্তে তাহার চাহিবার অন্য কিছুই নাই, তাহার সমগ্র জীবনের সার্থকতা সে ঐ পরম পদে সংন্যস্ত দেখে। এরূপ দেখিবার অধিকার না আসিলে যোগী হওয়া যায় না।

শ্লোকটিতে 'রহসি স্থিতঃ' আর একটি কথা আছে। 'রহসি স্থিতঃ' অর্থে মাত্র বাহ্য জাগতিক নির্জ্জনতাকে লক্ষ্য করা হয় নাই, 'আমি আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতেছি না,' এইরূপ জ্ঞানে আরূঢ় হইলে তবে রহসি স্থিতঃ হওয়া যায়, অথবা আমি আমার ভগবান্‌কে দেখিতেছি, এইরূপ একাগ্রচিত্ত ভূমিতে অবস্থান করিলে রহসি স্থিতঃ বলা যায়।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২

শুচৌ দেশে ন অত্যুচ্ছ্রিতং নাত্যুচ্চং, ন অতিনীচং, চেলাজিনকুশোত্তরং কুশানাং উপরি অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম, তদুপরি চেলং বস্ত্রখণ্ডম্, এবম্প্রকারমাত্মনঃ স্থিরমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য, তস্মিন্ এব আসনে উপবিশ্য, তত্র যোগারুরুক্ষুঃ মনঃ একাগ্রং কৃত্বা, যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ সন্ আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ।

ব্যবহারিক অর্থ।—জ্ঞানসন্ন্যাস বা যোগেচ্ছু পুরুষ পবিত্র দেশে কুশের উপর চর্ম্ম, চর্ম্মের উপরে বস্ত্রখণ্ড দিয়া, নাত্যুচ্চ ও নাতিনীচ অচঞ্চল আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাতে উপবেশন করিবে এবং একাগ্রমনে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া, আত্মবিশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবে।

যৌগিক অর্থ।—তত্ত্বতঃ তাঁহাকে জানিবার জন্য জ্ঞানসন্ন্যাস বা যোগের আবশ্যকতা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আত্মবিশুদ্ধি না হইলে তত্ত্বদর্শন হয় না। আত্মবিশুদ্ধি শব্দের অর্থ—বিশুদ্ধ আত্মাকে উপলব্ধি করা। পূর্ব্বে যে অসঙ্গ আত্মনির্ণয়ের কথা বলিয়াছি, তাহা লক্ষ্য করিয়াই এখানে আত্মবিশুদ্ধি কথাটি বলা হইয়াছে। ভোগময় নিজত্বের মধ্যে অসঙ্গ নিজত্ব কেমন সুন্দরভাবে অবস্থান করিতেছে, সেইটিই প্রথমে সংযতচিত্তে আবিষ্কার করিতে হইবে। ভূমা পরমাত্মা একাংশে প্রত্যগাত্মরূপে তোমার তুমিত্বের মূলে অবস্থান করিতেছেন এবং সেই প্রত্যাগাত্মা অবলম্বন করিয়া একটি

ভোগময় অহংআকারীয় তুমি ফুটিয়া রহিয়াছ। ভোগময় তোমার অন্তরের মাঝে অভোক্তা সেই আত্মতত্ত্বটি পরিদর্শন করাই আত্মপরিদর্শন বা আত্মশোধন। যোগ অভ্যাসকারীকে একাগ্রমনা ও যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয় হইবার কথা শ্লোকটিতে বলা হইয়াছে। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক বৃত্তির নাম মন, স্মৃতি আদি সর্ব্বসাধারণ জ্ঞানক্রিয়া চিত্ত নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয় ও চিত্তক্রিয়া সংযত করিয়া, একাগ্রমনা হইয়া অর্থাৎ একপ্রত্যয়াবলম্বী হইয়া, এক সঙ্কল্পে আবচ্ছিন্ন ধারায় সঙ্কল্পবান্ থাকিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে, ইহাই আন্তরাসন। শুচিদেশে কুশাদি বাহ্যাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া, সর্ব্বজ্ঞানবৃত্তিকে, সুতরাং তৎসহ ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত করিলে বাহ্য ও আন্তর আসন প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এই দুইটি শ্লোকে প্রধান ভাবে আসন প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হইয়াছে। চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া, মনকে একাবলম্বিভাবে রাখিতে পারিলে চিত্তাকাশ নামে একটি আকাশ অন্তরে প্রকাশ পায়। সেই আকাশই যথার্থ সুখাসন। যত ক্ষণ না সেইরূপ চিত্তাকাশ প্রকাশ পায়, তত ক্ষণ বুঝিতে হইবে, আসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪

কায়শিরোগ্রীবং কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ মূলাধারাৎ সহস্রারপর্য্যন্তং সমং ঋজুং, অচলং, ধারয়ন্, স্বং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য ভ্রুবোর্মধ্যে দৃষ্টিং সংরক্ষ্য, অনেনোপায়েন দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ স্থিরো ভবেৎ শরীরং দৃষ্টিং চ স্থিরীকুর্য্যাৎ। তথা মনঃ সংযম্য একাগ্রং মনঃ পরমেশ্বরে সংন্যস্য ইতি ভাবঃ। মৎচিত্তঃ পরমেশ্বরে সমর্পিতান্তঃকরণঃ, তস্মিন্নেব সমগ্রং চিত্তমিত্যুপলভ্য, যুক্তঃ সন্, মৎপরঃ অহমেব তদিতি সারূপ্যম্ উপগম্য আসীত। তদা প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতো ভবতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—কায়, শির ও গ্রীবা সমভাবে রক্ষা করিয়া অর্থাৎ মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ঋজুভাবে রাখিয়া, নাসিকাগ্র বা ভ্রূমধ্যে অন্য কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া দৃষ্টি স্থির করিবে। তার পর মনকে সংযত করিয়া, সমস্ত জ্ঞানবৃত্তি আত্মায় সমর্পণ করিয়া, আত্মযুক্ত হইয়া, মৎপর হইবে এবং এইরূপে প্রশান্ত, অভীত ও ব্রহ্মস্থ থাকিবার অভ্যাস করিবে।

যৌগিক অর্থ।—মনের স্থান ভ্রূমধ্য অন্তরালে; সেই জন্য কোন কিছু চিন্তা করিতে হইলে দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে স্বতঃই সংস্থাপিত হইয়া যায় অথবা সুদৃঢ়ভাবে কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করিলে গভীর চিন্তায় অধিকার আসে। লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, মনের চাঞ্চল্যে দৃষ্টির চাঞ্চল্য; সাধারণ মানুষের চক্ষের দৃষ্টি অনবরত দিক্ হইতে দিগন্তরে ছুটিয়া যায়। মানস দৃষ্টি কোন এক বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন-

ভাবে স্থির করিতে গেলে চক্ষের দৃষ্টিও স্থির হইয়া যায়। সমকায়শিরোগ্রীব হওয়ার উদ্দেশ্য, স্নায়ুপ্রবাহকে সরলভাবে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতে দেওয়া। এইরূপে শরীরকে ও দৃষ্টিকে সংযত করিয়া, মনকে সংযত করিতে হয়। মনকে ধ্রুবলক্ষ্যে ধারণ করিয়া ভগবানে সমর্পণ করার নাম মৎচিত্ত হওয়া। স্বয়ং বা নিজবোধরূপে প্রতিভাত যে অপরিণামী ভগবৎসংস্থিতি আমাদের অন্তরে আছে, প্রতি জ্ঞানক্রিয়ার তলে তলে সেই অপরিণামী বোধময়কে লক্ষ্য করিলেই চিত্ত তাঁহাতে সমর্পিত হয় এবং সমর্পিত চিত্তদ্বারা তাঁহাতে যুক্ত হওয়া হয়। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে,—"ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥"—প্রতি জ্ঞানক্রিয়া, প্রতি বোধের তলে তলে নিজস্বরূপ অপরিণামী বোধটি ফুটাইয়া আত্মা যে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহারই ভোগ সংসাধন করিতে ও অপবর্গ বা মুক্ত স্বরূপ দেখাইতে চিত্ত যে সতত ক্রিয়াশীল, ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। সুদৃঢ়ভাবে বোধক্রিয়ার তলে তলে এই আত্মবোধের দিকে লক্ষ্য করিলেই তাঁহাতে যুক্ত হওয়া হয়। এইরূপে যুক্ত হইয়া, সেই যুক্ত ভাবকে এমন গভীর করিতে হইবে—সেই বোধে এমন তন্ময় হইতে হইবে যে, আপনাকে তদাকারে ভিন্ন অন্য আকারে দেখিতে পাইবে না। "অহম্ এব পরো যস্য, স মৎপরঃ"—আমিই সেই পর বা শ্রেষ্ঠ অন্বেষ্য আত্মা, এইরূপ জ্ঞানে উপনীত হইলে মৎপর হওয়া হয়। সে হওয়ায় বিন্দুমাত্র বাহ্য জীববোধের আভাস থাকিলে চলিবে না। ইহা কঠিন নহে; প্রত্যেক বোধক্রিয়ার তলায় নিজবোধটিকে ধীর স্থির ভাবে দেখা অভ্যাস করিলেই এ অবস্থা শীঘ্র লাভ করা যায়। যখন এইরূপে জীব আপনাকে পায়, তখন তাহার আত্মভাবটি ক্রমশঃ ভূমা অদ্বয় জ্ঞানে পরিণত হয় এবং সেইরূপ উপলব্ধি আসিলে তখনই আত্মার ব্রহ্মত্বে উপনীত হওয়া হয়। ইহারই নাম "ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত" হওয়া। চিত্তের তলে নিজবোধ অবলম্বনে সেই নিজবোধের ব্রহ্মত্বে বা মাত্র আত্মবোধ ভিন্ন সর্ব্ববোধের ঐকান্তিক বিলয়ে যে অদ্বৈত জ্ঞানাত্মক সংস্থিতি জীব লাভ করে, তাহাকেই বলে ব্রাহ্মী স্থিতি। যোগী এই প্রণালীতে প্রশান্তাত্মা, অভয়যুক্ত ও ব্রহ্মস্থ হওয়া নিত্য অভ্যাস করিবে।

মচ্চিত্ত কথাটি আর একটু ভাল করিয়া বলি। মচ্চিত্ত অর্থে আত্মস্বরূপ ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত। লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত পক্ষে চিত্ত সর্ব্বদাই আত্মবোধনামক ওই জ্ঞানমূর্ত্তিটির ভোগসম্পাদনে নিযুক্ত। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীব প্রকৃত পক্ষে চিত্তের বা জ্ঞানেরই বিভিন্ন মূর্ত্তির ভোক্তা—বাহ্য জগৎ বা বাহ্য শরীর উদ্রিক্ত করিবার কারণ মাত্র। শব্দ স্পর্শ, রূপ রস গন্ধাদি অথবা সুখ-দুঃখাদি যখন ভোগ করি, তখন জ্ঞানেরই সেই সব মূর্ত্তি ভোগ করি। চিত্তের যে বৃত্তি যখন ঐ আত্মবোধনামীয় জ্ঞানমূর্ত্তির সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই তাহা বৃত্ত্যাকার প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। চিত্তের যে অংশ আত্মবোধের সহিত মুখ্যভাবে সংযুক্ত না থাকে, চিত্তের সে দিকটি প্রলীন হইয়া

যায়। যে কারণেই হউক, নিজবোধের প্রভাবে চিত্তের বিচিত্র ভোগমূর্ত্তি সৃষ্ট হয়। এইরূপে চিত্ত, জীবের ভোগ সম্পাদন করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজনামীয় চিত্তবহির্ভূত জ্ঞানমূর্ত্তি যে রহিয়াছে, ইহাও সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেয় এবং আরও দেখাইয়া দেয় যে, সেই নিজনামীয় জ্ঞানমূর্ত্তিটি বিচিত্র চিত্তবিলাসের মাঝে থাকিয়াও বিন্দুমাত্র পরিণামিত হয় না—"নিজ" এ জ্ঞানটির কোন বিকৃতি ঘটে না। প্রতি চিত্তবৃত্তির ভোগের মাঝে ভোগকে ও নিজেকে এইরূপে আমরা অহর্নিশ দেখিতে পাই। কিন্তু ভোগটিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, নিজ জ্ঞানমূর্ত্তিটি অগ্রাহ্য ভাবে পড়িয়া থাকে এবং সেই জন্য প্রতি ভোগেই আমরা অভিভূত ও মুহ্যমান হইয়া পড়ি। ঐ নিজমূর্ত্তিটি লক্ষ্য করা অভ্যাস করিলে বুঝিতে পারি, চিত্ত প্রকৃতপক্ষে আমাতেই সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে; আমারই সেবা, আমারই তৃপ্তি, আমারই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ প্রতিনিয়ত করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে অপরিণামী আমি যে রহিয়াছি, ইহা জাগাইয়া দিতেছে। সুতরাং নিজবোধটি লক্ষ্যে আসিলেই চিত্ত যে তাহাতে সমর্পিত, ইহা স্বতঃসিদ্ধভাবে দেখা যায়।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫

এবমুক্তপ্রকারেণ সদা আত্মানং নিজবোধরূপং যুঞ্জন্ গৃহ্নন্ নিয়তমানসঃ নিঃশেষেণ যতং মানসং চিত্তং (আত্মনি) যস্য, স যোগী শান্তিং চিত্তবিকারবিক্ষোভাৎ সমতাং, নির্ব্বাণপরমাং নির্ব্বাণং পরমং (প্রাপ্তব্যং) যস্যাং তাং, মৎসংস্থাং আত্মরূপেণাধিষ্ঠিতস্য পরমেশ্বরস্য সরূপতাং অধিগচ্ছতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—নিঃশেষরূপে আত্মাভিমুখচিত্ত যোগী নিজবোধরূপ আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গ্রহণ করিতে করিতে নির্ব্বাণদায়িনী, আত্মরূপী পরমেশ্বরসারূপ্যরূপ শান্তি লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—পরমেশ্বর প্রতি জীবহৃদয়ে আত্মরূপে অবস্থান করেন। আমার চিত্তের মাঝে অপরিণামী নিজবোধরূপে প্রতিভাত জ্ঞানমূর্ত্তি মহেশ্বর স্বয়ং স্বয়ম্ভূমূর্ত্তিতে আপনাকে প্রকাশ করিয়া, প্রতি জীবের অন্তরে ঐরূপে বিরাজ করিতেছেন, প্রতি জীবের অন্তরে উনিই স্বয়ম্ভূ শিব, প্রত্যগাত্মরূপে সর্ব্বত্র প্রতিভাত। বাহ্য দিকে উনিই আমাদিগের জীবত্বের ধর্ত্তা, অন্তরে উনিই পরমাত্মা পরমেশ্বর। যে দিকে উনি জীবত্বের ধর্ত্তা, সেই দিকে সাংখ্য উহাঁকে চিতিশক্তি বা প্রত্যগাত্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন এবং গীতা উহাঁকে পরা প্রকৃতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। জীবত্বের দিক্ হইতে উনিই আমাদের মা, জগদ্ধাত্রী, পরমতত্ত্বের দিকে উনিই পরমাত্মা। উপনিষদ্, চিৎ ও চিন্মহিমা চেতনা, আত্মা ও আত্মমহিমাকে ভিন্ন করিয়া দেখেন নাই, ভিন্ন বা অভিন্ন, এরূপ দেখিবার আবশ্যকতা উপনিষদ্ উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ আত্মতত্ত্ব ও আত্মমহিমতত্ত্ব ভিন্ন করিয়া দেখিবার আবশ্যকতাও বিন্দুমাত্র নাই। শুধু জীব, ঈশ্বর ও পরমাত্মসংস্থিতিকে

বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার জন্য ভিন্নতা অভিন্নতা, ভিন্নাভিন্নতা প্রভৃতি নানারূপ পরিকল্পনা করা হয়। জীবত্বপ্রধান দর্শন হইলে এই প্রত্যগাত্মরূপ জীবত্ব, পরমাত্মরূপ পরমেশ্বরত্বে বিলগ্ন থাকিয়া, তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, এইরূপ বলিতে হয়। আবার বিশুদ্ধ আত্মত্ব দেখিলে, যে দিকে আত্মচেতনা জগদ্ভোগে ভোগময়ী, সেই দিকে আত্মা বিষয়ের রাগে রঞ্জিত ও বিষয়ের উপভোক্তা এবং প্রধানভাবে অন্য দিকে একান্ত অভোক্তা, এই ভাবে গ্রহণ করিতে হয়। সেই ভোগটি একটি রঞ্জনা মাত্র—প্রকৃত ভোগ নহে; ওই অসঙ্গ রূপটিই প্রধান মূর্ত্তি, ভোগরঞ্জনা স্ফটিকে জবারঞ্জনাবৎ তুচ্ছ, সাংখ্য এই ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষদ্, যুগপৎ ভোক্তা ও অভোক্তা—ব্রহ্মের দুইরূপ প্রকাশ, এই ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। এ সকল শুধু বুঝিবার বা গ্রহণ করিবার তারতম্য মাত্র। ভোগের মাঝে নিজবোধটি অবলম্বন করিয়া যিনি অসঙ্গ অথচ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক ও প্রেরক, তিনিই জীবের অন্তরে এক দিকে জীব ও অন্য দিকে ঈশ্বর সাজিয়া বিরাজ করিতেছেন, ইহাই দেখিতে হইবে। ভোগের মাঝে তাঁহার অপরিণামী আত্মমূর্ত্তিটি গ্রহণ করিয়া, আপনার তদ্রূপতা উপলব্ধি করিয়া, জীবত্ব সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাপিত করিয়া, পরমব্রহ্মরূপ পরমাত্মত্বে বিলীন হইতে হইবে।

পূর্ব্বশ্লোকে ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত হইবার কথা বলিয়াছেন। এ শ্লোকে আত্মার ব্রহ্মত্বদর্শনরূপ সাধনার পরিণতি কি, তাহাই বলা হইল। আত্মার ব্রহ্মত্ব দেখিতে হইলে প্রথমে ভোগের মাঝে অভোক্তা অথবা ভোক্তা ও অভোক্তারূপে যুগপৎ যে নিজবোধরূপটি চিত্তবেষ্টনের ভিতরে ও মূলে রহিয়াছেন, সেইটি প্রথম আবিষ্কার করিয়া, সে আত্মবোধের নিত্যত্ব ও অপরিণামিত্ব দেখিয়া, অভীতি ও প্রশান্ততা লাভ করিয়া, তার পর তাহাতে আরও সুগভীর ভাবে সংযুক্ত থাকিয়া, জীবত্বের কথা একেবারে বিস্মৃত হইতে হয় বা আত্মতত্ত্বে জীবত্বকে নির্ব্বাণ করিতে হয়। সেই নির্ব্বাণের ফল—শান্ত ব্রহ্মে অর্থাৎ তাঁহার চিন্মাত্র স্বরূপে একত্ব লাভ। এখানে মাত্র এই ফলটির কথা বলা হইল। কিন্তু ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তৃত্বরূপ সিদ্ধিও ইহার আনুষঙ্গিক ফল। সর্ব্বভাবময় চিত্তের তলে তলে এই নিজবোধকে দেখিতে দেখিতে, সেই দ্রষ্টার সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অসীম অনন্ত প্রকারের সিদ্ধিসকল সমুদ্ভাসিত হইতে থাকে। চিত্তের যে যে ভাবের উপর বা ভাবের মূলে আত্মত্ব দেখা অভ্যাস করিবে, সেই সেই চিত্তাংশই সাধকের অধীন হইয়া পড়িবে। ইহা পরে বলিব। প্রসঙ্গক্রমে মুক্তি ও সিদ্ধিঅভিমানী আত্ম-বিলাসের এই উল্লেখটুকু করিবার উদ্দেশ্য—জীবের হৃদয়ে আত্মার যেমন ভোক্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্বরূপ উভয় দিক্ দেখা যায়, তেমনই পরমাত্মাও নির্ব্বাণাশ্রয় হইয়াও অন্য দিকে চরাচরভোক্তা পরমেশ্বর, এইটি স্মরণ করাইয়া দেওয়া।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ১৬

হে অর্জ্জুন ! অত্যশ্নতঃ অত্যন্তং অধিকং ভুঞ্জানস্য, তথা একান্তমনশ্নতঃ অত্যন্তমল্পং ভুঞ্জানস্য ন যোগঃ অস্তি, তথাচ অতিস্বপ্নশীলস্য, জাগ্রতশ্চ যোগো ন ভবতি (অন্নব্যঞ্জনাদিভিরুদরস্যার্দ্ধং, উদকেন তৃতীয়ং পূরয়েৎ, বায়ুসঞ্চরণার্থং চতুর্থং শূন্যং রক্ষণীয়ং। অয়মেব যোগশাস্ত্রপরিপঠিতো ভোজনবিধিঃ।)

ব্যবহারিক অর্থ।—অত্যাহারী বা একান্ত স্বল্পভোজী, অতিনিদ্রাশীল বা একান্ত জাগরণশীল পুরুষের যোগাধিকার নাই।

যৌগিক অর্থ।—যোগাভ্যাসকারীর জন্য আহার ও নিদ্রার পরিমিত ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। অতিরিক্ত আহার করিলে বা অত্যধিকরূপে অনাহারী থাকিলে, অতিরিক্ত নিদ্রাশীল বা অত্যধিক জাগরণশীল হইলে শরীর ও মন আদি ইন্দ্রিয় অপ্রকৃতিস্থ হয়, সুতরাং যোগাভ্যাসে অন্তরায় সৃজন করে, চিত্তকে আত্মসংস্থ থাকিতে দেয় না। যোগ-সংসিদ্ধি লাভ হইলে এ সব বিচারের তত আবশ্যকতা থাকে না ; কিন্তু প্রথমে যোগনিষ্ঠ হইবার জন্য যাহারা যত্নশীল, তাহাদের পক্ষে এ সব নিয়ম অবশ্য পালনীয়। পাকস্থলীর দুই ভাগ অন্নব্যঞ্জনাদি, এক ভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করিবে এবং চতুর্থাংশ বায়ুসঞ্চালনের জন্য অপূর্ণ রাখিবে, ইহাই আহারের সাধারণ নিয়ম। নিদ্রার পক্ষে প্রথম ও শেষ, এই প্রহরদ্বয় ত্যাগ করিয়া, মাত্র মধ্য দুই প্রহর যোগীর নিদ্রায় অধিকার। যথাসম্ভব এইরূপ আহার ও নিদ্রার ব্যবস্থা যোগীকে অবশ্যই করা উচিত। এরূপ নিয়মে পরিচালিত না হইলে যোগাভ্যাসকারীর শরীর ব্যাধিগ্রস্ত, বিশেষতঃ বায়ুবিকারগ্রস্ত হইতে পারে।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭

পরিমিতাহারনিদ্রাদিনিয়মমুক্ত্বা ইদানীং যোগস্য দুঃখনাশকত্বং বিশিনষ্টি যুক্তাহারবিহারস্যেতি। যুক্তৌ আত্মবোধসম্মিতৌ আহারবিহারৌ যস্য, তথা কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য আত্মযুক্তচেষ্টস্য, তদ্বৎস্বপ্নাববোধস্য যোগঃ দুঃখহা ভবতি। ন তু আহারবিহারাদীনাং সংযমমাত্রেণৈব যোগো দুঃখহা ভবতি, পরন্তু আত্মবোধযুক্তৈব তত্র মুখ্যকারণমিতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—ভগবদ্‌যুক্তভাবে আহার বিহার, নিদ্রা জাগরণ ও কর্ম্মময় হইয়া থাকিলে যোগ দুঃখনাশক হয়।

যৌগিক অর্থ।—যোগফল দুই প্রকারে প্রকাশ পায় ; এক,—ত্রিবিধ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ, দ্বিতীয়—অমৃতত্ব বা ব্রহ্মৈশ্বর্য্যভোক্তৃত্বরূপ অমৃতলাভ। দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়াই পরম সুখ নহে। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া একপাদ এবং ভূমাসুখ-সম্ভোগ অন্য একপাদ—যোগের সফলতাকে ঋষিরা এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। “অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে” এইরূপ ভাবে মুক্তির উভয়লিঙ্গত্ব শ্রুতিসিদ্ধ। মাত্র প্রত্যগাত্মতত্ত্বদর্শনে ত্রিবিধ দুঃখের নাশ হয় এবং তাহাই পরম পুরুষার্থ, ইহাই

সাংখ্যমত ; সাংখ্য মাত্র এই পাদটির প্রাধান্য দিয়াছেন। এই অধ্যায়ে যে প্রথমেই প্রত্যগাত্মদর্শনের কথাই বলা হইতেছে, ইহা বলিয়াছি। আপনার অসঙ্গ, নিত্য, অপরিণামী আত্মবোধে অধিরূঢ় থাকিতে পারিলে সমস্ত দুঃখাবর্ত্তনের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, অর্থাৎ যোগ দুঃখহা হয়। সেইরূপ আত্মবোধজয়ী হইতে হইলে পরিমিতাহারবিহারী হইলেই চলিবে না, যোগাভ্যাসকারীকে সর্ব্বকর্ম্মে আত্মযুক্ত হইয়া বিচরণ করিতে হইবে। আহারে বিহারে, কর্ম্মে শয়নে, সর্ব্বদা অন্তর্যামী আত্মার দিকে চক্ষু সংন্যস্ত রাখিতে হইবে। ঘড়ির কাঁটা যেমন এক প্রান্তে প্রতি কালপরিমাণের চিহ্নে চিহ্নে পরিভ্রমণ করে, অথচ অন্য প্রান্তে স্বীয় আশ্রয়স্বরূপ কেন্দ্রদণ্ডে সংলগ্ন থাকে, তেমনই সর্ব্বকর্ম্মে, সর্ব্বচিত্তাবর্ত্তনে পরিভ্রাম্যমান হইয়াও তুমি যে অবিচ্ছিন্নভাবে অন্য দিকে আত্মস্থ রহিয়াছ, ইহা দেখা অভ্যাস করিতে হইবে। মহেশ্বরের দুইটি ভৃত্যের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—নন্দী ও ভৃঙ্গী। ভৃঙ্গ যেমন ফুলে ফুলে বিচরণ করিয়া একমাত্র মধুই সংগ্রহ করে, সেইরূপ যে সাধক কর্ম্মে কর্ম্মে বিচরণ করিয়া, প্রতি কর্ম্মময় বোধের তলে তলে মাত্র অন্তর্যামী আত্মাতেই লক্ষ্য রাখে, তাহাকে ভৃঙ্গী বলে। আর যখন কেহ মাত্র আত্মসমাহিত ভাবে নিশ্চেষ্টরূপে অবস্থান করিয়া আত্মানন্দের ভোক্তা হয়, তখন তাহাকে নন্দী বলে। যোগী হইতে হইলে প্রতি কর্ম্মে, প্রতি চিত্তআবর্ত্তনের তলে তলে আত্মসংগ্রহ বা নিজবোধটিকে দর্শন করিতে হয়। নিজবোধেরই বুকে বুকে সর্ব্ববোধক্রিয়া, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুপ্তি আদি সকল জ্ঞানপরিণাম যে সংঘটিত হইতেছে এবং প্রতি জ্ঞানক্রিয়াদ্বারা সেই নিজবোধটি যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে, এইটি শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে হইবে। এইরূপে সকল কর্ম্মকে আত্মসাধনায় পর্য্যবসিত করিয়া লওয়াকে ভগবানে যুক্ত হইবার একটি বিশিষ্ট পন্থা বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। টলিলে চলিবে না, আলস্য করিলে হইবে না, উপেক্ষা করিলে আক্ষেপ করিতে হইবে। আত্মোদ্ধারের জন্য কৃতসঙ্কল্প না হইলে সাধনার পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়।

এই যে নিজবোধটির কথা এত বিশদভাবে বলা হইল, ইহার মধ্যে "আমি" আকারীয় যে অভিমানটি নিজবোধের সঙ্গে জড়িত দেখিতে পাই, সেই অভিমানের তলে আত্মপ্রত্যয়সার অথচ আমিত্বাভিমান হইতে বিমুক্ত যে পরমচিন্ময় সত্তা, সেই জ্ঞানমূর্ত্তিকেই পাইবার জন্য যত কিছু সাধনা। সেই জ্ঞানমূর্ত্তিই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম আদি পদবাচ্য এবং আমাদিগের অর্থাৎ আমিত্বের জন্মস্থিতিলয়ের আশ্রয়। যে দিকে এইরূপে তিনি আমাদিগের আশ্রয়স্বরূপ, মায়ের মত প্রতি আমিত্বকে প্রসব করিয়া, বক্ষে লইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দিকে আমরা তাঁহাকে পরা চিতিশক্তি বা প্রত্যগাত্মরূপে প্রতি আমিত্বের অন্তরে দেখিতে পাই। সুতরাং যাহারা ভগবদ্ভাবে সাধনপরায়ণ, তাহারা ওই আত্মপ্রত্যয়েরই মূলে আত্মপ্রত্যয়েরই সারস্বরূপ অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বাত্মা

ভগবান্‌কে ধারণা করিবে এবং তাঁহাতেই আমার আত্মপ্রত্যয় জাত হইয়া রহিয়াছে, এইরূপে জীব ও পরমাত্মার সম্মিলন দর্শন করিবে। যাহারা এই অধ্যায়োক্ত প্রত্যগাত্ম-নিরূপণে সচেষ্ট, তাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রথমে আপনার নিজবোধটি সংগ্রহ করিয়া, পরে তাহার পরমাত্মহৃদয়ে সংস্থিতি দর্শন করিবার প্রয়াস পাইবে। একই সাধনার দুই প্রকার উপায়। কেহ প্রথমে প্রধান ভাবে ভগবদ্‌ভাব গ্রহণ করিয়া, তাঁহাতে সারূপ্য লইবার প্রচেষ্টায় রত থাকিয়া, নিজত্বটি যে তাঁহারই নিজত্ব অর্থাৎ তিনিই আমাদিগের আকারে প্রকাশ পাইয়াছেন, এইটি উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকেই আত্মরূপে পাইয়া, তাঁহাতে মগ্ন হইবে ও আমিত্বের নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। কেহ বা নিজস্বরূপ বোধটিকে প্রধান ভাবে অবলম্বন করিয়া, তাহার তলায় তাহার ভূমামূর্ত্তি দেখিয়া, সেই আত্ম-প্রত্যয়কে আর আমিত্বের দিকে আসিতে না দিয়া, আমিত্বের নির্ব্বাণ সংসাধন করিবে। যে দিক্ দিয়াই সাধনার গতি হউক, প্রতি কর্ম্মের অন্তরে অন্তরে আত্মবোধে অথবা ভগবদ্‌-বোধে নিজেকে যুক্ত দেখার অভ্যাস না করিলে, অনাবিল, নিশ্চেষ্ট পরমাত্মসংস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না—নন্দিত্ব লাভ হইবে না।

এই শ্লোকটিতে যোগ কেমন করিয়া "দুঃখহা" হয়, ইহা বলাই মায়ের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং পরিমিত আহার-বিহার, পরিমিত নিদ্রা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এ ভাবে ব্যাখ্যা করা হইল না।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮

অধুনা নিষ্পন্নযোগস্য পুরুষস্য যুক্তত্বং কথয়তি যদা বিনিয়তমিতি। পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ প্রতিকর্ম্মসু আত্মসংগ্রহো যদা সুসম্পদ্যতে, চিত্তং বিনিয়তং অবিচ্ছিন্নরূপেণ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ সর্ব্বচিত্তবৃত্তিভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ পুরুষঃ যুক্ত ইত্যুচ্যতে পরং যুক্তত্বমাপ্নোতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—চিত্ত যখন অবিচ্ছিন্নভাবে আত্মস্থিতি লাভ করে, তখন পুরুষ সমস্ত চিত্তবৃত্তিতে আসক্তিশূন্য হইয়া যুক্তপদবাচ্য হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকটিতে ভৃঙ্গবৎ আত্মসংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহার পরিণতি দেখান হইতেছে। প্রতি চিত্তবৃত্তির আশ্রয়স্বরূপ স্বয়ংবোধটি পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে করিতে চিত্ত যখন অবিচ্ছিন্নভাবে তাহাতেই সংন্যস্ত হয়, তৎকামময় হইয়া অন্য সমস্ত কামনায় স্পৃহাশূন্য হয়, তখন পুরুষকে যুক্ত বলা যায়। স্বয়ংবোধের আত্মভূতা চিতিশক্তিরূপিণী সাক্ষাৎ মা, যিনি প্রতি স্বয়ম্ভূ শিবের প্রসবকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী, হৃদয়ের মাঝে তাঁহার এই সংস্থান দর্শন করিয়া, অন্য কামনা হইতে জীব যখন বিরত হয়, অনাত্মমগ্ন, অনাত্মের দাস, বদ্ধ জীব তখনই প্রকৃত যুক্ত, আত্মানন্দে বিভোর, আত্মস্থ হয়। সাধনার কালে যুক্ত হইবার জন্য প্রচেষ্টার সময়ে পুনঃ পুনঃ চিত্তকে বাহ্য জগতের

দিকে ধাবমান হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ কামনা। বাহ্য শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি তরঙ্গহিল্লোল পাইবার জন্য অন্তরের যে লালায়িত ভাব, তাহাই পুনঃ পুনঃ সাধককে বাহিরে টানিয়া আনে। সাধক মনে করে, তাহার সকল চেষ্টা দুর্নিগ্রহ মনের তাড়নায় ব্যর্থ হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজে যে সর্ব্বদা আকুল ভাবে বাহ্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা, এ কথাটি লক্ষ্য করে না। সাধনার ব্যর্থতা আমাদিগের চিত্তে বাহ্যকামিত্বই দেখাইয়া দেয়। আপনার স্বয়ংআকারীয় অপরিণামী বুদ্ধিতে যত দিন না মুগ্ধ হই, তত দিন চিত্তের এ বাহ্যাভিমুখী গতি রুদ্ধ হয় না এবং এই স্বয়ম্বোধে মুগ্ধ হওয়াও তত দিন হয় না, যত দিন না উপলব্ধি করিতে পারি যে, সমগ্র চিত্ত তাহার অনন্ত বিশ্বপ্রকাশিনী শক্তি লইয়া এই স্বয়ংএরই ভোগ এবং অপবর্গ সংসাধনে নিরত—যত দিন না দেখিতে পাই, শব্দ-স্পর্শাদি যাহা কিছু বাহ্য হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া ধারণা করি, বাহ্য জগৎ তাহার উদ্রিক্তকারী কারণ মাত্র, সেগুলি সব এ চিত্তেরই ভিন্ন ভিন্ন মহিমপ্রকাশ। রূপ রস শব্দাদির আকার ধরিয়া, সুখ-দুঃখ, প্রীতি-দ্বেষাদি ভোগময়ী মূর্ত্তি ধরিয়া, নিদ্রা জাগরণ, ভয় ভক্তি, লজ্জা ঘৃণা, ভালবাসাদি নানা বৃত্তির আকার ধরিয়া যে চিত্ত আমার এই স্বয়ংস্বরূপটিকে বেষ্টন করিয়া, অবিচ্ছিন্ন ধারায় আমায় ভোগময় করিয়া রাখিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে আমার এই অপরিণামী সত্তাটি দেখাইয়া দিতেছে, সে চিত্ত অন্য কেহ নহে, অন্য কিছু নহে, চিতিরূপা মায়েরই আমার চিত্তরূপ ভোগময় বপু, অন্তর্যামিনী আত্মভাবময়ীর ভোগাপবর্গদায়িনী বিশ্বরূপা অনন্তা অন্তরশক্তি। অন্তরে সর্ব্বস্ব, অন্তরেই শিবশক্তিবিভাগ, অন্তরে শিবপূজায় শক্তি নিরতা, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের এই উভয় রূপ—বিশ্বের এই জ্ঞানময়ত্ব উপলব্ধ হইলে তখন আর চিত্ত বাহ্যাভিমুখে ধাবিত হয় না। সুতরাং যোগসংসাধন অভ্যাসকালে সঙ্গে সঙ্গে গুরুর নিকট, পঞ্চতন্মাত্রজাত এ জগৎ যে জ্ঞানমূর্ত্তি, সে সম্বন্ধে সম্যক্ উপদেশ লাভ করা প্রয়োজন। "নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ" এই কথা বলিবার অন্য কোন আবশ্যকতা ছিল না; শুধু স্বয়ম্বোধে সংস্থিত হইবার পক্ষে কামনা আমাদিগকে বাহিরে প্রক্ষিপ্ত না করে, সেইরূপ উপায় অবলম্বনের জন্য উহা বলা হইয়াছে। এক দিকে স্বয়ংমূর্ত্তিটিতে লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে এবং অন্য দিকে সমস্ত কাম্য বা ভোগ্য বিষয় যে অন্তরেই, ইহা জানিয়া চিত্তকে অন্তরেই রক্ষা করিতে হইবে, এইটি ইঙ্গিত করিয়া "নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ" কথাটি দেওয়া হইয়াছে। কেন না, ওই যে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ তোমার অন্তরে, উহার সেবায় ব্যাপৃতা চিত্তশক্তি অন্তরেই সর্ব্বভোগ সুসম্পন্ন করিতেছে, এই ধারণা অভ্যাস করিলে জীব অন্তরেই অবস্থান করিতে সক্ষম হয় এবং স্বপ্নকালে যেমন সকল ভোগ বাহ্যনিরপেক্ষ ভাবে অন্তরেই প্রকাশ পায়, সেইরূপ অন্তর্ভূমিতেই কাম্য বিষয়-সকল প্রকাশ পাইতে থাকে, এবং সেইরূপ আপনার অন্তরেই ভোগ্যসকল নিহিত, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই তবে জীব যথার্থ নিঃস্পৃহ হইতে সমর্থ হয়। অবশ্য ইহা সময়সাপেক্ষ সাধন-ফল। কিন্তু যুক্তপদবাচ্য হইতে হইলে ওইরূপ তত্ত্বাধিকার লাভ করিতে হইবে, ইহা বলাই এ শ্লোকের উদ্দেশ্য।

সময়সাপেক্ষ বলিলাম, এ কথায় নবীন সাধকের হতাশ হইবার কিছু নাই। চিত্তরূপিণীকে মা বলিয়া গ্রহণ করা অভ্যাস করিলেই ইহা দ্রুত প্রকাশ পায়, এ অধিকার সহজে সাধক লাভ করে। চণ্ডীর উত্তরচরিতে দেবতাদিগের কৃত দেবীর স্তোত্রটী স্মরণ কর,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।" —এইরূপে এই চিৎ ও চিত্তরূপিণী ব্রহ্মশক্তির আরাধনার কথাই বলা হইয়াছে।

যদা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯

যুক্তস্য আত্মসারূপ্যাবস্থিতচিত্তস্য উপমানং কথয়তি যদেতি। যদা দীপো নিবাতস্থঃ নিবাতে বায়ুপ্রবাহশূন্যে কালে দীপ্যমানঃ নেঙ্গতে ন কম্পতে, সা এব উপমা স্মৃতা কথিতা। কস্য ? যতচিত্তস্য আত্মনো যোগং যুঞ্জতঃ যোগিনঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—যোগীর চিত্ত যখন আত্মায় যুক্ত হয় বা একাকারতা প্রাপ্ত হয়, তৎকালীয় চিত্তের অবস্থা নিবাত-নিষ্কম্প দীপের সহিত উপমিত হয়।

যৌগিক অর্থ।—কাঁপে না, স্পন্দিত হয় না, বৃত্তিবায়ুর তরঙ্গ আসিয়া চিত্তকে আন্দোলিত করে না; তার চিত্ত থাকে স্থির অবিচল স্বয়ংবোধে একীকৃত। এইরূপ চিত্তের স্থিরতা, আত্মসংলগ্নতা—ইহাই যোগীর কাম্য, ইহাই যুক্তের লক্ষণ। বুদ্ধির এক দিকে অনন্ত ভ্রাম্যমাণ জগৎ, অনন্ত প্রবাহ চিত্তবৃত্তির আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই বুদ্ধিই অন্য দিকে নিত্য আত্মায় সংন্যস্ত, নিত্যই স্বয়ম্ভু শিবের উপাসনায় মগ্ন। চিত্তরূপা মহাশক্তি এক দিকে পূজার সম্ভার বিশ্বভোগ রচনা করিতেছে, অন্য দিকে শিব-পূজায় বিভোরা—ইহাই তোমার অন্তরের ছবি—ইহাই তোমার অন্তরের সংস্থিতি। মা যেমন সন্তানের জন্য বহুবিধ রন্ধনে ব্যাপৃতা থাকে—সে রন্ধনরূপ কর্ম্মাবর্ত্তনের তলে স্থির থাকে তার পুত্রস্মৃতি, বুদ্ধি সেই স্থির পুত্রত্বে সংলগ্ন থাকিয়া, অন্য দিকে কর্ম্মময় রূপ ধারণ করে, তেমনই তোমার চিত্ত তোমার নিত্য স্থির সনাতন আত্মায় একান্ত স্থির, যুক্ত, তৎস্বরূপ, তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থান করিয়া, অন্য দিকে বিবিধ বিলাস রচনা করে। তুমি দেখ না, তুমি উপলব্ধি কর না—তুমি ভাবিতেছ, আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া বৃথা জগৎসংসার লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমার চিত্ত সর্ব্বদা ভগবৎশূন্য হইয়া জগৎমোহে বিমূঢ় কিন্তু তাহা নহে—তাহা হইবার উপায় নাই। এমন এক মুহূর্ত্ত এ জীবনে দূরের কথা, কোন জীবনে কাহারও হইতে পারে না, যে মুহূর্ত্তে সে আত্মহারা। আহা, যদি দেখিবার চক্ষু থাকিত—আহা, যদি দেখিবার প্রচেষ্টা থাকিত—আহা, যদি গুরুকৃপায় সে চক্ষু ফুটিয়া উঠিত, তবে সকল বিফলতা সফলতায় পূর্ণ হইয়া যাইত। ভগবৎশূন্যতার দৈন্যে, আশ্রয়হীন পথপর্য্যটনে রক্তাক্ত, নিপীড়িত, লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুভীতিগ্রস্ত এই যে তোর ক্ষণভঙ্গুর জীবন, ওরে মহামায়ার চিরকুমার, এই দৈন্য তোর মুছিয়া যাইত, এ ভিখারীর বেশ তোর ঝরিয়া পড়িত, মুহূর্ত্তে—যদি মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতিস, তুই বিশ্বেশ্বরীর প্রশান্ত কোলে

আত্মরূপে সংযুক্ত, আত্মরূপে—অন্য রূপে নহে, অন্য আকারে নহে, অন্য ভাবে নহে, তার নিজের নিজত্ব লইয়া, তুই আপনি ফুটিয়া আছিস তাহাতে। সে আপনি ধরিয়াছে তোর আত্মমূর্ত্তি—সে আপনি সাজিয়াছে বিশুদ্ধ তুই স্বয়ংশিব ; ইহাই তাহার চিতিশক্তির মহিমা, ইহাই তাহার বহু হওয়া—ইহাই তাহার আত্মপুরুষ রচনা করিয়া জগদ্বিলাসে মত্ত হওয়া। "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" এই তাহার ভাষা। ইহাই দেখিতে পাইবি, যদি লক্ষ্য করিস তোর অন্তরে ; এই স্বাধিকারে উঠিতে পারিবি, যদি অনুধাবন করিস গুরুর উপদেশ। ফেরা লক্ষ্য তোর চিত্তের—তোর অন্তরের মাঝে অনন্ত জ্ঞানের প্লাবনে। তোর চিত্তপ্লাবনের মাঝে লক্ষ্য কর ওই নিজবোধরূপ শিবলিঙ্গ। যাহাকে তুমি "আমি" বলিয়া জ্ঞাত হও, সেই প্রধান প্রকাশ অহঙ্কার ওই "নিজ"বোধের বুকে—ওই নিজবোধকে আশ্রয় করিয়া অহর্নিশ অবস্থিত। ওই নিজত্বের মুখ চাহিয়া কি তোর বিশ্বপ্রত্যয় ঘুরিতেছে না ? ওই "নিজ"—ওই স্বয়ংবোধ তোর চিত্তের বা বুদ্ধির সেই স্থির প্রান্ত, যাহা চিদ্রূপাতে অনন্ত কাল সংন্যস্ত। ওখানে তুই মায়ের বুকে যুক্ত রে—স্থির আত্মায় একীভূত। ওইখানে তুই স্থির আত্মার বুকের মাঝে মিলিত হইয়া নিবাত-নিষ্কম্প দীপের মত আত্মসারূপ্যে অবস্থিত।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ২০

যুক্তস্য লক্ষণান্তরং কথয়তি যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে যোগসেবয়া যোগানুষ্ঠানেন নিরুদ্ধং আত্মনি এব পরিধৃতং চিত্তম্ উপরমতে আত্মন্যেবোপরতং ভবতি, যত্র যস্মিন্ কালে চ আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ স্বয়ম্প্রকাশত্বমুপলভ্য আত্মনি এব তুষ্যতি স্বাধীনতাত্মিকাং তুষ্টিমাপ্নোতি, তদৈব যুক্ত ইতি ভাবঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—যোগানুষ্ঠানের দ্বারা যখন আত্মাতে সমগ্র চিত্ত সংন্যস্ত হইয়া আত্মরমণে মগ্ন থাকে, যখন আপনার দ্বারা আপনি প্রকাশ হইয়া রহিয়াছি, এইরূপ দর্শন করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে থাকে, (তখন সে পুরুষ যুক্ত)।

যৌগিক অর্থ।—নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপশিখার স্থিরত্বমাত্র সেই যুক্ততার লক্ষণ নহে। চিত্ত তখন আত্মরমণে বিভোর হয়। মাত্র নিজবোধ উপলব্ধিতে একটা মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে করিতে সে আপনাকে স্বয়ম্প্রকাশ দেখে। দীপশিখা যদি চিন্ময় হইত, তবে সে যেমন বোধ করিত, সে আপনার আলোকে আপনি প্রকাশ হইয়া রহিয়াছে, অন্য কোন জ্যোতির সাহায্যে সে নিজের কাছে প্রকাশিত নহে, সেইরূপ যোগী তখন আপনার দ্বারা আপনাকে দেখিতেছি, ঠিক এইরূপ উপলব্ধি করিতে থাকে। আপনার দ্বারা আপনাকে জানিতে পারিতেছি, এইরূপ উপলব্ধি যত ক্ষণ না আসে, ততক্ষণ জীব স্বাধীনতার আস্বাদ পায় না ; জাগতিক আনন্দের বিপুল পরিব্যাপ্তির মাঝে

থাকিলেও আপনাকে সর্ব্বদা বিষয়াধীন দেখিতে বাধ্য হয় এবং সেই বিষয়াধীনতার উপলব্ধির জন্য আনন্দ অন্বেষণে বিষয়ের পশ্চাতেই ধাবিত হয়। আপনার স্বয়ম্প্রকাশত্ব অনুভূতিতে আসিলে তখন সে আপনাতেই সমস্ত তুষ্টি অনুভব করিতে থাকে। এই স্বাধীনতার আস্বাদন লক্ষ্য করিয়াই "আত্মনি তুষ্যতি" কথা বলা হইয়াছে।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১

তুষ্টের্ব্বিশিষ্টতামাহ সুখমিতি। সুখং সুলভান্তরাকাশম্ আত্যন্তিকম্ অতীবান্তঃস্থং যৎ, তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ আত্মাকারয়া বুদ্ধ্যা লভ্যং, ন তু ইন্দ্রিয়বিষয়সংযোগজনিতম্, অয়ং পুরুষঃ বেত্তি অনুভবতি, তথা চ যত্র স্থিতঃ তত্ত্বতঃ তত্ত্বস্বরূপাৎ ন চলতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে অবস্থার সুখ একান্ত অন্তর্নিবিষ্ট, ইন্দ্রিয়বহির্ভূত, মাত্র আত্মবুদ্ধিগ্রাহ্য এবং যেখানে সাধক আত্মতত্ত্ব হইতে যে সে কখনও বিচলিত হয় না, ইহা অনুভব করে।

যৌগিক অর্থ।—সুলভ অন্তরাকাশের নাম সুখ—দুর্লভ অন্তরাকাশের নাম দুঃখ। স্বসম্বেদনময় পূর্ব্বোক্ত আত্মস্থ ভাবে অবস্থানকালে চিদাকাশ একান্ত সপ্রকাশ হইয়া পড়ে, সুতরাং সে প্রকাশ আত্যন্তিক সুখস্বরূপ। তোমরা বিষয়ে যে কখনও সুখ, কখনও দুঃখ অনুভব কর, উহা ওই অন্তরাকাশ প্রকাশেরই তারতম্য মাত্র। চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া অন্তরাকাশকে যখন আবৃত করিয়া ফেলে, তখন তাহার নাম হয় দুঃখ এবং চিত্ত প্রসারিত হইয়া অন্তরাকাশকে যখন সুপ্রকাশিত করে, তখন তাহার নাম হয় সুখ। সু+খ—"খ" অর্থে আকাশ, সুলভ আকাশ—ইহারই নাম সুখ। সাধক যখন এই অন্তরাকাশ দর্শন করে, তাহার সুখের তখন অবধি থাকে না। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখম্…যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তৎ মর্ত্ত্যম্।"—শ্রুতি ব্রহ্মের সুখস্বরূপতার কথা এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। জীবের নিজবোধটি বিশ্ববোধাবর্ত্তনের অন্তরে যতক্ষণ সমাচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ সে আপনাকে ক্ষুদ্র, খণ্ডিত, মর্ত্ত্য বা মৃত্যুশীল বলিয়া বোধ করে। বিশ্ববোধের তলদেশে প্রবিষ্ট হইয়া, পরতন্ত্র বিশ্ববোধ হইতে স্বতন্ত্র অসঙ্গ নিজবোধে যখন তাহার লক্ষ্য পড়ে, তখন সে আপনাকে ভূমা সুখস্বরূপ অমৃতময়রূপে অনুভব করে। সেই জন্যই বৃত্তিময় জ্ঞানক্রিয়ার তলে তলে নিমগ্ন হইয়া, তদধিষ্ঠিত অথচ তাহার বাহিরে যে নিজত্বের সংস্থিতি আছে, তাহাতে লক্ষ্য ফিরাইতে হয়। সাধক যুক্ত হইলে অর্থাৎ এই বোধে আরূঢ় হইলে, সেই জন্য তাহার একান্ত অন্তর্নিহিত ভূমা সুখ প্রকট হইয়া পড়ে। উহা ইন্দ্রিয়াধীন সুখ নহে—পরতন্ত্র সুখ নহে—আপনা হইতে ভিন্ন একজন বা অন্য কিছু পাইয়া যে

সুখ, সে সুখ নহে ; সুতরাং পরাধীন সুখ নহে। উহা আপনাকে আপনি পাইয়া যে সুখ, তাহাই—উহা স্বাধীন সুখ। বিষয়ের মাঝে আত্মহারা জীব এ সুখের কল্পনা করিতে পারে না। এই সুখেরই কণামাত্রের পরশ পাইয়া বিষয়সুখ উপলব্ধ হয়। আত্মকামী হইয়া এই ভূমিতে অবস্থান না করিলে এ সুখের মর্ম্ম বোঝা যায় না। মাত্র স্বয়ংজ্ঞানের মাঝে আমি আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না, এইরূপ জ্ঞানাবস্থান হইতে এ সুখের প্রকাশ সূচিত হয়। আর তখন অনুভব হয়, এই সুখভূমি হইতে মুহূর্ত্তের জন্য আমি কখনও বিচ্যুত হয় নাই—এই সুখভূমিতে আমার নিত্যবাস, চিদ্‌রূপার এই সুখমূর্ত্তিই আমার মূর্ত্তি। আমি জগতের সুখ-দুঃখে, চিত্তের তরঙ্গে তরঙ্গে আবর্ত্তিত, বিভ্রাম্যমাণ হইয়াও তত্ত্বত আমার এ স্বরূপ কখনও হারাই নাই। অসংখ্য অসংখ্য মৃত্যুর প্রলয় আমার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইয়া মহাবিস্মৃতির অন্ধকারে জন্মের পর জন্ম আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু বস্তুত সে হারানর মাঝে আত্মহারা কখনও হই নাই। আমি কখনও আমাকে হারাই নাই, এ জ্ঞানের আস্বাদন জীবকে অমৃত করে, স্বাধীন করে, ঈশ্বরত্বের আস্বাদনে জীবের বদ্ধতাকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত করে।

পূর্ব্বশ্লোকে তুষ্টির কথা বলিয়া, এই শ্লোকটিতে তুষ্টির দুইটি বিশিষ্টতার কথা বলা হইল—একটি আত্যন্তিক স্বতন্ত্র সুখ, আর একটি আপনার তাত্ত্বিক অবিচলতা। আমি নিত্য আত্মরূপে অবস্থিত এবং আমার সে স্থিতি "স্ব"তন্ত্র সুখময়। একটি কথা বলা হয় নাই। সুখকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখ, আমা হইতে ভিন্ন অন্য কাহাকে বা কিছু পাইয়া যে সুখ, তাহাকে পরতন্ত্র সুখ বলে, আর আপনাকে আপনি পাইয়া যে সুখ, তাহাকে "স্ব"তন্ত্র সুখ বলে। অন্তরে জ্ঞানক্রিয়ার তলে আপনার নিজবোধটিকে তাহা হইতে স্বতন্ত্র, ইহা দেখিতে পাইলেই এ "স্ব"তন্ত্র সুখ প্রকাশ পায়।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২

লক্ষণং কথয়তি যমিতি। যং আত্মসংস্থানং লব্ধ্বা প্রাপ্য অপরং লাভং ততঃ অধিকং ন মন্যতে, যস্মিন্ স্থিতো গুরুণা মহতাপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে, [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি পরেণান্বয়ঃ।]

ব্যবহারিক অর্থ।—যাহা লাভ করিলে, তাহা হইতে অধিক লাভের আর কিছু আছে, এমন মনে হয় না এবং যাহাতে অবস্থিত থাকিলে গুরুতর দুঃখাভিঘাতেও বিচলিত হইতে হয় না [তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে]।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে আত্মসংস্থিতির আত্যন্তিক অতীন্দ্রিয় সুখের

কথা বলা হইয়াছে এবং তত্ত্বতঃ আত্মবোধ হইতে জীব কখনও যে বিচলিত হয় না, সেইরূপ উপলব্ধির কথাও বলা হইয়াছে। "আমি কখনও এই আত্মবোধ হইতে চ্যুত নহি" এইরূপ উপলব্ধি যোগাবস্থায় একটি বিশেষত্ব, ইহা দেখান হইয়াছে। এই শ্লোকে সেই আত্যন্তিক সুখ, আর সেই অবিচ্যুত আত্মোপলব্ধির কথা আরও বিশদ ভাবে বলা হইতেছে। সে সুখ এমন যে, তাহা লাভ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ কিছু আছে, এমন আর মনে হয় না। আর সে আত্ম-অবিচ্যুতির বোধ এত ঘন যে, গুরুতর দুঃখবিপ্লবে সে আত্মবোধের বিন্দুমাত্র স্খলন হয় না। সুখ ও দুঃখের প্লাবনে জীব অহর্নিশ আপনাকে আবর্ত্তিত হইতে দেখে। সুখে ও দুঃখে আত্মহারা হইয়া জীবসঙ্ঘ প্রতিনিয়ত জগতে বিচরণ করে। সুখ ও দুঃখের চিন্তায় জীব অনবরত কাতর। কিন্তু যোগস্থ হইয়া সেই জীবই আবার দেখে, সুখ দুঃখের ঝঞ্ঝাবাতে এত বিচলিত হইয়াও তত্ত্বতঃ সে মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহারা হয় নাই ও অবিচ্ছিন্ন অপরিমেয় সুখে সমাসীন। আপনার এই সুখময় আশ্রয়ে প্রবিষ্ট হইলে সর্ব্বলাভের যাহা শ্রেষ্ঠ লাভ, তাহাই পাইয়াছে বলিয়া সে অনুভব করে, এবং সকল দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত হইতে পরিত্রাণ পায়, গুরুতর দুঃখাভিঘাত আসিয়াও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

এমন স্থিতি আছে ? এই জীব—এই ধূলির দাস, সুখ-দুঃখের তরঙ্গাভিঘাতে নিত্য জর্জ্জরিত, মৃত্যুভয়ে অনবরত ভীত, অচেতনান্ধকারে সমাবৃত, বিষয়ের দাসত্ব-পরিক্লান্ত, কাঙ্গাল আতুর জীব—ইহারই অন্তরে, ইহারই এমন সুখ-সংস্থান বিদ্যমান, সুখের যেথায় অবধি নাই, দুঃখের যেথায় স্পর্শ নাই, মৃত্যুর যেথায় অধিকার নাই, এমন স্থিতি আছে ? গুরুতর দুঃখেও বিচলিত করে না। সর্ব্বাপেক্ষা গুরু দুঃখ মৃত্যু, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ ভূমা স্বাধীন আনন্দময় আত্ম-সংস্থান। যতক্ষণ আত্মজ্ঞানের বাহিরে আত্মা হইতে অপর বা অন্য কিছু আছে মনে হয়, ততক্ষণ সেরূপ আত্মোপলব্ধি, সেরূপ নিজের থাকাটি শ্রেষ্ঠ লাভ বা শ্রেষ্ঠ সুখরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। এরূপ আত্মস্থিতি—যাহার বাহিরে কিছু নাই, যাহার অধিক কিছু নাই, তাহারই নাম ভূমা সুখময় আত্মস্থিতি বা আত্মলাভ। এইরূপ ভূমা আত্মবোধ লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" এই কথাটি বলিয়াছেন। শুধু আপেক্ষিক সুখ-দুঃখের তুলনা করিয়া এ শ্লোকটি বলা হয় নাই। এক দিকে দুঃখের চরম দুঃখ, আপনাকে হারাইয়া ফেলিলাম, আপনি ফুরাইয়া গেলাম, আপনি আর থাকিলাম না, এইরূপ ভীতিপ্রদ মৃত্যু, আত্মশূন্যতার অধিকার, অন্য দিকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের, সমগ্র অস্তিত্বের আত্মকবলে কবলিতরূপ ভূমা স্বাধীনতাময় আত্মবিস্তার—এক দিকে চরম শূন্যতা, এক দিকে চরম পূর্ণতা। এই চরম শূন্যতার ঐকান্তিক বিপরিলোপ

এবং এই চরম পূর্ণতার ঐকান্তিক প্রাপ্তি, এমনই সে স্থিতি জীবের সত্যই রহিয়াছে। জীব আপনার ভিতর আপনাকে সংস্থিত করিবার চেষ্টা করিলে—আপনার ভিতর আপনাকে পাইলে, সে এইরূপ মৃত্যুর বিলয় সাধন করিতে পারে ও অমৃতত্বের অপার লাভে লাভবান্ হয়।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগর্বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥ ২৩

কথং গুরুণাপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে, তদাহ তমিতি। তং যোগসংজ্ঞিতং যোগপদবাচ্যং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ। কিম্ভূতম্? দুঃখসংযোগবিয়োগম্—অনাত্মজ্ঞানাত্মকবিষয়সংযোগো দুঃখং, তস্মিন্ সংযোগো দুঃখসংযোগঃ (এতেন জীবভাবঃ সূচিতঃ), তস্য বিয়োগো যস্মিন্। স যোগো নিশ্চয়েন অয়মাত্মেতি সুনিশ্চয়বুদ্ধ্যা যোক্তব্যঃ, অনির্ব্বিণ্ণচেতসা দুঃখরহিতেন চিত্তেনেতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—দুঃখসংযোগ হইতে বিযুক্ত অবস্থাকেই যোগ নামে বিজ্ঞাত হইবে। দুঃখহীন চিত্তদ্বারা নিশ্চয় ভাবে এই যোগে যুক্ত হইতে হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে যোগের লক্ষণস্বরূপ দুইটি কথা বলা হইয়াছে। একটী ঐকান্তিক সুখ, আর একটি সর্ব্বাপেক্ষা গুরু দুঃখেরও পরিহার। সেই দুঃখপরিহারের কথাটি সুস্পষ্টভাবে ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন। যে অবস্থাটিকে যোগ নামে অভিহিত করা যায়, সে অবস্থাটি লাভ করিতে হইলেই দুঃখ হইতে বিযুক্ত হইতে হয়। দুঃখ কি? জীবভাবে বিষয়ানুপ্রবিষ্ট, বিষয়াধীন, সুতরাং আত্মজ্ঞানশূন্য পরাধীন বদ্ধ অবস্থিতির নামই দুঃখ। দুঃখ অর্থে সঙ্কীর্ণ আত্মাকাশ, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই সঙ্কীর্ণ বিষয়াধীন আত্মদর্শন, যাহা লইয়া জীব সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করে, তাহারই মূলে বিশুদ্ধ নিজবোধলক্ষণময় যে অপরিণামী অসঙ্গ আত্মস্থিতি রহিয়াছে, সেই আত্মস্থিতিতে বুদ্ধি সংযোগ করার নামই যোগ। সুতরাং যোগ অর্থেই দুঃখসংযোগের বিয়োগ। ওই অসঙ্গ আত্মসত্তায় যুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে সেই আত্মা ব্রহ্মভূত, সুতরাং পরম সুখে অধিষ্ঠিত হয়; ব্রহ্ম সুখস্বরূপ। তবেই যোগের প্রথম পাদ হইল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ এবং শেষ পাদ অপার সুখ-সম্পদ্। এই শ্লোকটিতে যোগের প্রথম পাদটি বিশেষ করিয়া বলা হইল, 'অনির্ব্বিণ্ণচেতসা' বলিয়া সেই কথাটিকে আরও সুস্পষ্ট করিলেন। দুঃখহীন চিত্তের দ্বারা যোগস্থ হইতে হইবে বলিয়া জীবত্ব হইতে চিত্তকে সম্যক্রূপে তুলিয়া লইবার কথা ভগবান্ নির্দ্দেশ করিলেন। যেমন তেমন করিয়া নহে, একান্ত নিশ্চয়ভাবে তুলিয়া লইতে হইবে, তবে সে অসঙ্গ আত্মস্থিতিতে স্থিতিবান্ হইতে সমর্থ হইবে। আমার পরিণামী নিজবোধের সহিত জাগতিক সুখ-দুঃখ ও বিষয়-সকলের যে সংযোগ সাধারণতঃ

দেখিতে পাই, উহার তলে এই আমার নিজবোধেরই যে অসঙ্গ সংস্থান রহিয়াছে, আমি সব ভোগ করিয়াও কিছু ভোগ করিতেছি না, এইরূপ উপলব্ধি যে স্থিতিতে, গুরুর উপদেশ অনুসারে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, সেই স্থিতিই আমার মৌলিক স্থিতি। ইহা ধ্রুব সত্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সে স্থিতির বর্ণনা আমি পূর্ব্বে করিয়াছি, সে স্থিতিতে মৃত্যুর বা আত্মচেতন হারাইবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং গুরু দুঃখ মৃত্যুর সেখানে যে স্থান নাই বা মৃত্যু যে সেখান হইতে আমাকে বিচলিত করিতে পারে না, এ সত্য প্রজ্ঞা সেখানে স্ফুটতর হইয়া উঠে। দুঃখহীন বা জীবভাবশূন্য যে চিত্ত, সেই চিত্তের দ্বারা দুঃখহীন যে আত্মসংস্থান, সেই আত্মসংস্থানে সংযুক্ত হওয়ার নামই যখন যোগ, তখন যোগ যে দুঃখসংযোগের ঐকান্তিক বিয়োগ, ভগবানের যোগবর্ণনা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। "ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" কেন বলিয়াছেন, এইবার তাহা বুঝিলাম।

জীবত্বের মোহ লইয়া যোগস্থ হইবার চেষ্টা করিও না, জীবত্ব হইতে মহাপ্রয়াণের জন্য উদ্যোগী হইয়া যোগস্থ হইবার যত্ন কর। আমার জীবত্বের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হইবে, আমি সুখে সংসারে থাকিব, এরূপ বুদ্ধি তোমার যোগস্থ হইবার ইচ্ছার মূলে যেন থাকে না। চলিয়াছ জীবত্ব ছাড়িতে—চলিয়াছ সেই ভূমিতে, যে ভূমিতে তুমি দেখিবে, স্বয়ং পরমাত্মা তোমার আত্মারূপে, তোমার নিজ বোধটির তলদেশে রহিয়াছেন। চলিয়াছ ব্রহ্মের জীবত্ব ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া, তাহার নির্ব্বাণ সাধন করিতে। মহাপ্রস্থানে যাইতেছ, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। সারা রাত্রি দাঁড় বাহিয়াছ, নঙ্গর তুলিতে ভুলিয়াছ বলিয়া অগ্রসর হইতে পার নাই, এরূপ আক্ষেপ যেন করিতে না হয়।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

সাধনোপায়ং কথয়তি সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পপ্রভবান্—সঙ্কল্পঃ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ নিঃশেষেণ ত্যক্ত্বা, মনসৈব ইন্দ্রিয়গ্রামং ইন্দ্রিয়সমূহং সমন্ততঃ বিনিয়ম্য, ধৃতিগৃহীতয়া ধারণাবশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ। কীদৃশং তদুপরমণং, তদাহ—আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা সমগ্রং মনঃ আত্মন্যেব সংস্থিতং কৃত্বা, ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তি, আত্মৈবেদং সর্ব্বম্ ইত্যনেন প্রকারেণ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।

ব্যবহারিক অর্থ।—সঙ্কল্পসকল যাহা হইতে প্রভব পায়, যোগ-প্রতিকূল এমন যে সকল কামনা, সেই সকল কামনা পরিহার করিয়া, ইন্দ্রিয় সকলকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া, ধীরে ধীরে আত্মধারণায় বুদ্ধিকে উপরত করিবে; মনকে আত্মায় সংস্থিত করিয়া, আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতেছি না, এইরূপ চিন্তা করিবে।

যৌগিক অর্থ।—যে কামনা হইতে সঙ্কল্পসকল প্রভব পায়, সেইরূপ কামনাকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবার কথা প্রথমেই যোগের উপায়স্বরূপ বলিলেন। আত্মলাভে সর্ব্বকামনা বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য আত্মলাভকামনা সঙ্কল্পপ্রভব নহে—সঙ্কল্পনাশক; সেই হেতু "সঙ্কল্পপ্রভব কাম" পরিহার করিতে বলিলেন। দ্বিতীয় কথা বলিলেন—ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের দ্বারা নিয়মিত করা। তৃতীয় কথা বলিলেন—ধৃতিগৃহীত বুদ্ধির দ্বারা উপরমণ করা। সে উপরমণ কি? আত্মায় দৃষ্টি রাখিয়া, অন্য কিছু চিন্তা না করা, নিজত্বে বা আত্মবোধে মনকে ধরিয়া রাখিয়া, অন্য সকল চিন্তা পরিহার করিয়া, ধীরে ধীরে সেই আত্মবোধে মনকে বিলীন রাখিতে চেষ্টা করা। অপরিণামী নিজবোধটিতে অবস্থান করাই যোগের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। কেন এই অপরিণামী নিজবোধে অবস্থান করার এত প্রাধান্য? উহারই তলে আত্মার ব্রহ্মত্ব। অপার, অভয়, ভূমা ব্রহ্মস্বরূপা, চিন্ময়ী আমার নিজবোধাত্মক আত্মাকে বক্ষে লইয়া ওই ভূমিতেই বিরাজিতা। ওই সেই জ্ঞানভূমি, যেখানে আমার বদ্ধ জীবত্বের ঐকান্তিক অবসান, আমার মুক্ত আত্মা ব্রহ্মশক্তির মহাপ্রকাশ। ওইখানেই সেই মা—সেই পরমাত্মশক্তি, যিনি বহুধা হইয়া, বহু জীব সাজিয়া, বহু ভূতবপু রচনা করিয়া বিশ্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। 'শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ'—ধীরে সাধক, ধীরে; ধীরভাবে এই ভূমিতে অবস্থান করা অভ্যাস কর। ধীরে প্রবেশ কর, ধীরে এ আত্মধারণায় মন প্রাণকে সংন্যস্ত কর। বহু কামনাময় নিত্য-চঞ্চল জীব তুমি, জগৎমোহে বিমূঢ়, জগদ্‌ভোগের জন্য লালায়িত তোমার প্রাণ চক্ষের পলকে ফিরিয়া আসে অচিৎ ধরণীর ধূলিতে। মন তোমার যেখানে বিশ্বআবর্ত্তন রচনা করিতেছে, প্রাণ তোমার যেখানে সুখের আশায় বিদ্যুতের মত ধাবমান, তাহারই তলে তোমার ওই নিজরূপ চাহিয়া আছে—শুধু তোমার ওই মন ও প্রাণের মত্ত তরঙ্গের বিলাসে। তুমি জান না, এই আত্মদর্শন প্রকৃতপক্ষে এ জগৎ হইতে মহাপ্রস্থান। আত্মদর্শনে চলিয়াছ অর্থ, অনাত্মজগৎ চিরদিনের জন্য পরিহার করিতে মহাযাত্রায় পা বাড়াইয়াছ। ভাবিয়া দেখ, সত্যই তুমি কি এ যাত্রার জন্য উদ্যুক্ত? সত্যই তুমি মাটির জগৎ ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানময় বিশ্বে অবস্থান করিতে অভিলাষী? দেখিবে, এ প্রশ্নের উত্তরে হয় ত তুমি "না" ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারিবে না। তাই ভগবান্

বলিলেন, "শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ"—ধীরে ধীরে আত্মরমণ অভ্যাস কর। আত্মপ্রীতি না আসিলে মর্ত্তের প্রীতি ঘুচিবে না; আত্মসঙ্গ না করিলে আত্মপ্রীতি আসিবে না; মনের তলায়, প্রাণের তলায় নিজবোধকে না দেখিলে মাতৃসংযোগ হইবে না।

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

চিচ্চিত্তৈকীকরণোপায়ং কথয়তি যতো যত ইতি। যতো যস্মাৎ কারণাৎ (স্বভাবতঃ) অস্থিরং চঞ্চলং মনঃ যতঃ যেষু শব্দাদিষু বিষয়েষু নিশ্চলতি নিপততি, ততঃ তস্মিন্ কারণে, ততঃ তেষু বিষয়েষু আত্মপ্রতীত্যা এতৎ মনো নিয়ম্য আত্মন্যেব বশং নয়েৎ। প্রতিচিন্তামূলেষু আত্মসংস্থিতিং তথাচ স্বতঃসিদ্ধচিচ্চিত্তসংযোগং দৃষ্ট্বা সম্যক্ সংযোগং কুর্য্যাৎ ইতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যেখানে যেখানে যে যে কারণে চঞ্চল মন ধাবিত হয়, সেখানে সেখানে সেই সেই কারণে মনকে আত্মাতে নিয়মিত করিয়া, আত্মবশে লইয়া আসিবে।

যৌগিক অর্থ।—মনকে আত্মসংস্থ করিয়া, চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণের কথা পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়া, মা এই শ্লোকে তাহার উপায় বর্ণন করিতেছেন। মনকে আত্মসংস্থ করিবে; কিন্তু চঞ্চলস্বভাব, বিষয়মুখে ধাবমান চিত্ত, বিষয় চিন্তায় অবিরত বিভোর, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের তরঙ্গাভিঘাতে সতত আলোড়িত—বিষয়স্মৃতির তাড়নায় সর্ব্বদা সংক্ষুব্ধ—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক চিন্তাজগতের আবর্ত্তনের আধারস্বরূপ চিত্ত, কেমন করিয়া ইহাকে স্থির, অপরিণামী, নিজবোধরূপ দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বটিতে ধরিয়া রাখিবে? ভাব ও অভাবের বিরামহীন মন্থনে, সুখে দুঃখে আতুর এ চিত্ত নিয়ত আর্ত্ত, নিয়ত অস্থির, নিয়ত বিষয়বিম্বে বিম্বিত, কেমন করিয়া ইহাকে আত্মবশে আনিবে? আপাতদৃষ্টিতে দুঃসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও মা গুরুরূপে যে উপদেশ দিতেছেন, সে উপদেশ অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবে, ইহা সহজসাধ্য; আত্মলাভের ইচ্ছা হইলে এ সাধনা কঠোর আয়াসসাধ্য নহে। প্রহ্লাদও দৈত্যবালকদিগকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন,—"ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ। আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥" পূর্ব্বে জ্ঞানভূমি যে দুইটি বিভাগের কথা বলিয়াছি, বিশেষ ভাবে তাহা স্মরণ কর। তোমার মন যে এত চঞ্চল, এত দুর্ব্বার অস্থির, এ কি তোমারই সুখের জন্য নহে? তোমারই তৃপ্তির জন্য তোমার মন কি অনবরত বিষয়মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে না? এই চিত্তের তলদেশে তোমার নিজনামীয় যে অপরিণামী বোধস্বরূপ তুমি রহিয়াছ, সেই তোমারই মুখ চাহিয়া এ চিত্ত কি এমন করিয়া

বিষয়মূর্ত্তি ধরিতেছে না? ওই অপরিণামী নিজত্বের বুকের উপর, উহারই দৃষ্টি অবলম্বনে, উহারই মুখ চাহিয়া, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক এ চিত্ত-লীলা কি লীলায়িত নহে? নিত্য-পরিণামী চিত্তনামীয় এই জ্ঞানাংশটি, উহারই মূলে ওই নিজবোধটির ভোগ সম্পাদনে অহর্নিশ কি ব্যস্ত নহে? ঋষির বাক্য স্মরণ কর,—"ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি"—ওই নিজবোধটির প্রীতির জন্যই চিত্তের এই বিরামহীন বিবর্ত্তন। মা এই শ্লোকে 'যতো যতঃ' এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন; একটি 'যতঃ' শব্দের অর্থ—যে কারণে এবং অন্য 'যতঃ' শব্দটির অর্থ—যেখানে বা যাহা হইতে।

কেন, কি কারণে চিত্তের এ নর্ত্তন, ইহা আমরা দেখিলাম। নিজবোধের প্রীতির জন্যই চিত্ত যে চঞ্চল, ইহা বুঝিলাম। এইবার যে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চিত্ত আত্মপ্রীতি সংসাধন করে, সেই সেই মূর্ত্তিপ্রকাশ কি ভাবে দেখিলে তাহা আত্মস্থ হইবে, সেই দেখার কথাটি বলিতেছি। চিত্ত যে মূর্ত্তিই ধরুক না কেন, সে যে তোমার ওই নিজবোধেরই বুকের উপরে ফুটিয়াছে—ওই নিজবোধেরই তৃপ্তির জন্য; প্রতি চিত্তমূর্ত্তির তলে তলে ফুলের ভিতর মধুর মত ওই নিজবোধটি রহিয়াছে উহাকেই ভিত্তি করিয়া, উহার বুক হইতেই ফুটিয়া রহিয়াছে, ইহাই তোমায় দেখিতে হইবে—ইহাই তোমার প্রতি চিত্তবৃত্তির খেলার মাঝে তোমায় লক্ষ্য করিতে হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে এই যে, তোমার চিত্ত বিপুল বাহ্য জগতের মূর্ত্তি ধরিয়া, তোমারই বুকের উপর তোমারই সুখের জন্য শিবের বুকে শ্যামার মত দাঁড়াইয়া। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, দিগ্‌দিগন্ত, গিরি কানন, নদ নদী, শস্যশ্যামলা ধরণী, এই যে বিশাল বিশ্বরূপ, ইহা কে সাজিয়াছে তোমার বুকে তোমারই জন্য, তোমারই তৃপ্তিবিধানে? ওই তোমার চিত্ত। ওই ভূমা দৃশ্যের, ওই চিন্তা লহরের মাঝে এমন একটি চিন্তাও কি দেখিতে পাইতেছ, যাহার তলায় তুমি নাই, তোমার ওই নিজত্ববোধটি নাই? মাটির উপর তরুলতার মত অথবা পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুরাজির মত ওই চিত্তবিলাস কি তোমার নিজবোধটির বুকে খেলিতেছে না? প্রতি চিন্তার তলায় এই নিজবোধটিকে সংগ্রহ করিতে হইবে তোমাকে ঠিক তেমনই করিয়া, ভৃঙ্গ যেমন মধু সংগ্রহ করে পুষ্পে পুষ্পে, পুষ্পত্ব ভুলিয়া—মধুত্বে মগ্ন হইয়া। যেখানে চিত্ত ধাবিত হইবে, যে মূর্ত্তি চিত্ত ধরিবে—ফল ফুল, শব্দ স্পর্শ, সুখ দুঃখ, যে ভাবে চিত্ত গঠন লইবে, তাহারই মুলে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতে হইবে তোমার নিজত্বকে, নিজ অপরিণামী বোধময় স্বয়ংনামীয় সত্তাকে। তখন দেখিতে পাইবে, তোমার ওই নিজত্ব ছাড়িয়া কোন চিন্তারই অস্তিত্ব নাই—কোন চিন্তারই আশ্রয় নাই—কোন চিন্তারই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ভূমি নাই। তখন ওই

নিজত্বদর্শনই হইবে প্রধান, অন্য চিন্তা হইবে অপ্রধান; চিত্ত তোমার অতি সহজে বিষয়াকারে আর না ফুটিয়া, আত্মবোধাকারে তন্ময় হইতে থাকিবে। আরও একটু এই নিজত্বদর্শন ঘনীভূত হইলে তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, চিত্ত এক দিকে অনন্ত পরিণামময় চিন্তার আকারে বিলসিত হইলেও অন্য দিকে সর্ব্বদাই ও আত্মযুক্ত, আত্মময়, আত্মস্থ হইয়া রহিয়াছে। সে থাকার বিরাম নাই, বিভঙ্গ নাই, নিত্য আত্মস্থ, নিত্য নিজবোধময়। এইটি দেখিলেই আত্মস্থ থাকা আর তোমার পক্ষে সুকঠিন বহ্বায়াসসাধ্য বলিয়া মোটেই বিবেচিত হইবে না।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭

এবংপ্রকারেণ আত্মনি চঞ্চলং মনঃ প্রলীনং ভূত্বা অদ্বয়াত্মবোধরূপং সুখময়ং ব্রহ্মত্বং উপৈতি ইত্যাহ প্রশান্তেতি। প্রশান্তমনসং শান্তাত্মনি একীভূতং মনো যস্য তং, শান্তরজসং প্রক্ষীণক্লেশং, ব্রহ্মভূতং অদ্বয়াত্মবোধরূপব্রহ্মত্বাপগর্তং, অকল্মষং অনাত্মদর্শনপাপবিহীনং এনং যোগিনং যৎ উত্তমং সুখং, তৎ উপৈতি উপগচ্ছতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—প্রশান্তমনা, গতচাঞ্চল্য, নিষ্পাপ, অদ্বয়জ্ঞানসম্পন্ন এই যোগী তখন পরম সুখ লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—প্রতি চিত্তবিলাস, প্রতি চিন্তাতরঙ্গ, প্রতি সুখদুঃখের অভিঘাত, তোমারই উপর তোমারই বুকে তোমাকেই আশ্রয় করিয়া ফুটিতেছে। প্রতি জ্ঞানাবর্ত্তনের তলদেশে তোমারই নিজবোধ শান্ত শিবের মত বুক পাতিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই দেখাটি, এই অনুভূতিটি অনবরত জাগাইয়া জাগাইয়া রাখিতে হইবে। এই অভ্যাসে অভ্যস্ত হইলে নিজত্বের বোধটি প্রোজ্জ্বল হইয়া, অন্য সকল বোধকে সূর্য্যকিরণে তারকার মত দীপ্তিহীন করিয়া তুলিবে। দিবাভাগে তারকা-সকল যেমন অদৃশ্য হয়, আত্মবোধরূপ আদিত্যের উদয়ে সকল জ্ঞানাভিঘাত তেমন অদৃশ্যতুল্য হইতে থাকিবে। শুধু তাহা নহে, শরীরের আপাদমস্তক নিজসত্তার অনুভূতিতে সম্বুদ্ধ হইয়া, স্থূল জড় শরীরের উপলব্ধিকে অপসারিত করিতে সক্ষম হইবে। আত্মবিশ্বাস, আত্মবীর্য্য, আত্মশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, এইরূপে ক্রমশঃ আত্মময় জ্ঞানসংস্থান অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ওরে, আত্মবোধেরই উপর সর্ব্ববোধ প্রতিষ্ঠিত—আত্মবোধের আলোকে সর্ব্ববোধ আলোকিত—আত্মবোধই সর্ব্ববোধের প্রাণস্বরূপ, এই উপলব্ধি যত ঘনীভূত হইবে, ততই তোর দ্বৈতবোধাত্মক জ্ঞান বিদূরিত হইয়া, হৃদয় অদ্বয় জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকিবে। এ সাধনায় বহু আয়াস নাই। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন আপনা হইতে তিরোহিত হয়, অন্ধকার দূর করিবার জন্য

স্বতন্ত্র প্রয়াস যেমন করিতে হয় না, অথবা অন্ধকার দূর হইলে সূর্য্যের উদয় হয়, এ কথা যেমন সত্য নহে, তেমনই এই আত্মবোধের উদ্ভাসনে অজ্ঞান অন্ধকারের আবর্ত্তন আপনি বিদূরিত হইয়া যাইবে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হইবে না।—মন ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া আত্মবোধে উপনীত হইতে হইবে, ইহাও তেমন সত্য নহে। দর্শন কর ওই চিন্তার মাঝে চিন্তামণিকে; প্রতি বিষয়-পরশের মাঝে ওই আত্মবোধরূপ পরশমণি স্পর্শ কর। এ আত্মবোধ তোর নিজস্ব। ব্রহ্মের বুকে ব্রহ্মতরঙ্গ, পরামাত্মার বুকে অণু আত্মা এই অপরিণামী নিজবোধ তোকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিবে, তোর এমন কোন কর্ম্ম নাই, এমন তোর কোন চিত্ত বা হৃদয়ের চাঞ্চল্য নাই, যাহা তোর এই আত্মবোধের বুকের উপর ভিন্ন অন্য কোথাও ফুটিতেছে। তোর মনের গতি, প্রাণের আবেগ দিগ্‌দিগন্তে উধাও হইয়া উড়িয়া গেলেও চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাবি, তোর এ আত্মবোধকে অতিক্রম করিয়া এক পদও কোথা যায় নাই—যাইতে পারে না। এই তোর চিত্তের ভূমা আত্মস্থিতি; তোর স্বয়ংপ্রকাশ, সনাতন, অচল, অচ্যুত এই আত্মস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ সপ্রকাশ ব্রহ্মসুখের আগার। এই ভাবে থাকিতে থাকিতে তোর স্বয়ংবোধটির জীবত্বের স্মৃতি রৌদ্রের তাপে কুয়াসার মত বিশুদ্ধ চিতিশক্তির বুকে বিলয় প্রাপ্ত হইবে।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮

তৎফলমাহ যুঞ্জন্নিতি। এবং এবম্প্রকারেণ সদা সর্ব্বদা আত্মানং যুঞ্জন্ চিচ্চিত্তমেকীকুর্ব্বন্ যোগী বিগতকল্মষঃ বিগতদ্বৈতবোধরূপপরতন্ত্রজ্ঞানঃ সন্ সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং চিত্তবিলয়াত্মকং অদ্বয়স্বতন্ত্রজ্ঞানরূপং যৎ অত্যন্তং সুখং (সুখময়ং ভূমানং বা, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখ"মিতি শ্রুতেঃ), তৎ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বার বার যোগযুক্ত হইতে হইতে যোগী বিগতপাপ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ ভূমা সুখ লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—শ্রুতি বলেন,—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্," যিনি ভূমা, তিনি সুখস্বরূপ। অবাধ, অদ্বয়, সর্ব্বপ্রাণজননী, গগনোপমা, আত্মবোধে একান্ত সুলভা, ব্রহ্মরূপিণী, সর্ব্বাত্মবোধাশ্রয়রূপা মা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মবোধে পুনঃ পুনঃ যুক্ত হওয়া অভ্যাস করিলে যোগী এই মাতৃসংস্পর্শে কৃতকৃতার্থ হইয়া পরম সুখ লাভ করে। সমস্ত হৃদয় বা প্রাণ, যাহা লইয়া তুমি জীবপদবাচ্য, প্রাণময় বলিয়া নিজেকে অনুভব কর, সেই সমস্ত হৃদয় বা প্রাণটি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, যাহা তোমার এই অপরিণামী নিজবোধটির বহির্জ্যোতিঃ, সেই প্রাণ যাঁহাতে মগ্ন হইয়া অপ্রাণ হয়, সেই তুমি যাঁহাতে মগ্ন হইয়া ভূমা

হও, সেই মা, সেই ব্রহ্মস্বরূপিণী, সেই তোমার অন্তরেরর অণু আত্মা, তোমার পুনঃ পুনঃ যুক্ত হইবার ফলে ভূমামূর্ত্তিতে প্রকাশ পান তোমারই অন্তরে। তোমারই এই সাধক আত্মা সাধ্যার মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া, তোমার জীবত্বকে ব্রহ্মত্বে পর্য্যবসিত করেন। সেই মূর্ত্তি সুখময়ী, মৃত্যুভীতিবিদলনে সে মহাসুখের আবির্ভাব, মৃত্যুময় এ জীবত্বে সেই মৃত্যুঞ্জয়ের মহাপ্রকাশ। আহা, মরিয়া মরিয়া মরণের কশাঘাতে পুনঃ পুনঃ জর্জ্জরিত তুই রে। চির-দুর্গতির অন্ধকারে চিরবিদলিত তুই রে! চিরখণ্ডিত, চিরভিখারী, অল্প সুখের, খণ্ড প্রাণের দীন সেবক তুই রে। এ কি আজ তোর ভূমা মূর্ত্তি! এ কি আজ তোর চিরনবীন, মৃত্যুভয়হীন জীবন লাভ! ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র তুই—ক্ষুদ্র সাধনা, ক্ষুদ্র জ্ঞানের ক্ষুদ্র পূজায় কাহার আবির্ভাবে ভরিয়া গেল মৃত্যুময় এ জীবন তোর। এ কি করুণার সাগর রে—এ কি অবাধ অপার আত্মদানের মহিমা! যে চিত্ত তুই পুনঃ পুনঃ অনন্ত বিষয়ে নিমগ্ন করিয়া, আপনাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিষয়িরূপে দেখিতেছিলি, ক্রিমির মত দুরিতের মাঝে জীবনের সন্ধান করিতেছিলি, সেই চিত্ত তোর নিজের বুকে ফিরাইয়া ধরিয়া, এ কি হইল তোর অপূর্ব্ব লাভ! সারা জগতের সার সম্পদ্ এত সহজে খুঁজিয়া পাওয়া, এ কি আজ তোর সুপ্রভাত! শুধু এতটুকু প্রচেষ্টা, এতটুকু আত্মাভিমুখী আত্মগতি, ইহারই ফলে লাভ করিলি শিব-সেবিত অমৃত! ভিখারী হইলি মহেশ্বর, ক্ষুদ্র হইলি ভূমা, জীবাত্মা ধরিল বিশ্বসেবিত বিশ্বাত্মার ভূমা রূপ! অপূর্ব্ব এই যোগের ফল—অনির্ব্বচনীয় এই চিৎ ও চিত্তের ঐক্যদর্শন। গুরুর আলোক বুকে ধরিয়া পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য কর—পুনঃ পুনঃ কর অনুশীলন—এ মৃত্যুতাড়ন মহাযজ্ঞের। উপকথা নয়, বাক্‌রঞ্জনা নয়—ঋষিদৃষ্ট, ঋষিবর্ণিত, ঋষিশ্রুত স্বয়ং ভগবানের অমৃতবাণী।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯

ইদনীং যোগস্থ ব্যাপকফলং কথয়তি সর্ব্বেতি। যোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মাত্মৈকত্বানুভূতিসিদ্ধঃ সর্ব্বত্র সমব্রহ্মদর্শনং যস্য স যোগী—সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং আত্মানং স্বয়ম্বোধাশ্রয়ং—ভূতমাত্রান্তঃস্থাং প্রজ্ঞানমাত্রাং, তদন্তঃস্থাং আত্মপ্রত্যয়সারাং চিতিশক্তিং উপলভ্য, আত্মমূলমিদং সর্ব্বমিতি দৃষ্ট্বা, আত্মানং সর্ব্বত্র তথাচ সর্ব্বভূতানি আত্মনি ঈক্ষতে পশ্যতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতকে সেই সমদর্শী যোগযুক্তাত্মা পুরুষ উপলব্ধি করে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে ব্রহ্মসংস্পর্শের কথা বলিয়া, ব্রহ্মস্থ যোগীর পরবর্ত্তী ব্যাপক উপলব্ধির কথা এইবার বলিতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাহ্য

জগৎ বলিয়া যাহা আমরা উপলব্ধি করি, বস্তুতঃ তাহা আমাদিগের চিত্তের বা জ্ঞানের বাহ্য জগদাকারীয় মূর্ত্তি। সুতরাং বাহ্য জগদ্দর্শনের তলেই স্বীয় চিত্ত বা জ্ঞানকেই জগদাকারে দেখিতেছি, ইহা বুঝি। আরও বলিয়াছি, চিত্ত যেখানে যে আকারেই প্রকাশ পাক বা পরিণমিত হউক, উহার মূলেই, উহার তলেই আত্মবোধ একান্ত সপ্রকাশভাবে রহিয়াছে। এমন কোন বোধ তোমাদের বুকে ফুটিতেছে না, যাহার তলে চাহিয়া দেখিয়া, সেই বোধের জীবনস্বরূপ আত্মবোধকে দেখিতে না পাও। যেখানে চিত্তের তলে আত্মবোধ অব্যক্ত, সেখানে চিত্তও অব্যক্ত। সুতরাং জগৎক্রিয়ার আকারে আকারিত চিত্তের প্রতি বৈচিত্র্যের তলে মাত্র আত্মাই সমুজ্জ্বল ভাবে যোগীর হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। যোগী তখন সর্ব্বভূতের মাঝেই আত্মাকে ও আত্মাতেই সর্ব্ববোধ, এই উপলব্ধি করিবেই। বাহ্য বলিয়া যাহা দেখা যায়, যোগীর বস্তুতঃ তাহা জ্ঞান বা অন্তরেরই বাহ্যনামীয় বোধমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া মনে হয় না। এমন কোন বোধমূর্ত্তি সে দেখিতে পায় না, যাহার তলে "নিজ"নামীয় আত্মবোধময় বোধমূর্ত্তি নাই। সুতরাং সর্ব্বত্র জ্ঞানমূর্ত্তি ও প্রতি জ্ঞানমূর্ত্তিতে আত্মা অথবা আত্মাতে সর্ব্বভূত, ইহা দেখাই হইয়া পড়ে যোগীর স্বাভাবিক দর্শন।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০

তৎফলমাহ যো মামিতি। পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ যো মাং আত্মানং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র পশ্যতি তথা সর্ব্বং চ ময়ি আত্মনি, তস্যাহং সর্ব্বাত্মস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি, স যোগী চ ন মে পরমেশ্বরস্য আত্মরূপতয়া প্রণশ্যতি অদৃশ্যো ভবতি "ন ততোঽন্যোঽস্তি দ্রষ্টে"তি শ্রুতেঃ। আত্মৈব সর্ব্বস্বয়ম্বোধস্য দ্রষ্টেতি জ্ঞাত্বা কদাপি ন তজ্‌জ্ঞানং বিস্মরতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে এইরূপে আত্মস্বরূপ ভগবান্‌কে এবং সমস্ত ভগবানেই বলিয়া দর্শন করে, ভগবান্ কখনও তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হন না এবং সেও ভগবানের দৃষ্টির বহির্ভূত হয় না।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহা যদি বেশ উপলব্ধি করিয়া থাক, তবে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, ওই প্রকারে আত্মোপলব্ধি প্রস্ফুট হইলে আর ভগবান্ জীবের দৃষ্টিবহির্ভূত হইতে পারেন না এবং জীব যে অহর্নিশ ভগবদ্দৃষ্টির তলে, এ কথা জীব আর ভোলে না। এ চক্ষে চক্ষে মহামিলন কাহাতে কাহাতে, সেইটি আর একটু পরিষ্কার করিয়া ধারণা করিয়া লও। ওই যে আমার আমিত্বের তলে, আত্মা যেখানে অপরিণামী অভোক্তা, শুধু আমার ভোগময় আত্মবিলাসের দ্রষ্টা ও প্রেরয়িতা, ওই পরমেশ্বর আত্মাতে—আর এই যে আমার ভোক্তৃত্ববোধময়

সেই পরমেশ্বর আত্মারই জীবমূর্ত্তি, এই ইহাতে। এই দুই আত্মায়—এই আত্মায় ও আত্মবোধময় জীবে মিলন দর্শন, প্রতি দর্শনের একীকরণ। কর্ম্মফলভোক্তারূপে এক দিকে—দ্রষ্টা ও প্রেরয়িতারূপে, ধর্ত্তা পাতা সংহর্ত্তারূপে, আশ্রয়রূপে অন্য দিকে,—এই জীবেশ্বরে আলিঙ্গন। সে জীবেশ্বরে মিলন হইতে জাগ্রত হয়, জাত হয়—প্রাণ, প্রীতি, অহৈতুকী ভালবাসা,—জীব হয় বীতশোক। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥" শ্রুতি এইরূপে যে আত্মতত্ত্বের স্বগতভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ভেদের মিলনজাত অবসান সাধকের বুকে পুনঃ পুনঃ ঘটিতে থাকে।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১

তদা অহৈতুকীভক্ত্যুদয়েন জীবন্মুক্তির্ভবতীত্যাহ সর্ব্বেতি। ভগবদীক্ষণালোকমুক্তপ্রজ্ঞঃ একত্বমাস্থিতঃ আত্মৈকত্বং প্রাপ্তঃ যোগী তদা অহৈতুকীপ্রীতি-প্রেরণয়া সর্ব্বভূতস্থিতং মাং পরমাত্মনং ভজতি (খণ্ডাত্মবোধসম্পন্নপুরুষস্য অহৈতুকীপ্রীত্যধিকারো নাস্তীতি ভাবঃ)। যো মাং এবম্প্রকারেণ ভজতি, সর্ব্বথা সর্ব্বকর্ম্মণি সর্ব্বভাবাবর্ত্তনে বর্ত্তমানোঽপি স ময়ি বর্ত্ততে, অচ্যুতং মাং পশ্যতীতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—একমাত্র পরমাত্মাই সর্ব্বভূতে আত্মারূপে অবস্থিত, এইরূপ জানিয়া যে আমার ভজনা করে, সে সর্ব্বব্যাপারে সংযুক্ত হইয়াও পরমাত্মাতেই বিরাজ করে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভগবদ্দৃষ্টির তলবাসী যোগীর অহৈতুকী প্রীতির উদয় হয়। আত্মসত্তার সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা পরিদৃষ্ট না হইলে অহৈতুকী প্রীতি বা ভক্তি জন্মাইতে পারে না। আত্মা ও পরমাত্মার মিলন ভিন্ন অহৈতুকী প্রেম জন্মে না, অহৈতুকী ভজনা হয় না। খণ্ডজ্ঞানবিমূঢ় জীব হেতুর ধারা অবলম্বন করিয়া ভগবদ্‌ভজনা করিতে পারে, কিন্তু তাহা থাকিয়া থাকিয়া শুকাইয়া যায়। কারণের তারতম্যে তাহার উৎকর্ষতা অপকর্ষতা সংঘটন হয়, খণ্ড স্বার্থের কালিমায় তাহা প্রায়শই কলঙ্কিত থাকে, তাই সর্ব্বত্র ভগবানের সহিত দৃষ্টি-বিনিময় যতক্ষণ না ঘটে, ততক্ষণ যে ভজনা, তাহা খণ্ড স্বার্থের ভজনা। সেই জন্য ভগবান্ ধারাবাহিক ক্রমে যোগীর উপলব্ধির ক্রমগুলি বর্ণনা করিয়া, সর্ব্বত্র আত্ম-দর্শনের কথা বলিয়া, তার পর ভজনার কথা উল্লেখ করিলেন। ওইরূপ উপলব্ধির পর তবে ভজনার উৎস খুলিয়া যায়, অফুরন্ত অচ্যুতরসে বিভোর হইয়া, সে আত্ম-মিথুনের ফলস্বরূপ বিমল প্রাণের প্রস্রবণ আত্মার লাবণ্যের মত বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। সাধক যতক্ষণ না সাধ্যের সহিত একীভূত হয়, ততক্ষণ কি সাধ্যের সাধনা হয় রে! তোদের যদি জিজ্ঞাসা করি,—কাহার তোরা উপাসক, এক এক জন

হয় ত এক এক দেবতার বা এক এক ভাবের নাম করিয়া পরিচয় দিবি,—আমি অমুকের উপাসক, আমি অমুক ভাবের সাধক। কিন্তু আমি বলিব—তোরা প্রকৃত সাধক তোদের জীবত্বটির। ওই জীবত্বটিতে তোরা আত্মহারা হইয়াছিস্; উহার সাধন ভজনে তোরা যে পরিমাণ ব্যস্ত, তাহার শতাংশের একাংশও তোরা ভগবৎ-সাধনা করিস্ না। কেন বলিব? বলিব এই জন্য, ভগবদ্‌ভাবে তোরা অমন করিয়া আপনাকে হারাইতে পারিস্ না বলিয়া। জীবত্বের সেবায় যে অহৈতুকী ভালবাসা তোদের বুকের উৎস হইতে প্রসারিত হয়, ভগবানের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলে তোদের সে উৎস ফুরাইয়া যাইতে দেখিতে পাই। আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করিয়া, সেই আত্মার ভূমা ব্রহ্মমূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া, আপনার জীবত্বের, বিশ্বের অচেতনত্বের ছবি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, আত্মা যখন স্বীয় মহতী তনু প্রকাশ করিয়া দাঁড়ান, তখন সমগ্র প্রাণের সমস্ত লহর যে দিগ্‌দিগন্ত ভাসাইয়া প্রবাহিত হইবে, তাহা কি বিচিত্র? ক্ষুদ্র জীবত্বের সাধনায় প্রাণের উৎস যদি এতই প্রবাহিত হয়, তবে এ ব্রহ্মত্বের আবির্ভাবে সমগ্র প্রাণ যে মুক্তধারায় বহিবে, সে কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। বিপুল আত্মবোধে উজ্জীবিত হইয়া, আত্মরমণে কৃতকৃতার্থ যোগী আত্মহারা হইয়া, তোরা যেমন অহরহ জীবত্বের ভজনা করিস্, তেমনই সে অহরহ ব্রহ্মত্বের ভজনা করিতে থাকে। জীবত্বের ভজনা তোদের যেমন অহৈতুকীরূপে প্রকাশ পায়, যোগীরও তেমনই ব্রহ্মত্বের ভজনা অহৈতুকীরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন তাহাতে ফুটিয়া উঠে জীবন্মুক্তের লক্ষণ। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, সে যোগী সর্ব্বকর্ম্মে সংযুক্ত থাকিয়াও আমাতেই বিরাজ করে।

অবহিতচিত্তে ভগবদ্‌বাক্যগুলি ধারণা কর। যে ধারায় আমি চিৎ ও চিত্তের বিভাগ দেখাইয়া, বিশ্বকে চিত্তময় বা জ্ঞানময় ও জ্ঞানকে আত্মময় করিয়া দেখাইলাম, সেই ধারাটি বুকে গাঁথিয়া রাখ। যদি বাঁচিতে চাহিস, যদি সত্য সত্য ভগবৎচরণে যুক্ত হইতে চাহিস্, যদি এ মর্ত্ত জগতের মরণময় জীবন চিরদিনের জন্য দূরে ফেলিয়া অমর হইতে চাহিস; তবে মায়ের আমার এ অমৃতময়ী বাণী মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া রাখ।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

জীবন্মুক্তস্য অন্যতমং লক্ষণং কথয়তি আত্মেতি। হে অর্জ্জুন! আত্মৌপম্যেন আত্মন এব প্রতিমূর্ত্তিঃ সর্ব্বমিদম্ ইত্যাকারজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমং আত্মানং যঃ পশ্যতি, সুখং বা দুঃখং সুখদুঃখাভিঘাতম্ অথবা সুখং ব্রহ্মত্বং, দুঃখং বদ্ধজীবত্বং সর্ব্বমেব আত্মতঃ ইতি যঃ পশ্যতি, ইত্যাকারোপলব্ধিং যোগী যদা লভতে, স তদা পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ মতঃ "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্," "আত্মত এবেদং সর্ব্ব"মিতি শ্রুতেঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সর্ব্বভূতকে আত্মারই প্রতিমূর্ত্তিরূপে দেখিয়া, সুখ বা দুঃখ, যাহা কিছু সব আত্মাই দিতেছেন, যে যোগী এইরূপে আত্মদর্শন রক্ষা করিতে পারে, সেই যোগী শ্রেষ্ঠ।

যৌগিক অর্থ।—যে পুরুষ আত্মার ভূমা মূর্ত্তি দেখিয়া, অহৈতুকী আত্মপ্রীতিতে মগ্ন হয়, সে পুরুষ সর্ব্বকর্ম্মে, সর্ব্বভাবে বর্ত্তমান থাকিয়াও আত্মাতেই বর্ত্তমান থাকে, এই কথা বলিয়া পূর্ব্বশ্লোকে জীবন্মুক্তির আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকটিতে সেই অবস্থার আরও ঘনীভূত অন্য একটি লক্ষণের কথা বলা হইতেছে। সর্ব্বত্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরমাত্মদর্শনে অভ্যস্ত পুরুষ সুখ বা দুঃখ, যেখান হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হউক না কেন, আত্মা হইতেই সমস্ত লাভ করিল, এইরূপ জ্ঞানে উজ্জীবিত হয়। অথবা সুলভ অন্তরাকাশস্বরূপ ব্রহ্মত্ব বা দুর্লভ অন্তরাকাশস্বরূপ জীবত্ব, এ উভয়ই আত্মাতেই, এইরূপ উপলব্ধিতে পূর্ণ হয়। সে অন্যত্র কোথা হইতে কিছু পাইতেছে বলিয়া বোধ করে না; সে পরের ধন গ্রহণ করে না;—"মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্" ঈশোপনিষদের এই বাক্যের সার্থকতা আপনাতেই অনুভব করে। এইটি হইল সাধকের আপনাকে পরীক্ষা করিবার কষ্টিপাথর বা নিকষস্বরূপ। আপনার ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি কতটা সুদৃঢ় হইয়াছে, তাহা এইখানেই ধরা পড়ে। সুখ-দুঃখের তরঙ্গাভিঘাত সমস্তই যে আত্মারই দান বলিা অম্লানবদনে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সেই পুরুষ মুক্তির দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া স্বীয় সম্বন্ধে ধারণা করিবার অধিকারী। যতক্ষণ ইহা না হয়, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে, তাহার ভগবদ্ভক্তি অহৈতুকী নহে।

এই যে আপনার ভিতর আত্মত্বে উপনীত হইয়া, বিশ্বময় আত্মদর্শন ও তাহার অপূর্ব্ব ফলের কথা সংক্ষেপে বলিলাম, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি উপাখ্যান বলি।—নবীন খামখেয়ালী রাজা প্রাচীন মন্ত্রীকে আদেশ করিল, সে সোনা ভিন্ন মাটিতে পা দিবে না। সুতরাং তাহার প্রাসাদপ্রাঙ্গণ, উদ্যান, যেখানে যেখানে সে বিচরণ করে, সব যেন সোনা দিয়ে বাঁধান হয়। অর্থনীতিজ্ঞ প্রবীণ মন্ত্রী সর্ব্বতোভাবে ইহাতে আপত্তি করিয়া রাজাকে জানাইল, রাজার সমস্ত ধন নিঃশেষে ফুরাইয়া যাইবে ও আর্থিক অস্বচ্ছলতায় সমগ্র রাজকার্য্য উচ্ছিন্ন হইবে, যদি এত সুবর্ণ ক্রয় করিয়া, এমন করিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখিতে হয়। রাজা অচল, কিছু শুনিল না। গত্যন্তর না দেখিয়া মন্ত্রী কার্য্য আরম্ভ করিল সত্য, কিন্তু রাজ্যের ভাবি অমঙ্গল ভাবিয়া, দিন দিন চিন্তাকুল হইয় বিমর্ষ ভাবে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। মন্ত্রীর ছিল একটি বুদ্ধিমতী কন্যা। পিতার মুখে পিতার বিমর্ষতার কারণ শুনিয়া, সে হাসিয়া পিতাকে বলিল,—এ বিপদ্ হইতে মন্ত্রীকে উদ্ধার করিবার ভাল উপায় সে জানে; দুই দিন

পরে তাহাকে রাজার কাছে লইয়া গেলেই সে ইহার উপায় বিধান করিতে সমর্থ হইবে। একান্ত অবিশ্বাস সত্ত্বেও নিরুপায় হইয়া একদিন মন্ত্রী কন্যাকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। কন্যাটি বিনয় সহকারে রাজাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলের ভিতর হইতে এক জোড়া স্বর্ণপাদুকা বাহির করিয়া, রাজার পদতলে রাখিয়া কহিল,—“মহারাজ, আপনি সোনা ভিন্ন মাটিতে পা দিবেন না বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা পূরণ করিবার জন্য এত অর্থ ব্যয় করিয়া, সোনা দিয়া মাটি মুড়িবার দরকার নাই। এই পাদুকা পায়ে দিয়া আপনি বিশ্বভুবন ঘুরিলেও সোনা ভিন্ন মাটিতে আপনার পা ঠেকিবে না।” মেয়েটির বুদ্ধির কাছে রাজা পরাভূত হইয়া, আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইল।

এই যেমন ‘সোনা ভিন্ন মাটিতে চলিব না’ সঙ্কল্পটি পূর্ণ করিতে সমগ্র মাটি সোনা দিয়া না মুড়িয়া, শুধু পা দুখানি সোনা দিয়া মুড়িলেই সে উদ্দেশ্য সফল করা যায়, তেমনই এ বিশ্বভুবন বিশ্বেশ্বরীর বিশ্বরূপ, সর্ব্বত্র এই ভাবে ভগবান্‌কে দেখিবার যে অভ্যাস করিবার কথা বলা আছে, তাহা সহজেই সুসপন্ন হয়, যদি স্বীয় আত্মাকেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগধারা অবলম্বন করিয়া ভগবান্ দিয়া মুড়িতে পারে। আপনাতে ভগবান্ দেখিলেই বিশ্বভুবন ভগবন্ময় হয়।

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩

এতস্য যোগস্য দুষ্করত্বং স্মৃত্বা অর্জ্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। হে মধুসূদন! (মধু ক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্মশুভাশুভে। ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনং মধুসূদনম্॥) যোঽয়ং সাম্যেন চিচ্চিত্তৈকীকরণেন যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ কথিতঃ, অহং এতস্য স্থিরাং স্থিতিং চিত্তস্য চঞ্চলত্বাৎ ন পশ্যামি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! তোমার কথিত এই যে চিত্তের সমতার দ্বারা পরমাত্মযুক্ত হওয়ারূপ যোগ, মনের চাঞ্চল্য বুঝিয়া ইহাতে আমি স্থিরভাবে থাকার উপায় দেখিতেছি না।

যৌগিক অর্থ।—পলাইয়া আসে মন। এ কৌশল অনুধাবন করিয়া, সমস্ত ব্যাপারটি সুন্দর ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইলেও মন এমনই চঞ্চল যে, এ ভাবে তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না; ছুটিয়া আসে বাহিরে জড়জ্ঞানে, ক্ষুদ্র জীবত্বে, ক্ষুদ্র লীলাবিলাসে। যাহা বলিলে, সবই ঠিক। কিন্তু মনের এ চাঞ্চল্য দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, এরূপ বিজ্ঞানে থাকা দুরূহ। তাই অর্জ্জুনও সাধারণ জীবেরই মত ভগবান্‌কে এই চিত্তচাঞ্চল্যের কথা বলিতে উদ্যুক্ত হইলেন।

এখানে অর্জ্জুন 'মধুসূদন' বলিয়া ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়াছেন। তামসিক ক্লীব ভোগশক্তি—যাহা প্রলয়ে ব্রহ্মার উপর এবং মৃত্যু ও সুপ্তিতে জীবের মনোগ্রন্থির উপর আধিপত্য করে, তাহাই মধুকৈটভ নামে খ্যাত। সাংখ্যোক্ত জড়া অব্যক্ত প্রকৃতিতে ও জীবের কর্ম্মাশয়ে উম্বের মত ইহার অধিষ্ঠান। অবকাশ বা শূন্য জ্ঞানের দ্বারা সম্বিদ্ধ এই শক্তির নিধনাবশেষ দ্বারা দিক্‌জ্ঞান রচনা হয়; এই জন্য বিষ্ণুর শ্রোত্রই ইহার আশ্রয় এবং মন বা ব্রহ্মা আত্মস্থ হইলেই ইহার অব্যক্ততা সিদ্ধ হয় ও সৃষ্টিকালে অচেতন ভৌতিক সৃষ্টির ইহাই উপাদান হয়। বিষ্ণুর জঘনদেশে ইহার মৃত্যু। "হন্‌" ধাতু হইতে জঘন শব্দের উৎপত্তি। "হন্‌" ধাতুর অর্থ বধ করা। জ্ঞানময় পরমেশ্বরের অচেতননামীয় জ্ঞান হইতে অচেতন ভৌতিক সৃষ্টি। এই অচেতননামীয় জ্ঞানই বিষ্ণুর জঘনদেশ এবং সমগ্র ভৌতিক বিশ্ব তাঁহার পাদদেশ। এ সম্বন্ধে বিশদভাবে পরে বলিব। এখানে শুধু এইটুকু লক্ষ্য করিবার যে, চিত্ত আত্মময় হইলেই বাহ্যবোধরূপ অবকাশ বা শূন্যবিস্তার তিরোহিত হইয়া, সব আত্মবোধে পূর্ণ হইয়া যায় এবং সেই উপলব্ধি পাইয়াই অর্জ্জুন 'মধুসূদন' বলিয়া ভগবান্‌কে সম্বোধন করিলেন।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

মনসঃ স্বভাবং বর্ণয়তি চঞ্চলমিতি। হে কৃষ্ণ! (চিত্তস্য তামসিকবিষয়প্রিয়ত্বং, ততো ভক্তজনচিত্তাকর্ষণযোগ্যতাঞ্চ সংস্মরন্ অত্র কৃষ্ণেতি সম্বোধনম্) চঞ্চলং হি মনঃ, নহি কেবলং চঞ্চলং, পরন্তু প্রমাথি ইন্দ্রিয়বিক্ষোভকরং, কিঞ্চ বলবৎ, দুর্দ্দমনীয়ত্বাৎ দৃঢ়ং দুর্ভেদ্যং, অহং তস্য নিগ্রহং নিরোধং বায়োরিব সুদুষ্করং মন্যে। বায়ুঃ যথা সর্ব্বত্র ধাবতি, তথৈব চিত্তং বিষয়েষু প্রধাবতীতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে কৃষ্ণ, মন অতীব চঞ্চল, বিক্ষোভকারী, বলবান্ ও সুদৃঢ়। ইহাকে বশীভূত করা, বায়ুকে বশীভূত করার মত দুষ্কর বলিয়া মনে করি।

যৌগিক অর্থ।—মনের চাঞ্চল্য, বিক্ষোভশীলতা, দুর্দ্দমনীয়তা প্রভৃতি যোগান্তরায়গুলি প্রতি জীবেই বিশেষভাবে অনুভব করে। অর্জ্জুন সেই জন্য যোগোপদেশ প্রাপ্তিতে মনের সেই স্বভাবগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেন। বিষয়াভিমুখী চিত্তগতি দেখিয়া যে আশঙ্কা প্রাণে জাগে, তাহারই কথা বলা হইতেছে বলিয়া অর্থাৎ চিত্তের তামসিক বিষয়প্রিয়তা স্মরণ করিয়া, অর্জ্জুন ভগবান্‌কে 'কৃষ্ণ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অথবা ভক্তের চিত্তকে স্বতঃই আকর্ষণ করারূপ ভগবৎধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ও চিত্তকে নিজে দমন করা অসম্ভব বুঝিয়া 'কৃষ্ণ' বলিয়া এ সম্ভাষণ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

শ্রীভগবান্ মনোনিগ্রহোপায়ং কথয়তি অসংশয়মিতি। হে মহাবাহো, সর্ব্বগ্রহণসমর্থ! মনো দুর্নিগ্রহং চলং, (এতৎ) অসংশয়ং নিঃসন্দেহম্। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাসেন পুনঃ পুনঃ এতস্য আত্মনি স্থিতিদর্শনেন, বৈরাগ্যেণ বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন, ভগবদনুরাগেণ চ গৃহ্যতে পরমাত্মরূপেণ পরিণতং ভবতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে মহাবাহো, মন নিশ্চয়ই দুর্নিগ্রহ এবং চঞ্চল; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত করা যায়।

যৌগিক অর্থ।—'মহাবাহো' বলিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্ভাষণ করিলেন। সর্ব্বগ্রহণসমর্থ জীব। এই ক্ষুদ্র, বদ্ধ, কাঙ্গাল, বিষয়াধীন জীব; এই জীবই আবার ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করিতে পারে। দুর্নিগ্রহ চঞ্চল জীবের এই মন, এই মনই আবার জীবকে মুক্তির ছবি দেখাইতে পারে। তুমি বিষয় চাহ, মন তাই বিষয়ের দিকে ছোটে। তুমি ভগবান্ চাহ যদি, তবে সে ভগবানের দিকে ছুটিবে। কিসে তুমি থাকিতে চাহ, তাহাই দেখ—আত্মায়, কিম্বা অনাত্ম বিষয়ে? আত্মজ্ঞান ছিল না বলিয়া নিত্য আত্মস্থ হইয়াও আপনাকে নিরাশ্রয়, শূন্যবাসী ও শূন্যে সৃজিত তামসিক বিষয়পদলেহী করিয়া রাখিয়াছিলে। এখন দেখিলে, তুমি পরমাত্মার বুকে সমাসীন। পূর্ণের বুকে, পূর্ণের বিষয়ে তুমি বিষয়ী। অজ্ঞানে যাহা শূন্যবৎ, অচেতনবৎ দেখিতে হইতেছিল, আত্মবোধসঞ্চারে তাহা আত্মময় ও পূর্ণতায় পরিব্যাপ্ত হইল। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ, তুমি কোন্ দিকে থাকিবে। যে দিকে থাকিতে চাহ, সেই দিকে থাক, পুনঃ পুনঃ আপনাকে সেই দিকে ধরিয়া রাখ। এই যে আত্মবোধে থাকিতে পারিতেছ না, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও আবার শূন্যে আসিয়া পড়িতেছ বলিয়া তোমার অনুভূতি, উহার কারণ অন্য কিছুই নহে,—তোমার আত্মানুরাগ এখনও সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, অর্থাৎ অন্য দিক্ দিয়া বলিলে, তোমার বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই। নৌকা লইয়া যাত্রা করিতে হইলে যেমন ক্ষেপণী সঞ্চালন আবশ্যক, তেমনই আবশ্যক তোমার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সঙ্গে সঙ্গে তুমি যে এ কূল হইতে ও কূলে যাইতে চাহিতেছ, এ সঙ্কল্পের সুদৃঢ়তা থাকা চাই। এ দিকের বাঁধনরজ্জু মুক্ত করা চাই। এ পারে যে সব মৃণ্ময় ফল ভোগ করিতেছিলে, ও পারে সেই সব ফলই সজীব সরস বিদ্যমান; তুমি এ পার হইতে ও পারে যাইতে প্রস্তুত কি না, ভাবিয়া দেখ। যে আত্মা ও চিত্তের সম্বন্ধ তোমার বুকে দেখাইলাম, উহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যদি ও পারে যাইতে সচেষ্ট হও, তবে নিশ্চয়ই তোমার আশা

ফলবতী হইবে। এক দিক্ দিয়া তোমার ও পারের উপর অনুরাগ এবং অন্য দিক্ দিয়া তদনুপাতে এ পারের প্রতি বিরাগ আসা চাই এবং আসিবে—যদি তুমি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর। মাতালের মত নঙ্গর না তুলিয়া দাঁড় বাহিলে চলিবে না, লক্ষ্য তোমার অভ্যাস ও বৈরাগ্য, দুই দিকেই পড়িয়া যাওয়া চাই। তাই ভগবান্ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা উল্লেখ করিলেন।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

আত্মবশীভূতচিত্তৈব যোগাবাপ্তৌ মুখ্যকারণমিত্যাহ অসংযতাত্মনেতি। অসংযতাত্মনা অনাত্মকামিনা, তস্মাৎ অযত্নশীলেন যোগো দুষ্প্রাপঃ দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মম মতিঃ। বশ্যাত্মনা আত্মকামিনা তু যততা যত্নশীলেন যোগ উপায়তঃ যথা-কথিতোপায়েন অবাপ্তুং প্রাপ্তুং শক্যঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অসংযতাত্মা পুরুষের পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহাই আমার অভিমত। বশীভূতাত্মা যত্নশীল পুরুষ পূর্ব্বকথিত উপায়ে যোগ লাভ করিতে পারে।

যৌগিক অর্থ।—আত্মকামী হইয়াছ কি না, ইহাই প্রথমে দর্শন কর। অভিলষিত বিষয়েই মন স্বতঃ ধাবিত হয়; যে দিকে প্রিয়ত্ববোধ, সেই দিকে চিত্তের গতি। শুধু তাহাই নহে, যাহা হইতে আপাত তৃপ্তির আশা আছে অথবা যাহা হইতে সমস্ত দুঃখ জ্বালা ভীতির পরিত্রাণ পাইবার ভরসা আছে, চিত্ত আপনা হইতে সেই দিকে ধাবিত হয়। আত্মলাভে সমস্ত দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ ও সমস্ত তৃপ্তির অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্তি, ইহা যদি ঠিক করিয়া যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে চিত্ত স্বতঃই আত্মাভিমুখে ধাবিত হইবে, তুমি আত্মকামী হইবে। যতক্ষণ আত্মকামী না হও, ততক্ষণ সংযতাত্মা হইতে পারিবে না; ততক্ষণ তোমাকে সংসঙ্গের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মমহিমা ও আত্মবিজ্ঞান শ্রবণ করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে যে যোগের উপায় কথিত হইয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ অভ্যাস হইলেও এ আত্মকামনা স্বতই জাগিয়া উঠে। সুতরাং সৎসঙ্গ ও যোগানুশীলন, ইহাই তোমার প্রথম করণীয়।

প্রতি বিষয়চিন্তার তলায় তলায় নিজবোধের বিদ্যমানতা দর্শন অভ্যাস করিলেই অনায়াসে তুমি সংযতাত্মা হইতে পারিবে। মাত্র একটু লক্ষ্য, একটু অভ্যাস, একটু মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সতর্কতা। সেই জন্য ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছেন। ঐরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের ফলে কামনার আত্মাভিমুখী গতি বলবতী হইতে থাকিবে।

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭

দুর্জ্জয়বিষয়বাসনাস্মরণেন যোগং প্রতি প্রযত্নশৈথিল্যম্ আশঙ্ক্য অর্জ্জুন উবাচ অযতিরিতি। হে কৃষ্ণ, অযতিঃ কুতশ্চিদন্তরায়াদপ্রযত্নবান্, শ্রদ্ধয়োপেতঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ, যোগাৎ চলিতমানসঃ মরণযন্ত্রণাদিনা কেনচিদপি কারণেন চলিতং যোগবিচ্যুতং মানসং যস্য সঃ, যোগসংসিদ্ধিং মোক্ষং অপ্রাপ্য, কাং গতিং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধা সহ যোগ করিতে গিয়া, প্রযত্নশৈথিল্যবশতঃ চিত্ত যাহাদিগের যোগ হইতে বিচ্যুত হয় যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া, তাহারা কি গতি লাভ করে?

যৌগিক অর্থ।—যোগকার্য্য অভ্যাস করিয়া শ্রদ্ধার দার্ঢ্য যাহার আসিল, অথচ বিষয়ানুরাগ যাহার কমিল না, ইচ্ছা সত্ত্বেও রোগ শোক আদি নানা যন্ত্রণায় অথবা মরণের আবির্ভাবে যোগে অপক্কতা হেতু যাহার চিত্ত আত্মচ্যুত হইল, সে পুরুষ মৃত্যুর পর কিরূপ গতি লাভ করিবে, ইহাই অর্জ্জুনের আশঙ্কাময় জিজ্ঞাসা। এ আশঙ্কা স্বাভাবিক। ভগবৎকামনা যতক্ষণ প্রবল হইয়া চিত্তের উপর আধিপত্য না করে, ততক্ষণ স্বভাবতঃই মনে হয়, দুর্ব্বার বিষয়বাসনা কেমন করিয়া ভুলিব অথবা সামান্যমাত্র ভগবৎলালসা লইয়া মরণকালে কেমন করিয়া ভগবদ্‌যুক্ত থাকিব? রোগ শোক যন্ত্রণা, ইহারাই যখন আমাকে আত্মবিচ্যুত করিতে সমর্থ, তখন মৃত্যুরূপ ভয়াবহ কালে কেমন করিয়া আমি যোগস্থ থাকিব। আত্মবিশ্বাস যতক্ষণ প্রগাঢ় না হয়, ততক্ষণ এ আশঙ্কা অনিবার্য্য। সমস্ত চিত্তব্যাপার, সমস্ত সুখ দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা, মরণ জীবন, যাহা কিছু নিজবোধরূপ আত্মারই উপরে সংঘটিত হইতেছে, উহারই আশ্রিত সমস্ত, মরণ উহারই বুকেরই একটি আয়তন, মরণ উহাতেই মরণ প্রাপ্ত হয়,—পাপ উহাতেই অপাপ হয়, সর্ব্বগতি উহাতেই গতি হারায়, এ ধারণা যতক্ষণ না পূর্ব্বকথিত উপায়ে বুকে আদিত্যবৎ প্রকাশ পায়, ততক্ষণ ইহ-পরলোক-সঞ্চারে জীবের এ আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

হে মহাবাহো, সর্ব্বধারক! ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মমার্গে বিমূঢ়ঃ, গতিহীনত্বাৎ জড়স্বভাবঃ, অতএব অপ্রতিষ্ঠঃ নিরাশ্রয়ঃ সঃ উভয়বিভ্রষ্টঃ—বদ্ধজীবগতেঃ যোগিজনগতেশ্চ বিচ্যুতঃ সন্ ছিন্নাভ্রমিব বিচ্ছিন্নমেঘখণ্ডমিব ন নশ্যতি কচ্চিৎ?

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে মহাবাহো, ব্রহ্মমার্গে যাইবার পথে সে পুরুষ কি

নিরাশ্রয়ভাবে বদ্ধ জীবের সাধারণ গতি ও যোগীর অসাধারণ গতি, এই উভয় গতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, ছিন্ন মেঘখণ্ডের মত বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ?

যৌগিক অর্থ।—সাধারণ বদ্ধ জীবের মত সংসার করিতে পাইলাম না, অথচ পূর্ণমাত্রায় যোগস্থ হইতেও পারিলাম না ; মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিল—এখন গতি হইবে কোন্ দিকে ? এ দিকেও আকর্ষণ নাই, ও দিকেও অগ্রসর হইবার শক্তি নাই, এরূপ উভয়তঃ বিভ্রষ্ট পুরুষ দেহান্তে কি ছিন্ন মেঘখণ্ডের মত শূন্যে বিলীন হইবে ? উভয় আশ্রয়চ্যুত—এক তোমার যে সাধারণ মঙ্গলময় ক্রমবিবর্ত্তনের পথ, যাহা ধরিয়া অজ্ঞ জীব ধীরে ধীরে জগদাসক্তি বুকে লইয়া অগ্রসর হয়, অনাস্থাবশতঃ সে পথ আমার রুদ্ধ হইল, আবার দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া অথবা নানা কর্ম্মফলের, নানা অন্তরায়ের সঞ্চারে যোগমার্গেও অগ্রসর হইতে পারিলাম না, সুতরাং এ পথে বিভ্রষ্ট হইলাম ; উভয় পথবিচ্যুত যে আমি, আমি কি শূন্যে বিলয় প্রাপ্ত হইব ? আমি কি উভয় আশ্রয় হইতে চ্যুত হইব ? না, ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গ ও মর্ত্ত, উভয়ের মাঝে গতিহীন, বিমূঢ় হইয়া পড়িয়া থাকিব ?

এ প্রশ্ন সমীচীন ; বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এ প্রশ্ন ভয়াকুল চিত্তের অর্থহীন প্রশ্ন নহে। অনুভূতি অনুসারে জীবের গতি। উভয় দিকের অনুভূতির কোনটিই যদি আমার উপরে জীবন্তভাবে ক্রিয়া না করে, তাহা হইলে ধ্বংস অথবা তামসিক বিমূঢ়তা প্রাপ্ত হওয়াই ত সম্ভব। সেই তামসিকতার আশঙ্কা করিয়া অর্জ্জুনের এবম্বিধ প্রশ্ন। প্রগাঢ় তামসিকতায় অবীচিনামীয় নরক নির্ম্মিত হয়। উভয়মুখী কর্ম্মগতি রুদ্ধ হইলে, পাছে সেইরূপ তামসিকতা আসে, ইহাই অর্জ্জুনের এ প্রশ্নের অভিপ্রায়। "নশ্যতি" শব্দটি অর্জ্জুন ঐকান্তিক বিপরিলোপ অর্থে ব্যবহার করেন নাই, তরঙ্গহীনতা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯

অজ্ঞানকর্ষণকারী সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ কৃষ্ণ এব সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা ইত্যাহ এতদিতি। হে কৃষ্ণ ! মে মম এতৎ (এবং) সংশয়ং ত্বং অশেষতঃ নিঃশেষেণ ছেত্তুম্ অপনেতুম্ অর্হসি। হি যতঃ ত্বদন্যঃ ত্বদ্ব্যতিরিক্তঃ অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে কৃষ্ণ ! আমার এ সংশয় একমাত্র তুমিই বিদূরিত করিতে সমর্থ। তুমি ছাড়া অন্য কাহাকেও এ সংশয়ের নিবর্ত্তক দেখিতে পাই না।

যৌগিক অর্থ।—গতিহীনতার আশঙ্কা প্রাণে জাগিলে অগতির গতি ভিন্ন কে আর সে আশঙ্কা বিদূরিত করিতে পারে ? সর্ব্বগতির উপর যাঁহার কর্ত্তৃত্ব,

সর্ব্বগতাগতির যিনি একমাত্র নিয়ন্তা, তামসিক অবীচিনামীয় নরকভূমিতেও যিনি সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত এবং সে ভূমিও যাঁহার রূপবৈচিত্র্যের অংশমাত্র,—তিনি ভিন্ন কে এ সংশয় দূর করিতে পারে? সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—শ্বেত, লোহিত, কৃষ্ণ, তিন ভূমিতেই যিনি কৃষ্ণরূপে বিরাজিত, তিনি ভিন্ন কে এ চিত্তের ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার দূর করিবে? অজ্ঞানকর্ষণকারী 'কৃষ্ণ' শব্দে অর্জ্জুন সেই জন্য এখানে ভগবান্‌কে সম্বোধন করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০

অর্জ্জুনস্য সংশয়নিরাকরণায় শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি। হে পার্থ! নৈব ইহ অস্মিন্ লোকে, ন অমুত্র পরস্মিন্ লোকে তস্য যোগভ্রষ্টস্য বিনাশো বিদ্যতে। নহি যোগভ্রষ্টস্য নিকৃষ্টজ্ঞানক্ষেত্রেষু জন্মপ্রাপ্তিঃ সংঘটত ইত্যর্থঃ; হে তাত! (তনোতি আত্মানা রূপেণেতি তাতঃ, শিষ্যোঽপি পুত্রতুল্যঃ, তস্মাৎ তাতেতি সম্বোধনম্।) কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিং নহি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পার্থ, ইহলোক বা পরলোক, কুত্রাপি যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কল্যাণকারী কেহই কখনও দুর্গতি পাইতে পারে না।

যৌগিক অর্থ।—ইহ জন্মে বা পরজন্মে কল্যাণকারীর বিনাশ নাই, দুর্গতি নাই, নীচতর জ্ঞানভূমিতে জন্ম নাই, একবার ভগবানের দিকে চক্ষু পড়িলে সাধারণ জীবের সঙ্গে তাহার এই পার্থক্য ঘটিয়া থাকে; সে কথা পরে বলিতেছি। যাহার প্রাণ একবার আত্মজিজ্ঞাসু হইয়াছে, সে কখনও ইহজন্মে প্রাপ্ত জ্ঞানভূমি অপেক্ষা নিম্নস্তরীয় জ্ঞানভূমি লাভ করে না। সাধারণ জীবে আত্মানুসন্ধিৎসু যাহারা হয় নাই, তাহারা কর্ম্মানুসারে নিম্নতর যোনিতে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু একবার আত্মযোগ যাহার হৃদয়ে সূচিত হইয়াছে, সে নিম্নে আর যায় না। এই অভিনব রহস্যটুকু বলিবার জন্য 'কল্যাণকারীর দুর্গতি নাই' ভগবান্ এই কথাটি বলিলেন। কত জন্ম ধরিয়া কত কর্ম্ম করিয়াছ, কত অজ্ঞানতার অন্ধকার তোমার সংস্কারগ্রন্থিতে তোমার জন্য লুকান আছে, তাহার ইয়ত্তা কোথায়? দেহত্যাগের পর কোন্ যোনি প্রাপ্ত হইবে, মাত্র আজিকার তোমার জীবনগতি দেখিয়া তাহা নির্ণয় করিতে কোন রকমেই সক্ষম হইবে না। সেই দুরন্ত অনিশ্চিত অন্ধকার ভেদ করিয়া, কি আশ্বাসের বাণী আজ ভগবানের মুখে শুনিলে! আত্মযোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে, সম্যক্‌রূপে তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিলে ত কথাই নাই; যদি নাও পার, তবু জানিয়া রাখ, ইহা অপেক্ষা নিম্নগতি আর তোমার কখনও হইবে

না। শুধু এক একটি দুষ্কৃতি সুকঠোরভাবে অনুষ্ঠিত হইলে কীট পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম, যে কোন ভূমিতে মনুষ্যকে টানিয়া লইয়া ফেলিতে পারে, এমন যে পিচ্ছিল জীবের জীবনগতি, এমন যে ক্ষণভঙ্গুর জীবের জন্মধারা, তাহার মাঝে দাঁড়াইয়া যদি আজ তাহাকে কেহ বলে, ইহাপেক্ষা নিম্ন স্তরে আর তোমাকে নামিতে হইবে না, তবে সে বাণী কত আশ্বাসের, কত আনন্দের ; কর্ম্মক্লিষ্ট—অবসাদগ্রস্ত প্রাণে কত আশা, কত উৎসাহ আনিয়া দেয় সে বাণী। একবার যখন আত্মাভিমুখী গতির জন্য প্রাণ সচেষ্ট হইয়াছে, তখন আর ভগবদ্‌বোধহীন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নাস্তিকরূপে কখনও জন্ম হইবে না। কর্ম্মাবর্ত্তন আর তোমাকে নিম্নে টানিতে পারিবে না। পরন্তু এমন কুলে তোমার জন্ম হইবে, যেখানে তোমার এই যোগারম্ভ সম্যক্ সিদ্ধিতে পরিণত হইবে, সেই কথা ভগবান্ পরে বলিতেছেন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১

যোগভ্রষ্টস্য গতিং প্রত্যাগতিঞ্চ কথয়তি প্রাপ্যেতি। যোগভ্রষ্টঃ পুরুষঃ পুণ্যকৃতাং পুণ্যকারিণাং পরমেশ্বরযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য, (তেষু লোকেষু) শাশ্বতীঃ নিত্য-বোধসম্পন্নান্, সমাঃ সম্বৎসরান্ উষিত্বা বাসং কৃত্বা—(দেবা যথা অমরত্ববোধসম্পন্নাঃ, তথৈবেতি ভাবঃ) (পশ্চাৎ) শুচীনাং সদাচারবতাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে অভিজায়তে জন্ম প্রাপ্নোতি (যোগক্ষেমস্য সুলভতয়া তদেব তস্যানুকূলং স্থানম্)।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যকারীদিগের ভোগ্য লোক বহু কাল ভোগ করিয়া, শুচি ও ধনশালী পুরুষদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে।

যৌগিক অর্থ।—যোগভ্রষ্ট পুরুষ দেহত্যাগের পর সেই লোকে নীত হয়, যেখানে এখানকার মত জীবনকে মৃত্যুময় বলিয়া বোধ হয় না। আমি অমর, আমার মৃত্যু নাই, এই প্রকার বোধে যেখানে জীব বোধময় থাকে, সেই প্রকার লোকে তাহারা নীত হয়। দেবতাদিগেরও প্রলয়ে সংহার আছে, তত্রাচ যেমন তাঁহারা অমরত্বের আস্বাদন করেন, যোগভ্রষ্টরাও তেমনই অমরত্বের আস্বাদন করে। দেবতাদিগের মত কল্পান্তস্থায়ী সে ভোগ না হইলেও বহুবৎসরস্থায়ী ভোগ তাহারা লাভ করে—"শাশ্বতীঃ সমাঃ" এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করিবার ইহাই উদ্দেশ্য। নিত্যত্বের বোধসম্পন্ন বহু বৎসর, "শাশ্বতীঃ সমাঃ"র এই অর্থ করিতে হইবে। "শাশ্বতী" অর্থে মাত্র 'নিত্য' ধরিলে তাৎপর্য্যের সহিত অর্থের অসঙ্গতি হয় এবং উক্ত শব্দের অর্থ 'বহু' ধরিলেও রূঢ়ার্থের ঈষৎ হানি হয়। বিশেষতঃ যাহারা যোগস্থ হইয়াছে অথচ সম্যক্‌রূপ তাহা লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকেই যোগভ্রষ্ট বলে। যোগানুভূতির প্রথম লক্ষণ—আত্মার নিত্যত্বের উপলব্ধি ; সুতরাং গতি-

বিজ্ঞান অনুভূতিবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে বলিয়া, যেখানে গিয়া তাহারা নিত্যত্বের অনুভূতি লাভ করিবে, সেইরূপ লোকেই তাহাদের গতি অবশ্যম্ভাবী। যোগ সম্যক্ পূর্ণ হয় নাই বলিয়া পুনরাবর্ত্তন রুদ্ধ হয় না; সেই জন্য আবার জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং যোগকালে নিত্যতার উপলব্ধি ঘটিয়াছিল বলিয়া, নিত্যতার বোধময় যে লোক, সেই লোক লাভ করে। তার পর যেখানে যোগক্ষেমের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, সেইরূপ শ্রীমান্ ও সদাচারীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করে।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২

যোগভ্রষ্টস্য পুনর্জ্জন্মগ্রহণে ক্ষেত্রান্তরং কথয়তি অথবেতি। অথবা (পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি তীব্রযোগানুশীলনকারী) ধীমতাং জ্ঞানবতাম্ এব যোগিনাং কুলে ভবতি উৎপদ্যতে। লোকে যৎ ঈদৃশং জন্ম, এতদ্ধি দুর্লভতরং, শুচীনাং শ্রীমতাং কুলাৎ ধীমতাং যোগিনাং কুলং দুর্লভতরং দুষ্প্রাপ্যমিতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অথবা জ্ঞানবান্ যোগীর কুলে সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষের জন্ম হয়। এইরূপ যোগিকুলে জন্ম দুর্লভতর।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বজন্মকৃত যোগের ঘনত্ব অনুসারে শ্রীমান্, সদাচারসম্পন্ন পুরুষের কুলে জন্ম অথবা জ্ঞানবান্ যোগীর কুলে জন্ম, যোগভ্রষ্ট পুরুষ লাভ করিতে পারে। যাহার যোগ যত ঘনীভূত, সে সেইরূপ কুল লাভ করে। উচ্চতর যোগভ্রষ্ট, জ্ঞানবান্ যোগীর কুল প্রাপ্ত হয়, এরূপ কুল-প্রাপ্তি দুর্লভতর। যোগী পিতার পুত্র হওয়া বহু সাধনার ফল। কেন না, সেখানে সে অতি সহজেই যোগানুকূল পারিপার্শ্বিক সংস্থিতি ও প্রকৃতি লাভ করে। এই জন্য শুধু নিজের মুখ চাহিয়া নহে, ভবিষ্যৎ বংশের মুখ চাহিয়া, প্রতি মনুষ্যের ভগবৎসাধনাতৎপর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। শুধু আপনার কল্যাণ নহে—বংশের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, জাতির কল্যাণ, সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ ভগবৎসেবী পুরুষের দ্বারা সংসাধিত হয়। যোগ করিয়া শুধু যোগী হওয়া নহে, যোগভ্রষ্ট পুরুষের আশ্রয়স্বরূপ পুণ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা। বহু যোগভ্রষ্ট অতিথি, আপন আপন যোগ সংসিদ্ধ করিতে এইরূপ কুলে সমাগত হয়। হায় রে! আজকাল সঙ্করকর্ম্মী হইয়া আমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মহিমা হারাইয়াছি, জন্ম কর্ম্মের ধারা আজ বিপর্য্যস্ত, বিপন্ন। তথাপি এখনও আছে, এখনও যদি বাঁচাই, এখনও যদি লক্ষ্য রাখি, পূর্ণ না হউক, কতক পরিমাণে যোগীর পুত্র যোগী, জ্ঞানীর পুত্র জ্ঞানী, ইহা আমরা পাইতে পারি। কিন্তু যা'ক—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

তত্র শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে, ধীমতাম্ বা যোগিনাং কুলে ইত্যুভয়বিধেঽপি জন্মনি পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বদেহভবং তং বুদ্ধিসংযোগং আত্মযোগবিষয়িণ্যা বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে প্রাপ্নোতি। হে কুরুনন্দন! (যোগস্যাপি কর্ম্মধারানুবর্ত্তিত্বং স্মৃত্বা সম্বোধনমিদং) ততঃ তস্মাৎ পূর্ব্বানুষ্ঠিতযোগবুদ্ধিসংযোগাৎ ভূয়ঃ অধিকতরং সংসিদ্ধৌ সংসিদ্ধিনিমিত্তং যততে যত্নং করোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই জন্মে সে পূর্ব্বজন্মকৃত বুদ্ধিসংস্কার লাভ করে এবং আরও অধিক যোগসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়।

যৌগিক অর্থ।—'কুরুনন্দন' বলিয়া এখানে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিবার উদ্দেশ্য—এ জীবন যে কর্ম্মক্ষেত্র এবং কর্ম্মধারাই জন্মজন্মান্তর ধরিয়া পরিপুষ্ট হইয়া জীবকে নৈষ্কর্ম্ম্যে উন্নীত করে, সেইটি যেন মা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। যোগসংস্কারের তারতম্য অনুসারে, হয় যেখানে যোগক্ষেমের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, তেমন গৃহে অথবা যেখানে যোগের উৎকর্ষতা বিরাজমান, তেমন লোকের গৃহে জাত হইয়া, পৌর্ব্বদেহিক সংস্কার লাভ করিয়া, যোগের সম্যক্ সিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হয়। যোগও কর্ম্মের অন্তর্গত, সুতরাং সাধারণ কর্ম্মবিজ্ঞান অনুসারে যোগকর্ম্মও এইরূপ জন্মে জন্মে বিবর্দ্ধমান হয়। যোগ যেন কর্ম্ম নয়, অনেকে এইরূপ ধারণা করে। সেই ধারণা যে অমূলক, যোগের এই জন্মজন্মান্তরে ক্রমবর্দ্ধমান গতির বর্ণনা দেখিয়া ইহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবে।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪

অভ্যাসাৎ স্বভাব ইতি শ্লোকস্য পূর্ব্বার্দ্ধেন দর্শয়িত্বা, উপসংহরণায় পরার্দ্ধেন যোগস্য তত্ত্বসিদ্ধান্তং কথয়তি। পূর্ব্বেতি—স যোগভ্রষ্টঃ, তেনৈব হি পূর্ব্বাভ্যাসেন পূর্ব্বজন্মকৃতযোগাভ্যাসেন অবশঃ অপি প্রচেষ্টয়া বিনাপি, হ্রিয়তে ব্রহ্মণি আকৃষ্টঃ ক্রিয়তে, অভ্যাসেন কর্ম্মণাং স্বভাবরূপপরিণামিত্বাৎ। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরপি, কিন্তুতোঽয়ং পরমাত্মনা সহ জীবস্য যোগঃ ইতি জ্ঞাতুম্ ইচ্ছুরেব, অনুসন্ধানমাত্রেণৈবেত্যর্থঃ, শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে—চিত্তস্বরূপিণীং শব্দাত্মিকাং বিশ্বমূর্ত্তিং অতিক্রম্য নিজবোধরূপম্ আত্মানং পশ্যতি, আত্মনঃ সার্ব্বভৌমত্বাৎ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত অভ্যাসের ফলে বিনা প্রচেষ্টাতেও আপনা আপনি যোগসাধনা হইতে থাকে। যোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলেই সাধারণ বিহিত কর্ম্মাদিময় ভাবসকল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মোক্ষের সূচনা হয়।

যৌগিক অর্থ।—আজ যাহা অভ্যাস কর, দুই দিন পরেই তাহাই স্বভাবে পরিণত হয়। জন্ম জন্ম যোগাভ্যাসীর যোগসাধনও সেই জন্য স্বভাবসিদ্ধ হইয়া যায়। স্বতঃ তাহার প্রাণের গতি ভগবন্মুখী হয় ও তাহাকে যোগস্থ করিতে থাকে। অভ্যাসের

এইরূপ স্বভাবতাপ্রাপ্তি আছে বলিয়াই আমরা জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জীব দেখিতে পাই। প্রকৃতি এইরূপে যাহার যোগমুখী হইয়া যায়, তখন সে যে স্বতঃসিদ্ধ যোগী হইবে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

যোগেশ্বরী এই অবধি যোগগতি বলিয়া, সেই যোগ মূলতঃ কিরূপ, যোগের প্রধান স্বরূপ কি, সেই সম্বন্ধে বক্তব্য উপসংহার করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—বৎস, যোগ এমনই জিনিষ যে, প্রাণ যোগজিজ্ঞাসু বা যোগের অনুসন্ধিৎসু হইলেই শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্তন করে—বাহ্যদর্শনময় চিত্ত অন্তর্মুখে ধাবিত হয় এবং শব্দব্রহ্ম বা শব্দাত্মক চিন্তাময় চিত্তজগতের মূলের দিকে দৃষ্টি গতিশালী হইয়া, নিজবোধরূপ শিবলিঙ্গে ন্যস্ত হয়। তত্ত্ববিৎ গুরুর নিকট উপদেশ পাইলে যে যোগের প্রারম্ভ এত সুলভ এবং সেই যোগ যখন অভ্যাসের দ্বারা প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে, তখন আশঙ্কা কিসের তোর রে জীব! মা বলিবামাত্র যদি মায়ে গিয়া উপনীত হইতে সক্ষম, তবে কিসের ভাবনা, কিসের ভয়? এমন সুলভ সহজ যোগে যদি তোর প্রযত্ন আসিয়া থাকে, তবে পরা গতি লাভ করিতে বিলম্ব কি?

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥ ৪৫

যোগস্য সম্যগ্‌লাভে পরমং ফলং কথয়তি প্রযত্নাদিতি। প্রযত্নাৎ যতমানঃ যোগী, যোগে উত্তরোত্তরমধিকং যত্নং কুর্ব্বন্‌, সংশুদ্ধকিল্বিষঃ বিধূতপাপঃ সন্‌, অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ অনেকজন্মসু উপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যক্‌ যোগী ভূত্বা, (ধ্রুবাং স্মৃতিং লব্ধ্বা—"স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি শ্রুতেঃ) ততঃ পরাং গতিং যাতি, মোক্ষং লভতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্তপ্রকার প্রযত্নের দ্বারা জন্মজন্মান্তরকৃত সংস্কারের বলে বিধৌতপাপ, স্বভাবসিদ্ধ যোগী হইয়া মোক্ষরূপ পরা গতি লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—হিরণ্যকশিপুর বধের পর প্রহ্লাদ যখন রাজা, তখনকার একটি উপাখ্যান বলি।—প্রহ্লাদের রাজসভায় যোগী ঋষিরা প্রায়ই আসিতেন এবং প্রশংসমানচিত্তে প্রহ্লাদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রহ্লাদ যে তাঁহাদের অপেক্ষাও সমধিক উচ্চ সাধক, এ কথা প্রায়ই বলিতেন। প্রহ্লাদ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিত না এবং ঋষিবৃন্দ যে তাহাকে বৃথা স্তুতি করিবেন, ইহাও ধারণায় আনিতে পারিত না। একদিন নারায়ণ প্রহ্লাদের নিকট আসিলে, প্রহ্লাদ তাহার চিত্তের এই সংশয়ের কথা নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নারায়ণ সে কথার বিশেষ কোন উত্তর না দিয়া, প্রহ্লাদকে লইয়া জলবিহার করিবার জন্য সমুদ্রে যাত্রা

করিলেন। নারায়ণ যে দিকে তরণী লইয়া যাইতেছিলেন, সে দিকে প্রহ্লাদ বহু বার আসিয়াছে, অথচ সে দিন প্রহ্লাদ সমুদ্রবক্ষে একটি বিস্ময়াবহ দৃশ্য দেখিতে পাইল। প্রহ্লাদ দেখিল, সমুদ্রবক্ষ হইতে এক শুভ্র পর্ব্বত অভ্র ভেদ করিয়া অবস্থান করিতেছে। এরূপ পর্ব্বত সমুদ্রবক্ষে সে কখনও ত দেখে নাই; নারায়ণকে সবিস্ময়ে এ কথা বলিলে, নারায়ণ তরণী লইয়া পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছু দূর যাইবার পর প্রহ্লাদ অধিকতর বিস্ময়ে দেখিল, সেটি প্রস্তর-নির্ম্মিত পর্ব্বত নহে—অস্থিস্তূপ। নারায়ণকে প্রহ্লাদ ভীতিবিজড়িত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল,—প্রভু, এ বিপুল অস্থিস্তূপ সমুদ্রের বুকে কোথা হইতে আসিল এবং এ কোন্ বিরাট্ পুরুষের অস্থিপুঞ্জ? সে ভীমকায় পুরুষ কোথায় কবে জীবিত ছিল কি তাহার পরিচয়? নারায়ণ বলিলেন,—বৎস, তুমি সমগ্র স্তূপ দেখিতে পাইতেছ না। উর্দ্ধে জলের উপরিভাগে যত দেখা যাইতেছে, জলগর্ভে সমুদ্রের তলদেশে এ স্তূপের ততখানি বিদ্যমান। ইহা একজনেরই অস্থিস্তূপ সত্য, কিন্তু এক জন্মের নহে। তাহার যতগুলি জন্ম আমার অনুসন্ধান না করিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল, ততগুলি জন্মের অস্থি জলগর্ভে নিহিত; এ স্তূপের যেখানটা জলের উপর হইতে পরিদৃশ্যমান হইতেছে, যে জন্মের ঐ অস্থি, সেই জন্ম হইতে সে আমার অন্বেষণে অগ্রসর হইয়াছিল। ঐ স্তূপের শিখরদেশে সর্ব্বশেষে যে অস্থি আছে, উহা তাহার গত জীবনের অস্থি এবং শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে প্রহ্লাদ! এ সমস্ত অস্থি তোমারই। ঋষিরা কেন তোমাকে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদর করেন, এ কথা আজ তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে। ঋষিরা অতিরঞ্জিত ভাষায় তোমাকে স্তুতি করেন নাই এবং তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ধ্রুব সত্য। তাঁহারা আজ প্রযত্নশীল যোগী, কিন্তু তুমি স্বভাবসিদ্ধ যোগযুক্ত পুরুষ; যোগে আর তোমায় যত্ন করিতে হয় না, চেষ্টা করিতে হয় না, আত্মযোগ আজ তোমার প্রকৃতিগত। আজ আমি তাই তোমার আবাহন মাত্রে, তোমার স্মরণমাত্রে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হই; মূর্ত্ত হইয়া—মানবীয় তনু ধারণ করিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করি। তুমি আমার ভজনা কর কি না, সে দৃষ্টি আজ আমার নাই, আমি তোমার সাধক।

ইহাই স্বভাবসিদ্ধ যোগীর লক্ষণ। বহু বহু জন্ম ধরিয়া প্রযত্ন করিয়া এইরূপে জীব স্বভাবসিদ্ধ যোগ প্রাপ্ত হয়। এমন কি তুই হ'বি রে! ধূলায় ধূসর, ছিন্ন কন্থাশায়ী নিরাশ্রয় জীব, খণ্ডজ্ঞানের আঁধারে ঢাকা দৈত্যকুলের ক্ষুদ্র কীট, এমন কি তুই হ'বি রে! প্রহ্লাদের মত স্বভাবসিদ্ধ যোগেশ্বর, ডাকিতে হয় না—আপনি আসেন ভগবান্, এমন কি তুই হ'বি রে! তোর বায়ুহীন, বদ্ধ, অন্ধ হৃদয়-কূপে আশা-প্রদীপের এ দীপশিখা কি জ্বালিয়া রাখিতে পারিস্ রে? যেথা বায়ু নাই, সেথা কি শিখা জ্বলে, যেথা প্রাণ নাই, সেথা কি এ আশা দাঁড়ায়?

দাঁড়ায় না সত্য, প্রাণহীন—তাই এ আশা তোর প্রাণে জ্বলিয়াও জ্বলে না সত্য, কিন্তু তাহা অপেক্ষা পরম সত্য, প্রতি জীবকণারই এ অধিকার আছে। মায়ের দেওয়া পুত্রত্বের বুকের ভিতর এ অধিকারের পুণ্যবিস্তার পাতিয়া দেওয়া রহিয়াছে। চাহিয়া দেখ্, চাহিয়া দেখিতে অভ্যাস কর অন্তরে। যে যোগের অনুসন্ধান মাত্রে তুই শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করিস, সেই যোগেরই পরিণতিতে এ অধিকার তোর দেখিতে পাবি। হয় ত প্রহ্লাদের মত তোকেও "মা" একদিন বলিবেন,—ওরে তুই আমার সাধন করিস কি না, জানি না ; কিন্তু আমি তোর নিত্য সাধিকা।

জলগর্ভে প্রহ্লাদ নিজের অস্থিস্তূপ নিজে যে দেখিতে পাইল বলিলাম, ইহার অর্থ কি বুঝিলি? ইহার অর্থ ধ্রুবা স্মৃতি লাভ। ধ্রুবা স্মৃতি জাগিয়া ওঠে এ সাধনায়, জ্বলিয়া ওঠে আলোর মত বুকের ভিতর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের যত ইতিহাস, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহধারণের হাসি কান্না যত কিছু, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনার ক্রমধারা, ক্রমপুষ্টি, ক্রমে ক্রমে অবিশুদ্ধা প্রকৃতির শুদ্ধা প্রকৃতিতে পরিণতি। অগণিত জন্মের অবিরাম প্রচেষ্টা, যাহা আজ সিদ্ধিরূপে তাহার বুকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সে দেখিতে পায়। এ দেখা না হইলে সর্ব্বগ্রন্থির সম্যক্ ভেদ হয় না। "স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ," শ্রুতি এ কথা বলিয়াছেন। সেই জন্য পরা গতির প্রসঙ্গে এ স্মৃতিলাভের কথা অবশ্যই বলিতে হইবে। অনেকজন্ম-সঞ্চিত প্রচেষ্টা সে অবস্থায় তাহার বুকে ভাসিয়া উঠে বলিয়াই শ্লোকে "অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ" কথা উল্লেখ হইল, নতুবা সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে এ কথাটি পুনরুল্লেখ মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬

যতো যোগেন পরা গতির্লভ্যতে, ততঃ তপস্বিভ্যো জ্ঞানহীনেভ্যঃ তপোনিষ্ঠেভ্যঃ যোগী অধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ, জ্ঞানিভ্যঃ অনুভূতিবিহীনজ্ঞাননিষ্ঠেভ্যোঽপি যোগী অধিকো মতঃ। কর্ম্মিভ্যঃ অসমুচ্চিতজ্ঞানকর্ম্মভ্যশ্চ যোগী অধিকঃ। হে অর্জ্জুন! তস্মাৎ ত্বং যোগী ভব।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন, তপস্বী অপেক্ষা, অনুভূতিশূন্য জ্ঞানী অপেক্ষা এবং অসমুচ্চিতজ্ঞানকর্ম্ম কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত। সেই জন্য তুমি যোগী হও।

যৌগিক অর্থ।—দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক সারা দিন মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও যেমন দিক্ নির্ণয় করিতে পারে না, তাহার সকল পরিশ্রম বৃথা হয়—যতক্ষণ না দিক্ নির্ণীত হয়, তেমনই অজ্ঞান তপস্বীর সকল পরিশ্রম প্রধানতঃ ব্যর্থতাতেই ভরিয়া থাকে, যদি না তার লক্ষ্য নির্ণীত হয়। অনুভূতিশূন্য জ্ঞানী হইলেও তাহার সকল

জ্ঞানগরিমা নিশাকালীয় দর্পণের মত জ্যোতিহীন হইয়া থাকে। ভগবানে অযুক্ত হইয়া আশ্রমধর্ম্মে নিরত থাকিলেও সকল পরিশ্রম ব্যর্থতায় ভরিয়া যায়। যুক্ত তপস্বী, যুক্ত জ্ঞানী, যুক্ত কর্ম্মী হওয়া যায়—যদি পূর্ব্বোক্ত যোগপ্রণালী অবলম্বনে তপস্বী, জ্ঞানী বা কর্ম্মী হই। সেই জন্য ভগবান যোগের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইয়া, অর্জ্জুনকে যোগী হইতে উপদেশ করিতেছেন।

এইখানে আর একবার যোগের প্রণালীটি বলিলে বোধ হয়, বুঝিবার সুবিধা হইবে। এই যে ভৌতিক বাহ্য জগৎ ও তোমার ভৌতিক দেহ, ইহা মূলতঃ বিরাট্ পুরুষের অভিমানে সৃষ্ট পঞ্চ ভূত হইতে জাত। মূলতঃ উহাও জ্ঞানময়। কিন্তু সে কথা এখন তোমায় ভাবিতে হইবে না। উহা পরে তত্ত্বদর্শনের সময় বুঝিলে চলিবে। এখন তোমায় শুধু মনে রাখিতে হইবে, তুমি বাহ্য পদার্থ বলিয়া যাহা কিছু উপলব্ধি কর অথবা তোমার মনে যাহা কিছু দৃশ্য আকারে জাত হয়, সে সমস্তই তোমার জ্ঞানের বিবিধ মূর্ত্তি মাত্র। বাহ্য বিষয়-সহযোগে তোমার চিত্ত তদাকার মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে, তুমি সেই তোমার চিত্তের বাহ্য বা বাহ্য বিষয়নামীয় মূর্ত্তিকে বস্তু বলিয়া উপলব্ধি করিতেছ। বস্তুতঃ তুমি তোমার চিত্তবিলাস ভিন্ন অন্য কিছু অনুভব করিতেছ না। আর তোমার প্রতি চিত্তমূর্ত্তির তলে—চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ জল অগ্নি, সুখ দুঃখ যাহা কিছু, সমস্তের তলে—সমস্ত চিত্তবৃত্তির তলে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, তোমার নিজনামীয় একটি বোধ রহিয়াছে। সেই বোধটির কোন পরিণাম নাই—সর্ব্ববোধের তলে, তোমার "আমি" নামীয় অভিমানের তলেও সে বোধটি চিরবিদ্যমান। সমগ্র চিত্ত পরিণামশীল, আর এই নিজবোধটি অপরিণামী। চিত্ত তোমার আকাশ পাতাল, যেরূপ মূর্ত্তিই ধরুক না কেন, এমন একটি মূর্ত্তিও দেখিতে পাইবে না, যাহার তলে এ নিজবোধ নাই, যাহা নিজবোধের বুকের উপর ভিন্ন অন্য কোথাও ফুটিয়াছে। বুকের উপর ফুটিতেছে সত্য, কিন্তু এ নিজবোধটি সেই সকল চিত্তমূর্ত্তি হইতে একান্ত স্বতন্ত্র নির্লেপ। সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক তোমার জ্ঞান বা চিত্তের লীলার একমাত্র আশ্রয় অথচ একান্ত অসঙ্গ এই নিজবোধটি। এইরূপে প্রতি বোধের তলায় নিজবোধটিকে দর্শন কর। কিছুক্ষণ করিলেই দেখিতে পাইবে, বোধের বা চিত্তের যত প্রকার পরিণামী মূর্ত্তি, যেগুলি এখন সাধারণতঃ তোমাকে সমাবৃত করিয়া সর্ব্বদা তোমার বুকে ফুটিতেছে, সেগুলি অপেক্ষা এই এত দিন যেটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পার নাই, সেই নিজবোধটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। সেই সর্ব্বজ্ঞানাশ্রয় নিজবোধটিই আত্মবোধ নামে পরিচিত এবং উহারই আলোকে উহাকে দেখিলে বুঝিতে পারিবে, উনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, ভোক্তা নাই, জ্ঞাতা নাই, অথচ উনিই দ্রষ্টা হইয়াও অদ্রষ্টা, ভোক্তা হইয়াও অভোক্তা,

জ্ঞাতা হইয়াও অজ্ঞাতা। এক দিকে সর্ব্বময়, অন্য দিকে বিশুদ্ধ, নির্লেপ, মাত্র আত্মপ্রকাশে বিভোর। এইরূপ যোগের সূচনা করিলে ক্রমশঃ এই আত্মতত্ত্বটি প্রকাশ পাইয়া, ইনি আপনার ভূমা ঈশ্বরমূর্ত্তি প্রকট করিয়া, তোমার তুমিত্বকে অব্যক্ত করিয়া দণ্ডায়মান হইবেন তোমারই বুকে। তখন তোমার আত্মপরমাত্ম-মিলন হইতে অহৈতুকী ভক্তি তোমাকে ভাসাইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে; তখন হইবে তুমি শ্রেষ্ঠ যোগী। মা সেই কথা বলিয়া এ অধ্যায়ের সমাপ্তি করিতেছেন।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭

“সর্ব্বভূতস্থিতং যো মা”মিতি শ্লোকেন পরমাত্মনঃ অহৈতুকীভক্তিময়ং ভজনং কথিতম্। তদেব প্রযত্নবতাং যোগিনামাদর্শরূপমিতি তদধিকারিণাং যুক্ততমত্বং কথয়তি যোগিনামিতি। সর্ব্বেষাং যোগিনাং প্রযত্নশীলানাং মধ্যে যঃ মদ্গতেন, পরমাত্মনি একীভূতেন অন্তরাত্মনা আত্মবোধেন শ্রদ্ধাবান্ সন্, মাং পরমেশ্বরং ভজতে, স যুক্ততমঃ যোগিভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ মে মম মতঃ সম্মতঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সমস্ত যোগীদিগের মধ্যে মদ্গতআত্মা হইয়া, শ্রদ্ধার সহিত যে আমার ভজনা করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী, ইহাই আমার অভিমত।

যৌগিক অর্থ।—আত্মবোধের উদয়ে সেই আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থিত বলিয়া যখন উপলব্ধি হইতে থাকে, যখন এই আত্মাই সর্ব্বভূতের আত্মা, পরমাত্মাই সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আত্মরূপে অবস্থান করিয়া, এই বিশ্বলীলাময় পরমেশ্বরত্ব প্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ উপলব্ধি আসিতে থাকে, তখন প্রাণে অহৈতুকী ভক্তির পূত প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। উহা সর্ব্ববিজ্ঞানাভাস সহস্রারের সুধাধারা, উহা যোগেশ্বরের শিরোবিহারিণী, দ্বিগলিত বিষ্ণুগঙ্গাধারা, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি। যোগী যোগের সম্যক্ পরিণতিতে এই গঙ্গায় অভিস্নাত হইয়া মোক্ষ লাভ করে। এই গঙ্গার সংস্পর্শে যত জৈবী শক্তি দৈবী শক্তিতে পরিণত হয়, যত মৃত স্মৃতি পুনর্জ্জীবিত হইয়া যোগীকে সর্ব্বজ্ঞ করে—আপ্তকাম করে, অহৈতুকী ভক্তি ধারণ করিবার সামর্থ্য দিয়া তাহাকে শিব করে। যোগের এ মহাপরিণতি যে যোগীর ভাগ্যে মা আবির্ভূত করিয়া দেন, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে ভাবে তোমরা জীবত্বকে ভোগ কর, সেই ভাবে যখন পরমাত্মতত্ত্বে আত্মহারা হইতে পারিবে, তখনই বুঝিবে, তোমরা অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিয়াছ। তোমরা সহজসিদ্ধ যোগী হইয়াছ, ঐরূপ ভজনাই অহৈতুকী ভজনা, ঐরূপ ভজনাই আত্মা দিয়া আত্মার উপাসনা। “মদ্গতেন অন্তরাত্মনা” শব্দটির অর্থ এই ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু মন দিয়া সাধনা করিলে চলিবে না, শুধু প্রাণ দিয়া তাঁহাকে জড়াইলে কাজ হইবে না, আত্মা দিয়া আত্মার

উপাসনা করিতে হইবে। শাক্তেরা ইহাকেই বলে—বলিদান, বৈষ্ণবেরা ইহাকেই বলে—আত্মসমর্পণ। এতন্নিম্নে যাহা, তাহা সম্যক্ আত্মসমর্পণ নহে। যতক্ষণ উপাস্য ও উপাসকের একত্ব সংসাধিত না হয়, ততক্ষণ বুঝিবে, সাধনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। এই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার জন্যই, পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবার অভিলাষেই তোমার ভিতর তোমার নিজত্বটি কোথায়, তাহা দেখিতে হয়। আত্মজ্ঞানের মূল্য এইখানে। নিজ আত্মজ্ঞানটিতে অবস্থান করিতে পারিলেই উনি আপনা হইতেই ভূমা পরমাত্মার মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া, অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও তোমার জীবত্বকে মুছিয়া দেন। পূর্ব্বে যে অহৈতুকী ভক্তির কথা বলিয়াছি, উহা অক্ষর, অফুরন্ত, অব্যয় প্রাণপ্রকাশ। একবার উহার আস্বাদন পাইলে জীব আর ভগবৎশূন্য হয় না, সে চিরদিনের জন্য আপনার নিত্য আশ্রয় খুঁজিয়া পায়, মর্ত্তের বসবাস সে গুটাইয়া লইতে থাকে। জলৌকা যেমন একটি তৃণ অবলম্বন করিয়া অন্যটি পরিহার করে, তেমনই সে অমৃত আশ্রয় লাভ করিয়া, মর্ত্ত আশ্রয় পরিহার করিতে থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।